প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

আনন্দধারা প্রকাশন

নতুন সংস্করণ :
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
ইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

জীবনের দুই সন্ধিক্ষণে, দুই মহাপ্রাণ নারী,—প্রাণকুমারের জীবনধারা পুষ্ট করেছিলেন। অপরিণত যৌবনে, অসহায় এবং উপেক্ষিত জীবনের বন্ধন দশায় একজন অল্পকাল জীবনাকাশ আলোকিত করে অকালেই চলে গেলেন পরলোকে, দিয়ে গেলেন অধীনতা পাশ কাটাবার শক্তি, স্বাধীন জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সাহস।

কিছুকাল পর, সেই ক্ষেত্রে আর একজনের উদয়। সেও এক জীবন-সমস্যার মধ্যে আত্মশক্তির উদ্বোধনে আত্ম-উপলব্ধির পথে বাধা বিঘ্ন নাশ করে, দীর্ঘকাল সংসার-জীবনে সহযোগিতার পর,— তিনিও আজ পরলোকে।

সেই লোকবাসী হলেও আজও তাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের সৃষ্ট নিজ নিজ গর্ভজ সন্তানদের মধ্যে।

প্রাণকুমার তাঁদেরই—।

প্রাণকুমারের স্মৃতিচারণ

এক

শিল্পীর জীবনে—গোড়ার কথা একটু আছে।

একটি জাতি বা সমাজ গড়বার কাজে প্রকৃতির হাত যদি লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এক একটা দেশাচার উপলক্ষ করে কেমন অদ্ভুতভাবে একটি জাতি অল্পদিনের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থা কাটিয়ে অভ্যুদয়ের পথে বেশ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। অষ্টাদশ আর সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে আমাদের বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের একটি প্রধান দিক, কুলীন-বংশের সঙ্গে কুলীন এবং অকুলীন-বংশের ঘন মেশামিশি। তখনকার দিনে হয়ত বোঝা যায় নি কিন্তু এখন ফলাশ্রয়ে আমরা বুঝতে পারি যে ঐ কৌলিন্যপ্রথা সংক্রান্ত যা কিছু ব্যাপার আগে ঘটে গিয়েছে তা এখনকার সামাজিক বিবর্তনের জননী। সমাজ, সমাজের জনসমষ্টি, ও তার প্রসার,—সব দিকের কথাই এর মধ্যে আছে।

সারা বাঙলার ব্রাহ্মণ-সমাজে বিবাহ ব্যাপারে কুলীন-বংশের প্রভাব এতটা প্রবল হয়েছিল যে, বহু বিবাহপ্রথা, যেটা এখনকার দিনে এতটা হেয় তখনকার সমাজে কিন্তু মহাগৌরবের বিষয়ই ছিল। একথা এখনও আমরা ভুলে যাই নি।

জোড়াসাঁকো বা পাথুরে ঘাটার ঠাকুরবংশ কিংবা বড়বাজারের গাঙ্গুলীবংশ প্রভৃতি তখনকার দিনে কলকাতার যত পুরোনো ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ অধিকাংশই অকুলীন, বংশজ অথবা পিরালী দোষযুক্ত। বংশের দিক দিয়ে তাদের এই যে পিরালী নাম, গোঁড়া কুলীন সমাজের নিম্ন দৃষ্টি তাতে নিজেদের খাটো মনে করার ফলে, কুলীন নিকষ, সকৃতভঙ্গ অথবা ভঙ্গ-কুলীন সন্তান প্রয়োজন হয়েছিল

তাঁদের বংশ-পর্যায় উন্নত করতে। আর ঐসব পাত্র সংগ্রহের জন্য বড় বড় ঘটক নিযুক্ত থাকতেন যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে মনোমত পাত্র আমদানী করে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতেন। স্ত্রীরত্নম্ দুষ্কুলাদপি, অকুলীন বা অঘর থেকে মেয়ে আনতে কুলীনদের দোষ নেই যদি কুলীনের মর্যাদা পাওয়া যায়। কিন্তু,—অকুলীনের ঘরে মেয়ে দেওয়া মহাদোষের কথা, কারণ তাতে কৌলিন্যের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ঐ যুগে কুলীন পাত্র ও অকুলীন পাত্রীতে ঘোরতর মিশ্রণের যুগ যার পরিণতি আমাদের বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসমাজ। এ ছাড়া অন্য রকমের মেশামিশিও হয়েছিল; তাতে কিন্তু আমাদের কাজ নেই, কারণ সেটা মুখ্য নয়।

সময় সময় কোন একটি লোভনীয় কুলীন পাত্রের বিবাহ-ব্যাপারে বলপ্রয়োগও চলত। আবার,—কন্যাবহুল সংসারে একটির পর একটি কুলীনপাত্র সংগ্রহ করতে কোন বংশের কর্তারা সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁর বংশধরদের পথে বসিয়েছেন, এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এসব ঐতিহাসিক সত্য অনেকেই জানেন। এই কুলীন মোহ এখনও উচ্ছেদ হয় নি বটে কিন্তু এর গৌরব-বোধ সমাজের উচ্চস্তর থেকে একেবারেই উবে গেছে। সারা উনিশ শতক পর্যন্তই সেটা ছিল, যদিও শেষের দিকে ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। কারণ তখন প্রকৃতির সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য অনেকাংশই পূর্ণ হয়ে এসেছে।

এখন থেকে প্রায় একশো ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা, যখন বড়বাজারের গাঙ্গুলীরা নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণবংশ বলে কলকাতায় পরিচিত; বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীমশাই ছিলেন প্রধান। তাঁর বংশই পরবর্তীকালে বৃহৎ গাঙ্গুলীবংশ বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তাঁর প্রথমা এবং একমাত্র কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রাননা, আর তার কোলে আশুচন্দ্র প্রমুখ পর পর ছয়টি পুত্র। বংশের মধ্যে সবাই না হোক, তার মধ্যে অবিনাশ ছিলেন চতুর্থ, তিনিই মহা কৃতী হয়েছিলেন। চন্দ্রার যখন তেরো বৎসর বয়স, সেই সময়ে

বঙ্গাব্দ ১২৩০-৩১ সালে ফাল্গুনের রাত্রে এক শুভলগ্নে তাঁর পরম রূপবতী প্রিয়তমা কন্যাকে নানাগুণে বিভূষিত, কৃতবিদ্য এবং রূপবান চট্টোপাধ্যায় বংশীয় কুলীন ব্রজসুন্দরের হাতে সমর্পণ করে বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীমশায় তাঁকে আপন সংসারভুক্ত করে নিলেন। পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলা, মাদারীপুর মহকুমা অন্তর্গত প্রসিদ্ধ খালিয়া গ্রামেই জামাতার পৈতৃক নিবাস। তাঁদের বংশেরই কোন বিবাহের নিমন্ত্রণে ব্রজসুন্দর কলকাতায় আসেন। তাঁর গুণ এবং বংশের পরিচয় জেনে গাঙ্গুলীরা তাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

ব্রজসুন্দর আর দেশে গেলেন না। এইখানেই কর্তাদের সাহায্যে একটা ভাল কাজ পেলেন। তাঁদের দাম্পত্য-জীবন সুখের হয়েছিল। তাঁদের তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। মেয়ে তিনটিরই স্ব-ঘরে বিবাহ দিয়েছিলেন।

ছেলে তিনটিই মেধাবী এবং সুসন্তান, তাদেরও বাল্যে বিবাহ দিয়েছিলেন এবং তাদের কারো কারো সন্তানাদি দেখে ব্রজসুন্দর প্রায় ১৮৬৭ সালে মারা যান।

তাঁর তিনটি পুত্র বলেছি, লয়প্রিয়, মায়াপ্রিয় ও মহাপ্রিয়, মামার বাড়িতে লয়, মায়া ও মহ নামেই তাদের ডাকা হ'ত। তিনজনেই পরম রূপবান এবং স্বাস্থ্যবান ছিলেন। কৈশোরে পাঠ্যাবস্থায় তিনজনেরই বিবাহ হয়েছিল। কুলীন সন্তানদের বাল্য বিবাহ তখনকার দিনে খুবই স্বাভাবিক। তবে এখনকার দিনে শুনে বিস্ময় লাগে যে অধ্যয়ন এবং সন্তানোৎপাদন যুগপৎ কি করে তখনকার দিনে চলত। তা থেকে আবার এটাও বোঝা যায় যে সন্তান-পোষণের দায়িত্ব জনকের উপরে থাকত না, সেটা থাকত সংসারের কর্তা, যাঁরা বিবাহ ঘটিয়ে দিতেন তাঁদের উপর। আমার পিতামহ কনিষ্ঠ। গৌরবর্ণ, তিনি এমন রূপবান কিন্তু আমার ঠাকুমা ছিলেন শ্যামা। সুতরাং এখনকার মতো সুন্দরী পাত্রীর মোহ তখন গৃহস্থঘরে ছিল না এ অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নয়।

যখন ঠাকুরদাদার বয়স পনেরো তখন তাঁর বিবাহ হয়, ঠাকুমার তখন তেরো। ঠাকুমার কাছেই শুনেছি তখন তাঁর পাঠ্যাবস্থা,—পায়রা আর পাখি ছিল তাঁর নিত্য প্রিয়সঙ্গী। বিবাহ করে ফিরে এসে গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢোকবার আগেই একজনের কাছে খবর নিচ্ছেন পাখিদের খাবার আর জল সময়মতো দেওয়া হয়েছে কিনা। এমনি বাই ছিল তাঁর।

স্কুলে থাকার সময়টুকু ছাড়া মামার বাড়িতে তাঁর পায়রা আর পাখি নিয়েই কাটত। দিনমানে তখন স্বামী-স্ত্রীতে দেখাদেখির নিয়ম ছিল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর যখন ঘরে আসতেন হাতে একগাদা বই। ঠাকুমা বলতেন,—ঐ বইগুলো ছিল যেন আমার সতীন। রাত বারোটা একটা পর্যন্ত পড়ে তবে শুতেন, আর উঠতেন ভোরবেলা। আবার কখনো কখনো ভোরে উঠে পড়া, আর পরীক্ষার সময় সারা রাত পড়া, শীতকালে রাত চারটেয় উঠে পড়া, এসব দেখতে দেখতে আমার হিসেব হয়ে গিয়েছিল যে কোন্ ঋতুতে কখন ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসবেন। এইভাবে চার-পাঁচ বছর পর যখন আমাদের হুটি মেয়ে হয়েছে তখন তাঁর একটা পরিবর্তন এল।

জুনিয়ার পরীক্ষার পরেই তাঁকে পড়া ছাড়িয়ে ছোটকর্তা, তাঁর ছোট মামা অবতারচন্দ্র—নিজের অফিসে পাকা চাকরিতে বাহাল করলেন। তাতে ভালোই হ'ল কারণ তিনি তখন থেকে ঠিক সংসারী হলেন। ক্রমে লক্ষ পড়ল আমরা ওখানে কি অবস্থায় রয়েছি। ঐ স্থানের হুর্গতিই তাঁকে কষ্ট দিয়েছিল, সেই সময় থেকেই। তাঁর চেষ্টা হ'ল কেমন করে স্বাধীন হওয়া যায়। তাঁর অন্তরের প্রার্থনা ভগবান শুনলেন।

কয়েক বছর পরেই তিনি পোস্তায় ভূষিমালের কারবার করেন, ঐ কারবারই হ'ল লক্ষ্মী। না হ'লে শুধু চাকরিতে এতগুলি পোষ্য পালন করে এতবড় বাড়িটা কি করতে পারতেন? ইতিমধ্যে প্রথমে

তাঁর পিতা মারা যান। তারপর নিঃসন্তান বড়দাদা, তারপর মেজদাদা, দুই পুত্র ও দুটি কন্যা রেখে পর পর মারা গেলেন,—তাঁর এই ভাবের একটা আতঙ্ক হয়েছিল মনে যে এখানে থাকলে তিনিও বাঁচবেন না। একা তিনি মাত্র রোজগারী, তাঁর উপরই সব দায়িত্ব।

ঠাকুরদাদামশাইয়ের মধ্য-জীবনের কথা আমার বাবার কাছে অনেকবার শুনেছি। তাঁর নির্ভীক স্বভাবের কথা,—অফিসে, কর্ম উপলক্ষে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে ব্যবহারের কথা, ইত্যাদি অনেক চিত্তাকর্ষক গল্প করতেন সে-সব একত্র দিতে গেলে একখানা বই হয়ে যাবে তাই সে-সব না বলে একটা মাত্র বলছি। বাবা বলছেন ;—

তখন আমার তেরো বছর বয়স, পৈতে হবে, একজোড়া জুতো কিনতে যাচ্চি টেরেটি বাজারে,—বাবার সঙ্গে।

বাবার তখনকার চেহারা ছিল, দেখবার মতো। একখানি দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর, ফুটফুটে গৌরবর্ণ, পথে বেরুলে লোকে চেয়ে দেখত। তিনি কখনও বিলাতী মিলের কাপড় পরেন নি। শান্তিপুরী পাত্‌লা কাপড়, কুচকুচে কালো পাড়, চুনট করা কোঁচা, তুলে পরা। কোঁচা ঝোলানো ব্রাহ্মণ-সাধারণের মধ্যে মোটেই চলন ছিল না। বাবার গায়ে জামা ছিল না, একখানা কোঁচানো চাদর গলায় বুকের দু'দিকে ঝুলচে। মোটা পায়ে মোটা চটি ;—মাথার চুল আঁচড়াতেন, কখনও টেরী কাটতেন না। মনিব্যাগ ছিল না তাঁর কখনও, টাকা-কড়ি ট্যাঁকেই সব গোঁজা।

যাই হোক, এখন আমরা গাঙ্গুলী গলি থেকে বেরিয়ে দরমাহাটা দিয়ে হ্যারিসন রোড পেরিয়ে মনোহর দাসের চক ছাড়িয়ে পুরোনো চীনা বাজারের ভিতর দিয়ে রাধাবাজারের রাস্তায় পড়েছি। ও অঞ্চলে তখন গাঁটকাটার উপদ্রব। প্রত্যেক বড় রাস্তার মোড়ে দু'চারজন করে দাঁড়িয়ে থাকত আর লোকের ট্যাঁকের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখত ; কারণ, তখনকার দিনে লোকে টাকাপয়সা

ট্যাঁকেই রাখত। আমি বাবার পিছনেই ছিলাম, বাবার ট্যাঁকে টাকার গোছা পাত্‌লা কাপড়ের ভেতর দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছিল, গাঁটকাটাদের সেটা পরম লোভের বস্তু।

আমরা রাধাবাজারের রাস্তা থেকে টেরেটি বাজারের রাস্তায় ফিরতেই সুমুখে খানিকটা দূরে দেখি দুটো ভীষণ মূর্তি গোরা, সেলার আসচে। কেল্লার গোরা বা জাহাজের সেলারদের অত্যাচার তখন খুবই ছিল ও অঞ্চলে। দিশি পুলিস সবাই ভয়ে পালাত তাদের দেখলে, ভদ্রলোকে পালাবে এ আর বিচিত্র কি! দিন দুপুরে মদ খেয়ে তারা বড় রাস্তার উপর ভদ্রলোকদের আক্রমণ করত এমন কি খুনজখম করে চলে যেত ;—সাদা রং বলে অনেক সময়েই তাদের বিচার হ'ত না।

এখন, গোরা দুটো কাছাকাছি এসে বাবার ট্যাঁকে টাকার গোছা দেখে থাকবে। একজন এগিয়ে আরও একটু এসে থমকে দাঁড়াল, তার নজর ট্যাঁকের দিকে। বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখি তিনি যেন সেদিকে লক্ষই করেন নি, আপন মনে সোজাই চলেছেন অথচ সেই গোরাটা, তাঁর ডানদিকে দশ বারো হাত দূরে। সেদিন ছিল রবিবার, বিকালে রাস্তায় তত লোক চলাচল ছিল না। আমি বাবাকে সাবধান করতে যাব, দেখতে দেখতে গোরাটা সোজা এগিয়ে এসে একেবারে খপ্ করে বাবার ট্যাঁকে টাকার গোছাটা মুঠো করে ধরে ফেললে। আর বাবাও যেন চক্ষের নিমেষে ডানহাত দিয়ে মুঠোটা চেপে ধরে বাঁ হাতে তার মুখের উপর একটা এমন ঘুষি বসিয়ে দিলেন তার মাথাটা পিছন দিকে বেঁকে গেল। দেখে সাহসে আমার বুকটা ফুলে উঠল। পিছনের গোরাটা তখন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন এই গোরা আর বাবাতে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, সেটা তখনও মুঠো ছাড়ে নি।

এইবার আমার ভয় হ'ল পিছনের গোরাটাকে এক-পা এক-পা এগিয়ে আসতে দেখে। তারা দু'জন, বাবা একা। আমি তখন

রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে, খানিকটা পিছনে টিনের লণ্ঠন তৈরি করচে মিস্ত্রীরা দেখেছিলাম, তাদের ডাকতে গেছি,—ওগো তোমরা সব এসে দেখ, আমার বাবাকে খুন করে দুটো গোরা টাকা কেড়ে নিচ্চে।

আমার কথা শুনে তারা হাতের কাজ ফেলে যে যেটা সুমুখে পেলে হাতে নিয়ে 'কৈ কোথায়?' বলে বেরিয়ে এগিয়ে এল। আমি তাদের নিয়ে দৌড়ে আসতে আসতে দেখিয়ে দিলাম,—ঐযে। আমার যাওয়া আর আসতে বড় জোর তিন-চার মিনিট, তার বেশী হয় নি নিশ্চয়ই, এসে দেখি ব্যাপারটা তখন অন্য রকম হয়ে গেছে। প্রথম গোরাটা ঘায়েল হয়ে রাস্তায় ফ্ল্যাট্ শুয়ে— তার নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে, গালে কপালে লাল লাল ঘুষির দাগ। আর একটা, সেও পড়েছিল, এখন গ্যাস পোস্ট ধরে ওঠবার চেষ্টা করছে। আর, ধস্তাধস্তিতে ট্যাঁক ছিঁড়ে যে টাকা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছিল, বাবা লাথি দিয়ে, শোয়া গোরাটার পা সরিয়ে টাকাগুলো কুড়িয়ে নিচ্চেন। বাবার মুখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে, কি সব বলছেন শুনতে পেলাম না। পাহারাওলাও তখন এসে জুটেচে।

এই ব্যাপার দেখে, কারিগর যারা সাহায্য করতে এসেছিল তারা বলে কি,—এই কি তোমার বাপকে খুন করে টাকা কেড়ে নেওয়া, বাবু? তখন অনেক লোক জড়ো হয়েচে। সকলেই বল্‌চে, ঠিক হয়েচে, বেড়ে হয়েচে, শালাদের বড় বাড়। ইত্যাদি।

ঠাকুরদাদামশাইয়ের পূর্ব কথা এই পর্যন্ত ;—এখন আমার বাবার পূর্ব কথা ঠাকুমার কাছে যা পেয়েছি তাই বলচি।

ঠাকুমার বাপের বাড়ি বেলঘরের কাছে নিমতে গ্রামে। ১২৭১ সালের আশ্বিনে যে বিখ্যাত মহাঝড় হয়ে বাঙলার সর্বনাশ হয়েছিল সেই ঝড়ের দিন, আট মাস গর্ভাবস্থায় ঠাকুমা প্রবল জ্বরে অচৈতন্য, প্রলাপ বকচেন। বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা, গর্ভাবস্থায় আটমাস অতটা জ্বর পোয়াতি-পক্ষে ভয়ের কারণ হলেও তখন তাতে কারো কোন হাত ছিল না। তার ওপর ঝড়ের বেগ দ্বিতীয় দিনেই ভীষণ

প্রবল হয়েছিল। ডাক্তার-কবিরাজ কিছুই পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং দেবতা বিমুখ দেখে ঠাকুমার বাবা হাতে পৈতা জড়িয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে আরম্ভ করলেন ; আর অন্দর মহলে মা, মাসি, পিসিরা সকলে ঠাকুরের দুয়ারে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে কপাল ফুলিয়ে ফেললেন। শেষে বিধাতার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। সেই প্রবল জ্বরের ধমকে অজ্ঞান অবস্থায় ঠাকুমা প্রসব করলেন, একটি শিশু। এতটুকু শরীর, কাটির মতো হাত-পা, তখনও চোখ ফোটে নি,—এমনি একটি নির্জীব। এ কখনও বাঁচে?—ছেলে কাঁদে না, নড়ে না-চড়ে না, নির্জীব, পড়ে আছে দিনের পর দিন, কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসেই জীবনের লক্ষণটুকু ছিল, কাজেই সকলে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করছিল যা হয় একটা হয়ে যাক্। যা হবার তা হ'ল ছয়টি দিনের পর, সাত দিনের দিন প্রভাতে দেখা গেল সেই সরু সরু হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, বড় বড় দুটি চক্ষু বিস্ফারিত করে শিশু এমন চীৎকার আরম্ভ করেছে যে শুনলে মনে হয় না ঐ শরীর থেকে এ রকম স্বর বেরুতে পারে।

যাই হোক ছেলেও বাঁচল, পোয়াতিও সুস্থ হয়ে উঠল, সকলেই বুঝলে এটা দৈবেরই খেলা। একমাস দু'মাস—ঐ পাখির মতো শরীরটি নিয়ে মাসের পর মাস কাটিয়ে শিশু বাড়তে লাগল বটে কিন্তু ছটফটানি ছাড়া শরীরের বাড় কিছু লক্ষ করা গেল না। ঠাকুমা ছেলে নিয়ে বড়বাজারে গেলেন। এইখানে ছয়মাসে ধুমধাম করে ঠাকুরদাদামশাইয়ের জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্নপ্রাশন হয়ে গেল। রাশি নাম হ'ল ধনঞ্জয় আর শিশুর পিতামহ নাম দিলেন রাজেন্দ্রনাথ ;—ডাকনাম হল রাজা।

বড় রোগা ছিল বলে গাঙ্গুলী বাড়িতে রাজা সকলকারই বড় অনুকম্পার পাত্র হয়েছিল। কর্তারা আদর করে রাজার অনেক অত্যাচার সহ্য করতেন। এইভাবে রাজা মানুষ হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে তার দুরন্তপনা বাপমায়ের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল।

লক্ষ্মী বলে একটি ঝি রাজাকে মানুষ করেছিল, সে ঐ ছেলের স্বভাব-প্রকৃতি দেখে প্রচার করে দিলে যে, ঝড়ের সময় যে নির্জীব শিশুটি হয়েছিল সে মরেছে—ঝড়ে তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তার জায়গায় একটা দানো রেখে গেছে। এটা কি মানুষ? এ একটা দানব। মানুষে কি এমন হয়?

রাজাকে একটু মোটা করবার জন্যে কোন দিকেই চেষ্টার ত্রুটি হ'ল না, এমন কি হাতির নাদ পর্যন্ত সংগ্রহ করে মাখানো হয়েছিল, তাতেও কোন ফল হয় নি। কিন্তু সে মোটা ত হ'ল না পরন্তু হয়ে উঠল ভয়ানক খেয়ালী আর নির্ভীক। ভাল লোকে যাকে বলে, লঘু-গুরু-জ্ঞানহীন যুক্তি-বিচার-বুদ্ধিহীন তাই। রাজার শরীর রোগা বটে কিন্তু তার ক্রিয়া-কলাপ মোটেই রোগাও নয় দুর্বলও নয়। গাঙ্গুলী গুষ্টির অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করলে মেজাজ বুঝে তার সঙ্গে খেলতে হ'ত—সেটা না বুঝে যে তার সঙ্গে খেলত—তার অদৃষ্টে অশান্তি। এইভাবে পাঁচ বছর গেল, তখন তার হাতেখড়িও হয়ে গেল। কিন্তু তাকে কাপড় পরানো মুশকিল।

হাতেখড়ির কয়েকদিন পরের কথা।

সেদিন বৈকালে ঈশান ভট্টাচায্যিমশাই; গাঙ্গুলী বাড়ির পুরোহিত যিনি,—বৈকালিক দেবার জন্য যথাসময়ে ঝারা থেকে তুলতে গিয়ে দেখলেন ঠাকুর নেই। নানা সংসারে শালগ্রাম শিলার নানা নাম থাকে, গাঙ্গুলীদের ঠাকুরের নাম শ্রীধর। সেই বাস্তু-দেবতা নেই, একি,—কী সর্বনাশ! হৈহৈ পড়ে গেল একটা চারদিকেই—খোঁজাখুঁজি চলল। বাড়িতে কারো মনে আর শান্তি নেই। কোন অমঙ্গলের পূর্বাভাস মনে করে পুরুতমশায় চণ্ডীদালানের রকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

তাঁর বিশ-পঁচিশ হাত দূরে সুমুখে সদর পেরিয়ে যে রাস্তা, সেখানে রাজা দিগম্বর অবস্থায় ছেলেদের সঙ্গে ঘুঁটি খেলচে। সে একটা টল দিয়ে সবার ঘুঁটির উপর এমন মারচে, এত জোরে জোরে

চোট লাগাচ্চে যে তাদের ঘুঁটি ভেঙেচুরে চারদিকে ছটকে পড়ছে চৌচির হয়ে। মহাস্ফূর্তি তার,—সে গর্ব করে বলচে,—দেখেছিস, আমার কেমন টল?

একজন জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় পেলি ভাই,—ওরকম কালো টল ত কোথাও দেখি নি? রাজা মহা উৎসাহেই বললে,—কেন, ঠাকুরঘরে!

এই কথা পুরুতমশায়ের কানে গেল, তিনি তাড়াতাড়ি এসে দেখেন তাঁর শালগ্রাম শ্রীধর রাজার হাতে টল হয়ে সকলের ঘুঁটি ফাটাচ্চেন। মেয়েরা বললে,—এটি ঠাকুরেরই খেলা।

সেই থেকে রাজার ঠাকুরঘরে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল,—তাতে রাজার কোন আফসোস হয় নি একথা সকলেই বুঝেছিল।

দুই

আমার ঠাকুরদাদামশাইয়ের ছোট বোন সর্বপ্রিয়া অপরাজিতা; যথার্থই তিনি সর্বপ্রিয়া ছিলেন. ডাকনাম তাঁর জিতু। সম্ভবত অপরাজিতা, থেকে জিতু হয়ে গিয়েছিল। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন বিশাল গাঙ্গুলীবংশের তিনি শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। এই সেদিনের কথা—কর্তাদের নাতিদের আমলেও তিনি জিতুপিসি বলে তাঁর মামাতো ভায়ের ছেলেদের শ্রদ্ধা পেয়ে গেছেন। গাঙ্গুলী বাড়ির ইতিহাস, কোথায় কবে কি হয়েছিল সেকালের কথায় তিনি ছিলেন অথরীটি। আমায় তিনি মানুষ করেছিলেন। তাঁর কাছে সেকালের কত কথাই শুনেছি। ছেলেবেলা তাঁর বিবাহ হয়েছিল এক বহুদার কুলীনের সঙ্গে—ঐ গাঙ্গুলী বাড়িতেই, মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করতেন। আমার দিদি ও বাড়ির পিসি—

তখনকার দিনে গাঙ্গুলীদের সংসারে তাঁর কাজ ছিল পান সাজা, আর আহারের পর হাতে হাতে সকলকে দিয়ে দেওয়া।

তাঁর বড় মামা আশুচন্দ্রের পাঁচটি ছেলের মধ্যে যজ্ঞেশপ্রকাশ ছিলেন মেজো, যজ্ঞেশ্বর বলেই ডাকা হ'ত। ভাই সম্বন্ধ ত! একদিন যজ্ঞেশ্বর এসে খাওয়ার পর একেবারে একমুঠো পান ডাবর থেকে তুলে নিলেন। তাঁর পাওনা মোটে তু'টি।

জিতু বললেন, কেন তুমি এতগুলো ভাগের পান নিলে ভাই! আমি কি আবার পান সাজতে বসবো? যজ্ঞেশ্বর বললেন, এখানে আজ আমার শেষ পান খাওয়া জিতু! কাল থেকে তোর কাছ থেকে আমি আর পান নেবো না।

জিতু বললেন, কেন তুমি এমন কথা বললে ভাই? ভাই তখন সরে পড়েছেন। জিতু মনে করলে ও তার ঠাট্টা! তারা সমবয়সী ছিলেন, কথাটা তেমন গুরুতর ভাবেন নি।

আগেই বলেছি, ঠাকুরবংশ আর গাঙ্গুলীবংশ এঁরাই কলকাতার প্রাচীন ব্রাহ্মণবংশ। ঠাকুরদের সঙ্গে গাঙ্গুলীদের বৈবাহিক আদান-প্রদান ত দূরের কথা আহারাদি ব্যবহারও ছিল না, কারণ ঠাকুরেরা পিরালী, গাঙ্গুলীরা গোঁড়া হিন্দু। তবে এ তুই পুরোনো বংশের মধ্যে অসদ্ভাবও ছিল না, সভাসমিতিতে কাজে-কর্মে যাতায়াত ছিল। ঠাকুরেরা চিরকালই উদারনৈতিক। তাঁদের অনেক দিনের সাধ গাঙ্গুলীদের একটি ছেলে তাঁদের ঘরে আনেন। গাঙ্গুলীরা রূপবান, তাদের ছেলেগুলি আরও সুন্দর,—বিশেষত যজ্ঞেশ্বর তখনকার দিনে বিখ্যাত রূপবান ছিলেন, ব্যবহারেও বড় তেজস্বী। এখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ সহোদর গিরীন্দ্রনাথের লোভটা গিয়ে পড়ল ঐ যজ্ঞেশপ্রকাশের উপর। কিন্তু প্রধান অন্তরায় গাঙ্গুলীরা গোঁড়া হিন্দু—সহজে, সামাজিকভাবে এ কাজ ত হতেই পারবে না আর কুল-প্রথা-অনুযায়ীও এ কাজ ত হবার নয়। তখন, কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ঠাকুরেরা একটা মহা সাহসের

কাজ করে বসলেন। প্রথমে যজ্ঞেশ্বরের পিতাকে হাত করে। তাইতে বাকী কাজটা সহজ হয়ে গেল।

গাঙ্গুলীদের বাড়ির কাছেই গঙ্গা, আর গাঙ্গুলীদের আবালবৃদ্ধ-বনিতা নিত্য-নিয়মিত গঙ্গাস্নান করে থাকেন। এখন যেখানে জগন্নাথের মন্দির, তার পশ্চিমে স্ট্র্যাণ্ড রোড, তখন গঙ্গা ঠিক তার পেছনেই ছিল এখন যেখানে বড় বড় পাটের গুদাম ঘর হয়েচে। যাই হোক পান নিয়ে জিতুর সঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের ঐ কথার ঠিক পরদিন, —যজ্ঞেশ্বর যথাসময়ে স্নানে গেলেন, কিন্তু আর ফিরে এলেন না। জিতুর তখন গতকালের কথাটা মনে হ'ল; এবং কথাটা তখনই সকলকে বলেও দিলেন; কিন্তু তা থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারলে না যে ব্যাপারটা কি হতে পারে। রাত দশটার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি থেকে অফিসিয়ালী সংবাদটি এসে পৌঁছল যে শুভলগ্নে তাঁর ভাই গিরীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী নাম্নী কন্যার সঙ্গে যজ্ঞেশপ্রকাশের বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

অপূর্ব ব্যাপার ঘটে গেল। শেষ শোনা গেল, যজ্ঞেশ্বরের পিতা প্রকাশকে ধরে এই যোগাযোগটা ঘটিয়েছেন ঠাকুরবাবুরা। আর একদল বলেন,—গাঙ্গুলীদের গোঁড়ামির উপর একটা ঘা দেবার জন্যই নাকি ঠাকুরেরা এই কৌশল করেছিলেন। তখন অবিনাশচন্দ্র কর্তা। এ নিয়ে একটা ঘোরতর কিছু করবার আয়োজনও হয়েছিল, কারণ এ ব্যাপারে গাঙ্গুলী ভায়েরা নিজেদের বড়ই অপমানিত বোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কিছুই হতে পারে নি কারণ যজ্ঞেশ্বর ঐ বিবাহে এমনই কিছু পেয়েছিলেন যার জন্য কিছুতেই আবার ফিরে আসতে রাজী হলেন না। অবিনাশচন্দ্র প্রমুখ ছোট কাকারা কোন রকমে তাকে আয়ত্ত করতে না পেরে শেষে তাঁর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছেদ করে দিলেন। হুকুম হয়ে গেল কেউ যেন এ বাড়ি থেকে আর কখনও তার কাছে না যায়।

পরে শুনেছি আশুচন্দ্রও যজ্ঞেশের কাছে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে

যজ্ঞেশপ্রকাশের কনিষ্ঠ ধনেশপ্রকাশ যতিন্দ্রমোহন ঠাকুরের কন্যাকে বিবাহ করেন, আর সে বিবাহও গোপনেই সম্পন্ন হয়েছিল। যজ্ঞেশপ্রকাশ সুস্থ দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন। আমরা যখন আর্ট স্কুলে পড়ি ১৯০৬-৭ সালেও তিনি সুস্থ শরীরে জীবিত ছিলেন দেখেছি।

আমার পিতামহ মহাপ্রিয় আর যজ্ঞেশপ্রকাশ শুধুই যে মামাতো পিসতুতো ভাই তা নয়, এঁরা পরস্পর অখণ্ড বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি যে গোপনে গোপনে যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যবহার রেখেছিলেন সে কথা বহুকাল জানা যায় নি, বাড়ির কেউ টেরও পায় নি। যখন কর্তাদের মধ্যে পুরোনো বাড়ির ভাগ বাঁটোয়ারা এবং সম্পত্তি বিভাগ আসন্ন হয়ে এসেচে এবং বৃহৎ পরিবারবর্গ নিয়ে মহাপ্রিয় যখন অন্যত্র যাবার জন্য বাড়ির সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছেন তখন সময় বুঝে ভাগনে রেজেস্ট্রি করা দলিল একখানি পেশ করলেন অবিনাশ প্রমুখ মামাদের কাছে। তাতে, ঐ বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের অংশটা, তিনি মহাপ্রিয়কে দান করেছেন। আসলে সে বাবদে ভাগনে তাঁদের কাছ থেকে কিছু টাকাই পাবেন যেহেতু ঐ বাড়ির সামান্য অংশটুকুতে তাঁর সঙ্কুলান অসম্ভব।

অতঃপর পিতামহ জোড়াসাঁকোয় একখানি বাড়ি কিনলেন। তাঁর অন্য মামারাও প্রত্যেকেই পাঁচশত করে তিন হাজার কর্জ-স্বরূপ দিয়েছিলেন যজ্ঞেশ্বরের অংশ ছাড়া। পরে সে টাকা তাঁরা আর গ্রহণ করেন নি। কাজেই বাড়ি খরিদ ব্যাপারে সম্ভবত ভাগনেকে নিজ সঞ্চিত বেশী কিছু বার করতে হয় নি, তবে তাকে মনোমত করে নির্মাণ ব্যাপারে অনেক কিছুই খরচ করতে হয়েছিল। সেটা অনেক পরের কথা।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা ভাল এই যে আমার ঠাকুর-দাদার আপন মামাতো ভাই যজ্ঞেশপ্রকাশ, ইনিই স্বনামধন্য প্রবীণ শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলীর পিতামহ।

ইং ১৮৭৮ অথবা ৭৯ সালে আমার ঠাকুরদাদা বড়বাজারে মাতুলাশ্রয় ত্যাগ করে নিজ বাড়িতে আসেন। তাঁর সংসারটি দেখে প্রতিবেশীরা তাঁকে এক সম্পন্ন গৃহস্থ বলে সম্ভ্রমের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। এখানে তাঁর পরিবারবর্গের পরিচয়টা একটু বিশদভাবে দিয়ে রাখি; কারণ সেই ১৮২৪ সালে ব্রজসুন্দর ও চন্দ্রাননার বিবাহ থেকে এখন পর্যন্ত এই ছাপ্পান্ন বৎসরের মধ্যে তাদের তুটি থেকে কতগুলি হয়েছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে। যদিও ব্রজসুন্দর নিজে, এবং তাঁর বড় এবং মেজ ছেলে লয় ও মায়া ইতিমধ্যে বড় অকালেই মারা গিয়েছেন। এখন মাত্র ছিলেন তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্রটি,—মহাপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় নিজে ঃ

তাঁর জননী চন্দ্রাননা, এখন ৭০ বৎসর বয়স
„ জ্যেষ্ঠা বিধবা ভগিনী সঙ্গে তু'টি বিবাহিতা কন্যা
„ মধ্যম „ „ নিঃসন্তান
„ কনিষ্ঠা „ „ জিতু ঠাকুমা
„ স্বর্গীয় মেজদাদা মায়াপ্রিয়র বিধবা পত্নী
„ „ „ „ „ কন্যা জ্যেষ্ঠা
„ „ „ „ সধবা কন্যা কনিষ্ঠা
„ „ „ „ জ্যেষ্ঠপুত্র যোগীন্দ্রনাথ
„ „ „ „ পুত্রবধূ।
„ „ „ „ কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্র।
„ নিজের স্ত্রী (আমার ঠাকুমা)।
„ „ জ্যেষ্ঠা বিবাহিতা কন্যা (বড়পিসি)
„ „ মধ্যমা „ „ আমার (মেজপিসি)
„ „ জ্যেষ্ঠপুত্র রাজেন্দ্রনাথ, রাজা (বাবা)
„ তৃতীয়া কন্যা, বিবাহিতা (সেজপিসি)
„ চতুর্থা „ „ (ন'পিসি)
„ পঞ্চমা „ কুমারী (ছোটপিসি)

তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ (ছোট কাকা)
" " জ্যেষ্ঠ কুলীন, জামাতা ঘরে রাখা (পিসেমশাই)
" " মেজ " " "
" " সেজ " " "

এতদ্ব্যতীত দু'জন ঝি, একজন চাকর একজন দ্বারবান এইগুলি ছিল তাঁর পোষ্য। সুতরাং তিনি যে একজন বড় গৃহস্থ সে বিষয়ে আর প্রশ্ন নেই। এখন তাঁর উপার্জনের দিকটা অর্থাৎ কি করে সংসার প্রতিপালন করতেন দেখা যাক।

প্রথম উপার্জন—তাঁর চাকরি। তিনি হাইকোর্টে শেরিফের বড়বাবু ছিলেন, মাহিনা তখন ছিল ১৫০৲ টাকা, তা ছাড়া অনির্দিষ্ট উপার্জনের ত হিসেব নেই। তখনকার দিনে সেটা মন্দ ছিল না। তা ছাড়া তাঁর অটুট স্বাস্থ্য ও চরিত্রবল তাঁকে গণনীয় করেছিল সমাজে।

দ্বিতীয় উপার্জন—পোস্তায় তাঁর ভুষিমালের কারবার, তখন তাঁর বাৎসরিক আয় আড়াই থেকে সাড়ে তিন হাজার—শেষে আরও বেড়েছিল।

আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁর স্বর্গীয় মেজদাদা মায়াপ্রিয়র যে বিবাহিত জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগীন্দ্রনাথের কথা তালিকায় বলা হয়েচে, এই যোগীন্দ্রই তাঁর শেষ জীবনের প্রধান অবলম্বন। শৈশবে পিতৃ-হীন এবং অতিশয় ধীর নম্র স্বভাবের জন্য ইনি আত্মীয়-মণ্ডলের মধ্যে সকলকারই বড় প্রিয় এবং স্নেহাস্পদ ছিলেন। পরোপকারী, অনুগত স্বভাব, সর্বশ্রমসহিষ্ণু এবং দূরদর্শিতার জন্য ইনি বংশের তৃতীয় পুরুষগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তখনও পাঠ্যাবস্থা। তিনি এ বাড়ির সকলকারই দাদা। এই দাদাটিকেও হাজার অত্যাচার বড় কম সহ্য করতে হয় নি। দুজনে তখন একসঙ্গেই স্কুলে যাতায়াত করেন। গোড়া থেকেই রাজার হাতে পয়সা দেওয়া হ'ত না, যা দরকার তা কিনে দেওয়া হ'ত।

একদিন রাজা একলা বাড়ি এল স্কুল থেকে। দাদা কোথা? মায়ের জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললে,—ছ' আনা পয়সা দাও আগে না হলে দাদাকে ছেড়ে দেবে না। শেষে জানা গেল জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হওয়াতে দাদাকে জামিন রেখে বাবাজী এক দোকানে খাবার খেয়ে এসেছেন। দাদা আত্মসম্মান হজম করে সেখানে রাজার জামিন হয়ে বসে আছেন।

এখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে দুই একবছরের মধ্যেই রাজা সকলকারই ভয়ের কারণ হয়ে উঠল বিশেষত তার বাপ-মায়ের। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে এমন দুর্দান্ত হওয়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। ভয়ানক খেয়ালী, দুঃসাহসী আর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল সে। কোন নিয়ম ছিল না তার, এক ঐ স্কুলে যাওয়ার কাজটি ছাড়া। আজকাল আবার থিয়েটারের ভক্তও হয়েছিল।

গৌরমোহন আড্ডির স্কুলে অর্থাৎ তখনকার বিখ্যাত ওরিএণ্ট্যাল সেমিনারীতে সে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। পড়াশুনায় রাজা মন্দ কোনদিনই ছিল না। বিশেষত কবিতা আবৃত্তি তার বড়ই প্রিয়, তাতে আবার সে বীররসের কবিতার বেশী ভক্ত ছিল। আগাগোড়া মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যখানা কণ্ঠস্থ তার। কিন্তু ঐ কবিতাবৃত্তি উপলক্ষ করে ধীরে ধীরে তাকে থিয়েটার পানেও টানছিল। তখন গিরীশচন্দ্রের বড়ই প্রভাব; তাঁর ব্ল্যাঙ্ক-ভার্সের সরল সহজ গতি, মাইকেলের তুলনায় অনেক সহজ, বেশী ভাবোদ্দীপক বলে রাজা ক্রমশই গিরীশচন্দ্রের ভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয়-সাফল্যই তখনকার দিনে থিয়েটারের উপর সাধারণের প্রবল আকর্ষণের কারণ হয়েছিল। তার ওপর রাজার এই সময়ে ব্যায়ামচর্চাও চলছিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাশূন্য খেয়ালী মন, আর নিঃসঙ্কোচ অগ্রগতি, কোন বাধাই সে মানে না। এইভাবে থিয়েটারের দিকে কতকটা, আবার কুস্তি লড়বার আকর্ষণে তার স্কুলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক্রমশই শেষ হয়েই

আসছিল। এখন যে উপলক্ষে সম্বন্ধচ্ছেদ হয়ে গেল সেইটিই বড় অদ্ভুত।

তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠে প্রায় মাসখানেক পরে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন তখনকার কমাণ্ডার ইন-চীফ জঙ্গীলাটকে আনা হয়েছিল অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত ও গৌরবান্বিত করতে। পুরস্কার বিতরণের আগে,—'আলেক্‌জেণ্ডার এণ্ড দি রবার' অভিনয়াবৃত্তি হ'ল। দস্যুর ভূমিকায় রাজা আবৃত্তি করেছিল। তার অভিনয় এমনি মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে জঙ্গী লাটসাহেব নিজে আসন থেকে উঠে রাজার করমর্দন করে পিঠ চাপড়ে তাঁর অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

ঠিক তারপরেই অঙ্কের মাস্টারমশাই কিভাবে কে জানে বলে উঠলেন, দস্যুর পার্ট দস্যুতেই ভাল করতে পারে। সকলেই হাসলে, রাজা কিন্তু হাসলে না। তার সহপাঠীরা সব মনে করলে, এ আর এমন কি কথা, অঙ্কের সময় তাকে অনেক সময় অনেক কঠিন কঠিন কথা শুনতে হয়, কারণ অঙ্কের দিকে রাজা বরাবরই অমনোযোগী।

কিন্তু তারা জানত না যে রাজা এবার স্কুল ছাড়বার জন্য তৈরী হয়েছে।

দুই তিন দিন ছুটি ছিল, তার পর স্কুল খুললে সেদিন বৈকালে স্কুলের দরোয়ান একখানা চিঠি নিয়ে এল গার্জেনের নামে। তাতে লেখা আছে যে, আজ স্কুল থেকে আসবার পথে, অঙ্কের শিক্ষক-মশাইকে রাজা এমন ভয়ানক প্রহার দিয়েছে যে তাঁর সুমুখের দুটি দাঁত ভেঙে গেছে, আর তাঁকে পালকিতে করে বাড়ি পাঠাতে হয়েছে, এখন তিনি চিকিৎসাধীন আছেন, এ সম্বন্ধে পুলিসে জানানো হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছাত্র-জীবন তার এইখানেই শেষ হ'ল। তারপর আরম্ভ হ'ল পালোয়ানী। দরজী পাড়ার বিখ্যাত অম্বু গুহ তস্যপুত্র ক্ষেতু গুহদের আখড়ায় প্রবেশ করে দস্তুরমতো বেশ কিছুদিন তালিম দিয়ে রাজা

কুস্তিগীর তৈরি হয়ে এল যদিও পাড়ার ছেলেরা বললে, নিজেদের পাড়ায় আখড়া থাকতে দরজী পাড়ায় যাওয়া তার ঠিক হয় নি।

সন্তানটির জন্য এখন থেকে অশেষ দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমাকে। রাজা সেজে-গুজে বাইরে বেরুলেই তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর উদ্বেগের সীমা থাকত না, নিশ্চিত হয়ে তাঁরা ঘুমোতে পারতেন না যতক্ষণ না সে ঘরে এসে পৌঁছত। কোথায় কার সঙ্গে দাঙ্গা বাধিয়ে ফৌজদারীর আসামী হয়ে আসবে। তার ওপর ইদানীং বাবাজীর সাহেব বা গোরা ঠেঙাবার প্রবৃত্তিটা এত বেড়ে গিয়েছিল যে গত দু'মাসের মধ্যে তিনটি কেস্ হয়ে গেছে তার ফলেই অর্থদণ্ড যোগাতে হয়েছে অবশ্য, সেও কম নয়। এর পর আর অর্থদণ্ড হবে না, জেল হবে। এই সব অশান্তি প্রায়ই ঘটতে দেখে তিনি একজন পল্টনের সেপাই রাখলেন, তখনকার দিনে বাইশ টাকা তার মাইনে। বাইরে বেরুলেই সে রাজার সঙ্গে যাবে, বরাবর থাকবে সঙ্গে আর হঠকারিতার থেকে রক্ষা করবে; কোথাও মারপিট করতে, বা মারামারি ঘটতে দেবে না। রাজাকে যারা মারামারি করতে দেখেছে তারা বলত যে তার গায়ে জোর খুব বেশী নয়, সে সাহসেই মেরে দিত। সাহসটাই ছিল তার অসাধারণ।

এইভাবে যখন পুত্রের স্বভাবে পিতামাতা উত্ত্যক্ত—তখন প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন সকলে একবাক্যে পরামর্শ দিলে যে ছেলের বিয়ে দাও তাহলে সুধরে যাবে। সোনার শিকল পায়ে বেঁধে দিলে বাছাধন সুড়সুড় করে শিষ্টশান্ত হয়ে আপনিই ঘর-সংসার করবেন। কথাটা সকলকারই মনঃপূত—আর এদিকে প্রজাপতির নির্বন্ধটাও ঘনিয়ে এসেছিল। কুড়ি-একুশ বছর বয়সে কুলীন সন্তানের বিয়ে এত স্বাভাবিক!

জয়নগর মজিলপুর অঞ্চলে লক্ষ্মীকান্তপুরের দশ আনি বড় সরকার, লোকে বলে জমিদার কিন্তু আসলে তালুকদার নিমাইচরণ

পুতিতুণ্ডমশাই তখন ষাট বছর, দীর্ঘকাল অসুস্থ হয়ে চিকিৎসার জন্য তাঁর কালীঘাটের বাড়িতে ছিলেন। একমাত্র কন্যা বারো তেরো বৎসরের কুমারী বিনোদাও তাঁর কাছে ছিল, কারণ তাঁর বিবাহের কথাও চলছিল। একবার মাত্র দেখাদেখিতে দুই পক্ষেরই মত হয়ে গেল। তাঁরা জোড়াসাঁকোতে এসে পাত্রকে আশীর্বাদ করে গেলেন।

মেয়ের বড়মামা, পুতিতুণ্ডমশাইয়ের বড় সম্বন্ধী শ্যামাচরণ মজুমদার, তিনি বড় চাকরে এবং ভগ্নিপতির প্রধান মন্ত্রীও বটে। অতি বিচক্ষণ এবং দূরদর্শী মানুষ বলে কর্তা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বেঁকে দাঁড়ালেন। ছেলের সম্বন্ধে বিশেষরূপে খোঁজ-খবর নিয়ে ঐ দুর্দান্ত পাত্রের হাতে তাঁর প্রতিমা ভাগনীকে কখনও তুলে দেবেন না।

যতই বিচক্ষণ হোন, জগদম্বার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ল। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা,—সেই দেবীই নিমাইচরণের বুদ্ধিতে স্থিতা হয়ে তাঁকে এই যুক্তি দিলেন যে ভদ্র, কুলীন বংশের ছেলে, কাঁচা বয়স, জ্ঞান হলে, বিবাহ হলে কখনও ওরকম থাকবে না; সময়ে সব শুধরে যাবে। তিনি দেখলেন, অমন দুই পুরুষে কুলীনের ছেলে, অমন দশে মান্য-গণ্য বড় চাকরে বাপ, অমন হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ সুপুরুষ যুবা পাত্র, এমন যোগাযোগ কি সুকৃতি না থাকলে ঘটে।

অঘটন-ঘটন পটিয়সী যিনি,—তিনি সময় মতো যথাশাস্ত্র সকল অনুষ্ঠানই ঘটিয়ে দিলেন চারহাত এক করে। রাজার বিবাহ হয়ে গেল, ধুমধামও কম হয় নি।

সৌভাগ্য ক্রমেই হোক বা দুর্ভাগ্য ক্রমেই হোক এই বিবাহের এক বৎসরের মধ্যেই নিমাইচরণের অসুখ চরমে পৌঁছে গেল, তিনি ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন। এমন তিনপুরুষে কুলীন, সুপুরুষ জামাই বাবাজীর পরিবর্তন দেখা অদৃষ্টে ঘটল না, সে ভার রইল তাঁর বিধবা পত্নী অপর্ণাদেবীর উপর, যিনি তখন থেকে পঞ্চান্ন

বৎসরকাল তাঁর মেয়ে, জামাই, নাতি ও নাতনীদের সকলকেই দেখে শুনে এবং যথেষ্ট ভুগে নিজ কর্তব্য সম্পূর্ণ সম্পাদন করে তবে স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন।

মেয়ের বিবাহ দিয়ে একবৎসরের মধ্যেই নিমাইচরণ দেহত্যাগ করেন বলেছি। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েক মাসের মধ্যেই জননী আমায় গর্ভে ধারণ করলেন।

প্রথম প্রসব মায়ের কাছেই হয়ে থাকে জানা কথা কিন্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হাসপাতাল, নার্স, ডিস্‌পেনসারী-হীন দেশ লক্ষ্মীকান্তপুরে পাঠাতে আমার ঠাকুরদাদা রাজী হলেন না,—কাজেই আমার দিদিমা কাতর হয়ে এলেন তাঁর বাপের বাড়ি বেহালায়। এখন বড় ভাই শ্যামাচরণের শরণাপন্ন হলেন, তুমি দাদা রক্ষা কর।

এই শ্যামাচরণই প্রথম থেকে ভাগ্নীর বিবাহের বিরোধী ছিলেন। বড় বিচক্ষণ এবং আত্মীয়বৎসল ছিলেন—এখন ভগ্নীর অনুরোধে স্বশরীরে এসে ঠাকুরদাদামশাইকে বোঝালেন; বেহালা কলকাতার নিকটেই, সেখানে ডাক্তার কবিরাজ প্রভৃতি শহরের সব সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যেতে পারবে;—এই বুঝে পিতামহদেবও রাজী হয়ে গেলেন।

কাজেই এই সকল কারণে আমার বাপের বাড়িতে নয়, মামার বাড়িতেও নয়,—বিধির বিধানে মায়ের মামার বাড়িতে, ১২৯২ সালের ২০শে কার্তিক বুধবার রাত্রে, বেহালায় নস্কর-পুকুরের মজুমদার বাড়ির খিড়কির পুকুরে যাবার পথের ঘরে, আমায় ভূমিষ্ঠ হতে হ'ল।

ঠাকুরমার কাছে শুনেছি বেহালায় ঘড়িতে বিশ্বাস নেই বলে আমার রাজা বাবা যথা সময়ে বেহালায় গিয়ে দুটি দিন তাদের বাইরের ঘরে ঘড়ি ধরে বসেছিলেন। যেই শাঁখ বাজল জন্মের সময়টা ঠিক করে নিয়েই তিনি সেই রাত্রে কলকাতায় চলে আসেন বাড়িতে খবর দেবার জন্য।

ওদিকে,—প্রকৃতি জননীর যে গুহ্য রহস্য উদ্ঘাটিত এবং মজুমদার বাড়ির অন্তরঙ্গ প্রবীণা-মহলে গোপনে প্রচারিত হ'ল সেটা এই যে,—মেয়েকে বড়ই ভালবাসতেন বলে নিমাইচরণ পরলোকে গিয়েও তাকে ভুলতে পারেন নি! তাই অতিরিক্ত স্নেহের টানে তাঁর প্রিয়তমা কন্যার কোলেই আবার ফিরে এসেছেন।

এরই নাম রি-ইনকারনেশন।

এদিকে কুলপ্রথা অনুসারে জাতকর্মাদি হয়ে গেল; কুমার দিনে দিনে কিসের ন্যায় যে বেড়েছিলেন তা শুনি নি,—তবে ছয় মাসে অন্নপ্রাশন সংস্কার হয়ে গেল। কন্যা-রাশি বলে নাম হ'ল প্রাণকুমার,—পিতামহ নাম দিলের প্রমোদকুমার, ডাকনাম ধন। মামার বাড়ির নামটি দর্পনারায়ণ। দিদিমা ও মামারা দর্পনারাণ বলে, কখনও দপু বলে ডাকতেন ক্রমে তাই থেকে ধপু হয়ে গেল। মা আর বাবা ডাকতেন মামার বাড়ির নামে। নামকে বিকৃত করতে আমাদের বাঙলার মতো আর কেউ নয়। শেষে বাবা ডাকতে আরম্ভ করলেন ধোপে বলে।

যখন বড় দুষ্ট হয়েছিলাম, দিদিমাকে জ্বালিয়ে মারতাম তিনি রাগ করে বলতেন, ওরে ওটা কাশ্যপ, বড় বজ্জাৎ; ওটা কি কম?

তিন

আমার জীবনের সর্বপ্রথম স্মৃতি যা আজও আমার মনে আছে সেটি এমনি এক ঘটনা যার কথা আমাদের পারিবারিক অতীত সংবাদ-ভাণ্ডারে বহুকাল ছিল; আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। ১৯১৯ সালে সে বাড়ির অস্তিত্বলোপের সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীত সংবাদ-ভাণ্ডারের অধিকাংশই লুপ্ত হয়েছে।

কারণ ব্রজসুন্দরের বংশ বিস্তৃত হয়ে ক্রমে অনেক দিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল।

মায়ের কাছেই শুনেছি তখন আমার বয়স আড়াই বছর কারণ আমার পরেই যে ভগ্নীটি হয়েছিল সে তখন ছ'মাসের। আমি যে দুরন্ত ছিলাম, সে কথা না বললেও চলে; আমার রাজা বাপের ছেলেবেলার স্বভাব আর আমার একই ছাঁচের। অন্তত—ছেলেবেলার দুরন্তপনায় এক হলেও প্রকৃতিগত পার্থক্যও কম ছিল না। আমি ছিলাম সাধারণ দুরন্ত,—বাবা ছিলেন তার উপর দুর্দান্ত,—সেটা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তা ছাড়া আমি ত আশ্বিনে ঝড়ের সময় হই নি। প্রথমেই সুখকর স্মৃতির কথাটা বলব—তাও ঐ গাঙ্গুলী বাড়ির স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত।

ও বাড়ি.—ও বাড়ি,—ও বাড়ি। জ্ঞানেন্দ্রিয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রথমে শুনে, তারপর দেখে আসচি সকলকার মুখেই প্রবল একটা উৎসাহ. সুখের পূর্তি এবং গতি ফুটে উঠত ও-বাড়ির নামে। তারপর জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে গাড়ি করে ঠাকুমার কোলে মা, পিসিদের সঙ্গে গিয়ে পড়েছি কোথায় যেন এক বিশাল, দীপমালায় উজ্জ্বল আনন্দ উৎসব এবং কোলাহলপূর্ণ সংসারের মধ্যে,—সেইটিই, ও বাড়ি। সেখানে মেয়ে, পুরুষ, বালক-বালিকা সবাই—ঝি-চাকরের কোলে শিশুগুলিও সুন্দর; এমন কি ঝি-চাকরেরাও দেখতে সুন্দর,—আমাদের সংসারের সবার সঙ্গে তুলনায় অবশ্য। মূল আকর্ষণ ছিল রূপের অথবা লাবণ্য যাকে বলে তার এবং বেশ-ভূষার উজ্জ্বল পরিচ্ছন্নতার আকারে। তারতম্য ছিল না মোটেই আমার দৃষ্টিতে অথবা স্মৃতির মধ্যে, ও বাড়ির সবার লাবণ্য যতটা আকর্ষণীয় ছিল।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ শরীরে কতকগুলি অনুভূতিরও স্ফূর্তি হয়ে থাকে,—স্বাভাবিক নিয়মেই এগুলি ঘটে যায়। বিশেষত আদর যত্ন এবং প্রীতির অভিব্যক্তি যেখানে, সেখানে ওটা দ্রুততর

হয়ে থাকে। তাই প্রথম ঐ ও-বাড়ির স্মৃতি এতটা গভীর। ওখানকার সকলকারই ব্যবহার মধুর যা প্রীতি-উত্তেজক। গাড়ি থেকে নেমেই পিসিদের কোল থেকে উঠতাম তাদের কোলে, আদরে মধুর সম্ভাষণে এরা যে কত আপন সেই পরিচয়ই এখানকার সর্বত্র স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠত ক্রমে ক্রমে। তাদের সঙ্গে আমার মূল পরিচয়ের সূত্র হ'ল আমি তাদের কতই না জানি স্নেহের বস্তু যে রাজা, বাবার ঐ ডাকনাম সেখানকার সবার কাছেই, তারই প্রথম সন্তান বলে। তাদের মধুর কণ্ঠে এই কথাগুলি,—

ওরে রাজার ছেলেটি হয়েচে দেখ? ঠিক রাজার মতোই মুখ হয়েচে, নয়? ইত্যাদি।

অপর একজন আবার তার কোল থেকে নিয়ে,—ওরে সেই রাজা, উঃ কি দুষ্টুই ছিল সে! মনে আছে, দিদি?—য়্যাঁ, এই তার ছেলে? এই ত সে-দিনের কথা, কি আশ্চর্য কাকী! তারপর একজন বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা বালিকামূর্তি এসে দাঁড়াল, দাও দিদি ওকে, বড় জেঠাইমা চাইচেন দেখতে। এইভাবেই গিয়ে পৌঁছলাম এক বিশাল ঘরের মধ্যে, যেখানে সৌম্যমূর্তি এক প্রবীণা গৃহিণী বসে আছেন একখানি পুরু গালিচার উপর পাখা হাতে, শুভ্রবর্ণ একখানি পাটিতে। দেখচি কোল থেকে এরা আমায় নামতে দেবে না, হাঁটতেও দেবে না। নামতে চেষ্টা করলেই বলবে, কি দুষ্টুরে, সেই রাজারই ছেলে ত? এখানে, অর্থাৎ এই বর্ষীয়সীর চারিদিকে ঘিরে আমাদেরই গুষ্টির মেয়েরা সবাই উপস্থিত ;—ঠাকুমা, পিসিরা, এমন কি একগলা ঘোমটায় ঢাকা মুখ, আমার মা পর্যন্ত। ঠাকুমাও একটু রসান দিলেন,—এমন দুষ্টু দেখো নি দিদি,—কারো ঘর খুলে রাখবার যো নেই, ঢুকে, ঘেঁটেঘুঁটে তচ্‌নচ্‌ করে দেবে ছিষ্টি। ইত্যাদি···

প্রীতি প্রফুল্ল বদনে সেই প্রবীণা আমায় কোলে নিলেন, এবং ডাক রাজাকে, রাজা আসে নি?—বাইরে! ডেকে নিয়ে আয় ত,

বল তাকে আমি (জেঠাইমা) ডাকচি। অল্পক্ষণেই রাজা এসে অত্যন্ত ভক্তিভরে পায়ের ধুলো নিলেন,—এই যে জেঠাইমা আমি এসেচি।

বলি হ্যাঁর‍্যা,—আমাদের সব ভুলে গেলি? এখনও আমি বেঁচে আছি না? এসে বাইরে বাইরে থেকে বাইরের লোকের মতোই খেয়ে-দেয়ে চলে যাস? আর বুঝি জেঠাইমাকে মনে নেই?—এখন বড় সংসারী হয়েচিস নয়?

একজন গুরু সম্পর্কের বিধবা কেউ ঘরে ঢুকে রাজাকে দেখেই, —আহা কত দুঃখের রাজা আমাদের; ও কি বাঁচবার! শ্রীধর ওকে বাঁচিয়েছেন।

বাবার সঙ্গেও দেখি এরা এমনই আপনভাবে কথা কইলে, তাতে বোঝা গেল বাবাকে এরা কতই স্নেহ করে। আর তারই জন্য আজ আমার এত আদর এদের কাছে।

*

এর পর যেটা সেটা সুখের স্মৃতি নয়, কিন্তু অত্যন্তই গভীর, আর তার প্রভাবও আমার জীবন কালের দীর্ঘাংশব্যাপী।

ঘটনাটা আমায় নিয়ে, অর্থাৎ আমি তার কর্তা আর আমিই তার ফলভোক্তা সেই জন্য আমার চেয়ে সেটা আর কেউ বেশী জানে না। আমি তখন থেকেই লক্ষ করেছি একটা যে কোন ব্যাপার বা ঘটনা প্রত্যেক দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তার বর্ণনা পৃথক পৃথক হবেই।

আমার তখনকার যে প্রকৃতির জন্য বাড়ির লোকেরা ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল, সেটা আর কিছু নয়—সর্বক্ষণ আমার অস্থির স্বভাব—জিনিস পেলেই ঘাঁটা আর না পেলে অনুসন্ধান করে জিনিস বার করা। সেইজন্য বাড়ির সকলকার ঘর, কেউ না থাকলে ছিটকী দেওয়া থাকত দরজায়, কেউ ভুলেও দরজা খুলে রাখত না আমি বাড়িতে থাকলে। যদি কেউ ভুলে দরজা খুলে রাখত তাহলে আমি যে ভাবে যে-সব কাজ করতাম এই ঘটনাই তার উত্তম

দৃষ্টান্ত। তবে এটুকুও জেনে রাখা ভাল যে অপ্রীতিকর বা অনিষ্টকর কিছু করলে যখন আমায় দেখিয়ে কেউ বলত, দেখ দিকি! কি করেছিস? তখন আমি সত্যসত্যই অনুতপ্তভাবে মুখ হেঁট করে থাকতাম; সময় সময় রোদনেও অনুতাপের পরিচয় দিয়েছি। একথা আমার জীবনে আজও সত্য।

এখন যা বলছিলাম,—

আমার মা বড়ই শান্তপ্রকৃতি কিন্তু আমার স্বভাবের কথা তাঁর চেয়ে কেউ বেশী জানত না। কাজেই তিনি কখনও দরজা বন্ধ করে ছিটকী দিতে ভুলতেন না ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও গেলে। আমার জ্বালায় ডান হাত বাঁ হাত ছিটকী দিতে হ'ত দরজায়।

সেদিন দৈবের ফের খুব সম্ভব তাড়াতাড়িতে কোন কাজে যেতে হয়েছিল বলেই মা ঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। দিগম্বর আমি, কি করি কি করি করতে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। দেখে নিলাম চারদিকে চেয়ে কোথায় ঘাঁটবার মতো কি আছে যা আমার নাগালের ভেতর। জানালার ধারেই একখানা চেয়ার— বাবা সেখানে মাঝে মাঝে বসতেন বই হাতে করে। সেই কেদারার ঠিক পাশেই চৌকির উপর উঁচু বড় তোরঙ্গ, তার উপর টিনের বড় হাত বাক্স বাবার, তার উপর আছে একটা কালো চেপ্টা বোতল আর তার উপর একটা কাঁচের গ্লাস উপুড় করা।

প্রথমে জানালার ধাপে উঠে তারপর চেয়ারে উঠলেই ওটা হাতের মধ্যে পাওয়া যাবে। সংস্কারগত সহজ বুদ্ধিই আমায় সে পথ দেখিয়ে দিলে। সুতরাং কালবিলম্ব না করে শুভকর্মে লেগে গেলাম। বোতলের মাথা থেকে গ্লাসটা সোজা করে বাক্সর উপর রেখেচি, বোতলের ছিপিও খুলেচি, তারপর ছোট গ্লাসটিতে ঢালতে আরম্ভ করে দিলাম দু'হাতে ধরে। ওষুধের মতো গন্ধটা। হাতের ব্যবহারে ত সংযমের বালাই নেই কাজেই হুড়হুড় করে গ্লাস উপচে পড়ে ছড়িয়ে বাক্সর চারিদিক দিয়ে ঝরতে লাগল, আমার গায়ে

পায়েও কতক লেগে গেল ; এমনই সময় ঝড়ের মতো মা ঘরে ঢুকেই, ওরে কি কচ্চিস; সর্বনেশে ছেলে, বলে সামনে এসে পড়লেন। তাতেই আমি চমকে উঠে যেমন বোতলটা রাখতে যাব, হাতের ঠিক ত ছিল না,—সেটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে চুরমার আর ভিতরের পদার্থটুকুও ছড়িয়ে মেঝেময় হয়ে গেল। মা কেঁদে উঠলেন,—কি করলি তুই, এসে আর তোকে আস্ত রাখবে, মেরে ফেলবে যে।

মা তখনই তাড়াতাড়ি ভিজে গামছা দিয়ে আমার গা, হাত-পা বেশ করে মুছিয়ে দিলেন। তারপর বোতল-ভাঙা কুড়িয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ধুয়ে-মুছে সাফ করে ফেললেন। ঠাকুমা এলেন, পিসিমা এলেন সকলের মুখেই ভয়ের চিহ্ন, চুপি চুপি কথা, কি হবে আর কি হবে ;—সে এসে দেখে-শুনে কি করবে। আমি ততক্ষণে সরে পড়েছি সেখান থেকে। মনটাও খারাপ হয়েচে,—একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি সেটা বুঝে, আর বাবার সঙ্গে এটার সম্বন্ধ আছে তাও যেন মনে হয়েছিল। যাই হোক আমি এই উদ্বেগ অশান্তির জায়গা ছাড়িয়ে বাইরে ঠাকুর-দালানে গিয়ে উঠলাম একেবারেই।

সেদিন বোধ হয় রবিবার ছিল, কারণ সকলেই বাড়িতে ছিলেন কেবল বাবা ছিলেন না।

ঠাকুর-দালানের পূর্বদিকে একটা দরজা ; দূরে সদর দরজার সামনা-সামনি সেই দরজার ধাপের উপর দাঁড়িয়েছি। একটু পরেই দেখি বাবা সদর দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। তিনি গঙ্গাস্নান করে এলেন,—আমার স্পষ্ট মনে আছে মাথায় ভিজে গামছা, কপালে চন্দনের ছাপ ফোঁটা, ভিজে কাপড়। আমায় সুমুখে দেখেই বেশ প্রফুল্ল মুখে কাছে এসে হাত বাড়ালেন, আমি নির্ভয়ে গিয়ে তাঁর সেই প্রশস্ত বুকে উঠলাম।

বোধ হয় আমার গায়ে বা হাতে কিছু গন্ধ ছিল—তিনি সন্দিগ্ধ-ভাবেই আমার হাত, গা, মুখ শুঁকে দেখছেন আর বলছেন, তোর

গায়ে এসব কি গন্ধরে ? আমি ত জানি না যে কিসের গন্ধ, চুপ করেই আছি,—আর অন্তরে একটা কেমন ভয়ের ভাবও এসেছে। আমার মুখটাও বোধ হয় চুন হয়ে গিয়েছিল,—সেই মুখ দেখে বাবা তখনই আমায় অপরাধী সাব্যস্ত করে ফেললেন। হনহন করে তিনি বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর মূর্তি দেখেই, নিচে পিসিরা, ঠাকুরমা অন্দরের দালানে যাঁরা ছিলেন সকলকার মুখও চুন হয়ে গেল। বাবা, সোজা নিচে থেকে তরতর করে উপরে উঠে একেবারে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ঢুকেই বাক্সের উপরে দেখলেন, বোতল নেই —তখন চিৎকার করে ডাকলেন,—শানি-বৌ! তারপর আমার নামিয়ে দিলেন। মাকে তিনি বরাবর ঐ নামেই ডাকতেন।

মা কাছেই ছিলেন, বলিদানের পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এলেন। ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—বোতল কোথা ? মা, কি যে বলেন শুনতেও পেলাম না, বুঝতেও পারলাম না,—তাঁর গলার স্বর অত্যন্ত মৃদু ছিল, বাড়িতে কেউ তাঁর গলার আওয়াজ পেত না। বাবা আমার মুখের দিকে একবার চাইলেন,—তুই ভেঙেছিস ?—মা বললেন, আমি ভেঙে ফেলেচি।

তবে ওর হাতে গন্ধ কেন ? বলে বাবা আমার টুঁটি ধরে তুলে ফেললেন,—তারপর,—বল, কেন ভাঙলি, বলতে বলতে বাইরে দালানে বেরিয়ে এলেন।

তখন ঠাকুমা, পিসিরা সব এসে পড়লেন ; ঠাকুমা বললেন,— অ রাজা ! ও অজ্ঞান শিশু, ওকে ছেড়ে দে, ওরকম করে গলা টিপে ধরিস নি, মরে যাবে। এই সব কত কাকুতি-মিনতি। আমি তখন কেমন একরকম হয়ে গেছি। বাবা, কারো কথায় কান না দিয়ে একহাতে আমার পা দুটো আর এক হাতে ঘাড়, ধরে উপরে তুলে ফেললেন। যেই ঠাকুমা বললেন, ওরে ছেড়ে দে, আহা,—মরে যাবে, তিনিও তখন,—তবে মর ! বলে সজোরে, ছ' আট হাত দূরে দেওয়াল লক্ষ করে আমায় আছড়ে ফেলে দিলেন।

চারিদিকে সেই হট্টগোলের মাঝে যখন বাবার হাতে, উপরে উঠেছি,—তখনও আমার জ্ঞান আছে। কারণ কানে সবই যাচ্চে;—ঠাকুমা কেঁদে উঠলেন,—ওরে কি সর্বনাশ হ'ল রে! পিসিদের চিৎকার,—মায়ের চাপা গলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নাও শুনেচি। তারপর যখন পড়লাম,—দোলায় উঠে নামবার সময় যেমন হয় গা-টা সেই রকম সিরসির করে উঠল আর ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল সবদিক। সঙ্গে সঙ্গে ফুলঝুরির মতো ছোট্ট ছোট্ট আলোর ফুল ফুটে উঠতে লাগল,—শেষে, দু'খানা যেন অত্যন্ত কোমল কাঁকন-পরা হাত, সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমায় ঠিক লুপে নিয়েই কোলের মধ্যে লুকিয়ে ফেললে। তখন আমার কোথাও কিছুই লাগে নি। আর কিছু জানি না তারপর।

যখন জ্ঞান হল, তখনই টের পেলাম মাথার যন্ত্রণা কেমন। ওঃ সে বেদনার কথা এখনও যেন মনে আছে। যেন, এই জন্যে বলছি যে পুর্বে পুর্বে ঐ ব্যাপার যখনই স্মরণ করেছি তখন সে বেদনার একটা স্মৃতিমূলক অনুভব ছিল আমার মধ্যে, এখন আর সেটা নেই কারণ সে আজ বাষট্টি-তেষট্টি বছর আগেকার কথা। চোখ খুলতেই যেমনি প্রথমে আলো দেখলাম, মাথায় যেন কে একটা লোহার ডাণ্ডশ মারলে। শুনেছি চব্বিশ ঘণ্টা পর জ্ঞান হয়। যাই হোক আমি তারপর কয়েকদিনে সেরে উঠেছিলাম। তবে আমার ধুক-ধুকিটা একটু বাঁদিকে নেমে বা সরে গিয়েছিল।

এখন রাজার কথা।

শুনেছি সেই দিন থেকে রাজা বাড়ি ঢোকেন নি,—আমাদের ঐ কানাগলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন,—বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করে নিতেন আমার খবর, কেমন আছি। যখন শুনলেন জ্ঞান হয়েচে, ডাক্তারে প্রাণের ভয় নেই বলেচে তখন থেকে বাড়ি ঢুকে তাঁর নিত্য-কর্মপদ্ধতিতে মন দিলেন।

এই ঘটনার পর থেকে আমার শিশু-মনে বাবার সঙ্গে সেই যে

একটা ভয়ের সম্বন্ধ বদ্ধমূল হয়ে গেল তা আর পরিবর্তন হ'ল না কখনও কোন কালে। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন ত ছিলই অর্থাৎ তাঁকে যমের মতোই দেখেছি। এখন, তিনি স্বর্গত, স্বপনেও অনেক সময় সেই যমের মতোই দেখি। তাঁর দশটি সন্তানের মধ্যে এখনও চারটি ভাই আর হু'টি বোন আমরা বেঁচে আছি,—আশ্চর্য কথা এই যে আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে কখনও স্বপনে দেখে নি।

আমার দিক থেকে এটা সংস্কারের প্রভাব কিংবা আতঙ্কে অভ্যস্ত মনের কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি। আমার উনিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত যে পীড়নটা পিতার দিক থেকে এসেছিল এইটি তার প্রথম, এমন কি মূলও বলা যায় যা আমার মনকে গড়তে শুরু করেছিল তখন থেকে,—সেই জন্যই এই ঘটনা উল্লেখ করলাম।

চার

অনেক সংসারেই দেখা যায়, শিশুসন্তানদের উপর জনকের বাহ্যত প্রীতির যেন অভাব। তাঁরা সন্তানকে কোলে-পিঠে বা নাড়াচাড়া করে আদর বড় একটা করেন না, তাঁদের স্নেহ-প্রীতির অভিব্যক্তি ভিন্নপ্রকার; হয়ত প্রচ্ছন্নই থেকে যায় অনেকের কাছে। আমার বাবার কিন্তু ঠিক বিপরীত। তাঁর যা কিছু সবই হাঁক-ডাক করে। হুঃসহ তাঁর শিশুসন্তানদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ। আমাদের পাঁচটি ভাই আর পাঁচটি বোন সকলকার উপরেই ভালবাসা, এক থেকে হুই আড়াই বছর বয়স অবধি প্রকট থাকত। অফিস থেকে এসেই তাঁর আদর করবার সময়। আগ্রহ করে

কোলে নেওয়া থেকে ক্লান্ত হয়ে নামিয়ে দেওয়া পর্যন্ত সময়টুকু, দুই পক্ষেই যেন একটা ব্যায়ামের ব্যাপার; তবে শিশুর পক্ষে সেটা যে মোটেই সুখের নয় তার প্রমাণ তার অসহায়, কাতর আর্তনাদ। এ বিষয়ে তাঁর আত্ম-পর বোধ থাকত না, আর আদরেরও কোন ব্যতিক্রম হ'ত না। অপর কারো গোলগাল ছেলে দেখলে তিনি আদর না করে থাকতে পারতেন না। একথা মনে রাখা ভাল যে, শিশুদের আদর করা আর তাদের ভালবাসা, তাঁর পক্ষে এক বস্তু নয়। তাঁর প্রকৃতিতে, আদর করলেই যে তাকে ভালবাসতে হবে, স্নেহ-মমতার বশীভূত হতে হবে তার কোন কথা নেই। কাজেই সুস্থ সবল শিশুর সঙ্গে তাঁর আদর করারই সম্বন্ধ। সে আদরের তিনটি পর্যায়।

আগে তাকে নেওয়া; অনিচ্ছা প্রকাশ করলে খাবার বা লোভের কিছু দেখিয়ে কোলে নেওয়া। কোল বলতে, বাঁ-হাতের ওপর বসিয়ে তাঁর সেই প্রশস্ত বুকের কাছে আনা যাতে তার মুখমণ্ডল নিজের মুখের সমসূত্রেই থাকে। তারপর প্রথম আদর আরম্ভ হয় গাল-টেপায়। মিষ্ট মিষ্ট ছড়া যেমন—'ওরে আমার বাপি, তোমায় খাওয়াবো জিলিপি' ইত্যাদি, যা মুখে আসে তখনকার স্ফূর্তির আমেজে—মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর নানা ছন্দে, এবং অর্থক অনর্থক নানা শব্দে আদর চলতে থাকবে ঘন ঘন চুম্বনের সঙ্গে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ঘর্ষণে তার কোমল মাংসের যে জ্বালার সৃষ্টি হয় সে দিক লক্ষই নেই। তাঁর উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠত যদি শিশু বিরক্তি প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আপত্তি জানাত তাঁর আদরে। দ্বিগুণ চলত তাঁর ব্যায়াম যতক্ষণ তিনি নিজে ক্লান্ত হয়ে না পড়তেন। শিশুর চক্ষের জলে বুক ভেসে যেত আর চিৎকারে বাড়িতে কারো শান্তি থাকত না। সময় সময় শিশুর ঐ অবস্থায় চক্ষের জল দেখে তাঁর স্নেহের সাগরে করুণার ঝড় উঠত। ঝরা-চোখের জল গালের ওপর দিয়ে

গড়ানো জায়গায় চলত তাঁর চুম্বনের ওপর চুম্বন যা কোন উপায়েই এড়াবার যো ছিল না। শেষে ক্লান্ত শিশুকে নামিয়ে মায়ের কোলে দিতেন। অবসন্ন হয়ে অল্পক্ষণেই সে ঘুমিয়ে পড়ত। শিশুসন্তানদের আদরের দ্বিতীয় পর্যায়।

বড্ড কচি অবস্থায় তাকে তাঁর ডান হাতের তালুর ওপর বসিয়ে বেশ টিপে ধরে তাকে উঁচুতে তোলা, যতটা উঁচু হতে পারে তাঁর হাত। এ অবস্থায় শিশুর যা হয় তা' ত হ'তই তা ছাড়া সে খেলা যারা দেখে, তাদের উদ্বেগের আর সীমা থাকে না। একটু ডাঁটো হলে শিশুকে তালুর ওপর দাঁড় করিয়ে তোলা। তারপর লোফা ইত্যাদি ব্যায়াম, সে যত কাঁদবে ততই তাঁর আদরের মাত্রা বাড়বে। শূন্যে অনেকটা ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে খপ্ করে নিচে থেকে ধরে নেওয়া —পড়বার আগেই। এ সকল ব্যায়াম পর পর চলত অতি সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে।

তাঁর স্নেহের, বোধ হয় চরম অভিব্যক্তি হ'ল—সময় নেই, অসময় নেই, জাগা অবস্থায় হোক বা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে তুলেই হোক, অর্থাৎ তাঁর যখনই খুশি, যা তা খাওয়ানো। শিশু-শরীরের পক্ষে সেটা উপযোগী কিংবা, তার পক্ষে ক্ষতিকর—এ সকল প্রশ্নই নেই, তাকে খাওয়ানোটা চাই-ই। এক বছরের শিশুকে ভাজা ইলিশ বা তপসে মাছ বা তার ডিম ভাজা, ভেটকীর ফ্রাই, গলদা চিংড়ির মাথা, মাংস, চপ্-কাটলেট, রাবড়ি, ক্ষীর, কড়াপাকের সন্দেশ, কালাকান্দ বরফি প্রভৃতি যা' তিনি খেতে বসেছেন তা' খাওয়ানো চাই-ই। কাঁদলে দণ্ড দিয়েও তাকে খাইয়ে সুখী করে তবে ছাড়বেন। খাওয়ালেই শিশু বলবান হয় সুতরাং খাওয়ানো দরকার। কিন্তু এত যত্ন তার ঐ আড়াই বৎসর পর্যন্ত—তারপর যখন তার পরেরটি তাঁর কোলে এল তখন থেকে আর সে বেচারার আদর নেই, তার ছোট যে তারই আদর সে দাঁড়িয়ে দেখবে। যখন তার যথার্থ ও সব খাবার ক্ষুধা হ'ল, বিধির বিধানে তখন তার

বনবাস। কারণ, তখন তার পরেরটির আমলদারী আরম্ভ হয়ে গেছে। দুর্বল রোগা শিশু তাঁর দু'চক্ষের বিষ।

বোতল ভাঙার সেই বিপত্তির পর থেকেই আমি তাঁকে ভয়ের চক্ষেই দেখতাম তা আগেই বলেছি। তিনি সেটা জানতেন, সেইজন্যই তিনি আমায় দেখলেই ডাকতেন আর বসিয়ে রাখতেন অকারণে। তাঁর কাছে আমি কিভাবে যাই, থাকি, তাই লক্ষ করতেন। আদর নেবার আমল অনেক আগেই আমার শেষ হয়ে গিয়েছিল,—কারণ, আমার পরে যে বোন রানী তার তখন পালা আর তার পরের ভাই হাবু তখন মায়ের কোলে তৈরী হচ্ছিল। আমার পালা শেষ হলেও আমার প্রতি তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন না অর্থাৎ আমি তাঁকে এড়াতে চেষ্টা করলেও তিনি আমায় উপেক্ষা করতেন না। হয়ত তাঁকে দেখে অন্য পথে আমি ঠকুর্দামশাইয়ের কাছে যাবার চেষ্টা করছি, ঠিক সেটি লক্ষ করেছেন, তখনই ডেকে বসিয়ে রাখতেন। চক্ষে জল দেখলে দণ্ডও বড় কম দিতেন না।

তবে একটা ব্যাপার আমি ঐ সময় থেকে বেশ লক্ষ করেছি,—ঐ ঘটনার পর থেকে আমার যেন জ্ঞান অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এমন সব ব্যাপার বা ঘটনার আভাস আমি আগেই পেতাম যা ঐ বয়সে আর কারো যে হয়, তা বোধ হয় না। একদিনর কথা,—বাবা বিকেলে সেজে-গুজে বেরুচ্ছেন, মায়ের কাছ থেকে পান নিয়ে খেলেন, দোক্তাও নিলেন,—বেশ প্রফুল্ল মনেই মায়ের সঙ্গে কথা কইতে কইতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে গেলেন। তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই আমি আনন্দে যেন মুক্তির স্বাদ অনুভব করতাম। সেদিন কিন্তু আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারলাম না। মনে হ'ল বাবা আবার এখনি ফিরে আসবেন আর মাকে নিয়ে এমন বিষম কাণ্ড করবেন যাতে শান্তি থাকবে না কারো। একথা মনে মনে ভাবছি, বোধ হয় দু'তিন মিনিট হবে—শুনলাম সিঁড়িতে জুতোর শব্দ, বাবারই পায়ের। আমি দৌড়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে,

শীগগির যাও ঠাকুমা আমাদের ঘরে, বাবা বোধ হয় মাকে,—বলতে বলতেই মায়ের ক্ষীণ আর্তনাদ সকলের কানে গেল। শেষে এমনই ব্যাপার ঘটল—সে রাতে বাড়িতে কারো শান্তি ছিল না।

তখনকার দিনে বোধ হয় এমন একটি দিনও যেত না যেদিন আমাদের বাড়িতে সকলে শান্তিতে কাটিয়েছে। মামার বাড়িতে থাকার সময়টা ছাড়া এখানে এলেই আমার মরণ যেন প্রতিদিনই ঘনিয়ে আসত। বয়সে ছোট হলেও বাবার ধাত বুঝতে পারতাম, কিন্তু তাঁর কোপ থেকে নিজের বুদ্ধিতে বাঁচতে তখন পারতাম না। আমি যতই তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইতাম, তিনি ততই আমায় টেনে এনে শাস্তির একশেষ করতেন। তাঁর অনেক জটিল দুর্বোধ্য ব্যবহার যা আমি তখন বুঝতে পারি নি পরে সেইসব ব্যবহারের রহস্য ভেদ করতে পেরেছি বড় হয়ে।

তাঁর চক্ষু দু'টি ছিল বিশেষ উজ্জ্বল, বড় বড়,—যাকে বলে ভাসা-ভাসা, তাই। সে চোখের দিকে চেয়ে কথা কইবার সাহস ও-বাড়িতে কারো ছিল কি না সন্দেহ। ক্রোধ বা বিরক্ত অবস্থায় ত দূরের কথা, সহজ অবস্থায় তাঁর মুখের দিকে চাইতে আমরা ভয়ে কাঠ হয়ে যেতাম। বিশেষত তখন থেকেই, ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার যে কত স্নেহ আমার উপর, তা আমি জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম, কাজেই তাঁদেরই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁরাই আমার তখনকার আশ্রয় ছিলেন। বাবার ব্যবহার,—সেই খেয়ালী নিষ্ঠুর পীড়নে যখন আমি নির্জীব হয়ে পড়তাম তাঁদের স্নেহধারা আমায় সজীব করে তুলত। মনে হয় তাঁরা না থাকলে ওখানে আমার বাঁচা সম্ভব হ'ত না।

এক শারীরিক পশুবল ব্যতীত স্নেহ বা প্রীতির শক্তিতে যে একজনকে বশীভূত করা যায় বাবা একথা বিশ্বাস করতেন না। বড় হয়ে আরও দেখেছি—যেখানে স্নেহ বা প্রীতির ঐকান্তিকতা দেখেছেন সেইখানেই তাকে মিথ্যা বা কৃত্রিম বলে তাঁর সন্দেহ

হয়েছে। প্রীতি, ভক্তি বা স্নেহাধিক্য, এ সকল—দুর্বল কাপুরুষ, নারী-প্রকৃতির পুরুষ যারা—তাদেরই গুণ, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। আমি তাঁকে যমের মতোই ভয় করতাম, তাতে তিনি আমর প্রতি মনে মনে প্রসন্নই ছিলেন ; কারণ, তাই-ই তিনি চাইতেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য—তিনি ভালবাসবেন বা আদর করবেন, যখন ইচ্ছা তাঁর হবে কিন্তু সন্তান তাঁকে ভালবেসে স্নেহের অধিকারে কোলে-পিঠে উঠতে চাইবে, এ তাঁর অসহ্য। তারপর, তাঁর সন্তান, তিনিই তার বিধাতা,—সে সন্তান তাঁর চক্ষের সম্মুখে আর একজনকে বেশী স্নেহ করবে বা তার বশীভূত হবে হোক না সে-জন তাঁর পরমাত্মীয়—পিতা বা মাতা, এ তাঁর অসহ্য এবং ন্যায়ত এর দণ্ড দিতে তিনি অধিকারী। তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য, তাতে আর কারো অধিকার নেই —এই তাঁর সার যুক্তি। ভালবাসা যাচাই করাটা মানুষের স্বভাব ধর্ম ;—কিন্তু তার একটা মাত্রা আছে। বাবার প্রকৃতিতে দেখেছি যেখানেই ভালবাসার সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে, সেখানে ঐ যাচাই ; যাচাইয়ের দাপটে সে সম্বন্ধ তিক্ত করে, আগুনের জ্বালা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

একদিন বিকালে অফিস থেকে এলেন,—প্রায়ই তিনি কিছু নিয়ে আসতেন আসবার সময়। সেদিন আপেল এনেছেন। আমি ঐ ফলটা ভালবাসি তা তিনি জানেন। এখন ঐ সময় ঠাকুরদাদা-মশাইও এসেছেন,—আমিও তাঁর কাছেই আছি। বাবা তা জানেন। তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন। তাঁর ডাক শুনেই আমি বুঝতে পারলাম তখন তাঁর মেজাজ কেমন। ভাল মেজাজের আভাস পেয়ে আমি উঠে এলাম। তিনি আপেল একটা হাতে করে আমায় দেখিয়ে ডাকলেন, আয়। অন্তরে একটা দুর্যোগের আভাস অনুভব করলেও তাঁর মন-রাখা রকম একটু প্রফুল্লতা দেখিয়ে একেবারে কাছে গিয়েই দাঁড়ালাম।

মা আপেল ছাড়াচ্ছেন, বাবা একটু দূরে বসে দেখছেন ; কোলে

তাঁর হাবু বসে, সেই-ই তখনকার প্রিয়, রানীর 'সাকসেসার' সে, রানীও সেখানে আছে মায়ের কাছে বসে, দেখছে মায়ের কাজ। আপেল সব কটা ছাড়ানো হলে মা রেকাবে সেগুলি গুছিয়ে সবই বাবার কাছে ধরে দিলেন। বাবা তাই থেকে এক টুকরো আমার হাতে দিলেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর কোন জিনিস হাত তুলে কাকেও, এমন কি আমাদেরও, দেবার অধিকার মায়ের কোন কালেই ছিল না। যাই হোক, হাত বাড়িয়ে একফালি নিয়েই আমি পিছু হটবার চেষ্টা করছি দেখে বাবা আর একফালি নিয়ে অপর হাতে দিয়ে বললেন,—বোস।

এখানে বোস! আমি বসতে চাইলুম না, আমার গ্রহ বৈগুণ্য, দাঁড়িয়ে রইলাম আর আপেলও মুখে তুললাম না। এইবার তিনি রাগতে শুরু করলেন। চোখ রাঙিয়ে,—বোস বল্‌ছি এখানে! বলে যেখানে বসতে হবে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। মা ভয়ে ভয়ে বললেন, বস না ওখানে, বোস।

আমি, দাদামশায়ের কাছে যাব, বলে ঠোঁট ফোলাতে আরম্ভ করলাম। তাতে তাঁর রাগ বেড়েই গেল। একখানা হাত ধরে মোচড় দিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে তিনি আমায় বসিয়ে দিয়ে বললেন —কোথাও যাবি নি, বসে থাক্ ঐখানে। যন্ত্রণায় আমি আর স্থির থাকতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

ঠিক আমাদের সামনা-সামনি, প্রায় পঁচিশ-তিরিশ হাত তফাতে অন্দরের চকের ছাদ, সেখানে পাতা একখানি শীতলপাটির উপর তাকিয়া, ঠাকুর্দামশাই সেখানে, যেমন রোজ হয়ে থাকে অফিস থেকে এসে তখন বিশ্রাম করছিলেন;—ঠাকুমাও সেখানে পাখা-হাতে বাতাস করছেন। ঐ সময়টা তাঁর কাছে থাকা আমার ধর্ম ও নিত্যকর্ম আর প্রধান সুখও বটে। ঐ সময়টাই তাঁর আমায় নিয়ে আদর—যা কিছু চলত, তাঁর ফলমূল মিষ্টান্ন জলখাবারের অংশও পেতাম, সে কথা না বললেও চলে।

যাই হোক,—আমার কান্না তাঁর কানে গিয়েছিল। তা ছাড়া আন্তরিক স্নেহের ক্ষেত্রে টেলিপ্যাথি, থট্‌রিডিং এসব খুব সহজে ঘটে যায় প্রাকৃতিক নিয়মেই। আমার বিপদ বুঝেই তিনি স্বাভাবিক স্নেহার্দ্র স্বরে ডাকলেন,—এস দাদা ভাই, আমার কাছে এস। আমি সব দুঃখ ভুলে তখন সংস্কারবশেই উঠে দাঁড়িয়েছি,—কারণ এ রকম ব্যাপার প্রায়ই ত ঘটে! বিপদে পড়লে আমি কেঁদে উঠলেই তিনি আমায় ডাকেন, বাবাও তখন আর কোন কথা বলেন না; সুতরাং আমি মুক্তি পেয়ে যাই। আজ কিন্তু বাবার মূর্তি অন্য রকম। তিনি আজ বোধ হয় ঠাকুর্দামশাইকে অপমান করবেন বলেই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আমি দাঁড়িয়েছি দেখে বাবা রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে,—ঠাকুর্দামশাইয়ের কানে যায় এমনই আওয়াজে বললেন,—বোস্ ওখানে, খবরদার উঠবি নি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা দেয়ালে এমন জোরে ঠুকে দিলেন, আমি চারিদিক অন্ধকার দেখলাম। তারপর কিল, চড়, ঘুষি পড়তে লাগল আমার ওপর। আমি ছট্‌ফট্ করতে করতে, আর যাব না, বলে চেঁচাতে থাকি আর তিনি, চুপ্ চুপ্ খবরদার চেঁচাবি নি, বলতে বলতে আঘাতের পর আঘাত করে আমার ওপর গভীরতম অনুরাগ প্রকাশ করতে লাগলেন। রানী, হাবু, এমন কি মা পর্যন্ত কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন আমার দুঃখ দেখে।

এইসব নাটকীয় নিষ্ঠুর ব্যাপার দাদামশাই অনেকক্ষণ ধরেই সহ্য করছিলেন, একটি কথা বলেন নি অধিকতর অপমানিত হবার ভয়ে। কিন্তু পীড়নের বৈচিত্র্য দেখে শেষে তিনি আর থাকতে পারলেন না। কতই যেন অসহায়, এমনিভাবে তিনি তখন বাবাকে বললেন,—ওকে ছেড়ে দাও, রাজন্দর, কেন অনর্থক শিশুকে পীড়ন করছো। পীড়ন কথাটার ওপর এমন একটু জোর ছিল যার অর্থ বোধ হয় আমার মতো শিশুও বুঝতে পারে। রাজন্দর কিন্তু ওসব লক্ষ না করেই ডাকাতে চিৎকার করে বলে উঠলেন,—

বেশ করছি,—আমার ছেলে, আমি যা খুশি করবো, তাতে কার কি ? খবরদার, বলে দিচ্ছি ফের আপনি কথা কইবেন না, কইলে,—বোধ হয় মান থাকবে না এই কথাটাই চেপে গেলেন।

আমি দেখলাম, বেশী দূরে নয় ত! দাদামশাই সেই পাটির ওপর চিত্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, তাঁর মুখ আকাশের দিকে।

সেইদিন থেকে হুকুম হয়ে গেল, খবরদার ওদিকে, ঠাকুরদাদার ঘরের দিকে, যাবি নি। তিনিও আর আমায় ডাকতেন না, তবে কাছে গেলে আদর করতেন। তবে যখন আমার ওপর পীড়নটা অতিমাত্রায় দেখতেন তখন ঠাকুমাকে পাঠিয়ে দিতেন। বাবার অপমান ঠাকুমার সহ্য করা অনেক দিনেরই অভ্যাস। তা ছাড়া আমাদের বংশে মায়েরা ছেলেদের কাছ থেকে শুধু অপমান নয় তার চেয়ে অনেক কিছু বেশী দুর্ভোগের নিশ্চিত দাবি রাখেন। অসাধারণ সহ্যগুণ না থাকলে আমাদের বাবার বা আমাদের মা হবার যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব নয়। ভাব-প্রবণতার ক্রিয়ায় মাকে যতটা ভক্তি, যতটা উচ্চে স্থাপনার অভিনয় দেখেছি আবার তার প্রতিক্রিয়ায় ততটাই গভীর গর্তে নিক্ষেপ ও নির্যাতনও বড় কম দেখি নি। কাজেই একদিক দিয়ে বাল্য বা শিশুকাল থেকে অভিজ্ঞতাই আমার জীবনের সম্বল একথা বললে ভুল হয় না।

আমার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ-বাড়িতে পিসীদেরও অনেকগুলি ছেলে মানুষ হচ্ছিল ; বাবার কাছে তারাও সময় সময় আদর পেত, অবশ্য তাদের মধ্যে যে ছেলে একটু গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট—তারাই। কখনও কখনও আবার আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে তাদের ডেকে খাবার খাওয়ানো, কত আদরের কথা, যাতে আমার মধ্যে ঈর্ষার উদ্রেক করে, সেই উদ্দেশ্যেই তা আমি তখনই বুঝতাম। আবার এটাও যখন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারতেন—আমার তাতে ঈর্ষার উদ্রেক হওয়া ত দূরের কথা বরং তার আদর থেকে নিষ্কৃতি পেলাম ভেবে একটা স্বস্তি অনুভব করি। তখন অন্তরে অন্তরে রেগে

আগুন হয়ে আমায় দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন। তাঁর কাছ থেকে দূরীভূত হয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতাম, অন্তরে অন্তরে বেশ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতাম এটাও তিনি যখন লক্ষ করতেন, তখন তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়েই উঠতেন। পাগলের মতো যা মুখে আসে তাই বলে অনেকটা হতাশ হয়ে, আমিই যেন তাঁর প্রবল শত্রু— একথা বলে চিৎকার ও আর্তনাদ করতেন। সেই চিৎকার ও আর্তনাদ শুনলে সাহসী মানুষের বুকেও ভয় আসে; সুতরাং ভয় আমায় কাঁপিয়ে অবসন্ন করে দিত, বোধ হয় অল্পক্ষণের জন্য সংজ্ঞা বিহীন হয়েও কাটাতাম, ঠিক অনুভব করে বলবার শক্তি নয় তখন আমার।

ঠাকুমা বলতেন,—জন্মাবধি তোর ওপর একটা আক্রোশ তাই তোকে ও দেখতে কখনই পারে না। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। আমার মনে হয়—সেই বোতল ভাঙার পর থেকেই তাঁকে দেখে আমার যে একটা ভয় বদ্ধমূল হয়েছিল সেইটাকে কোন রকমে ঘুচাতে না পেরেই এই রকম সম্বন্ধ হয়ে গেল। আমায় ভোলাতে অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আমার ভয়টা বেড়েই চলেছিল। তাইতেই এই সম্বন্ধটি দুঃখময় হয়ে গেল।

ঠাকুমার প্রতি বাবার ব্যবহার সব সময়েই খারাপ থাকত না। তবে ঠাকুরদাদার কাছে বাবা ঘেঁষতে পারতেন না। কোন বিশেষ কারণ না ঘটলে তিনি তাঁর কাছে যাবার অধিকার পেতেন না। মাঝে মাঝে অফিসের কাজের জন্য ঠাকুমার কাছে সুপারিশ করে অনেক অশান্তি সৃষ্টির পর তবে হয়ত একটু অনুগ্রহ পেতেন। আমায় নিয়ে ঐ যে ব্যাপার ঘটে গেল তারপরে অনেকদিন বাবা ঠাকুর্দামশায়ের কাছে যেতে সাহস করেন নি।

পাঁচ

এইবার আমার মায়ের কথা একটু আছে : মা আমার নিরীহ শান্ত-প্রকৃতির মানুষ, একেবারে বাবার বিপরীত। তাঁর পিত্রালয়ে বাপ, মা ও আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে তাঁর মতো আদর তাঁর আর পাঁচটি ভাইও পায় নি। তিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠাকন্যা তাঁর কোলে পর পর পাঁচটি ভাই হয়ে পৈতৃক বিষয় রক্ষার কারণ হয়েছিল ব'লে বাপের বাড়িতে তাঁর আদরের সীমা ছিল না। তাঁর ভাইয়েরাও বাল্যকাল থেকেই—দিদি বলতে আনন্দে অস্থির হতেন। মেয়েদের যে আশ্চর্য য়্যাডাপটিবিলিটি,—সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শক্তির কথা যা শোনা যায় তার চমৎকার দৃষ্টান্ত আমার জননী। বাপের বাড়ির অতটা যত্ন আদর ও স্নেহে গড়া যা কিছু ঐ তেরো বৎসর পর্যন্ত,—তেরো বৎসরে এলেন শ্বশুর-ঘর বা স্বামী-ঘর করতে। প্রথমবার যখন শ্বশুর-ঘর করে ফিরে যান তখন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছিল যে, এমন শান্ত-প্রকৃতির বৌ দেখি নি, যেন লক্ষ্মী মূর্তিমতী। আমি মাকে কখনও মাথার কাপড় খুলতে দেখি নি। মায়ের গলার স্বর চার-পাঁচ হাত তফাতের কেউ শুনতে পেত না। আমার ঠাকুমা বলতেন—মহাপুণ্যেই রাজার ঐ বৌ হয়েছে, কিন্তু এ বানরের গলায় মুক্তামালা। মাকে, বাপের বাড়িতে পাঠিয়েই ঠাকুমা সুখী হতেন—ঐ ক'টা দিন শান্তিতে বাঁচতে পারবেন ব'লে। মায়ের জন্যে ঠাকুমার দুঃখ ও দরদের অন্ত ছিল না। বাবা বাড়িতে, বিশেষ ক'রে ঘরে থাকলে তাঁর কান সজাগ রাখতে হ'ত। বেশী কথায় কাজ নেই—বাবার ঘরের ভিতর দিকে দরজার খিলটা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, এই কারণে, বাবার

সব কাজই পাকা, মেথডিক্যাল ; যখন প্রহার করতেন তখন বাইরের কারো হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। তাই ভিতর দিকে খিল লাগিয়ে প্রাণের সাধে নিজ বৃত্তি চরিতার্থ হলে তখন দরজা খুলে বেরিয়ে চলে যেতেন। তারপর সেবা-শুশ্রূষার কাজটি তখন ঠাকুমা ও পিসিমা করতেন। যতদিন ঠাকুর্দামশাই বেঁচে ছিলেন এই দুঃখই তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন, একথা তখনকার সকলেই জানত ; তখন ছেলেমানুষ ছিলাম আমরা বুঝতাম না। মায়ের সহ্যগুণের পরিচয় আজও আমরা পাচ্ছি যদিও আজ তাঁর বয়স সাতের কোঠার মধ্যে পড়েছে।

মাঝে মাঝে মায়ের প্রকৃতির ব্যতিক্রম দেখা যেত, তিনি যেন কেমন একরকম হয়ে যেতেন। চার-পাঁচ বছর বয়স হলেও তখন আমার আর একটা দৃষ্টি যেন খুলে গিয়েছিল বলেছি,—আমি অনেক কিছুই বুঝতে ও জানতে পারতাম। মনে হ'ত যেন কোনও দৈব-শক্তি তাঁকে চালনা করত। মায়ের এ ভাবটা বড়ই অদ্ভুত লাগত। দেখতাম মায়ের লজ্জা-সরম তখন খুবই কম হয়ে যেত, —মাথায় কেবল, নিশেদলের জল চাপড়াতেন। আর সময় সময় মাথা গেল, বুক গেল ব'লে ছট্‌ফট্ করতেন ঘরের মধ্যেই। কখনও কখনও অনেক কথাই বলতেন। যে মায়ের মুখে কথা বেরুত না তখন নির্ভীকবক্তা হয়ে উঠতেন, রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না, সারারাত ঘরের মধ্যে এটা ওটা নাড়াচাড়া করতেন। দু'তিন-চার বার করে স্নান করতেন। অকারণ হাসি, অকারণ কান্না এইসব ভাব তখন তাঁর প্রবল হ'ত। বাবাও তখন যেন শক্তিহীন হয়ে যেতেন মামারা তখন এলে কবিরাজী তেল নিয়ে আসতেন—দিদিমা পাঠিয়ে দিতেন।

এই রকম সময় একদিন আমি দরদালান দিয়ে যাবার সময় উঁকি মেরে দেখি, আমাদের ঘরে পালঙের ওপর বিছানায় বাবা বসে বসে পাইপ খাচ্ছেন, মুখে কেমন একটা অসহায় ভাব। বাবার মুখের ওপর ঐ ভাবের ছাপ বড়ই বিচিত্র—আর কখনও এমন দেখি নি ;

আর মা মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে পালঙের বিছানার ওপর উপুড় হয়ে বাবার সঙ্গে এমনই স্বচ্ছন্দ-ঘনিষ্ঠ ভাবে কথাবার্তা কইছেন— এমনটাও কখন দেখি নি। মাথায় কাপড় ঠিক তিনি এ বাড়ির বৌ নয়, যেন এ বাড়ির মেয়ে। তাঁর এমন ভাবটা স্বাভাবিক নয়। তবে জানতাম আজ কয়েক দিন থেকে মায়ের মাথার অসুখটার আবির্ভাবের লক্ষণ বাড়ির সবাই লক্ষ করেছে। আমাদের বংশের অপর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যতক্ষণ না একজনের অসুখ অসাধারণ বা কঠিন হয়ে ওঠে ততক্ষণ কারো রোগীর প্রতি লক্ষই থাকে না, কেউ তার খোঁজখবরও করে না। রোগ বেড়ে উঠলে সবাই তখন একসঙ্গে তাদের যত যত্ন আছে সব ঢেলে উজাড় করে,—রোগীর ঘরে ভিড় করে।

মায়ের ঐ অসুখটা হলে আমি মায়ের কাছেই থাকতে চাইতাম। যাই হোক্, এখন বাবা আর মাকে একসঙ্গে দেখে কি জানি আমার কেন যেতে ইচ্ছা হ'ল ; মনে হ'ল আমার যাওয়াই ভাল। আরও আশ্চর্য কথা এই যে, সে ক্ষেত্রে আমার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাবার মুখের অসহায় ভাবটা কেটে বেশ প্রফুল্ল ভাবের বিকাশ হ'ল ; বুঝলাম যে, তিনি অপ্রসন্ন হন নি। ততক্ষণে আমি পালঙের ওপর উঠে বিছানায় মায়ের কাছেই গিয়ে বসেছি। মায়ের নিঃসঙ্কোচ স্ফূর্তির ভাব যা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাঁর এই অস্বাভাবিক স্ফূর্তি আমার মধ্যে ভয়ের উদ্রেক করত।

আমি গিয়ে বসতেই মা নিঃসঙ্কোচে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, এস বৎস, পিতার কাছে এসেছ তো অত ভয় কেন তোমার, বাপ? কিছুদিন আগে আমাদের বাড়িতে মতিরায়ের হরধনুভঙ্গ-যাত্রা হয়েছিল তাই থেকেই, বৎস কথাটি তিনি প্রয়োগ করেছেন বোঝা গেল। বাবাও অবাক্, রাগ দ্বেষশূন্য হয়ে শুনতে লাগলেন, কোন বাদ-প্রতিবাদ করলেন না, আর পাইপ টানতে লাগলেন। তখন মা সস্নেহে আমার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন।

বোধ হয় আগে তাঁদের যে কথা চলছিল তারই খেই ধরিয়ে দিতে বাবা মৃদু কোমল কণ্ঠে যেন বললেন।

বল না, আমি তাই করবো, কি করলে মাথা ভাল থাকে, বুকের যন্ত্রণা, ওটা না হয়; ইত্যাদি এই ধরনের মিষ্টি-মিষ্টি কথা। মা বেশ ছিলেন, যেন নিজের ভাবেই মত্ত, এখন বাবার মুখে ঐ কথাগুলি সখ্যভাবের সম্বোধন শোনামাত্রই কেমন একরকম হয়ে গেলেন, যেন ঠিক বুঝতে পারছেন না বাবা কি বললেন, এমনভাবে খানিকক্ষণ বাবার মুখের পানে চেয়ে রইলেন; তারপর হঠাৎ যেন ফেটে পড়লেন। একটা অস্বাভাবিক তীব্র অথচ কোমলকণ্ঠে বলে উঠলেন,—

কি বললে, প্রভু? আমি কিসে ভাল থাকি। যাতে আমার মাথার অসুখ না হয় তাই তুমি করবে? তাতে তোমার যে সুখ হবে না প্রভু! ইচ্ছে হয়—সকলকে ডেকে দেখাই, শোনাই; আহা আহা আর্যপুত্র! তোমার কি ভালবাসা অভাগিনীর ওপর। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে হঠাৎ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। অবাক্ বাবার মুখ চুন হয়ে গিয়েছে, আমারও মনে ভয় হ'ল মায়ের এই অদ্ভুত নিঃসঙ্কোচ বক্তৃতা শুনে। তারপর হঠাৎ হী—হী—হী—হী হাসি আরম্ভ হয়ে গেল, অস্বাভাবিক সে হাসি, না শুনলে বোঝা যায় না কতটা অস্বাভাবিক ও হাসি মায়ের পক্ষে। এইভাবে তাঁর মাথার অসুখ চলত প্রায় এক মাস; তারপর ধীরে ধীরে কমে আসত; তখন তিনি খুব ঘুমোতেন।

যতদিন ছোট ছিলাম, দুই থেকে চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত রুক্মিণী বলে প্রায় বুড়ো এক ঝিয়ের কথা আমার জীবনে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। মায়ের অসুখের সময়ে সে খুবই দরদ দিয়ে সেবা ও যত্ন করত। রাজপুত-জাতের মেয়ে সে, বীরভূঁইয়ে তাদের দেশ। সে আমায় মানুষ করেছিল বলে আমার অত্যাচার সে বড় কম সহ্য করে নি। আবার ছোটবেলায় বাবার অত্যাচার থেকেও সে অনেক বার বাঁচিয়েছে। তাই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার কম ঝগড়া

হ'ত না। বাড়িরই একজনের মতো সেকেলের ঝি,—অধিকারের দাবি তার কম ছিল না। যখন বাবার মেজাজ ভাল থাকত তখন রুক্মিণীর নামে ছড়া রচনা করে আমায় শেখাতেন, আর আমায় সেগুলো তার কাছে বলতে শিখিয়ে দিতেন। তার মধ্যে এমন সব কথা থাকত যাতে তার অন্তরে ঘা লাগে। সে রাজপুতের মেয়ে, মুখ বুজে কারো কথা সহ্য করত না। বাবাকে সে বলত—ডাকাত বড়বাবু। তার জন্যে ছড়াগুলি এই রকম :

'ওরে! রুক্মিণী রাজপুত, পান দোক্তার মজবুত, দেশে গেলে হয় ভূত।' যখন সে দেশ থেকে আসত গায়ের রং হ'ত ঘোর। 'আপনার কম্মে খুঁত খুঁত, খায় গরুর মূত', অসুখের জন্যে সে চোনা খেয়েছিল একবার। 'গায়ের রক্ত টাকার সুদ, চুরি করে খায় দুধ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাবা আমায় মুখস্থ করিয়ে রাখতেন; তারপর আমায় বলতেন —যা, ওর কাছে বলে আয়। আমি পিতৃ আজ্ঞায় তার কাছে গিয়ে ঐ ছড়া আবৃত্তি করতাম। শুনেই সে রাগে ফুলে উঠে খপ্ করে আমায় কোলে তুলে নিয়ে একটু আড়ালে চলে আসত। তারপর—হাঁ রে পোড়ামুঁয়ো, আমায় ঐসব কথা বলবি? বাবা শিকুঁয়ে দিয়েছে বটে?—আমি স্বীকার করতাম। তখন সে আমায় পাল্‌টা হুকুম করত—আর যাবি না ওর কাছে।

তার দরদী প্রাণ, আমারও প্রীতি তার ওপর গভীর ছিল, আর ঐ বাড়িতে ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমার পরেই সেই-ই ছিল আমার পরমবন্ধু। হয়ত আমায় নিয়ে সে বাড়িতেই আছে; এমন সময় বাবা আমায় ডাকলেন। পাছে আমার ওপর আবার পীড়ন শুরু হয় সেই ভয়ে সে কারো অনুমতির অপেক্ষা না করেই একেবারে আমায় নিয়ে চলে যেত বাড়ির বাইরে। কোনও ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে উঠত আর বাবার গুণের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখে লেগে যেত। তার এই যে প্রচেষ্টা—আমায় বাঁচাবার জন্যে নিয়ে

পালানো, তা অনেক সময় বিপরীত ফল উৎপন্ন করত, তা দেখেও সে আবার কেঁদে মরত। রাত্রে আমি তার কাছেই শুতাম। সে আমায় নানা উপদেশ দিত। সে আন্তরিকভাবে চাইত—আমি বড় হয়ে বাবার শাসনের প্রতিবাদে তাঁকে শাসন করি। শুধু তাই নয়—ঠাকুরদাদার মতো লেখাপড়া শিখে, দশে মান্যগণ্য হয়ে, খুব বড় হই আর হাইকোর্টের বড়বাবু হই। কেমন করে আমি বাঁচবো এই বয়সে এত কঠিন পীড়ন সহ্য করে—এই ছিল তার ভাবনার কথা। একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম, পুজোর সময়, ফিরে এসে দাঁড়াতেই পিসিরা আমায় জানিয়ে দিলেন যে, সে আর নেই, মরে গেছে। তাকে আমি অনেকবারই স্বপ্নে দেখেছি। আমার বিশ্বাস—তার স্নেহ ও আন্তরিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষার প্রভাব অনেকদিনই আমার বাল্যজীবনে কাজ করেছে।

বাবার কাছ থেকে আমি অনেকসময় এমন কতকগুলি ব্যাপার লক্ষ করেছি যার কথা আমার সারাজীবনে জেগে আছে। তার প্রথম হ'ল সাধু বা সন্ন্যাসী যাদের পথে-ঘাটে দেখা যায় এবং যারা বাড়িতে এসে পয়সা বা ভিক্ষা চাইত ভণ্ড বলে, তাদের প্রতি বাবার হাড়ে হাড়ে অশ্রদ্ধা। তাদের তিনি নির্যাতনও করতেন। সে বেচারা তার ভেকের দণ্ড পূর্ণমাত্রায় ভোগ করে নিষ্কৃতি পেত। তারপর ভিখারী, যারা গান গেয়ে ভিক্ষা করত, তখনকার দিনে সব ঋতুতেই তাদের পৌরাণিক গান হ'ত, পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি। পুজোর সময়ে আগমনী, শীতের সময়ে কৃষ্ণলীলা, যশোদা, রাখাল-সখাদের সঙ্গে গোষ্ঠে যাবার গান, শ্যামা-সংগীত, ভোরের গান, ব্রহ্মনাম, তারপর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম,—এই সব উপজীবিকা যাদের। ভিক্ষায় যখন আসত তাদের ওপর তাঁর অসীম মমতা দেখা যেত। সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে যে মুষ্টি ভিক্ষা পাবার কথা, তা ত ছিলই, তা ছাড়া তাঁর কাছ থেকে অনেক সময় দু'আনা চার আনা বেশী পয়সা পেয়ে তারা প্রসন্নমনে

বিদায় নিত, দেখেছি। আমারও, ঐ সময় থেকেই তাদের মুখের সব গান মুখস্থ বেশ হয়েছিল। গানের পর গান শুনতেন তাদের বসিয়ে রেখে। খেয়াল ধ্রুপদ তাঁর মনে লাগত না, কিন্তু যাত্রার গান ভিখারীদের মুখে শুনতে তাঁর প্রীতির সীমা ছিল না।

শিশুকাল থেকেই দেখে এসেছি, আমাদের পাড়ায় গানের চর্চা খুবই ছিল তা ছাড়া প্রতিবৎসরে বৈশাখমাসে রক্ষাকালী পুজো উপলক্ষে আমাদের উঠানে যাত্রা হ'ত। চাঁদা তুলে প্রতি বৎসরই বৈশাখমাসের প্রথম শনিবারে রক্ষাকালী পুজো আর সেই উপলক্ষে যাত্রা না হয় কবিগান, কিছু না কিছু একটা হ'তই। আর একটা বিষয় এখনকার তুলনায় খুবই স্পষ্ট দেখা যায় যে, তখন যেমন ভিখারীদের মুখের সুন্দর সুন্দর ভক্তি-রসের গান শুনেছি গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর থেকে বোধ হয় সে ধরনের ভিখারীও আর দেখি না, আর সে রকম গানও শুনি না। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সিদ্ধ ভক্তদের পদগুলো গাওয়া ত একরকম উঠেই গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে কীর্তন এখন ভদ্রসমাজেই অনুশীলিত হতে চলেছে দেখছি। কিন্তু প্রভাতী-নামকীর্তন বা ব্রহ্মনাম আর কলকাতার কোন অংশেই শোনা যায় না। ব্রাহ্ম-মুহূর্তে ঘুম থেকে জাগাবার জন্যে হরিনাম তখনকার দিনে প্রতি পল্লীতেই শোনা যেত। আর ধনী মধ্যবিত্ত এমনকি গরীব গৃহস্থেরাও তাদের উপযুক্ত বিদায় দিতে পরম উৎসাহশীল ছিলেন। অবশ্য রুচির পরিবর্তনেই এ সব পরিবর্তিত হয়েছে বোঝা যায়।

আমি যখন শিশু, অথচ অল্প অল্প জ্ঞান এবং স্মৃতিশক্তির বিকাশ হয়েছে সেই সময় থেকেই মনে হয় বাবা থিয়েটারের ভক্ত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রই তখনকার আলোচনায় বিষয় ছিল। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলোর রচনা উপলক্ষ করে আমাদের অন্দরবাড়ির একতালার দালানে মজলিস বসত। দাদামশাই ছাড়া, ঠাকুমা থেকে শুরু করে বাড়ির যত মেয়ে এবং পুরুষ কাকাবাবু, জ্যেঠামশাই সবাই একত্র

বসে শুনতেন। বাবাই বক্তা। রামায়ণ বা মহাভারতের কথা, যা নাটকে অভিনীত হয়েছে আর তাঁরা সকলেই সম্প্রতি দেখে এসেছেন সেই সব আলোচনা। বাবার মুখে পৌরাণিক কথা এত মিষ্ট, এমনই মধুর ভক্তিরসপূর্ণ এমনই আবেগময় যে, সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনত। জ্যেঠামশাই মধ্যে মধ্যে কোথাও একটুকু বিশেষ ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিতেন; রাজেন্দর ঐখানটা বল। বাবা তখন সেই ব্যাপারটি আবার ব্যাখ্যা করে বলতেন। আমি হয়ত তখন চার বৎসরের। ঐ সময় থেকেই তাঁর ঐ অপূর্ব পুরাণ আমার মধ্যে ভক্তি-রসের গোড়া পত্তন করেছিল। আমার বিশ্বাস যে, আমার মধ্যে ধর্মজীবনের সঙ্গে যদি কিছুমাত্র সম্বন্ধ কখনও ঘনীভূত হয়ে থাকে তার গোড়া ঐখানেই। পাঁচজনের সঙ্গেই আমি সেখানে স্থির হয়ে শুনতাম তাদের মতো, তা সকলেই লক্ষ করতেন। ঠাকুমা বলতেন,—দেখ দেখ, ও কেমন চুপ করে শুনছে দেখ, যেন কতই বুঝছে।

এক আধ দিন নয়, পৌরাণিক কথা এমন মাঝে মাঝে ত হ'তই তা ছাড়া ঐ সভা নিত্যই বসত, শনি ও রবিবার ছাড়া – তখন নানা কথার আসর। বক্তা অনেকেই। সমাজের কথা, পারিবারিক কত কথা, গাঙ্গুলীবাড়ির সকলের আচার-ব্যবহারের কথা। মায় ঘোড়দৌড় ও জলের খেলার কথা পর্যন্ত আলোচ্য বিষয় ছিল। এ সকল আমার বেশী বেশী মনে আছে এইজন্যে যে, আমার ষোল সতের বৎসর বয়স অবধি, মামার বাড়িতে থাকার সময়টা ছাড়া, নিত্য—সকল ঋতুতেই সব সভায় একদিকে আমিও থাকতাম। তা ছাড়া, ঐ দালানে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের শিন্নি ও কথা হ'ত। তখনকার দিনে ঐ শিন্নি খুব ধুমধাম করেই হ'ত। বিশেষত যখন কারো মাইনে বাড়ত তখন বেশী বেশী মোকাম করে পুজো ও শিন্নি দেওয়া হ'ত। সারেঙ্গায়, রাজগঞ্জে, সেজ পিসেমশাইয়ের ইটের কারবার। যখন তাঁর লাভ বেশী হ'ত তখন নিয়মিত পুজোর

ওপর অতিরিক্ত পুজো ও প্রসাদের ব্যবস্থা হ'ত। আটখানা বাতাসা আর চারটি মুণ্ডিসন্দেশ এই ছিল সাধারণ, বেশী হ'লে বেশী প্রসাদ পাওয়া যেত।

সেই সময় থেকেই এটা লক্ষ্য—করেছি প্রতিমাসে একদিন অমাবস্যায় আমাদের গোষ্ঠীর মেয়েরা, ঠাকুমাকে কেন্দ্র করে এক-গাড়ি কখনও দু'গাড়ি নিরেট বোঝাই দিয়ে কালীঘাট পানে ছুটত। আমি ঠাকুমার কোলে বরাবরই থাকতাম। কালীমূর্তি দেখার কথা থাক্—কেনাকাটার ধুম লাগত মেয়েদের, এটা ভুলবার নয়। নকুলেশ্বর দর্শনের পর বট গাছতলায় এক দোকান থেকে কড়ায়ের ডালের ধাবড়ি কেনা হ'ত টাকাটাক। সে যে কী চমৎকার খাবার তা ভাষায় প্রকাশ করবার সাধ্য নেই। বেশ অনেকটা মহাপ্রসাদ নিয়ে সন্ধ্যার ঠিক পূর্বেই সবাই ফিরে আসত, —মেয়েদের বোঁচকা-বুঁচকি আর ছেলেদের হাতে এক এক পুতুল। ঠাকুরদামশাই বাড়িতে থাকতেন, তাই জোর গলায় নয়, খাটো ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যেত গাড়ি থেকে নেমেই।

হাঁরা অচলা, আমার ধাবড়ির ঠোঙাটা, তুই ত দেখেছিলি, গাড়ি থেকে নাবাস নি?—কিংবা আমার ছেলের হাতের পুতুলটা তোর ছেলে কেড়ে নিয়েছে,—ইত্যাদি নানা প্রকার। মোটকথা আমাদের বংশটা কালীভক্ত বলেই মনে হয়।

বাবাও, বাহ্যত যেন কালীভক্তই মনে হয়! কিন্তু যখন তিনি ভগবৎ কথা, মহাভারতের কথায় পাণ্ডব ও কৃষ্ণের কথা কন, তখন সে কথা শুনলে মনে হয় অন্য রকম। তারপর সময় সময় তাঁর কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যে আলোচনা তা এমনই ক্রিটিক্যাল তা শুনেও আবার বিপরীত মনে হয়। তবে শিবের কথায় বাবা একেবারেই তন্ময়, ভক্ত মনে হ'ত।

আমার হাতেখড়ি হ'ল ঠিক পাঁচ বৎসর বয়সে। কিন্তু সে সময় বাবা বাড়িতে ছিলেন না। অবশ্য সে সময়ের সকল কিছু বিশেষ

ব্যাপার বড় হলে শুনেছিলুম। এই সময়টা বাবা ঠাকুমাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে গিয়েছিলেন। এটা ঠাকুরদাদা মশাইয়েরই প্ল্যান—উদ্দেশ্য হ'ল বাবাকে কিছু দিন তফাতে রাখা আর দেশ ভ্রমণের সুযোগে কতকটা প্রকৃতিস্থ হবার সুবিধা করে দেওয়া, ঠাকুরমারও তীর্থদর্শন। উত্তরা খণ্ডের সকল তীর্থ ই দেখা হয়েছিল, তিন থেকে চারমাস ধরে। তীর্থভ্রমণে স্বভাবের যে পরিবর্তন হয় একথা সকলেই বিশ্বাস করে—তাছাড়া জ্যেষ্ঠ সন্তানের পক্ষে মায়ের অভিভাবক হয়ে যাওয়ারও একটা দায়িত্ব আছে। সবদিক দিয়েই বেশ সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্য। কিছু দিন নানা দেশ ভ্রমণ করায়ও আনন্দ আছে—এই পরিবর্তনটা বাবাও খুব পছন্দ করলেন। অগ্রহায়ণে বেরিয়ে, নানা তীর্থ ঘুরে সারা মাঘমাসটা কল্পবাসে কাটিয়ে ফাল্গুনমাসের প্রথমেই তাঁরা ফিরে এলেন।

যখন তাঁরা গেলেন, ঠাকুরদাদা আমাদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন, আবার তাঁরা ফিরে আসবার একসপ্তাহ পূর্বে আমরা জোড়াসাঁকোয় এলাম। এই সময়েই পুরোহিতকে ডাকিয়ে যথাযোগ্য আয়োজন করে আমার বিদ্যারম্ভ হয়ে গেল, কানা দীনু গুরুমশাইয়ের পাঠশালে।

আমাদের বাড়ির পাশেই একখানা ছোট বাড়ি—সেখানা উমেশ চাটুজ্যের বাড়ি, তার পরেই দুর্গাচরণ বল্লভের প্রকাণ্ড বাড়ি পুরোনো, বহুকালের, বেশ বড় তিন মহল বাড়ি ছিল। তখন কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ বললেই হয়। বাইরের উঠানের সুমুখে প্রকাণ্ড ঠাকুরদালানেই—ঐ পাঠশালা। ছড়ওয়াল থাম ছিল এক সময়ে। এখন তার প্রতি ইটখানা বোধহয় খসে গিয়ে শুধু নেড়া কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে। বার ও ভিতর দিকের কার্নিস পায়রায় ভরা। উপরে পায়রা আর নিচের আসনে আমরা বিদ্যালাভ করি। হাতে-খড়ির পরেই প্রকাণ্ড এক বিঘৎ লম্বা রামখড়ি দিয়ে অ, আ, ক, খ, লিখি। সকাল আর বিকেলে পাঠশালা বসে, আমি একখানি ধুতি,

কোঁচা দিয়ে পরে আর একখানি চাদর গায়ে দিয়ে খালি পায়ে যাই। তখনও স্লেট ধরানো হয় নি, কেবল বর্ণবোধ আর একখানি চটি ধারাপাত, বই এই দু'খানি।

বাবাকে অনেকদিন দেখি নি, মনেও ছিল না, মামার বাড়িতে ছিলাম একরকম মনের আনন্দে। তারপর এখানে এসে বাবাকে দেখতে না পেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করি,—বাবা কোথা? তিনি তীর্থে গেছেন ঠাকুমাকে নিয়ে। যেখানেই যান, এখানে নেই সেইটাই আমার অভয়। একদিন বিকেলে গিয়েছি পাঠশালে, সুমুখেই উঠানের দিকে মুখ করে বসে লিখছি অর্থাৎ দাগের ওপর খড়ি বুলিয়ে অক্ষর লেখা অভ্যাস করচি,—হঠাৎ উঠানের দিকে চেয়ে দেখি,—ঝাঁকড়া চুল, বেশ বড় বড় চোখ, দীর্ঘ শরীর, হাসিখুশি মুখ, আমার দিকে চাইতে চাইতে হাতে একটা পাত্র নিয়ে কলের দিকে গেল একজন, কল থেকে বাটিতে জল নিয়ে আবার আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। তারপরেই রুক্মিণী আমায় ডাকতে এল। বাড়িতে এসে দেখি ঠাকুমা এসেছেন আর বাবা, তাঁর ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। তখন পাঠশালে তাঁকে দেখে চিনতে পারি নি।

এখন হাতেখড়ি হয়েছে শুনে বাবা খুশী হলেন, আমার উপর তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টি, এবার আমায় আপন করে নিয়ে, তখনকার জন্য অন্তত ভয়ের ব্যবধানটা ঘুচিয়ে দিলেন। সত্যসত্যই আমি সুখী হয়েছিলাম। তাঁর তীর্থ-পর্যটনের এ একটা প্রত্যক্ষ ফল।

আরও একটা কারণে আমার আনন্দ যেন উপচে উঠেছিল। সেটা বাবার ঐ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ব্রহ্মচারীর মতো মূর্তি দেখে। চার মাস চুল কাটেন নি, গোঁফ তাঁর সুন্দর মানান-সই ছিল কেবল দাড়ি কামাতেন। দাড়িটা রাখলে আমি আরও খুশী হতাম। স্বাভাবিক বড় বড় চুল আর দাড়ি-গোঁফ রাখা মুখ আমার বড় ভাল লাগে। ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা ছেলেবেলা কখনও বড় চুল রাখতে

পাই নি ;—ঠাকুর্দামশাই আর আমার মা দু'চক্ষে কারো বড় বড় চুল রাখা দেখতে পারতেন না। আমার চুল দুই ইঞ্চির বেশী বাড়তে দেখেচেন ত—চুল বড় হয়েচে, কাট। কাটিয়ে তবে শান্তি। কেমন তাঁর একটা ঝোঁক। মামার বাড়িতে তখন মামাদেরও ছোট ছোট কদম্ব-কেশরের অনুকরণে চুল-ছাঁটাই। আরও এক কথা ছিল, তখনকার দিনে ভাল ছেলে যারা, টেরীটা পর্যন্ত কাটে না, তাদের বড় গৌরব,—আর যারা বড় চুল রাখে তারা গোল্লায় যায়। আবার ছোট-বড় দশ-আনা ছ-আনা বা বারো-আনা চার-আনা ছাঁটে যারা, তারা গাড়োয়ান, না হয় বয়াটে, সমাজের বার। তখনকার ভাল ছেলের পরিচয় ছিল তার চুল ছাঁটায়। বিদ্যালয়ে টেরী অথবা ছোট-বড় চুল-ছাঁটা অচল।

ঠাকুরমার এই তীর্থ-ধর্মের শেষে একটা আরও চমৎকার ব্যাপার আছে। ঠাকুরমার আগমনে বাড়িতে একটা বেশ উৎসাহ পূর্ণ গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল সেই দিন সেই ক্ষণ থেকেই। বিস্তর মালপত্র এসেছিল তাঁর সঙ্গে। পরদিন থেকে সেইসব খোলাখুলি আর বিতরণ আরম্ভ হয়ে গেল আত্মীয় সমাজে। তিনি যেখানে গিয়েছেন সেখানকার যা কিছু ভাল ভাল জিনিস, শিল্পদ্রব্য —যেমন গয়া থেকে পাথরের বহুবিধ জিনিস, বাসন, তৈজসপত্র ; বৃন্দাবনের ছাপা কাপড়, আসন শতরঞ্চ—এই রকম কত কত জিনিস এনেছেন। শুধু বড়দের জন্যই যে ঐ সব তা নয়। তাঁর যত ছোট বড় নাতি-নাতনী, তাদের জন্যও কাপড়-চোপড়, খেলনা প্রভৃতি কত কি এনেচেন। ঝি-চাকর দারোয়ান এদেরও সকলকার অংশ আছে তাতে ; এমন কি, ঘনিষ্ঠ পাড়া-প্রতিবেশীরাও বাদ পড়ে নি। এই নিয়ে তাঁর আগমনে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেল।

তার চরম হ'ল এক বিরাট ভোজন-যজ্ঞে। আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে সেদিনকার মধ্যাহ্ন-ভোজের কথা। জ্যেঠামশাই যোগীন্দ্রনাথ, তিনি ছিলেন সর্বাধ্যক্ষ। ঠাকুরদাদামশাইয়ের ডান

হাত তিনি—এ যজ্ঞের সকল কিছুই তাঁর হাত দিয়ে। ঠাকুরদাদার অর্থ ও উপদেশ আর তার পরিশ্রম আগাগোড়া প্রত্যেক ব্যাপারেই। বাবা আর কাকাবাবু মধ্যে মধ্যে পরামর্শ সভায় উপস্থিত থাকতেন, আর কাজের দিন অভ্যাগতদের আদর-অভ্যর্থনার অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু আসল কোন কাজেই তাঁদের হাত দেবার অধিকার ছিল না। ঠাকুরদাদামশাই যতদিন বেঁচে ছিলেন আর আমাদের বাড়িতে যতগুলি উৎসব বা সংস্কার-মূলক ক্রিয়া-কর্ম হয়েছিল—দেখেছি ঠাকুরদাদামশাই সকল ব্যাপারেই জ্যেঠামশাইয়ের পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করতেন অথচ বাবা, কাকাবাবু তাঁর নিজের ছেলে, আর জ্যেঠামশাই তাঁর ভাইপো।

সেদিন লোক হয়েছিল বহু—বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রতিবেশী কুটুম্ব-সমাজের সবাই—আসল ব্রাহ্মণ ছিল একশোটি। তাদেরই সর্বপ্রথমে খাওয়ানো হয়েছিল। পরিতৃপ্ত ভোজন-শেষে একটি করে এলাচি-পৈতা, পান-সুপারি আর চক্চকে একটি ক'রে টাকা দক্ষিণান্তে, একখানা ক'রে সবুজ পশমের শীতবস্ত্র উপহার দেওয়া হ'ল।

আমার জ্ঞান হয়ে এই প্রথম উৎসব দেখলাম আমাদের বাড়িতে; সেই কারণে উপলক্ষটা ত মনে আছেই আরও অনেক কিছু মনে আছে। ছোট্ট একটি জগ হাতে নিয়ে তার মধ্যে কেওড়া-দেওয়া গন্ধ জল পরিবেশনের যোগ্যতা লাভের জন্য ছট-ফটানিটাও যেমন মনে আছে, আবার পাছে কিছু অন্যায় ক'রে ফেলি বা সামলাতে না পারি তাই ছোট কাকাবাবুর ধমকানি ;—এই, কেন তুমি এখানে এসেছ—যাও, ওটা রেখে চুপ করে বসে থাকগে, ব'লে তাড়িয়ে দেওয়ার কথাও মনে আছে। বিশেষ মনে আছে কারণ মনে বড়ই লেগেছিল। আমি কি একটু জলও পরিবেশন করতে পারি না? উৎসবের দিনে ঐ দুঃখ আমায় কাঁদিয়েছিল তাই আরও মনে আছে। আমার মনে হয়, তখনকার

কাজ-কর্মে একটা গলদ ছিল আমাদের বাড়িতে,— সেটা এই যে, কর্তৃপক্ষেরা—আমাদের মতো ছোট যারা তাদের অত্যন্ত ছোট দেখতেন, এতই ছোট দেখতেন যে, আমাদের উৎসাহ ভঙ্গ করে অনেক সময় তাঁরা যে আমাদের শুধু দুঃখ দিয়েছেন তা নয়, অনেক ক্ষতিও করেছেন। অবশ্য সুখের কথা এই যে, আমরা কিন্তু ঐ ভুল কখনও করি নি—কখনও ছোটদের উৎসাহ ভঙ্গ করি নি, যখন আমরা উপযুক্ত হয়েছিলাম। তখনকার লোকেরা তাঁদের ব্যক্তিগত শক্তি বা বুদ্ধির ব্যবহারে যতটা বড় বা সুপটু ছিলেন, উপযুক্ত অধিকারী কর্মীদের সঙ্গে নিজ শক্তি মিলিয়ে কাজ করতে, অপরকে তাঁদের কর্মের অংশ দিতে ততটাই অক্ষম ছিলেন। তাঁরা যেন চাইতেন—এই উৎসব সংক্রান্ত কর্ম-ব্যাপারের সব যশটুকু তাঁরাই উপার্জন করুন, আর কেউ যেন এর অংশভাগী না থাকে।

একটি আরও দুঃখ ছিল আমার সেদিন। সেটি বড় গভীর আর মর্মান্তিক। সেদিন এতগুলি আত্মীয়স্বজনের আগমনে দিনের বেশীভাগ সময় সর্বত্র এমনই এক আনন্দের প্রবাহ বয়ে চলেছিল যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। তারপর ক্রমে ক্রমে যখন সব চলে গেল, সন্ধ্যার আঁধার ঘনিয়ে এল, উৎসবের ধারা ক্রমে নীরব হয়ে এল, রইল শুধু পিসিদের কচাকচি, তখন আমার মধ্যে আরম্ভ হ'ল একটা বিষম অবসাদ,—যেন কোন স্বর্গ থেকে আমি কোন অন্ধকার অশান্তির গহ্বরে পড়ে গেলাম। সারাদিনের এত লোকের স্ফূর্তি-মাখা মুখ দেখে তাদের সেই স্ফূর্তির ছোঁয়াচ আমার মনকে যে পরিমাণে উজ্জ্বল, আলোকিত করে তুলেছিল, তাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার ভিতরের সে আলো নিভে গেল। সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ির গলিঘুঁজিতে যে অন্ধকার, কেবল যেখানে মেয়েরা জটলা করচে সেইখানেই একটি হ্যারিকেন টিম্‌টিম্ ক'রে জ্বলচে—এইসব দেখে আমার ভিতরটা শূন্য হয়ে গেল। এতটা উৎসবের শেষে আমার মধ্যে এল

এক শোক—এটা যে আমার মর্মান্তিক হয়েছিল তা প্রকাশ করে বলবার ভাষা নেই। কেবল একজনের মুখ দেখলাম প্রথম থেকেই প্রশান্ত-গম্ভীর, তাঁর আবাহন ও বিসর্জন দুইই সমান—ঠাকুর-দাদামশায়ের সেই মূর্তি প্রসাদপূর্ণ, সন্তোষ ও তৃপ্তিতে যেন ভরপুর—ও মুখের কোন বৈলক্ষণ্য দেখিনি সারাদিন। আমার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন তিনি—এদিক ওদিক চারদিক ঘুরতে ঘুরতে শেষে সন্ধ্যার পর ক্লান্ত হয়ে তাঁর মেঝের বিছানায় তাঁর পাশে শুয়ে পড়লাম। তারপর তাঁর কোমল হাতটি আমার মাথার উপর আসতেই বিরামদায়িনী নিদ্রার শান্তিময় কোলে কখন ডুবে গিয়েছি আর কিছুই মনে নেই।

জ্যেঠামশাইয়ের কথা পরে বিশেষ বলবার প্রয়োজন আছে, এখন কেবল এইটুকুই বলে রাখি যে, আমাকে নিয়ে এখন থেকে বাবার যে সকল ব্যবহার তাঁর সুমুখেই চলেছিল,—তিনি তার ঘোরতর প্রতিবাদ করতেন। এমন কি, গরম গরম কথা আমায় নিয়ে দু'জনের মধ্যে হ'ত। সে সব কখন কখন সকলের, আমারও,—সামনে আবার কখন কখন নেপথ্যেও হ'ত। বাবাকে দেখেছি জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে যুক্তিতে পারতেন না, সকল বিষয়েই হেরে যেতেন কিন্তু পাছে বাবা পরাজিত হয়ে তাঁকে অপমান করে বসেন সেইজন্য এমন কৌশলে ঠাণ্ডা করে দিতেন, অত ছোট হলেও আমি তা বুঝতে পারতাম। বাড়িতে কোন বিরোধ বা অত্যাচারে প্রবৃত্ত রাজেন্দরকে প্রকৃতিস্থ করতে বিশেষতঃ আপন মর্যাদা অটুট রেখে তাঁকে ঠাণ্ডা করতে একমাত্র জ্যেঠামশায়ই পারতেন। কারণ আর কিছু নয়,—দেখেছি দাদা ব'লে একটা শ্রদ্ধা ছিল বাবার; ছেলেবেলা, এমন কি শৈশবেই, তাঁরা গাঙ্গুলী বাড়ি থেকে একত্র একই সংসারে মানুষ বলে একটা বন্ধুভাবের সম্বন্ধও গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে। তা ছাড়া জ্যেঠামশায়ের শান্ত, নিষ্কলঙ্ক পবিত্র নৈতিক জীবনের প্রভাবও বাবাকে অনেক সময় শান্ত এবং তাঁর

অনুগত ক'রে রাখত, অনেক হঠকারিতা থেকে তিনি বাবাকে রক্ষা করতেন, ঐ সংসারের মধ্যে অন্য কারো তা সাধ্য ছিল না ; এমন কি ঠাকুরদাদামশাইয়েরও নয়।

যাই হোক, ঠাকুমার সঙ্গে এই তীর্থ-ভ্রমণের প্রত্যক্ষ ফল বাবার পক্ষে যেটি মহাকল্যাণ নিয়ে এল সেটি তাঁর দুর্ধর্ষ প্রকৃতির পরিবর্তন আর ভাগ্যের দিক দিয়েও শুভফল এই হ'ল যে, ঠাকুরদাদামশাই এখন বাবাকে উপযুক্ত বুঝেই হাইকোর্টে এক বিভাগের কাজে বার করলেন। এই যে তাঁর অফিসে প্রবেশ তা বাবার কর্ম-জীবনের মধ্যে এক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল।

এখন থেকেই তিনি নিয়মিত অফিসে যেতে লাগলেন। আর কোথাও বার হতেন না—সন্ধ্যার পর আমার পড়া দেখতেন। সে দেখার স্বরূপ,—পরে বলচি। আবার কোন কোন দিন কাজ নিয়েও আসতেন, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তা করতেন। যেদিন কাজ না থাকত সেদিন বই নিয়ে শুয়ে পড়তেন ছাতের উপর মাদুরে এক হ্যারিকেন লণ্ঠন মাথার শিয়রে রেখে। সেটা ইংরেজীর প্রায় ১৮৯০-৯১ সাল হবে। এই যে এখন থেকে তিনি ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত হয়ে পড়লেন সারা জীবন এমন কি মৃত্যুরোগের তাড়নার মধ্যেও তাঁর নিষ্ঠা সমান ছিল। পড়াই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উপভোগ, এটা অবশ্য ভোজন বিলাসের পরেই। তিনি বই কিনে পড়তেন বেশীর ভাগ। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্যতীত বইয়ের আদান-প্রদান করতেন না অপরের সঙ্গে। তাঁর শয্যার পাশেই একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচ ছয়টা সেলফ্‌ওয়ালা খাটাল ছিল, সেইখানেই বই জমতে সুরু হ'ল। সে সব সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে আমিই উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম।

বাবার জীবনে এই যে পরিবর্তন, এইজন্যই মহাকল্যাণকর ফল বলছিলাম। যদিও আমার উপর তাঁর যে ব্যবহার—তার পরিবর্তন ঘটেনি বহুকাল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে আমার

যতদিন পাঠশালায় পড়া চলেছিল ততদিন পড়ায় উৎসাহ পাইনি, আনন্দ পাইনি ; বরং সে যে দুর্ভোগ সে কথা আর কি বলব ! প্রথম ভাগ শেষ হতেই দ্বিতীয় ভাগের সঙ্গে আরম্ভ হ'ল ফার্স্ট বুক। তখন থেকেই শাস্তিটা বড়ই বিষম হয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে বাবার এক বন্ধু—গুঁড়ি তাঁর নাম—ফার্স্ট বুকের পড়ানোটা তাঁর হাতেই ছিল আর দ্বিতীয় ভাগের পড়া নিজেই করতাম। বোধ হয় ফাস্ট বুকের পড়াও নিজেই করতে পারতাম কিন্তু আমার পোড়া অদৃষ্টের ফলে বাবা মনে করলেন—একজন কেউ পড়িয়ে না দিলে, বুঝিয়ে না দিলে আমার পক্ষে পাঠ তৈরি বা শব্দ উচ্চারণ জ্ঞান সঞ্চয় করা মোটেই সম্ভব হবে না। কারণটা বোধ হয়—তাঁরাও ঐ প্রকারেই তৈরি হয়েছিলেন।

অফিস থেকে এসে সন্ধ্যার পর স্নান করে, চুল পিছন দিকে আঁচড়ে তিনি বাইরে বৈঠকখানায় আসতেন—হাতে তাঁর একটা পুরিয়া থাকত। লণ্ঠনের আলোয় পড়া হ'ত। গুঁড়ি কাকাও ঠিক ঐ সময়েই আসতেন। তীর্থ থেকে এসে বাবার যেটা বিশেষ পরিবর্তন দেখেছিলাম, এই যে,—মদটা আর আটপৌরে রইল না, পোষাকী হয়েছিল ; প্রত্যহ মদের পরিবর্তে আর একটা কিছু—যেটা খুব সরু ছোট্ট একটা কলকেতে সেজে উপরে আগুন লাগিয়ে টানতে হয়। গুঁড়ি কাকা ঐ বিষয়ে বাবার সুযোগ্য সহকারী ছিলেন। বাঁ-হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে জোরে টিপতে টিপতে বাবা বেড়াতে বেড়াতে সেটা তৈরি করতেন, আর সেই অবস্থায়ই আমায় পড়ানো চলত। তারপর একটা কাঠের চৌকো পাটার উপর রেখে ছুরি দিয়ে কুচি কুচি করে কাটা হ'ত, তারপর আবার টিপে টিপে সেটাকে দুরস্ত করে শেষে কলকেতে সেজে অগ্নি-সংযোগ। এক একটা গাঁট্টার ব্যবস্থা করে বাবা আমার সঙ্কোচ ও ভুল শুধরে দিতেন, কিন্তু পুনরায় আর একটা গাঁট্টা আসছে এই আশঙ্কায় আমি আবার ভুলে

যেতাম। কাজেই এবার সেটা ডবল জোরেই আসত মাথার উপরে। তখনকার বিভীষিকা আমায় চোখের জলেই হজম করতে হ'ত। গুঁড়ি কাকা মারতেন না, তিনি মার খাবার ব্যবস্থাটি করে দিতেন মাত্র। ঝিম মেরে বসে এক একটা কথা উচ্চারণ করে আমায় বলতেন আমি সেটা উচ্চারণ করে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতাম। তিনি—ও হচ্চে না হচ্চে না, ব'লে বাবার দিকে চাইতেন, যেন বলতেন—দেখ হে, হচ্চে না, আমি যে কি উচ্চারণ করছি মনে থাকত না,—ওদিক থেকে বেড়াতে বেড়াতে একটা গাঁট্টা আসচে কিনা চম্‌কে এক একবার চেয়ে দেখতে যেতাম আর তখনই,—পড়তে পড়তে এদিকে কি দেখচিস, বলে আবাব পড়ত মাথায় ঐ বজ্রটি। মাথাটা ঘুরে উঠত, চোখেও যেন সব কত কি দেখতাম,—তখন একেবারে ঘাড় গুঁজে পড়তে থাকতাম। কি জানি কেমন করে সে পড়া শেষ হ'ত।

যখন ঠাকুরদাদার কাছে যেতাম তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে দেখতেন। বড় বড় চার-পাঁচটা ফুলো দেখে তাঁর কি মনে হ'ত জানি না, কিন্তু তাঁর কোমল হাতের পরশে আমি আর সজাগ থাকতে পারতাম না—ঘুমিয়ে পড়তাম। তখনই কিছু করতে পারলেন না বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি যে ব্যবস্থা বা কৌশল করলেন তা আমার পক্ষে যেমন সুখের তেমনই কল্যাণকর হয়েছিল। তিনি আমায় মামার বাড়িতে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

বাবার পড়ানোটা ঐ রকমই ছিল কিন্তু জ্যেঠামশাই বা ঠাকুর-দাদামশাইয়ের পড়ানো চমৎকার। বহুকাল পরে তবে আমার অদৃষ্টে তাঁদের কাছে পাঠ বুঝিয়ে নেবার সুযোগ হয়েছিল সে অনেককাল পরের কথা। মোটের উপর দীনু গুরুমশাইয়ের পাঠশালে পুরা একটি বছর আর মাস তিন কি চার ছিলাম। তাঁর খবরদারীতে থেকে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়ে ফার্স্ট বুকেরও খানিকটা হয়েছিল বাড়িতে।

তামাকু-বিলাসী গুরুমশাইয়ের সঙ্গে ছাত্রদের কি সম্বন্ধ কিংবা কোন্ সম্বন্ধটা প্রবল তা নিয়ে বেশ একটা গোলমাল সৃষ্টি হয়েছিল আমার মধ্যে। তা ছাড়া তখন সবে মাত্র আমার বাড়ির বাইরে গতি হয়েছে, বাইরের লোক দেখবার বুঝবার জন্য কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠেছিল। লোক দেখলেই হাঁ করে চেয়ে থাকতাম আর কি যে দেখতাম তা জানি না। বাড়িতে প্রতিদিনই আপনার আর পর এই কথা দু'টি কেবলই শুনে বুঝবার চেষ্টা করতাম কিন্তু কে আপন আর কে পর, দেখে কিছুতেই ঠাহর করতে পারতাম না। বাড়ির লোকে বলত— যাদের সঙ্গে কোন পারিবারিক সম্পর্ক আছে তারাই আপনার আর তা যেখানে নেই সেই-ই পর। তা যদি হয় তবে একজনকে আমার আপন মনে হয় কেন? আমাদের সঙ্গে পড়ে প্রভাস, তাকে আমার এত আপন মনে হয় কেন? তার সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা হয় কেন? তারা ত কুণ্ডু? বাড়ির দিক থেকে ত পারিবারিক কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে?

এক গাছা দু'হাত লম্বা বেত তার ডগাটা ফাটা, সকল সময়েই গুরুমশাইয়ের ডান হাতে অথবা কাছেই থাকত। আর কুচকুচে কালো খোল আর লম্বা কালো নলচে একটা হুঁকো, মাথায় বড় একটা কলকে সব সময়েই তাঁর বাঁ-হাতে ধরা, আর সেই হুঁকো থেকে লম্বা নল বেরিয়ে তাঁর মুখের মধ্যে একেবারে গোঁজা থাকত। পড়াতে পড়াতে এমন অবিরাম তামাক খাওয়ার দৃশ্য জীবনে আর কোথাও দেখি নি।

তাঁর ডান চক্ষুটি নাকি ভগবান নিয়েছিলেন; তাই তাঁর সেই ডান দিকেই থাকত তাঁর নিজের দু'টি ছেলে, একটির নাম সতীশ তার ডাকনাম সতিনি, মেজটির নাম নলিনী। দুই ভাই তাঁর ডান চক্ষুর কাজ করত অর্থাৎ সেদিকের কোন ছেলে যদি কিছু করত, তখন—বাবা, ঐ ছেলেটা পড়চে না, হাঁ করে ওই দিকে চেয়ে আছে ইত্যাদি। বাবার ডান কানে পৌঁছবামাত্রই বেতটা এগিয়ে তার

পিঠে পড়তে আরম্ভ করত। বাঁ দিকের সারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। আমি তাঁর বাঁ-দিকেই বসতাম বটে কিন্তু কিন্তু সতিনি নলিনীর ক্রিয়া-কর্ম আমার দৃষ্টি এড়াত না।

সতিনি করত কি—শ্যামার দিকে চেয়ে ;—এই শ্যামা ? শালা মার্বেলটা দিবি কিনা বল্—না হলে মার খাওয়াব। মার্বেলটা শ্যামাকে দিতে, কিংবা দেবো স্বীকার করতেই হ'ত। সে কথা কিন্তু গুরুমশাইয়ের কানে পৌঁছাত না।

একটা করে পয়সা আনবার নিয়ম ছিল প্রতি শনিবারে তামাকের জন্যে। যে তামাক না আনতে পারবে তার অদৃষ্টে দুঃখ। তা ছাড়া পাল-পার্বণে সিধা আনার নিয়মও ছিল, বিকল্পে এক আনা দু' আনা পয়সা। এ সব ত সনাতন প্রথা, এর জন্য আমার কিছু আপত্তি ছিল না কিন্তু ঐ যে তামাক খাওয়াটা ছেলেদের ঘাড় দিয়ে চালানো, ছেলেরা তামাকের পয়সা যোগাবে এইটি আমায় পীড়া দিত তখনই ; যদিও কারণ বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা ছিল না। আরও একটি কাণ্ড অসহ্য হয়েছিল—গরীব ছেলে যারা, ময়লা বা ছেঁড়া কাপড় পরে, খালি গায়ে অথবা ছেঁড়া জামা পড়ে আসত, দেখতেও হয়ত রং ময়লা, ধূলায় মলিন শরীর, সিধা বা পয়সাও আনতে পারত না, তাদের উপর ডান হাত বাঁ হাত বেত চালান, বেদম প্রহার কোন না কোন সূত্রে। কী বিশ্রী চিৎকার তাঁর—যখন তখন। এ্যাঁ, কেন করিস নি ? ব্যাটা হারামজাদা, শূয়োর বাচ্চা, জানোয়ার গাধা, ইত্যাদি। আমি বড় বাড়ির ছেলে বলে বেত আমার কাছেই আসত না।

বড় হয়ে যে সকল জ্ঞান বা মীমাংসার অধিকারী হয়েছিলাম, সেই সকল প্রশ্ন ঐ সময় থেকেই উঠে মনে আঘাত করতে আরম্ভ করেছিল। প্রথমে, বাড়িতে বাবার, তারপর পাঠশালায় গুরু-মশাইয়ের অত্যাচার,—কেন এমন হয় ?

এদের শাসনের কি কোন ব্যবস্থা নেই ভগবানের রাজ্যে ? ধ্রুব

প্রহ্লাদের আমল থেকেই যেন এই প্রথা চলে আসছে তার আর প্রতিবিধানও বোধ করি ঐ একভাবেই হয়ে আসছে। এখানেও গুরুমশাইয়ের বেলা তাই হ'ল একদিন।

আমাদের পাড়ায় সম্প্রতি এসে বাড়ি করেছিল শশী কুণ্ডু, একজন খুব ধনী বণিক্, ঘিয়ের কারবার, তার চারতলা বাড়ি। সব বাডির ছাদ থেকে তার ছাদ উঁচু দেখা যেত যেন সকলকার উপর মাথা তুলে আছে। তার একমাত্র ছেলে—নাম প্রভাস। সে পড়ত আমাদেরই সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের ক্লাসে। যদিও বয়সে সে প্রায় চার বছরের বড়, স্বাধীন প্রকৃতি, সরল আর ভারি মিশুক। ছোট-বড় সুন্দর-অসুন্দর নির্বিচারে তার আলাপ, খেলা-ধূলা, মেশামেশি সবার সঙ্গে। তবে সে, গুরুমশাইয়ের ছেলে সতিনিকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। বড় বাড়ির ছেলে ব'লে সতিনিও তাকে 'মার খাওয়াতে' পারত না। সতিনির এই 'মার খাওয়ানো'-কে সে বলত 'হালুয়া খাওয়ানো'। ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে বলত—এই শ্যামা, সতিনিকে একটা দু'টো রজনচুস দিবি, না হলে সে তোকে 'হালুয়া খাওয়াবে'; এই রকমেই সে সতিনিকে জ্বালাত।

সেদিন, কি ভাবে ঠিক জানি না, হয়ত বা না দেখতে পেয়ে কিংবা সতিনির সঙ্গে তার খিটিমিটি হ'ত বলে তাকে শাসন করবার জন্যই হবে, কি ক্ষণে গুরুমশাই—এই, এই, কি কচ্ছিস, বলে কোন প্রশ্ন করবার আগেই এক ঘা বেত বসিয়ে দিলেন প্রভাসের গায়ে

তাঁর নিয়মই হয়ে গিয়েছিল, বোধ হয় অবিরাম ডান হাতকে চালনার ফলেই, আগেই এক ঘা লাগিয়ে দেওয়া—যেন সেটা তাঁর কার্য আরম্ভের ভূমিকা—যাতে একাগ্র হয়ে তাঁর প্রশ্ন বা পাঠগ্রহণ বিষয়ে সজাগ থাকে। তার আরও সহজ ভাষা এই, আমি তোমার মুণ্ডুপাত করতে এসেছি, প্রস্তুত হও। তারপব ঐ প্রথম ঘা-টি বড় বাড়ির আর অ-বড়-বাড়ির ছেলে হিসাবে হালকা বা তীব্র হ'ত এটাও জেনে রাখা ভাল। কিন্তু প্রভাসের গায়ে সেদিন যে ঘা-টা

পড়ল সে ত মোটেই প্রস্তুত ছিল না তার জন্য। আচমকা বেতটা পড়তেই, প্রভাস দাঁড়িয়ে উঠে একেবারে তাঁর হাত থেকে হ্যাঁচকা মেরে বেতটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। রাগে তার মুখ আর কানটা লাল হয়ে উঠল, তারপর সে চীৎকার করে বললে,—আমায় মারলে কেন?

গুরুমশাইয়ের মুখটা যেন চুন হয়ে গেল। সামলে নিতে নিতে —ততক্ষণে প্রভাস, তোমার মতো গুরুর কাছে আমি পড়তে চাই না, বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল। দালানের সিঁড়িতে গুরুমশাইয়ের চটিজুতো থাকত, নামবার সময় সে এক পাটি নিয়ে কোন্ দিকে লক্ষ করেছিল কে জানে, সেটা এসে পড়ল সতিনির মাথায়।

গোলমালে যে জায়গাটা সব সময়েই ভরপুর থাকে, সেখানে টুঁ শব্দ নেই—একেবারে নিস্তব্ধ। গুরুমশাই হুঁকো রেখে দাঁড়ালেন, কি ভেবে,—সতিনি, বেত গাছটা নিয়ে আয় ত, বলে সেদিকে দেখিয়ে দিলেন। বেতটা হাতে এসে পৌঁছোতেই,—দেখচিস কি? —বলেই বাঁ-দিকের প্রথম ছেলেটির মাথায় সপাং করে এক ঘা বসিয়ে দিলেন। তারপর তার পরেরটিকে, তুই কি দেখছিস, বলে, এক ঘা, তার পরেরটিকেও,—বড় মজা না?—বলে এক ঘা। এভাবে তারপর, তারপর হ'তে হ'তে আট দশজনকে মেরে জ্বালিয়ে যখন লাল করে দিয়েছেন—সকলকেই হয়ত করতেন, এমন সময় ছেলের হাত ধরে শশী কুণ্ডুমশাই এসে দালানে উঠলেন। খর্বাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ শরীর, কোঁকড়ানো চুল, অল্প অল্প দাড়ি, সৌম্য মূর্তি, দেখে শ্রদ্ধা হয়।

তাঁকে দেখেই, গুরুমশাই যে ভাবটা প্রকাশ করলেন তা কোন সাহিত্যিকই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে না, কারণ কথায় সে ভাবটি প্রকাশ অসম্ভব। চিত্রশিল্পী হয়ত আঁকতে পারত। তিনি প্রথমত স্তম্ভিত হয়ে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে, তারপর কি করতেন কে জানে! তাঁকে কিছু বলা বা করার অবকাশ না দিয়েই কুণ্ডুমশাই

ছেলেদের সকলকে ডেকে বললেন,—তোমরা সব বাড়ি যাও, আজ এ বেলা আর পড়া হবে না, তোমাদের ছুটি হয়ে গেল।

গুরুমশাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে সকলেই একবার দেখলে বটে। কিন্তু বই-স্লেট গুছিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি সবাই নামতে লাগল, অনুমতির কোন অপেক্ষাই করলে না। আমিও নেমে এসে যখন সদরের দিকে ফিরেছি তখন গুরুমশাইয়ের শুষ্ককণ্ঠের আওয়াজটা পেলাম—বলছেন,—সতিনি, নলিনী! তোমরাও যাও।

বিকালে গিয়ে দেখি বেত-গাছা দেয়ালে টাঙানো আছে, গুরু-মশাইয়ের হুঙ্কার করে কথা নেই—শান্তমূর্তি,—আর সতিনি, নলিনী যথাস্থানেই আছে—আর আছে হুঁকোর সঙ্গে নলটি গুরুর মুখে লেগে। তারপর যতদিন ছিলাম,—বেত আর নামে নি। তবে নিল-ডাউন, কানমলা, গাঁট্টা, জুল্‌পি ধরে টানা, চুলের মুঠি ধরা, চাপড়, কীল এসব পূরা মাত্রায় চলত।

প্রভাস আর এল না কিন্তু সেইদিন থেকে। একদিন দেখা হতে বললে,—যদু মাস্টারের স্কুলে সে গিয়েছে এখন, আর তিনি খুব ভাল মাস্টার—মোটেই মারেন না। তবে যদু মাস্টারের স্কুলটা ছিল দূরে,—দাঁয়েদের গলিতে, যেখানে আমার যাবার যো নেই।

নামতা পড়বার সময় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ত, সর্দার-পড়ো বলত আর সকলে সমস্বরে আবৃত্তি করত। সবশেষে হাত ছড়ির ব্যবস্থা ছিল। যে দেরিতে আসত কিংবা যে না বলে চলে যেত—এই রকম খুচরো অপরাধে তাদের হাত পেতে বেত খেতে হ'ত; শশী কুণ্ডুর দয়ায় সে সব বন্ধ হয়ে গেল বটে, গরীব ছেলেদেরও আর বেত খেতে হ'ত না, তবে কানমলা আর ইট হাতে নাড়ুগোপাল হয়ে থাকতে হ'ত তুচ্ছ অপরাধে কিংবা বিনা অপরাধে;—তাদের দুঃখ কিছুই কমে নি।

ছয়

ছোটবেলায় মামার বাড়ির সঙ্গে বাপের বাড়ির সম্বন্ধ-বোধটা ছিল ঝাপসা,—কিন্তু সেখানকার সবাই আমায় একই চোখে দেখত, একই রকমের ব্যবহার ছিল তাদের আমার প্রতি। কিন্তু জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, বাবা, কাকারা, জ্যেঠামশাই, ঠাকুরদাদা, ঠাকুমা, পিসিরা,—এমন কি ঝি-চাকরেরা পর্যন্ত সবাই আমায় একভাবে দেখত না,—প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন,—এটা আভাসে অনুভব করতাম। তারপর সেটা ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

মামার বাড়ি সম্বন্ধে আমার সর্বপ্রথম শিশুবেলার সংস্কার ছিল এক অদ্ভুত রকমের। এখন সে কথা মনে হলে হাসি পায়। সে ছিল যেন একটা হাওয়ার দেশ। হু-হু শব্দে ঝড়ের মতোই দমকা হাওয়া, দিন-রাত অবিশ্রান্ত চলত সেখানে, আর ঘরের মধ্যে ঢুকে তোলপাড় করত ঘরের জিনিসপত্র সব।

সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই সব সময়েই পেতাম ঐ দক্ষিণে-হাওয়া, যা ঠিক ঝড়ের মতোই বয়ে চলেছে। তাতে কেবলই আমার ঘুম আসত,—সে বাতাস যেন ঘুম মাখানো; গায়ে লাগা মাত্র ঘুমে চোখ ঢুলে আসত। বড় হয়ে যখন আমি কিশোর বয়সের চঞ্চল বিদ্যার্থী, তখন তার নাম দিয়েছিলাম, ঘুম-পাড়ানী বাতাস। ফাল্গুন থেকে বর্ষার শেষ পর্যন্ত ওটা থাকত। সে সময় প্রত্যহ দিনে ও রাতে আমায় ঘুম থেকে তুলে খাওয়াতে হ'ত। একবার,—তখন আমি পাঠশালে যেতাম না,—ছোট ছিলাম, আমার ঘুমের বহর দেখে দিদিমা সন্দেহ করলেন বোধ হয়

আমার শরীর ভাল নেই; না হলে এত ঘুম কেন? তাঁর গালটি আমার কপালে ও গালে স্পর্শ করে তিনি তাপ নির্ণয় করতেন। দেখতেন কোন তাপ নেই, ঠাণ্ডা—দেখে মহাচিন্তিত হয়ে পড়তেন; —তাই ত জ্বর নয়, জ্বালা নয়,—এত ঘুমোয় কেন? একে জিজ্ঞাসা করেন, ওকে জিজ্ঞাসা করেন,—এমন দুরন্ত ছেলে, জ্বর-জ্বালা নয়, —এত ঘুমোয় কেন? শেষে মাঝের বাড়ির দিদিমা, মামাদের জ্ঞাতি সম্পর্কে, এসে দেখে-শুনে বললেন, এটা উপরি-হাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়,—দিদি, তুমি পূব পাড়ার মহেশকে ডাকাও।

মহেশ এসে বললে, যে সময় ও ঘুমোয় সেই সময়েই দেখাবার সময়,—ঐ সময়েই ঠিক ঠিক সব বুঝতে পারা যাবে। তখন আমি জেগে বেড়াচ্ছি খাওয়া-দাওয়ার পর; —দিদিমা আমায় বললেন, যা ভাই, বিছানায় শুয়ে ঘুমোগে যা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ঘুমোব? শেষ অবধি হ'ল কি, মহেশ বসে রইল বটে আমি আর কিছুতেই ঘুমোতে পারলাম না। সন্ধ্যার পর সে এই বলে চলে গেল,—মা ঠাক্‌রান, রোজার ভয়ে হয়ত আর রোগ থাকতে পারলে না। সে দিন রাত গেল। তার পরদিন আবার যখন ঘুমিয়ে রয়েছি তখন বোধ হয় দিদিমা, মহেশকে ডাকিয়ে এনে দেখিয়ে থাকবেন। ঘুম থেকে উঠে দেখি গলায় আমার আমড়ার আঁটির মতো একটা লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। খুব উঁচু কাগজী বাদামের গাছ একটা ছিল মামার বাড়ির খিড়কীর বাগানে বড় পুকুরের ধারে। তার তলায় আমরা কত কত বাদাম কুড়িয়েছি, সে বাদামের পাকা অবস্থায় ঐ ধরনেরই দেখতে যেরকম আঁটির মতো একটা আমার গলার বাঁধা আছে। আমার ধারণা হয়ে গেল এটাও একটি পাকা বা ঝুনো বাদামই হবে—সুতরাং অবিলম্বে জাঁতি দিয়ে কেটে তাকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে দেখি, ভিতরের দিকে ছোট্ট কুলের আঁটির মতো বেরিয়ে পড়ল একটি জিনিস সেটাকে জাঁতি দিয়ে কাটার শক্তি আমার নেই। কাজেই ইটের উপর

রেখে ভাঙবার চেষ্টাও হ'ল, কোন রকমেই কৃতকার্য না হয়ে যখন, অন্য আর কি উপায়ে ওটার গতি করা যায় ভাবছি এমন সময় মায়ের আবির্ভাব ঘটল। তিনি একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেন, ব্যাপারটা দেখে। তারপর এলেন দিদিমা! তিনি আমায় বললেন, —কি করলি, ওরে অলপ্পেয়ে!

আমি আর সেখানে দাঁড়াই! সে আঁটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে, তাঁদের দৃষ্টি ছাড়িয়ে একেবারে বাইরে উপস্থিত। তারপর কিন্তু আর আমার ঘুমের ব্যাপারটার গুরুত্ব রইল না। তাঁদের কাছে ঠিক পরদিন যখন ঘুম থেকে তুলে খাবার জায়গায় পিঁড়ের উপর বসিয়ে দিয়েছে,—দিদিমা আছেন, আর মামারা সব খেতে বসেছেন,—তখন ন'মামা আমার চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—হ্যাঁ রে এখানে এসে তুই এত ঘুমুচ্চিস কেন বল্ দিকি ?

আমি বললাম,—কি জানি এখানের হাওয়ায় আমার ভারি ঘুম পায়। ব্যস্, ঐখানেই যেন দিদিমা সহজভাবেই বুঝে নিলেন—ব্যাপারটি কি।

এই ব্যাপারটা আরও মনে আছে এইজন্যে, সেবার ঠিক ঐ সময়েই বড় মামার বিবাহ হ'ল মথুরাপুরে। পালকিতে করে বর গেল। বরযাত্রী যত মামাদের সব সম্ভ্রান্ত আত্মীয়-কুটুম্ব তাঁরাও পালকিতে গেলেন, প্রায় ত্রিশ বত্রিশখানা পালকি এসেছিল। আমায় একজনের পালকিতে তুলে দিলে সাজিয়ে-গুজিয়ে। ঘুমুতে ঘুমুতে গেলাম আর পরদিন এলাম। আমরা আসবার পর—ছোট্ট বড় মামীটি এসে দাঁড়ালেন, যেন দুর্গা প্রতিমা। আট বৎসর বয়স, আমাদের নিয়ে খেলা করতেন।

মা বরাবরই আমাদের নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন। পোষাক পরিয়ে কপালে খয়েরের একটি টিপ কেটে দিতেন। এখন এই টিপের ব্যাপারটার কিছু বিশেষত্ব ছিল যেটা আমার জীবনে এক

গভীর যোগ-রহস্য উদ্ঘাটিত করেছিল আমার যৌবনে যখন আমি সাধন উদ্দেশ্যে ঘর ছেড়েছিলাম। এখন কেবল এইটুকু মাত্র বলছি তার মূল সূত্র হিসাবে।

আমি ত চঞ্চল ছিলাম, একমুহূর্তও স্থির থাকতে পারতাম না। তিনি যখন আমায় ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে শেষে টিপটি পরাতেন তখন আমার মাথাটি বাঁ হাতের তালু আর আঙুলগুলি দিয়ে ধরে রাখতেন যাতে না নড়ে যাই—আর ডান হাতে টিপের কাঠিটা নিয়ে, টি-টি, টি-টি করতে করতে সময় বুঝে ঠিক জায়গায় বেশ সুন্দর একটি বড় টিপ এঁকে দিতেন। দু'টি ভ্রূর মধ্যেই ত ঠিক টিপের জায়গা! যখন তিনি আমায় স্থির করবার জন্যে টি-টি, টি-টি বলে ঠিক জায়গায় বিন্দুটি বসাবার চেষ্টা করতেন—তখন আমার ঐ ভ্রূযুগলের মধ্যে ভিতর থেকে একটা অপূর্ব, তীক্ষ্ণ এবং সুখকর অনুভূতি হ'ত যা আমার তখন থেকেই বেশ স্পষ্টভাবেই স্মৃতির মধ্যে বসে ছিল। অবশ্য চার-পাঁচ কি ছয় বৎসর পর্যন্তই টিপ পরা চলেছিল, তারপর বোধ হয় আর আমি বেশী বয়স অবধি টিপ পরি নি। আমার যখন বিশ-বাইশ বৎসর বয়স তখন কিন্তু ঐ অনুভূতিটা আপনিই ক্রিয়া করতে আরম্ভ করে। তখন তার উদ্দেশ্যও যেমন বদলে গেছে,—তার কার্যকারিতাও ততোধিক গভীর হয়েছে, যার কথা সেই সময়েই বলা ভাল।

নর-নারীর মধ্যে এক একটি মানুষ থাকে অথবা আমাদের মধ্যেই আছে যারা, নিজেদের ব্যক্তিত্বকে এমনই প্রচ্ছন্ন রাখে যে, সহজে তাদের চেনা যায় না যতক্ষণ না তার গুণের যথার্থ পরিচয়ের সময় আসে।

মা আমায় ধীর, শান্ত, সংযতবাক্। অবশ্য ঐ মাথার অসুখের সময়টি ছাড়া: আর ঐ মাথার অসুখ তাঁর সারা জীবনেরই সাথী, বৎসরে একবার, দু'বার, তিনবারও দেখা দেয় ঐ বিষম রোগটি। চিরকাল না হোক বাল্যকাল থেকেই যতদিন আমাদের

জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছিল, ততদিন তিনি জগতের চোখে একেবারে অদৃশ্যই ছিলেন। আমরা ঘরের ভিতরে মাকে পেতাম যখন তাঁর মুখ আমরা দেখেছি, আমাদের সুমুখেও মাথার উপর থেকে কাপড় কখনও সরে নি, আর বাবার কাছে কপাল পর্যন্ত ঢাকা। অন্য সকলের কাছে ঘোমটা। তাঁকে দেখতাম আমরা তাঁর ঘরের কাজকর্মের সময়, আর কোন জায়গায় নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে আমাদের সজিয়ে দেবার সময়। পোষাক পাজামা থেকে আরম্ভ করে মোজা জুতো পরানো হলে মাথার চুলও পরিপাটি করে আঁচড়ে দেওয়ার পর টুপি পরিয়ে—কানে আতর দেওয়া, সব শেষে টুপিটি পরানো হলে তবে ছেড়ে দিতেন বাইরে। এই যে তাঁর সাজানো তাতেই তাঁর অপূর্ব শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যেত। আমরা ভাই-বোনে যখন সেজে-গুজে ঘর থেকে বেরোতাম তখন জ্যেঠামশাই প্রভৃতি সকলেই মায়ের সাজানো নিয়ে কত সুখ্যাতি করতেন। বিশেষত ঠাকুরদাদামশাই বলতেন, এমন সুন্দর করে সাজাতে কেউ পারবে না আমার বৌমার মতো। আমি কিন্তু ঐ সাজগোজ খুব বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারতাম না। ফিরে যখন আসতাম তখন টুপি আর পোষাকের বহু অংশ সেই রুক্মিণীর হাতে বাড়ি আসত।

বড় হয়ে,—দিদিমার কাছেই শুনেছি মায়ের কথা। বারো থেকে তেরোয় তাঁর বিবাহ হয়েছিল। মেয়েদের ব্রত-নিয়মাদি ঐ বয়সের যা-সব শিক্ষণীয় ব্যাপার ছিল,—তা সবই তাঁর হয়েছিল। সে-কালের সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোটা চলন ছিল না, অন্তত আমাদের মতো মধ্যবিত্ত বা স্বল্পবিত্ত ভদ্রসমাজে। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে সেই সময়ে অন্যদিক দিয়ে কিছু শিখিয়েছিলেন। সামান্য রকম লেখা আর পড়া তার সঙ্গে নানা দেব-দেবীর ধ্যান ও স্তোত্র তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল; তা, তিনি আবার শিশুকাল থেকেই আমাদের মুখস্থ করাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর যেটা যথার্থ পরিচয়, যে অমূল্য গুণ-সম্পদ উৎসাহ ও সুযোগ পেলে তাঁকে ঐ

সংসারে একটি উজ্জ্বল রত্নের সম্ভ্রম দিতে পারত সেটি তাঁর প্রচ্ছন্ন শিল্পী-মন। উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবে তা বিকশিত হবার সুযোগ পেল না, না বাল্যে না যৌবনে। এমন মধুর, এমন কোমল গানের কণ্ঠ ছিল তাঁর এমনই বিচিত্র তাঁর সুর-বোধ ও তার স্ফুরণ, সুন্দর একটি গান সহজেই তিনি আয়ত্ত করতে পারতেন। মৃদু গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে ঐ গানই ছিল তাঁর একমাত্র সঙ্গী বা নির্জনের বন্ধু আমাদের বাড়িতে।

নির্বাক্ এবং সকল আনন্দ-উৎসবে বঞ্চিত অবগুণ্ঠনে আবৃত তাঁর বঙ্গ-কুলবধূর জীবন এবং অস্তিত্ব ঐ বাড়িতে কারও আকর্ষণের বিষয় ছিল না, মাত্র অনুকম্পার বিষয় ছিল। আহা! অমন প্রতিমার মতন বউটা,—একটা দুর্দান্ত দানবের হাতে পড়ে সুখী হতে পেল না। মাত্র ঐ পর্যন্তই তাঁর শ্বশুর বাড়ির লোকের সঙ্গে ভাবগত সম্বন্ধ। কিন্তু ও বাড়িতে তাঁকে কেউ অনুকম্পার চক্ষে দেখে,—কিংবা তাঁর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করতে সহানুভূতিমূলক কথার ভিতর দিয়ে বাবার নিন্দা করে এ ছিল তাঁর অসহ্য, মর্মান্তিক যন্ত্রণার কারণ। আত্ম-সম্ভ্রমে স্থির, গম্ভীর প্রকৃতি তাঁর,—নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে তিনি ঐ পুরীর মধ্যে একলা আপন ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে আমাদের আগলে রাখতেন, আর থাকতে ভালবাসতেন—কখনও বিনা আহ্বানে কারও ঘরে যেতেন না। যতদিন স্কুলে ভর্তি হই নি ততদিন আমাদের ভাই, বোন দু'তিনটিকে নিয়ে দুপুর-বেলা— পাছে বেরিয়ে যাই তাই ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে থাকতেন। ঐ সময়েই আমরা তাঁর গান শুনতাম। সেলাই-ফোঁড়ার কাজ করতে করতে, অথবা আমাদের ঘুমপাড়াতে তিনি কিন্নর-কণ্ঠে গান করতেন। বোধ হয় সে গান দরজার বাইরে থেকে শোনা যেতনা। ঐ গানেই তিনি আমার মতো দুরন্তকে শান্ত করে রাখতেন।

কোথায় পেতেন ঐ সব গান? মাঝে মাঝে বাড়ির মেয়েদের

সঙ্গে থিয়েটারে যেতেন,—সীতার বনবাস, দক্ষযজ্ঞ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি তখনকার উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকগুলি দেখে তার মধ্যে সেখানে যে যে গান কানে লাগত সেটি তিনি অবিকল গ্রহণ করতে এবং গলায় তুলতেও পারতেন। ভিখারীদের ভাল ভাল গান রোজই বাড়িতে শুনতেন। তারপর যাত্রা হ'ত প্রতি বৎসরে আমাদের বাড়িতে। কোথাও শিক্ষা না পেয়ে তাঁর সুরের কান কি করে এতটা তীক্ষ্ণ হয়েছিল আমি ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। তাঁর যে-সব গান তখন শুনেছি—আমার সেই শিশুস্মৃতিতে বড় হয়ে আবার আমিও তার কতকগুলি আবৃত্তি করেছি। আসলে মায়ের গানের উৎস ছিলেন আমার বাবাই। বাবার গানের কথা উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরে বলব। এই কয় সূত্রেই মা গান সংগ্রহ করতেন তাঁর সহজাত সংস্কার-বশে। আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারি নি যে আমাদের মধ্যে সঙ্গীত-সংস্কার পিতৃকুল থেকে এল, কি মা থেকে এসেছে ?—অথচ আমাদের সংসারে যাঁদের সঙ্গে তিনি সেই বধূ-অবস্থা থেকে ঘরকন্না করেছেন তাঁরা,—এমন কি বাবাও কখন কল্পনা করতে পারতেন না যে মা গান করতে পারেন। সর্ববিধ নারী-শিক্ষার বিরোধী ছিল বাবার মন।

একজন বৈষ্ণব আসত সারা বৈশাখ মাসের সকালে—সে এমন মধুর কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম আবৃত্তি ক'রে যেত ;—অনন্যমনা মা, আমাদের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে শুনতেন,—একটি প্রতিমার মতো। তার প্রত্যেক শব্দ, উচ্চারণ ভঙ্গি, সুর ও তাল চমৎকার আয়ত্ত করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তাঁর দীক্ষার পর, পূজা-জপাদি শেষে, তা নিত্য পাঠ করতেন।

আমার তখন থেকেই মনের মধ্যে একটা প্রবল ক্ষোভ জমা হতে চলেছিল ; সামাজিক বিধি-নিষেধের বিশেষত তখনকার কর্তাদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে এমনই একটা অশ্রদ্ধা জন্মেছিল যা পরবর্তীকালে আমার মানসিক বিবর্তনের কারণ

হয়েছিল। শুধু আমার মা নয়, জীবনে এমনই কয়েকটি অপূর্ব শিল্প প্রতিভার অধিকারী নারী আমি দেখেছি যাদের চিত্রশিল্প, সঙ্গীত এবং সাহিত্য প্রতিভা সংসারের চাপে একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ধুম পড়ে যেত বাবা যখন মামার বাড়ি যেতেন। দিদিমা শশব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কখন কি হয়, অথবা, কি ক'রে কি হবে, এই ছিল তাঁর বুলি। কেমন ক'রে রুদ্রদেব প্রসন্ন থাকবেন এই কথাই বলতেন। বাবাকে তুষ্ট করবার জন্য বাস্তবিকই দিদিমার দিন-রাত ভাবনা—যে ক'দিন বাবা ওখানে থাকতেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু না হয়, তা হলেই অভিমানী দুর্ধর্ষ জামাই চলে যাবেন, আর যা করে যাবেন তা কল্পনাতেও ভয় হয়। মামারা সারাদিন—চাটুয্যে মশাইয়ের কি চাই আর কি চাই না সেই চিন্তাতেই কাটাতেন। আর মায়ের দুর্ভাবনা, পাছে তাঁর প্রতি ব্যবহার এখানকার কারো চোখে পড়ে। প্রতিবেশী জ্ঞাতি-কুটুম্বের মেয়েরা জামাই দেখতে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতেন। পল্লী-গ্রামের কোন সুখী সচ্ছল সংসারে জামাই আসা যে কি আনন্দ উৎসবের ব্যাপার সহরে এখন আমরা তা কল্পনাও করতে পারি না। বাবার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়াটা কিন্তু একেবারেই যেন বিপরীত।

মামারা সবাই মায়ের ছোট। তাঁদের মুখে, দিদি, সম্বোধনটি কানে যে কি মধুর লাগত আমার, কি বলব। মাকে দেখলে তাঁরা আনন্দে অধীর হতেন; বিশেষত দীর্ঘকাল পরে যখন মা বাপের বাড়ি যেতেন। এমনই স্নেহমমতাপূর্ণ কথাবার্তা মায়ের সঙ্গে মামাদের এবং দিদিমার, আমি অবাক হয়ে শুনতাম। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এমনটি হবার নয়। সেখানে সকলের কথাই কঠোর একেবারেই স্নেহ-মমতার অভিব্যক্তিহীন ও নীরস। কেবল গাঙ্গুলী বাড়ির অহঙ্কারে ভরা।

ছেলেবেলা দেখেছি বাবার সুমুখে এসে সহজভাবে আলাপ করা মামাদের সাহসে কুলোত না। সম্বন্ধীরা বড় কুটুম্ব বলেই চলতেন,

কিন্তু বাবা তাঁদের গুরুজন বলে তাঁদের ব্যবহার ছিল গুরু,—সঙ্কোচপূর্ণ। বাবার মেলামেশার সুবিধা, ছোট সরকারের শিরীষ মামার সঙ্গেই হ'ত বেশী। তাঁর সঙ্গেই বাবার চলত ভাল, যদিও মামাদের সঙ্গে তাদের শরিকানী বিবাদ-বিসম্বাদ লেগেই থাকত। বাবা গেলে শিরীষ মামা খুব খুশী হতেন আর বাবাকে বাহ্যত নানা ভাবে আপ্যায়নের চেষ্টা করতেন। যদিও সবাই জানত তিনি অত্যন্ত ক্রুর-প্রকৃতির মানুষ এবং মামাদের পরম শত্রু।

মামারা দশ আনি'র বড় সরকার আর শিরীষ মামারা দু' ভাই ছ' আনির ছোট সরকার। শিরীষ মামা ছিলেন আমার মায়ের বড়, সুতরাং দাদা। এই দুই শরিকের পরস্পর ব্যবহার বড়ই আশ্চর্য লাগত আমার ঐ ছোটবেলা থেকেই। ৺দুর্গা আর কালীপূজা প্রতি বৎসরেই হ'ত। এক বৎসর বড় সরকারের অর্থাৎ মামাদের ; পর বৎসর শিরীষ মামাদের। মামাদের পূজার বছর শিরীষ মামারা লক্ষ্মীকান্তপুরে থাকতেন না, সপরিবারে কলকাতায় তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে চলে আসতেন, আর যে বছর তাঁদের পালা, মামারা দিদিমাকে নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে এসে উঠতেন। আর আমাদেরও ঐখানে নিয়ে আসতেন জোড়াসাঁকো থেকে। এইভাবে মুখ দেখাদেখি ছিল না দুই শরিকে। কিন্তু আবার কখনও কখনও দেখতাম—ও বাড়ির শিরীষ মামারা পূজার সময় ভবানীপুর আসে নি, মামাদের পূজায় ঐখানেই আছেন,—বেশ কথাবার্তা কইছেন তাদের সঙ্গে।

আমি কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারতাম না কেন মামারা আমায় ওঁদের বাড়িতে ওঁদের ঘরে ঢুকতে বা যেতে বারণ করতেন। একে ত শিরীষ মামাকে দেখলেই আহ্লাদে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াতেই আমায় কোলে নিতেন। তাঁর মাকে আমি ঠাকুমা বলতাম সম্পর্কে দিদিমা হলেও ; তাঁর আদরটা আমার ঠাকুমার মতো বলে। তিনিও আমায় ভাল বাসতেন, লুকিয়ে লুকিয়ে কেউ না

দেখে—আমায় নিয়ে তাঁদের ভাঁড়ারে দরজা বন্ধ করে দিতেন আর চিনির পুলি, নারিকেল নাড়ু এইসব খেতে দিতেন, খাইয়ে আবার কেউ না দেখতে পায় এমনভাবে টুক্ ক'রে দরজাটি খুলে রকের ধারে রেখে যেতেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কেমন ক'রে দিদিমা ঠিক দেখে ফেলতেন।

কোথায় গিয়েছিলি?—ঠাকুরমার কাছে। এ্যাঁ এত করে বারণ করেছিলাম না, কেন গেলি? আমায় নিয়ে গেল যে? খেতে দিলে!—ইত্যাদি।

শিরীষ মামা রূপবান্ ছিলেন। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কিন্তু দেখাত যেন গৌরবর্ণ, বড় বড় চোখ, খড়্গনাসা আর নাকের ডগায় একটা বড় কালো আঁচিল ছিল। সেটা না কি বড়ই কুলক্ষণ তাঁর; আর দুর্দান্ত-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ত বটেই, তাঁর দম্ভ বড় ভয়ানক ছিল। সময় সময় মাতাল অবস্থায় যখন তিনি চিৎকার ক'রে প্রজাদের দণ্ডবিধান করতেন, ভয়ে শুধু আমার নয়, অনেকেরই শরীর বুক কেঁপে উঠত। তাঁর কুষ্ঠিতে ছিল, তিনি না কি বিষয়-সম্পত্তি সবই ধ্বংস ক'রে, সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী হবেন। ঠিক তাই হয়েছিল শেষে। এসব আমি বড় হয়ে শুনেছি আর তাঁর ক্রম অধঃপতনটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাঁর ক্রূর বুদ্ধি আর ভীষণ প্রতিহিংসা-পরায়ণতার কথা সর্বজনবিদিত। এমন কি, সত্য সত্যই আমি বাবার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিল দেখতে পেতাম। শিরীষ মামাকে বাবার চেয়ে অনেক মৃদু বা শান্ত মনে হ'ত কোন কোন বিষয়ে। শিরীষ মামা কখনও বাড়ির ভিতরে, তাঁর মা বা স্ত্রীকে পীড়ন করতেন না। তাঁর যা কিছু সবই বাইরে। বাবার বার-ভিতরে ব্যবহার ছিল সমান।

তখন আমার মনে হ'ত তিনি আমায় ভালবাসেন। একলা আমায় পেয়ে যখন যা বলাতেন আমি তাই বলতাম। মামার বাড়িতে আমার নাম দর্পনারায়ণ, দিদিমারা বলতেন, দপ্পনারাণ।

তাঁদের আদরের অনেকগুলি ছড়া ছিল আমার ঐ নাম নিয়ে, সেগুলি আবার আমারই মুখ থেকে না শুনলে তাঁদের সুখ হ'ত না। কাজেই আবৃত্তি আমার শৈশবের প্রবৃত্তি।

বাবা আর শিরীষ মামা দু'জনে আলাপ করছেন, আমি গিয়েছি—দেখেই বললেন, বল, দপ্পনারাণের কথা; শুনেই আমি আরম্ভ করলাম, তাঁর শেখানো ছড়া,—বাবাকে শুনিয়ে;

দপ্পনারাণ গল্প করে তালপুকুরের ধারে?
একটি তাল পড়ে গেল দপ্পনারাণের ঘাড়ে।

শুনেই শিরীষ মামা জ্যেষ্ঠ মাতুলের অধিকার-গর্বে ফুলে উঠে বললেন—বল, একটি তাল পড়ে গেল দপ্পনারাণের বাপের ঘাড়ে। বাবার অধিকার কম নয় ত, কাজেই বাবা বললেন, না, বল—মামার ঘাড়ে।

এক্ষেত্রে বাপ আর মামায় প্রতিযোগিতা লেগে গেল, শিশুর উপর কার কতটা প্রভাব তাই নিয়ে। কি জানি কেন, আমি যখন বলে ফেললাম, মামার ঘাড়ে—তখন শিরীষ মামা বাবার সুমুখেই হাসতে হাসতে অথচ ভিতরে বিষ,—বললেন,—আচ্ছা রহো তুমি, তোমায় দেখাচ্চি, বাপের উপর তোমার বড় ভক্তি, নয়?

তখনই আমি বললাম, বাপকা বেটা, সিপাইকো ঘোড়া; কুছ নহি তো থোড়া থোড়া।

এটাও তাঁরই শেখানো। এখন আমার উপর বিরক্ত দেখে তাঁকে তুষ্ট করবার জন্যই বললাম। কিন্তু ক্রূর তিনি, রেগে গেলেন বাবার উপর প্রীতির পরিচয় পেয়ে; —শেষে বললেন, ও আপনার মারের ভয়ে বলেচে, রাজেনবাবু!

বাবা বললেন—কখনো, নয়, স্বাভাবিক টান। আচ্ছা দেখা যাবে, ব'লে তাঁরা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করলেন।

শিরীষ মামা আমার প্রকৃতি বুঝতেন, তিনি ঠিক জানতেন যে, এর পর আমি তার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াবো তাঁকে সন্তুষ্ট

করতে। এর পর আমি নিশ্চয় তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবো। তিনি সেদিন আর আমায় আদর করলেন না।

শিশুকাল থেকেই একটা দুর্বলতা আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রবল,—আমার উপর কেউ অসন্তুষ্ট থাকবে এ আমি সহ্য করতে পারি না বেশীক্ষণ। আমি কেবলই তাঁর পিছনে পিছনে বেড়াই তাঁকে প্রসন্ন করতে। অন্য আরও কত কি করতে লাগলাম,—পরদিন বিধির বিধানে আবার সেই যোগাযোগ!

এই দুইজনের কথাই বলছি,—বিশেষত শিরীষ মামার; যার উপর তাঁর রাগ থাকত তার দুর্গতি না দেখে শান্তি পেতেন না। বাবাতে আর তাঁতে প্রতিযোগিতায় বাবা নিশ্চিন্ত আছেন, যেহেতু আমি তাঁরই ছেলে আমি তাঁকে যমের মতো ভয়ও করে থাকি, আমি কখনও তাঁর আদেশের অন্যথা করতে পারি না। কিন্তু শিরীষ মামার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা প্রীতির সম্বন্ধও ছিল—তার উপর মামা। যাই হোক, সেদিন অন্য এক ছড়া, যদিও আবৃত্তির উদ্দেশ্য একই। সেটা হ'ল,—

ছেলেবেলায় আমার গলায় একটি হাঁসুলী ছিল তাই, 'দপু আমাদের হাঁস, দপুর গলায় সোনার ফাঁস।' বাবা বললেন, 'বল দপুর মামার গলায় ফাঁস।' আর শিরীষ মামার উপদেশ, 'দপুর বাপের গলায় ফাঁস।' পূর্বদিনে শিরীষ মামার মনে ব্যথা দেওয়ার আক্ষেপ ছিল, তাই আজ তার প্রতিক্রিয়া। তাঁকে তুষ্ট করতে স্বাভাবিক প্রেরণায় দপুর বাপের গলাতেই ফাঁসটা দিয়ে ফেললাম—মানে বোঝাবার বুদ্ধির বালাই ত ছিল না, তিন-চার বছরের শিশু তখন।

যেই বলা, শিরীষ মামার জয় হ'ল, তিনি বিকট হাসির ফোয়ারা ছোটালেন,—ততক্ষণে বাবা আমার টুঁটি ধরে শূন্যে তুলে কিলের উপর কিল, চড়ের উপর চড় দিয়ে অপমানের শোধ নিতে লেগে গেলেন, তাঁরই সুমুখে। শিরীষ মামা প্রসন্ন হলেন এতক্ষণে তাঁর প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল।

আমার উপর শিরীষ মামার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বহু কালই প্রবল ছিল, যদিও মামার বাড়ির সকলের কাছে তিনি ছিলেন দুর্যোধন বিশেষ ; আমি কিন্তু কখনও তাঁকে শত্রু ভাবতে পারি নি।

মনে আছে, সেইবারেই বাবার সঙ্গে আমাদের শেষ মামার বাড়ি যাওয়া,—কারণ, বাবা একটা বড়ই জোর দাবি করেছিলেন দিদিমার কাছে, যা পূরণ করা দিদিমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেই সূত্রেই অভিমান তাঁর। তখন থেকেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি ঠাকুরদাদামশাই মারা গেলেন যখন,—তিনি দ্বারস্থ হতেও যান নি। অবশ্য পরে নিজেই সে মান ভেঙেছিলেন—অন্য ব্যাপারে, আর তা ঘটেছিল দশটি বৎসর পরে।

প্রতি বৎসর মামার বাড়িতে দুর্গাপূজা হ'ত বটে কিন্তু প্রতি বৎসরই মামাদের পূজা নয়। যে বছর তাঁদের পালা, সেই সেই বৎসর দিদিমা মাকে নিতে পাঠাতেন। বাবাকে প্রসন্ন ক'রে দ্বিবৎসরান্তে মাকে তাঁর কোলে নিয়ে আসতে স্তুতি-নতি মিনতির সঙ্গে অনেকগুলি টাকা জামাইকে দিয়ে তা সম্ভব হ'ত।

আমাদের যে একটা দেশ কোনও কালে ছিল এ কথা প্রথমে বাবা, কাকা, জ্যেঠা, এমন কি ঠাকুরদাদামশাইয়ের কাছে কখনও শুনি নি, কিন্তু পিসিদের কাছে বা জিতু ঠাকুমার কাছে শুনতাম। শৈশবে—আমার পাঠশালায় পড়বার সময়টাতেই এক ঘটনায় অদ্ভুতভাবে আমাদের পরিবারবর্গের পিতৃভূমির কথা জানিয়ে দিয়েছিল।

একদিন পাঠশালা থেকে বিকালবেলা এসে বাড়ির ভিতর ঢুকেই দেখি—এক অপরূপ মূর্তির চারদিকে ঘিরে পিসিরা মহা কোলাহল আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। আমি আসতেই সেই মূর্তি বকের মতো ঘাড় তুলে যে চোখ দু'টি আমার উপর ফেললেন সে চোখের দৃষ্টি সহ্য করা সহজ নয় ; বিশেষত আমার মতো শিশুর। সে চোখ কাকাবাবু বা বাবার মতো ডাগর নয়, ভাসাও নয় ;

গভীরতম কোটরের মধ্যে তীক্ষ্ণতম, বিদ্যুৎপূর্ণ দু'টি চোখ—আর এমন তীব্র তার দৃষ্টি, আমার চৈতন্য লোপের উপক্রম হয়েছিল। যদি সেখানে অতগুলি আপনজন না থাকত তা হলে বোধহয় ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়তাম। যাই হোক সেই দ্রষ্টার সঙ্গে এখন পরিচয় করিয়ে দিতে অচলা পিসি বললেন,—কাকা, এত ছোড়দার ছেলে। আর আমায় বললেন, ঠাকুরদাদা হয় নমো করো।

ওঃ হো.—রাজনদরের পোলা,—বলে আমার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি আবার ফেললেন। 'জ'-এর উচ্চারণ যেন Z। যাই হোক আমি ত ভয়ে ভয়ে নমো করলাম।

ইনিই ঠাকুরদাদার জ্ঞাতিভাই কাশীরাম। সুতরাং পিসি, বাবা, কাকাদের কাশীরাম কাকা, দেশ থেকে এসেছেন। মাঝে মাঝে দেশ থেকে কলকাতায় আসেন, এলেই আমাদের বাড়িতে আসেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, দুই এক-দিন থাকেন আবার চলে যান। এবারে এসেছেন বিশেষ একটি কাজে।

প্রকাণ্ড মাথা, ছোট ছোট, কাঁচা-পাকা চুল, পিছনে শিখা বাঁধা, ভ্রূহীন, কপাল প্রকাণ্ড নাক ও কোটরের মধ্যে দু'টি চোখ, তীব্র উজ্জ্বল চাহনি,—একটিও দাঁত নেই,—ঠোঁটের জায়গায় বেশ দীর্ঘ একটি লাইন। শরীর আরও খানিক ছোট হলে তাঁকে বামন বলা যেত।

পরে তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হয়েছিল। বহু বিস্তৃত আমাদের পারিবারিক ইতিহাস,—সেই বীজ পুরুষ দক্ষ থেকে তস্য পুত্র, তস্য পুত্র ক্রমে যত পিতৃপুরুষের নাম তাঁর মুখে শুনে আমার মধ্যে সত্য সত্যই কেমন একটা দেশের ওপর আকর্ষণ বেশ প্রবল হয়ে উঠে ছিল। সেই সময়েই তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিলাম, যদি দেশে কখনো যাই তা হলে কোথায় থাকবো? তিনি বললেন—কেন? তোমাদের দালান-বাড়ি এখনও আছে, সেইখানেই থাকবে?

দেশে ঠাকুরদাদা মহাশয়ের পৈতৃক ভিটা ও বাগান প্রভৃতির

যে অংশ, তারই ব্যবস্থার জন্যে এইবারেই তিনি এসেছিলেন। ঠাকুরদামশাই—সেই সকল তাঁর জ্ঞাতিভাইদের একেবারেই দানপত্র ক'রে দিলেন। যাই হোক এই সূত্রে কাশীঠাকুরদার পরিচয় এবং তাঁরই মুখে পিতৃপুরুষগণের অনেক কথা শুনেছিলাম।

*

বাবার এইরকম অভ্যাস যে তিনি বেলা প্রায় ন'টায় উঠতেন। পরিচ্ছন্ন হয়ে তেল মেখে স্নান করে একেবারে উপরে উঠেই অফিসের কাপড় প'রে ফেলতেন; গানটা তাঁর সকল সময়ই চলত। তেল মাখতে মাখতে গান, গা রগড়াতে গান, গা মুছতে মুছতে গান, কাপড় পরতে পরতে গান। জামা-জুতো পরা হ'লে বাক্সের ওপর একগ্লাস জল আর চারটি পান রেখে মা দাঁড়িয়ে থাকতেন। জলটি খেয়েই পানে মুখ বোঝাই করে, মায়ের সঙ্গে—ও-বেলা তাঁর কি খাওয়া হবে সেই কথাটি কয়েই বেরিয়ে যেতেন। বাড়িতে কিছুই খেতেন না সকালে। একটা দেড়টা বা দু'টোর সময় নাকি সেখানে খাবার খেতেন। ঠাকুরদাদামশাই প্রায়ই বলতেন ঠাকুমাকে যে, তোমার ছেলে কোনদিন ঠিক সময়ে অফিস যায় না।

বাবা, বছরখানেক বা দেড় বছর অফিসে বেরোবার পর—তাঁর আর এক নেশার কথা জানতে পারা গেল। সেটা প্রথমে ঠাকুরদাদাই টের পান। তিনি একদিন বিরলে ঠাকুমাকে বলছিলেন। যেমন থাকি আমি তাঁদের কাছেই ছিলাম, তাই শুনলাম, কিন্তু বুঝতে পারলাম না কিছু।

তোমার ছেলের সর্বনেশে বুদ্ধি যাবার নয়, গিন্নী! সে এবার যেদিকে ঝুঁকেচে সেদিক থেকে কেউ কখনো সর্বস্বান্ত না হয়ে ফেরে নি, এর চেয়ে থিয়েটার নিয়ে আগে ভালই ছিল। শুনে ঠাকুমা খুব ভয় পেয়ে গেলেন, কি নেশা জিজ্ঞাসা করলেন। অফিসে ফিরিঙ্গি সাহেবদের সঙ্গে মিশে ও রেস খেলতে আরম্ভ করেচে, অমুক সাহেবের মুখে শুনলাম।

তখন দেখতাম, প্রতি শনিবার বাবা স্যুট প'রে বেরিয়ে যান। অন্য দিন কাপড়ের ওপর শার্ট-কোট প'রে যান কিন্তু শনিবারে ঐ স্যুট। বুকের ওপর প্লেটওয়ালা কড়া চকচকে সাদা শার্ট, তার সোনার বোতাম চারটে ঘোড়ার খুরের গড়ন মোটা মোটা আর উঁচু, গলায় কলারের বোতামটা, হাতের স্লিভেও বড় বড় ঐ ডিজাইনের বোতাম। তার ওপরে ওপ্‌ন ব্রেস্ট লম্বা ফ্রক্ কোট; ঠিক প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের মতো, যিনি পরে সপ্তম এডওয়ার্ড হয়েছিলেন, দেখাত বাবাকে। তাঁরই একটা ছবি ছিল আমাদের ঘরে—কুইন ভিক্টোরিয়া বসে, তাঁর কোলে একটি শিশু। সেটা হাণ্টলী পামারের একটা রঙীন ক্যালেণ্ডার।

রাত্রে ফিরে আসতেন যখন, কোন কোন দিন মন-মেজাজ ভয়ঙ্কর, কোন দিন বা অনেক কিছু হাতে করে আসতেন—বেশ স্ফূর্তি দেখা যেত তাঁর মুখে। এইভাবে শনিবারটায় যেন আমাদের ঘরে শনি দেবতার খেলাই চলতে লাগল।

ক্রমে ক্রমে দেখা গেল সোনার বোতামের সেট অন্তর্ধান করেছে তার বদলে এল ঝিনুকের সেট। মায়ের গহনাও দুই একখানা করে সরে গেল, অবশ্য যা তাঁর গায়েতে ছিল,—পোষাকী গহনাগুলি ঠাকুমার কাছে—তার ঘরে লোহার সিন্দুকে থাকত। তাতে দন্তস্ফুট করবার যো নেই। একদিন মায়ের গহনার কথা নিয়ে ঠাকুমা বাবাকে ধরে বসলেন,—তুই বৌমার গহনা নিয়ে কি করেছিস বল? বাবা বললেন, রাতারাতি বড়লোক হবার আশায় বিক্রি ক'রে রেস খেলেচি, পরে যখন টাকা পাবো—গড়িয়ে দেবো; তুমি এ নিয়ে আর হাঙ্গামা করো না, বাবার কানে তুলো না বলে দিচ্চি। বাবা যেন না জানতে পারেন খবরদার।

যাত্রা-থিয়েটার নাচ-গান, রামায়ণ-গান, কথকতা, পাঁচালী, সঙ্কীর্তন এমন কি কবিগানেও বাড়ির মেয়েদের বিশেষ প্রীতি। বিলাস-ব্যসনে ছোট কাকাবাবু তৈরী হবার আগে বাবাই ছিলেন

মেয়েদের মুরুব্বি ও উৎসাহদাতা। তাঁর বেশ একটা কৌশল ছিল—কেমন ক'রে মেয়েদের আগ্রহ বাড়িয়ে তার সুযোগ নিতে হয় তা তিনি খুব ভালই জানতেন,—এক্কেবারে ব্রিটিশ পলিশি যাকে বলে তাই।

এক শনিবার সকালে, ঠাকুরদাদামশাই অফিস বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই—কারণ, সেই সময়টাই ঠিক উপযুক্ত,—খবর দিলেন ঠাকুমাকে উদ্দেশ ক'রে, যাতে পিসিরাও সকলে শুনতে পায়,—জানো মা! আজ মিনার্ভায় খুব ভাল একটা বই দিয়েচে, দক্ষযজ্ঞ, গিরীশ ঘোষ দক্ষ, দানী শিব ইত্যাদি। কিংবা বললেন, স্টারে 'বুদ্ধদেব' হচ্চে—অমর্ত মিত্তির সিদ্ধার্থ ইত্যাদি।—এই রকম গরম গরম খবর পেয়েই পিসিরা নাচবার আগে ঠাকুমাই নেচে উঠলেন, বললেন,—চল না রাজা, আমাদের নিয়ে!

রাজা গম্ভীরভাবে বললেন,—আমি কি পারবো? অফিসের কাজ কখন্ ছুটি পাবো ইত্যাদি, তারপর, আচ্ছা! দেখবো, তা হলে টাকা কিন্তু যোগাড় করে রেখো, জানো তো দু'টাকা ক'রে সিট? পিসিরা যদি বললে—কেন? আমরা এক টাকার সিটেই বসবো।

উত্তরে তখন তিনি বললেন,—তা কি হয়? সে কাজ আমার দ্বারা হবে না, ওখানে সবাই আমাদের জানে শোনে, এক টাকার জায়গায় বসলে ইজ্জত থাকবে না। এই ইজ্জত না থাকার কথাটা আমাদের বাড়িতে একেবারে মোক্ষম অস্ত্র। কাজেই, এক গাড়িতে গুড়ের নাগরীর মতো বসে যতগুলি মেয়ে ধরে ততগুলি দু'টাকা এসে পড়ল তাঁর হাতে। তা ছাড়া গাড়িভাড়া দু'পিঠের তা-ও সব ঠাকুমারই।

যথাসময়ে যাত্রা ক'রে যদি স্টারে হয় ত অমৃত মিত্র বা ভুনি বোসের কাছে, আর মিনার্ভায় হয় ত গিরিশ ঘোষের কাছে গিয়ে রাজা হাসিমুখে দাঁড়ালেন। রাজার প্রীতির দাবি সব জায়গাতেই সমান ছিল।

আরে রাজা যে! এসো, এসো; এতদিন কোথায় ডুব মেরে

ছিলে? আর দেখা নেই ব্যাপার কি? বোস বোস…ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজা প্রফুল্ল মুখে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন,—হ্যাঁ, বসচি; আগে মেয়েদের টিকিটটা ক'রে নিয়ে বসিয়ে, ল্যাঠা চুকিয়ে দিয়ে আসি—সঙ্গে বাড়ির মেয়েরা আছে কিনা?

ওঃ হো ও—বাড়ির মেয়েরা এসেছেন তাই বাবুর টিকির নাগালটা পাওয়া গেল। তার ওপর ভদ্রতা ক'রে বাবু আবার টিকিট করতে যাচ্ছেন। আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই, এখানে চুপ করে বোস দিকি! এই, কে আছ?—ওখানে রাজেনবাবুর বাড়ির মেয়েরা এক-গাড়ি এসেছেন, তাঁদের যত্ন করে, অমুক জায়গায় বসিয়ে দাওগে।

এইভাবে প্রায় বারো চৌদ্দ টাকা তাঁর ট্যাঁকে আসত, মেয়েদের থিয়েটার দেখাও হয়ে যেত,—উপরন্তু সকলে কৃতজ্ঞও থাকত যে, এতটা অনুগ্রহ এবং ত্যাগ স্বীকার ক'রে তাদের থিয়েটার দেখানো হ'ল। তারা বলাবলি করত, ছোড়দা এদিকে খুব ভাল। ছোড়দা কিন্তু এত ভাল যে এই সঙ্গে (আমার) মায়ের জায়গার দামটাও ঠাকুমার কাছে আদায় করতেন! কেবল নিজের জন্যে কোন দাম নিতেন না; তাঁর চেনাশোনা আছে কিনা? এতটা অনুগ্রহ তাঁর জননীর প্রতি।

ঠাকুরমা এ সবই জানতেন, কেবল অশান্তির ভয়ে মুখটি খুলতেন না।

*

কলকাতা-ভক্ত আমাদের বংশের প্রত্যেকেই, পল্লী-গ্রামের নামে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। পাড়া-গাঁ যেন তাঁদের একটা অভিসম্পাত—এ কথা প্রকাশ করতে তাঁদের কোন সঙ্কোচ ছিল না। আমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতাম, কোন বিবাহের ঘটক-ঘটকী যদি পড়াগাঁ থেকে সম্বন্ধ নিয়ে আসত, তৎক্ষণাৎ কঠিন কথা শুনত। অদ্ভুত এ বাড়ির লোকেরা, মেয়ে-মরদ সমান পল্লিগ্রামদ্বেষী।

আমার বিশ্বাস—মানুষের প্রকৃতিজাত সহজ আকর্ষণটি—নির্মল

মুক্ত বাতাস, আকাশ আর নদী-জল ঘেরা গাছ-পালায় ভরা স্বচ্ছন্দ পল্লী-জীবনের উপরেই। কিন্তু এই শহরের কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে, কৃত্রিম অর্থকরী জীবনে সেই সহজ আকর্ষণটি চাপা পড়ে গিয়েছে। আমার ঠাকুরদাদা, বাবা, জ্যেঠা, কাকারা কেউ কখনও কলকাতার বাইরে এক রাতের জন্যও থেকে সুখ পেতেন না, হাঁপিয়ে উঠতেন। তাঁরা কোন কাজে বাইরে কোথাও পল্লীগ্রামে গেলে, ফিরে এসে বলতে শুনেছি—বাপ্! কেমন ক'রে ওরা ঐ রকম বনে-জঙ্গলে থাকে?

কিন্তু তাঁদের সাক্ষাৎ বংশধর আমি, কলকাতার বাইরে গেলেই যেন প্রাণ পাই, হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। এ কেমন ক'রে হয়? যখন বাপ-পিতামহের কৃতিত্বে, বড় বংশের অহঙ্কারে ভরা জোড়াসাঁকোর ঐ বাড়ির মধ্যে থাকি তখন মনে হয় যেন যমের বাড়িতেই আছি। স্বর্গে যে যমের বাড়ি সেখানকার যেমন যমরাজ, তেমনি আমাদের এই যমের বাড়ির রাজা হলেন, বাবা সকলকারই তিনি সাক্ষাৎ যম, বিশেষত আমার। আর ঠাকুরদাদা হলেন ব্রহ্মা, তিনি সবারই সৃষ্টিকর্তা—ধীর, গম্ভীর প্রকৃতি, নিজ আসনে থাকেন; সময় সময় তিনি যমেরও নিয়ন্তা। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—কৌশলে আমায় যমের অধিকার থেকে ছাড়িয়ে মামার বাড়িতে লেখাপড়ার ব্যবস্থা। যেমন কৌশলে তিনি ঠাকুরমাকে সঙ্গে দিয়ে তিন-চার মাস বাবাকে পশ্চিমে তীর্থ ঘুরতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এবারে এমন কৌশল করলেন, বাবা জানতেও পারলেন না যে, এটা তাঁর নির্দেশেই হয়েছে। বাবাকে পিসিরা বুঝিয়ে দিলেন—ধনের শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে! ছেলেটা কি দুরন্তই না হয়েছে এখানে পাঠশালার সব খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছে! কি রোগা হয়ে যাচ্ছে, কিছু খেতে পারে না, ওকে এখানে রাখা কোন রকমেই উচিত নয়, ওকে মামার বাড়িতে পাঠানোই ভাল, সেখানে ভাল পাঠশালা আছে—মামাদের শাসনে ভাল হবে।

বাবা এদিকে ভীষণ দুর্দান্ত বটে, কিন্তু এক একটা বিশেষ ব্যাপারে, অবলীলাক্রমে পিসিদের উপদেশই শিরোধার্য ক'রে নিতেন। বড় হয়েও দেখেছি কোন একটা বিপদে-আপদে তিনি একেবারে ছেলেমানুষের মতোই হয়ে পড়তেন; তখন পিসিরাই তাঁকে কর্ণধার রূপে চালনা করতেন। তিনি সুবুদ্ধি বালকের মতো তাঁদের নির্দেশমতোই সে ক্ষেত্রে চলতেন। পিসিরা বাবাকে কি সুন্দর এক একটা বিষয়ে চালনা করতেন, দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

যাই হোক, আমায় মামার বাড়িতে রেখে পড়াবার পক্ষে আরও বিশেষ বলবৎ কারণ হয়ে পড়ল একটা ছোট ঘটনা।

দীনু গুরুমশাইয়ের পাঠশালার শেষ অভিজ্ঞতা। বড় দালানেই পাঠশালা বসত। ঠাকুর দালানের দু'পাশেই ঘর থাকে ভোগের জিনিসপত্র বা পূজার জিনিসপত্র রাখবার জন্য। যে যে বাড়িতে ঠাকুর-দালান আছে, তার দু'পাশে ঘর থাকবেই। আমাদের বাড়িতেও আছে, গাঙ্গুলী-বাড়িতেও আছে,মামার বাড়িতেও দেখেছি। এখানেও ছিল দু'খানা ঘর এবং তা বন্ধ থাকত পাঠশালার সময়। পেঁচো বলে একটা কালো, ধেড়ে ছেলে, মুখখানা বসন্ত-দাগে ক্ষত-বিক্ষত—সে থাকত তার বাবার সঙ্গে সেই ঘরে, ভাড়া নিয়ে। এখন, তার বাবা তাকে রেখে দেশে গেছেন দুই সপ্তাহের মতো, সে একলাই থাকে।

সেদিন শনিবার। পেঁচো বললে—এই ধোনা, কাল সকালে আসিস্ এমন একটা চমৎকার মজা দেখাব, এমন কখনও দেখিস নি। সুতরাং মজা দেখতে সকালে আসতেই হ'ল। এসে দেখি— বাপের বাঁধা হুঁকোতে সে দিব্বি ভড়াক্ ভড়াক্ ক'রে তামাক খাচ্ছে; আর আশু বলে একটা ছেলে হাতের তালুতে কি টিপচে। বাবা রোজ সন্ধ্যায় যে জিনিসটি টেপেন এটাও তাই নাকি?

ওটা কি ভাই? জিজ্ঞাসার উত্তরে পেঁচো বললে—জানিস না? গাঁজা! বলে হা হা হা হা ক'রে হাসি। গাঁজা, গুলি, মদ—এসব

নেশা যে, ভেবেই আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, এ বলে কি? গাঁজা? ভয়ে ভয়ে কেবল বললাম,—অ্যাঁ তুমি গাঁজা খাবে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খাবো, তুই খাবি, আশু খাবে, তাতে হয়েচে কি, তারপর আরও কত কি করবো তখন দেখবি।—বলে হা-হা-হা-হা করে হেসেই আকুল। এত সহজ তার পক্ষে এইসব ব্যাপার—দেখে, বুঝে, আমি ত অবাক। কেমন একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগল।

আমি আস্তে আস্তে দরজার দিকে সরে যাচ্ছি,—চতুর পেঁচো ঠিক সেটা বুঝে নিয়েই খপ্ করে আমার হাতখানা ধরে ফেললে,—তারপর জোর করে ভিতরে টেনে নিয়ে এসে,—ঘরের দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলে।

আরও কি হ'ত না হ'ত ভগবানই জানেন, ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল; একজন বললে—এই, এখন তোরা দরজা দিয়ে ভিতরে কি গোলমাল করছিস? জ্যেঠামশায়ের মতোই গলার আওয়াজ, শুনেই আমি ডাকলাম, বাবুয়া? পেঁচোকে দরজা খুলতেই হ'ল। আজ রবিবার, জ্যেঠামশাই আমায় এদিকে আসতে দেখেই তিনি ঠিক পিছনে পিছনে এসে ধরেছেন।

পেঁচো দরজা খুলতে খুলতে বললে, আমরা রান্নার যোগাড় করচি। কাকেও কিছু না বলে, বাবুয়া আমার হাত ধরে নিয়ে এলেন বাড়িতে। এই হ'ল আমার শাপে বর। জ্যেঠামশাই বাবাকে দৃঢ়ভাবেই বুঝিয়ে দিলেন, ওখানে ওকে আর পাঠানো উচিত নয়, ওকে লক্ষ্মীকান্তপুরেই পাঠিয়ে দাও। পাঠশালার কাজটা সেখান থেকেই শেষ করে আসুক।

দাদামশাইয়ের কৌশল, পিসিদের দিয়ে বলানো তারপর জ্যেঠা-মশাইয়ের বলবান্ সৎযুক্তি, তার ওপর দিদিমা ও মামাদের প্রস্তাব—এতগুলির প্রভাব বাবা এড়াতে পারলেন না, আমায় মামার বাড়িতে রেখে পড়াবার প্রস্তাবে রাজী হলেন।

এখন মামার বাড়িতে এই সূত্রে আমার যথার্থই বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। যথার্থ, এইজন্য বলছি, কলকাতায় দীনু গুরুমশাইয়ের পাঠশালে যে বিদ্যারম্ভ তার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ছিল না। পীড়নের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাসের কথা হয়ত কোন কোন ভাগ্যবানের বাল্য-জীবনেও আমরা পেয়েছি—তাতে তাঁদের ঐকান্তিকতার ব্যাঘাত ততটা ঘটে নি—আমার মনবুদ্ধি কিন্তু সে ধাতুতে গড়া নয়, আর তাঁদের গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের ঘরের বিস্তর প্রভেদ। তাঁদের পিতা প্রভৃতি অভিভাবকগণের সঙ্গে সম্বন্ধ এবং ব্যবহারের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। সেদিকে অনেক বড় প্রভেদ ত ছিলই, তা ছাড়া আমার মন ছিল তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন এবং ভাবপ্রবণ। শরীর মনে কোন কঠিন আঘাত আমি খুব সহজে ঝেড়ে ফেলতে পারি না সে জন্যও বটে, আর লেখাপড়া শিক্ষায় আমার সহজ প্রবৃত্তি প্রতি পদেই বাধা পেয়ে এসেছে গুরুজন প্রভৃতি অভিভাবকগণ-পরিবৃত সংসারের মধ্যে। আমার বোধ হয়, পড়ার বিষয়ে বেশী কঠোরতা না ক'রে যদি আমায় উপেক্ষা করা হ'ত, তা হলে অনেকটা উপকার হ'ত। সহজেই আমি পথ ক'রে নিতে পারতাম। তাতে আমার অন্তরের আনন্দ ছিল।

যাই হোক—আসল ঐ সময়টাতেই বলতে গেলে যথার্থ আমার মন আর বুদ্ধির স্ফূর্তি আরম্ভ হয়েছে। ভিতরকার অবস্থা অনেক কিছুই বুঝিতে পারি,—সঙ্গে সঙ্গে সুখ-দুঃখের অনুভব ; আত্মসম্মান, আত্মাভিমান এবং তার সঙ্গে ভাবপ্রবণতাও তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

যখন জোড়াসাঁকো থেকে মহানন্দে বড়মামার সঙ্গে, বুকের ডান দিকে কলারবোনের নীচেই একটা প্রকাণ্ড ফোড়া নিয়ে উপস্থিত হলাম, সেটা তখন পেকে এসেছে। যন্ত্রণা সহ্য করবার ধৈর্য গোড়া থেকেই ছিল।

এখানে সকল রোগের টোটকা দিদিমার মুখে মুখে, চিরকালই শুনে এবং ব্যবহারে দেখেও এসেছি। এখন আমার ফোড়ার

চেহারা দেখেই তোপমারীর ব্যবস্থা করলেন, যদিও মেজমামা সেটা দেখেই বলেছিলেন, বেশ কাটবার মতোই হয়েছে, না? দিদিমা বললেন,—না, না, কাটাকুটির দরকার নেই, আপনিই মুখ হবে, আর সময় হলে তখন যা কিছু গলদ বেরিয়ে সেরে যাবে। আমারও সেই যে বিশ্বাস হয়ে গেল, যে ফোড়া যথাসময়ে পাকে আর আপনিই মুখ হয়ে ফেটে গলদ বেরিয়ে সেরে যায়, সে বিশ্বাস আমার এখনও অটুট আছে।

রোগটা যেমন আপনি হয় সারেও আপনি। এটা আমি দিদিমার কাছেই পেয়েছিলাম। প্রকৃতির নিয়মেই রোগ সারে, ধুমধাম করে তার জন্য একটা বিশেষ আয়োজন বা প্রক্রিয়া অনাবশ্যক;—এ বুদ্ধি আমার সংস্কারগত হয়ে আছে এই সময় থেকেই, এমন কি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে আছে বলা যায়। তার মূলে আরও একটা কারণ ঘটল;—মেজমামা,—দিদিমার অগোচরে তাঁর নিজ অভিপ্রায় অনুসারেই ফোঁড়াটাকে কাটিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, সার্জারী চিকিৎসার সৃষ্টি হয়েছে কেন তবে?

এই অস্ত্রোপচারের যোগাযোগটাও যেন দৈবযোগে, কার্য-কারণ সম্বন্ধেই সুনির্দিষ্ট ছিল। তখন যদি মহেন্দ্র ডাক্তারের প্রত্যহ ওখানে আসার প্রয়োজন না থাকত তা হলে দিদিমার ঐ তোপমারীর গুণে সহজেই সেরে যেত;—আমার এই ফোঁড়া কাটবার জন্য ডাক্তারকে ঘাটেশ্বরা থেকে নিশ্চয়ই ডাকা হ'ত না। মহেন্দ্র ডাক্তারের প্রত্যহ শুভাগমনের যে কারণ, তার মূলেও এক অদ্ভুত ঘটনা।

যখন আমার মাতামহ মারা যান চারটি মামাই নাবালক, বিষয় দেখবার মতো অবস্থা নয়। বড়মামা পড়াশুনা করেন কলকাতায় থেকে আর সবাই বাড়িতেই থাকে। কেবল মেজমামা স্কুলে কখনও পড়েন নি, ঐ গ্রামের পাঠশালে তাঁর যা কিছু বিদ্যা। কিন্তু মামাদের

মধ্যে তাঁরই বিষয়বুদ্ধি ছিল সব চেয়ে বেশী। বিষয় বৃদ্ধি আর রক্ষার ব্যাপারে তিনি সকলকার বড়ই ছিলেন। সংসারের সব কিছু আজীবন তিনিই দেখে এসেছেন। এখন যা বলছিলাম—ঐ সময়ে, নাবালকদের অভিভাবক হয়ে মামাদের কতকগুলি নিকটাত্মীয় কেউ নায়েব, কেউ গোমস্তা, কেউ বা ম্যানেজার হয়ে বিষয় রক্ষা করতেন। কাদুয়া বলে একটা তালুকের নায়েব ছিলেন গোবিন্দ পুতিতুণ্ড, মামাদের এক নিকট জ্ঞাতি খুড়ো। রক্ত শ্যামবর্ণ, বিরাট ভুঁড়িওয়ালা স্বাস্থ্যবান্ শরীর ছিল মামাদের এই বিপত্নীক খুড়োর, —আর সৌদামিনী বলে এক গিন্নি ঝি সব সময়েই তাঁর সংসারে ছিল, কর্ণধার, তার ডাক নাম সদু। ও অঞ্চলে সকলেরই ধারণা গোবিন্দ খুড়োর না কি অনেক নগদ টাকা, তা ছাড়া তাঁর পরলোক-গত স্ত্রীর অনেক গয়না-গাঁটি ঐ সদুর হাতেই ছিল। এই অপবাদের ফলে এক দুপুর রাত্রে একদল ডাকাত কেদুয়ার কাছারি বাড়িতেই তাঁকে আক্রমণ করে। প্রাণভয়ে সদু তাড়াতাড়ি যা কিছু তার কাছে ছিল সেইসব নিয়ে পালিয়ে—পিছনের বাগানে লুকিয়ে থাকে। ডাকাতেরা গোবিন্দ খুড়োর কপালে একটা, নাকের সেতুর উপরে একটা আর কাঁধের উপরে একটা ভোজালির কোপ মেরে কাহিল করে ফেলে। যখন তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন তখন তাঁর সিন্দুক ভেঙে নগদ টাকা-কড়ি, এবং গহনা-পত্রাদি যা পায় তা-ই নিয়ে সরে পড়ে। জনপ্রবাদ সদুরই ষড়যন্ত্রের ফলে এসব হয়। খুড়োর তখন বয়স ষাট-বাষট্টি হবে। ঐ সাংঘাতিক তিনটি ঘা খেয়েও তিনি সহজে কাবু হন নি,—তিনি লড়েছিলেন ততক্ষণ, অতিরিক্ত রক্তস্রাবে যতক্ষণ না অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। আঘাতগুলি পরে চিকিৎসার সময়ে আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। গভীর সে কাটা দেখলে ভয়ে গা শিউরে ওঠে। মামার বাড়িতে বার মহলে দক্ষিণের বড় ঘরে তাঁকে রাখা হয়েছিল। তাঁর বিছানার আশেপাশে নানা রকমের লটবহর ছিল। আমি এই সময়েই এখানে এসেছিলাম—

আর তাঁরই চিকিৎসার অবসরে আমার বুকের ফোড়াটায়— অস্ত্রোপচার করা হয়, মেজমামার জেদ বজায় রাখতে।

প্রায় দুইটি মাস লেগেছিল খুড়োর সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে। মেজমামা তাঁর কাছে হামেশাই হাজির থাকতেন, সকল কিছুই দেখতেন। ঘাটেশ্বরার মহেন্দ্র ডাক্তার একটা বড় বাদামী ঘোড়ায় চড়ে প্রত্যহই সকালে আসতেন। ঘা ধোয়া, কার্বলিক তেল দিয়ে লিণ্ট পোরা, ব্যাণ্ডেজ করতে আমি রোজ রোজই দেখতাম। আয়ডাফর্ম আর কার্বলিকের গন্ধে শুধু ঘরটা নয় সদর বাড়িটা ভরে থাকত। এতটা ঘায়ের যন্ত্রণা অনায়াসেই সহ্য করে খুড়ো এক-মাসেই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন, একদিনের জন্যও তাঁর জ্বর হয় নি। তাঁর পথ্যও ছিল তেমনি জুৎসই যেমন তাঁর শরীরটি। রোজ একটা করে পাঁঠা কাটা হ'ত তাঁর জন্য পঞ্চাননতলায় মা মনসার থানে। সেই মাংসের রান্না অর্ধাংশের বেশী ভাগটা তিনি মধ্যাহ্নে ভোজন করতেন।

বাবাও ভোজনবিলাসী ছিলেন কিন্তু পরিমাণের কথায় বোধ হয় এই বৃদ্ধের স্থান তাঁর উপরে। প্রতিদিন দু'বেলাই তাঁর প্রসাদ পেতাম সেইজন্য এই ব্যাপারটা ভালই মনে আছে। পুরো দু'টি মাস কাটিয়ে, সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে, বিষয়াশয়ের ব্যবস্থা ক'রে, যা কিছু ছিল সব নিয়ে-থুয়ে, সকলকে আশীর্বাদ ক'রে, বুড়ো কাশী চলে গেলেন। আমরা বাড়ির সকলে মিলে তাঁকে ডোঙ্গাঘাটায় তুলে দিয়ে এলাম ; গ্রামশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছিল তাঁর যাত্রা দেখতে।

মামার বাড়িতে প্রত্যহই বৈকালে, সদরের দু'ধারের প্রশস্ত রকের একদিকে মামাদের বৈঠক বসত। সেখানে রাজনীতি, কর্মনীতি,—সমাজের নানা কথা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সারা দুনিয়ার যত খবর ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়। প্রতিবেশী, জ্ঞাতি এবং বাবুদের ভিন্ন গ্রামের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-কুটুম্ব যারা সেই সময় থাকতেন সকলে সমবেত হয়ে সভা উজ্জ্বল করে বসতেন—হরদম

তামাক চলত। গোবিন্দ খুড়োর ডাকাতে কাটার ব্যাপারটা বহুদিনই সেখানকার আলোচনার বিষয় ছিল।

কাশীতে গিয়ে তিনি আরও বারো বৎসর সুখে বেঁচে ছিলেন। মামাদের সেই দীর্ঘজীবী খুড়ো গোবিন্দের ছেলে-পুলে কিছুই ছিল না, মামারাই ছিলেন তাঁর সম্পত্তির ওয়ারিসান।

সাত

এখন থেকেই মামার বাড়ির সঙ্গে আমার জীবনের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। আমার শরীরের যে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য তার অর্ধেকের উপর মামার বাড়ির দান। আমার অন্তঃকরণের সুকুমার বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি এই মামার বাড়ি থেকেই। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের অনুশীলন, কর্তব্য নির্ধারণের বুদ্ধি এ সকল ঐ মাতৃকুল থেকেই, আমার বিশ্বাস। আত্মীয়স্বজন প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাল্যে আমি ঐখানেই দেখেছিলাম। ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যে যদি আমার কিছু গতি হয়ে থাকে তা পিতৃ-মাতৃ উভয় কুলের প্রভাব বলেই বোধ হয়। পিতৃ-কুলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমার বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্যের বিষয় হয়েছিল যা আমার বিচার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করেছিল। নিষ্ঠুরতা, দম্ভ, কুলীন বংশের অহঙ্কার, যদিও আমাদের কৌলীন্য আমায় নিয়ে চার পুরুষ হ'ল ভঙ্গ হয়েছে, ইত্যাদি বাপের বাড়ির যে সকল দোষ বাল্যকাল থেকেই স্পষ্টভাবে লক্ষ্যের বিষয় হয়েছিল তার সঙ্গে পাশাপাশি মামার বাড়ির স্বজনপ্রীতি এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সদ্ভাব ও ব্যবহার লক্ষ ক'রে, আর এই দুই বংশের পরিবারের মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্যই আমার সদসৎ বিচারবুদ্ধিকে জাগিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল।

মামার বাড়িটি আমার সেকেলে ধরনের, ছোটখাটো নয়—বেশ বড়ই,—তবে ধ্বংসোন্মুখ জমিদার-বাড়ি। সুমুখে অনেকটা খোলা জায়গা তাতে দু'টো কাঁচামিঠে আমগাছ কয়েকটা নারকেল আর একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। শীতকালে ধান কাটা হলে এখানেই বড় বড় গাদা দেওয়া হ'ত, তারপর খামারের কাজ চলত যতক্ষণ না সব ধান ছাঁটা, ঝাড়া হয়ে গোলায় উঠত। খামারের সময় তখন ঐ জায়গাটা নিকিয়ে-চুকিয়ে ঝরঝরে-তরতরে করা হ'ত; অন্য সময় সবুজ ঘাসে পূর্ণ থাকত। তারই পূর্বদিকে পথের ধারেই প্রকাণ্ড দু'টি গোলাবাড়ি আর গোলাবাড়ির সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোয়াল ঘর।

বিশাল দুটি পাল্লা, তাতে বড় বড় চৌকো চৌকো লোহার গুল বসানো সদর দরজা। তার একটা পাল্লার নিচের দিকটা একটা ছোট কাটা দরজা;—বড় দরজা বন্ধ হলে, তখন ঐ কাটা দরজা দিয়ে আনাগোনা চলত। ঢুকেই দু'দিকে লম্বা দেউড়ি,—সেখানে এক একদিকে তিনখানা করে খাটিয়া পাতা ছ'জন দারোয়ানের জায়গা, বাকি দারোয়ান সব গোলাবাড়িতেই থাকত। দরজার ঠিক উপরেই একটা ঢালের দু'দিকে দু'খানা ধূলায় ধূসরিত খড়্গ রাখা। দেউড়ি পেরিয়ে প্রকাণ্ড আটচালা, মোটা মোটা চৌকো প্রায় দোতলার সমান উঁচু আটটা থামের উপর খড়ে ছাওয়া চাল;—তার সুমুখেই তিনটি গোল খিলানওয়ালা ঠাকুর-দালান। তখনকার দিনে যেমন কলকাতার সর্বত্রই দেখা যেত ছড়ওয়ালা থামের উপর খিলান—এও সেই রকম। ঠাকুর-দালানের দুই পাশে লম্বা লম্বা দু'টি ভোগের ঘর; পুজোর সময়, দেবী পুজো ও ভোগের যা কিছু ঠাকুরের জিনিসপত্র ঐ ঘরেই থাকত। তার উপর তলে ঠাকুরঘর। বাস্তুনারায়ণ শ্রীধর—মামাদের কুলদেবতা।

আটচালার দু'দিকেই বড় রক। তাতে কোথাও দাবা, কোথাও পাশা, কোথাও বাঘবন্দী খেলার ঘর কাটা। মেঝের উপর এইসব

খেলার পাকা ব্যবস্থা তখন ছিল আর এই কয়টা খেলাই যুবা ও বুড়োদের মধ্যে হামেশাই ওখানে চলত দেখেছি। রকের পরেই দর-দালান, তারই কোলে কোলে সব ঘর—কোনটা বৈঠকখানা আবার কোনটাতে কাছারীর কাজ হ'ত। তার পরেই লণ্ঠনের ঘর। বেশ বড় একটা ঘরের চারিদিকেই উঁচু উঁচু অনেকগুলি তাকওয়ালা ঘড়াঞ্চে, কাঠের কাঠামো তার মধ্যে নানা রঙের ঝাড়, দেয়ালগিরি ও সামাদানের অসংখ্য ফানুস রাখা আছে। উপরে একহাত অন্তর এক একটা গেলাপ দেওয়া ঝাড় ঝুলছে, সারা বার-বাড়িটা ভরা,—কাজকর্মের সময়ে নামানো হ'ত; আর বাইরের সব ঘরেই বেল লণ্ঠন, সাদা রঙীন নানা রকমের ঘেঁষাঘেঁষি—কড়িকাঠ থেকে ঝোলানো রাখা আছে। ঘড়াঞ্চেতে রাখা বেলোয়ারী কাঁচের ফানুস, গেলাস আমরা সখ করে কত যে ভেঙেছি তার নির্ণয় নেই। দু'হাতে দুটি ফানুসের গোড়ায় ধরে শেষ দিকে বিস্তৃত গোল চক্র একটার গায়ে একটা লাগিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাতে আরম্ভ করলে একটি সুন্দর সুরের সৃষ্টি হ'ত, যতই দ্রুত চলত ঘোরানোর কাজ, সুরের কাঁপুনি বাড়তে বাড়তে শেষে, ফট্ ঝন্‌ঝন্। এই লণ্ঠনের ঘরে আর একটা জিনিস থাকত,—একদিকে দুটো পাশা-পাশি ঘড়াঞ্চের মধ্যে হাতখানেক ব্যবধান,—তার মধ্যে মুখ বাড়ালে, অন্ধকার হলেও দেখ যাবে, খুব ভারি একখানা প্রকাণ্ড খাঁড়া, কড়িকাঠ থেকে একটি কাছিতে বাঁধা ঝুলছে। বলিদানের জন্য পুজোর সময় এটা নামানো হ'ত, অন্য সময়ে ঐখানেই তার স্থান। ঐ ঘরটায় একধারে একখানি তক্তাপোশ তার উপরে মাদুর পাতা,—চাকর-বাকর, পাচকেরা ঐখানে বসত। আর বড়মামা যখন বৈঠকখানায় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পাশায় বসতেন তখন আমরা ছেলের দল রাত্রে এই ঘরেই পড়তাম।

এই ঘরের পরেই অন্দরের দর-দালান লম্বা চলে গেছে। তার একদিকে সারি সারি ঘর, অপরদিকে খোলা বারান্দা; দর-দালানের

পশ্চিম প্রান্তে উপরে ওঠবার চওড়া চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে প্রত্যেক বাঁকের মুখে একটা করে জানালা। শেষ বাঁকে মোটা মোটা চৌকাঠের উপর প্রকাণ্ড ভারি তু'টো চাপা দরজা, তাতেও লোহার গুল বসানো। পাল্লাত্ন'টি তু'দিকের দেয়ালে লোহার আংটায় আটকানো থাকে। রাত্রে সবাই উপরে উঠলে সেটা বন্ধ করা হয়। তাতে খিল লাগালে আর চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না। তার পরেই আবার বড় দরজা একটা দিয়ে উপরের লম্বা দর-দালান; আর ঠিক নিচেকার ঘরের মাপে মাপে উপরের ঘরগুলি শোবার জন্য। কাজে-কর্মে যখন অনেক দূর-দূরান্তরের মেয়ে আত্মীয়-কুটুম্ব দল আসেন, তখন এই তুইটি দর-দালানের মধ্যেই গড়া গড়া বিছানা ও মশারি পড়ে। তখন ঘরে কুলিয়ে ওঠবার নয়। যাই হোক, ঐ সিঁড়ি উঠে গেছে তেতালার ছাদ পর্যন্ত। সেই সিঁড়ির শেষে ছাদের চিলেকোঠা, সেই কোঠার একদিকে একটা উঁচু বেদীর মতো, সেখানে থাকত দিদিমার আচারের হাঁড়ি, বড়ির হাঁড়ি—তার এক ধারেই কতকটা ঘেরা-জায়গায় থাকত প্রকাণ্ড একটা লক্ষ্মীপেঁচা। ঐটি ছিল আমার তখনকার দিনে প্রবল আকর্ষণ। এতবড় পেঁচা আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। সারাদিন সে সেইখানেই থাকত, ঘুমোত আর সন্ধ্যা হলেই উড়ে যেত, আবার ভোরে ফিরে আসত। তায়ই জন্য ছাদের দরজা কখনও বন্ধ হ'ত না। আমি মাঝে মাঝে তুপুর বেলা উঠে তাকে দেখতাম। এমন চমৎকার রং তার! কতকটা পাঁশুটে হালকা সবুজ গা, আর বুকের দিকটা তুধের মতো কিংবা ধোনা তুলোর মতো নরম আর ধব্‌ধবে সাদা। বড় বড় গোল গোল কটা চোখ, বাঁকা ঠোঁট। তার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি যখন মিলত, ভয়ে আমার বুকটা তুরুতুরু করে উঠত;—কিন্তু তবুও যেতে ছাড়তাম না। হাতে একটা কাঠি নিয়ে, কি কিছু নিয়ে কাছে গেলেই সে ফোঁস ফোঁস করে উঠত।

সেই চিলেকোঠার ছাদের দিকেও অনেকগুলি চৌকো বড় বড় খুপরি ঘর ছিল, দিদিমার বড়ি ও আচারের পাত্রাদি রাখবার জন্য। রোজ রোজ সারাদিন রৌদ্রে দেবার দরকার যে সব জিনিসের, সেগুলি পূর্ণ রকমের পক্ক হবার পূর্বে নিচে ভাঁড়ারে নামানো হ'ত না,—ঐখানেই সে সব থাকত। ঐ ছাদের উপর উঠলে বহু দূর-দূরান্তরের মাঠ—এমন কি চক্রবাল রেখা দেখা যেত। কখনও কখনও আমি সারা দুপুরে ঐ ছাদের উপরে উঠে আকাশ আর মাটির বিস্তার অবাক হয়ে দেখতে দেখতে কাটিয়ে দিতাম, কেউ জানত না। কলকাতায় ত এ জিনিস নেই।

নিচে, যেখান থেকে সিঁড়ির ঘর দর-দালানের শেষের দিকে বেঁকে ডানদিকে চলে গেছে, তার কোলে বড় বড় ঘর বলেছি; এই লাইনেই ভাঁড়ার ঘর দু'খানা—তারই একখানাতে মেঝের উপর দিদিমার সন্ধ্যাপূজার জায়গা। বাইরের বড় ঠাকুর-ঘরে তিনি যেতেন পূজার যোগাড় ও কাজকর্ম করে দিতেন, কিন্তু নিজের আসন ছিল এই ভাঁড়ার ঘরেই।

উপরে যাবার সিঁড়ির কোণ থেকে উত্তর দিকের দর-দালান, তারই কোলে বড় বড় ঘর. চৌকির উপর ছোট-বড় জালায় ভরা, এটা চালের ঘর। তার পাশে জলের ঘর—সেখানে জল থাকত পাথরের বড় বড় উঁচু চৌকির উপর, আর মেঝেতে বড় বড় শিল,—বাটনা বাটার জন্য, তার পরেই পানের ঘর, তার পাশেই আঁতুড় ঘর। অবশ্য অন্য সময়ে সে ঘরে ভিয়ানও চলত কাজ-কর্মের বেলায়। ঘরের কোলে উঁচু দালান বলে ঘরগুলি একটু অন্ধকার দেখায়। কেমন একটা রহস্যময় আবহাওয়ায় যেন আচ্ছন্ন এ দিকটা। সেই দর-দালানের শেষে আবার চত্বর, উপরে ছাদ, সেও লম্বা-চওড়ায় একটা বড় দালানের মতো, যেখানে দশ থেকে পনেরো জন বাড়ির পুরুষ মানুষ আমরা একত্র ঠাঁইয়ের উপর আসনে বসে দুপুরে ও রাত্রে ভোজন করতাম। তা ছাড়া একটা আলাদা লাইনে

ছোট্ট ছেলেরা আট দশজন বসত খেতে বড়দের সঙ্গে। ঠিক তারই লাগোয়া প্রকাণ্ড রান্নাঘর, একদিকে আঁশ, আর একদিকে নিরামিষ রান্নার ব্যবস্থা ;—ছ'দিকে ছ'সার উনান। আর ধারে ধারে উঁচু পিঁড়ির উপর বড় বড় জলের কলসী রাখা। রান্নাঘরের পরেই একদিকে লম্বা চালা, তারই নিচে উঠান। তার গায়েই চওড়া বারান্দা, সেখানেই মাছ কোটা হয়। ছোট-বড় অনেকগুলি বঁটি রাখা আছে। খাবার জায়গার পরেই একটা পথের ঘর, তার পরেই আবার লোহার গুল বসানো অপেক্ষাকৃত ছোট খিড়কির দরজা।

সেখানে চ্যালা করা কাঠ জমা থাকে—সেইখান থেকে নিয়ে রোজ রান্না হয়। তখন কয়লার চল হয় নি। এই দিকটা খুব পুরোনো ; দেয়ালেতে বালির চিহ্নমাত্র ছিল না। ইট বার করা, আর রান্নার ধোঁয়ায় কড়ি-বরগা সবই প্রায় কালো হয়ে এসেছে। মেঝেতে গোবর-মাটি দিয়ে প্রত্যহ সকালে নিকোনো হ'ত। ঐ গোবর-মাটির গন্ধ একটা সব সময়েই পাওয়া যেত। কলকাতা থেকে গিয়ে প্রথম প্রথম সে গন্ধটা খুবই বেশী লাগত আমার, কিন্তু খারাপ লাগত না। আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ির আর কোনও ছেলেমেয়ে সে গন্ধ সহ্য করতে পারত না। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার, রাত্রে খাবার সময় সেখানে ছ'দিকে ছ'টো দেরকোর উপর কেরোসিনের লম্প জ্বলত, ভর ভর করে তার কালো শিখা উড়তো ; ওখানে মামাদের সব নিয়ে এক দালান লোক সেই আলোতে রাত্রের ভোজন সমাধা করতেন বেশ সহজেই। ১৮৯২ সালের কথা। সেই সঙ্গেই আবার দর-দালানে সারি সারি দশ বারোজন জনমজুরও খেতে বসত, একই সময়ে, সেখানেও ছ'দিকে ছ'টো ঐ লম্পই জ্বলত, তার নাম টেঁপী। মামীরা কেউ বা, শিখর মাসিমা বুড়ী একই সঙ্গে সকলকে ভাত-ডাল তরকারি পরিবেশন করতেন। এর তিন বছর পরে বড়

ও মেজ মামী রান্নার ভার নিলেন দুবেলা। ভাবতে আশ্চর্য লাগত, কেমন করে ঐ ছোট্ট মামী দুটি, অতো অতো রান্না ক'রে একই সঙ্গে অতগুলি লোককে পরিবেশন ক'রে খাইয়ে শেষ করতেন। জনমজুরেরা দু-তিনবার ক'রে ভাত-তরকারি নিত, তাদের প্রত্যেকের ভাতের পরিমাণ দেখলে এখনকার যে কোন ভদ্রলোক অবাক হয়ে যাবেন।

ঐ রান্না-বাড়ির শেষের দিকে একটা দরজা পার হলেই পথের ঘর, তার পরেই খিড়কির দরজা ব'লেছি। ঘাটে যাবার পথ,—পথের পাশেই একটা দাম পুকুর, পানা আর কলমির দামে পূর্ণ, তার জল দেখা যায় না। কেবল ঘাটের সামনে খানিকটা একটু পরিষ্কার দেখা যায় ঝিয়েদের বাসন ধোয়ার সময়। সকালে বিকালে কত বক, কাদা-খোঁচা, ডাকপাখি, মাছরাঙা চারদিকে আড়ি পেতে থাকে, পায়ে পায়ে দামের উপর দিয়ে হেঁটে যায়। বিশেষত তার পূর্বদিকের পাড়ে যেখানে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ তারই কোলে হাওয়ায় ছাওয়ায় চুপটি ক'রে গা-ঢাকা হয়ে তারা শিকার সন্ধানে সারাদিনই ব্যস্ত থাকে। পুকুরটাতে কই, মাগুর আর কচ্ছপ ছিল অনেক, পুকুরটায় যখন ভাসা জল হ'ত, তখন কইমাছগুলো কানকো বেয়ে ডাঙায় আসে, আর চুপ্‌ড়ি হাতে মেয়েরা গিয়ে সেগুলিকে স্বচ্ছন্দে বন্দী ক'রে বেশ একবেলার ঝোলের ব্যবস্থা করে ফেলে।

সেই পচাপুকুর পেরিয়ে গিয়ে খিড়কির বাগান দিয়ে গেলে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ তলায় বড় পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাট। ঐ ঘাটে সকালে বিকালে সব মেয়েদের স্নান, কাপড়কাচা, গা ধোয়া, —আর বিকালে সকল বাড়ির মাতব্বর মেয়েদের বৈঠকও বসে। কত কালের ঐ বটগাছটি, বিশাল আয়তন, অনেকখানি জায়গা জুড়ে তার ছায়া পড়ে দুপুরবেলা। কত শত কোটর, তাতে শালিক, টিয়া, ছাতার, কোকিল, বুলবুলের বাসা। উপরদিকে কাক চিলের বাসা। জটার মতো অসংখ্য ঝুরি নেমেছে, তাই ধরে দোল খাওয়া

আমাদের নিত্য ব্যায়ামের মধ্যে। এ সব সুখ কি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কোন কালেই মিলবে, না মিলতে পারে? বটতলার নাম বাবাঠাকুরতলা,—তার নিচে অনেকটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মতো, তার সামনেই পঞ্চানন আর মনসাতলা—এইখানেই বলি হয়। গাজনের সময় ঝাঁপ, তরজা, কবির লড়াই এইসব প্রতি বৎসরেই হয়ে থাকে।

সদর বাড়ির সামনে যে প্রশস্ত জমি তাতে একটা বিরাট কৃষ্ণচূড়ার গাছ বলেছি—সেটি অনেক দূর থেকেই দেখা যেত। তার পাশেই সব-রেজেস্ট্রী অফিস এবং সব-রেজেস্ট্রারের বাসা। পাশেই একটা পুকুর, নাম তার সেকরার পুকুর, সেটা পুরুষদের ব্যবহারের জন্য,—আর তার লাল রঙের শান-বাঁধানো ঘাটে সকালের দিকে বেটাছেলেদের বৈঠক বসত মাঝে মাঝে। ওখানে দেখেছি দু'তিন জন একত্র হলেই একটা বিষয় নিয়ে কথা আরম্ভ হয়ে যেত। ততক্ষণে আরও দু'চারজন এলেই পুরো সভা বসত। গুরুতর কিছু বিষয় আলোচনা শুরু হলে স্নান করবার সময় পর্যন্ত সেই সভা গড়াত। মামাদের বাড়ি, পাশে দু'ঘর জ্ঞাতিদের মাঝের বাড়ি আর তার পাশে বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি এই কয়ঘর নিয়েই ভদ্রসমাজ। বাকি সব বৈদ্য, কৈবর্ত, পোদ, ধোপা, তাঁতি প্রভৃতি প্রজারাই লক্ষ্মীকান্তপুরের অধিবাসী। প্রত্যেক পথের দু'ধারে পানাপুকুর। বাবলা খেজুর, নারকেলের আর তাল গাছের আধিক্য,—মাঝে মাঝে এক একটা বট বা অশ্বত্থ গাছ। বাগানের মধ্যে কেবল আম আর কাঁঠালগাছের অস্তিত্ব দেখা যেত। ওখানকার তালগাছগুলি খোঁচা খোঁচা, ঝাঁকড়া চুল আর গোঁফদাড়িওয়ালা দৈত্যের মতো মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হ'ত তখন যেন আমাদের ও দেখছে,—আমাদের চেনে,—তাই কিচ্ছু বলে না।

আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেমন সবই সঙ্কীর্ণ, সবই ছোট, সরু,—এখানে মামার বাড়িতে, সবটাই বিশাল—সবটাই বড়,

সব জায়গাই প্রশস্ত। চারদিকে মাঠ, মাঠের উপর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তার দু'ধারে বড় বড় বাবলা, খেজুর, বট ও অশ্বত্থ আর জামগাছ। গ্রামের ওপর দিক দিয়ে একটা চওড়া রাস্তা কুলপী পর্যন্ত চলে গেছে। আগে সেই রাস্তায় কলকাতা থেকে বাবুরা ঘোড়ার গাড়িতে আনাগোনা করতেন। তারপর হ'ল খালপথে ডোঙায় চেপে মগরা হাট থেকে যাওয়া আসার ব্যবস্থা। এখন এ যুগে বোধ হয় ১৯২০ সাল থেকে রেললাইন হয়েছে লক্ষ্মীকান্তপুর পর্যন্ত—সেটা বারুইপুর থেকে একটা শাখা হয়ে এখানে এসেছে, বরাবর কাকদ্বীপ বা ফ্রেজারগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত হবার কথা।

এখানকার আবহাওয়ার একটা বিশেষত্ব আছে। আমার দিন-রাত ঘুমের কথা আগেই বলেছি,—এখন সাধারণের কথাই বলছি। সেটা এই যে, দুপুরবেলা ভাত খাবার পর প্রত্যেক সংসারে প্রত্যেক মানুষই বেশ একটা ঘুম দেয়, জুত ক'রে বিছানা পেতে। ভাত না খেয়ে বরং চলতে পারে কিন্তু দিনের বেলা একটা গভীর ঘুম না হলে ওখানে কারো চলবে না। দেখেছি এক দিদিমা ছাড়া এবাড়িতে আর কারো এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। তখন গোবিন্দ খুড়োর চিকিৎসার সময়, তিনিও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ঘুমিয়ে পড়তেন, গুড়গুড়ি টানতে টানতে আমায় বলতেন,—তুমি ভাই এখানে বসে বসে নামতা মুখস্থ করো,—আমি উঠে শুনবো। আমি অবশ্য খানিকটা মুখস্থ করে যেই দেখতাম তাঁর নলটা মুখ থেকে পড়ে গেছে, অমনিই বেরিয়ে পড়তাম গ্রামের মধ্যে। প্রত্যেক প্রজাদের বাড়ির পরিবারবর্গের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয়—বাবুদের ভাগনে। খাতিরও ছিল তেমনি, গেলেই মাদুর পেতে দিত। কিন্তু আমি ত মাদুরে বসতে যাই নি তাদের বাড়ি, গিয়ে বসতাম চটের দোলায়।

উমাচরণ মোড়ল আর মহেন্দ্র বদ্দি এরা হ'ল গ্রামের বর্ধিষ্ণু প্রজা। এদের বাড়িতে গেলে আরও বেশী খাতির পাওয়া যেত।

তা ছাড়া উমাচরণের ছেলে নিরাপদ, ডাক নাম নিরো—পাঠশালায় সে হয়েছিল আমার সহপাঠী।

এখানকার সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবন-যাপন প্রণালী একটু বিচিত্র, কলকাতার সমাজের তুলনায়। বারোটা বাজার আগে কেউ স্নান করে না আর একটার আগে কেউ ভাত খায় না। খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ একটি সুখনিদ্রা দিয়ে চতুর্থ প্রহরে আবার কাজে লাগার ব্যবস্থা। কেবল চাষ-বাসের সময়টা এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকে।

আমাদের পাঠশালাও সকালে বসে, বেলা প্রায় এগারোটা পর্যন্ত—তারপর বৈকালে তিনটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কাছারীর কাজও ঐরকম সকাল থেকে দ্বিপ্রহর—তারপর স্নানাহার, তারপর এক ঘুমের পর তিন চারটার সময়ে আবার কাজে বসা। হয়ত না খেলে চলতে পারবে এদের,—কিন্তু একদিন দুপুরে না ঘুমোলে কারো চলবে না। মামার বাড়ির এই বৈশিষ্ট্য আমার অদ্ভুত লাগত। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার—চট্‌পট্ কোন কাজ করা যেন এদেশের নীতিবিরুদ্ধ। হচ্ছে হবে, যাচ্ছি যাবো—এই ভাবটা সকল কাজেই প্রকট; কেবল আমার দিদিমা, তিনি এ সকল নিয়মের বাইরে।

ওখানকার সকলেই যখন দুপুরে ঘুমোত, আমার তখন একটা অপূর্ব সুখকর অনুভূতির সঙ্গে যেন নূতন ভাবে এক কর্মরাজ্যের দ্বার খুলে যেত,—আমি যেন অবাধ মুক্তির আস্বাদন পেতাম, বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারতাম না। বনের ধারে বাদাড় কোলে, কোন বাগানে নয় ত মাঠের ধারে, জঙ্গলের মধ্যে, কখনও বা প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম।

সকলে ঘুমুচ্ছে, বাইরে রৌদ্রে কাঠ ফাটছে,—যখন বেরিয়ে এসে বাইরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াতাম, আমার সুমুখে যেন কি এক নূতন বিচিত্র জগৎ ভেসে উঠত। ছেলেমানুষ, কলকাতায়

আমাদের বাড়ি, এখানে মামার বাড়িতে এসেছি, আবার এখান থেকে যেতে হবে, এ সকল কিছুই মনে থাকত না। এতটা কড়া শাসন, সব ভুলে যেতাম, প্রাণ আমার আনন্দে নৃত্য করত। সে আনন্দ আবার শতগুণ বেড়ে যেত এক একদিন বৈকালে যখন ঘোর ঘনঘটায় আকাশ ছেয়ে যেত। তারপর আরম্ভ হ'ত ঝড়, সে ঝড়ের কি ভয়ঙ্কর বেগ, কি অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে তাল নারকেল গাছগুলির দোলানি ;—একবার এদিক একবার ওদিকে তাদের ঝাঁপালো মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে—হেসে লুটিয়ে পড়া। মনে হ'ত যেন, আমার মতোই আনন্দে তারা উন্মত্ত হয়েছে। তারপর শুরু হ'ত জল, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্—আঃ কি সুখ সেই বৃষ্টিতে ভিজতে।

আবার কোনো কোনো দিন,—হেথা সেথা ঘুরতে ঘুরতে—দিন দুপুরে, বাড়ি পালিয়ে প্রজাদের বাড়ি গিয়ে যখন উঠতাম,—একেবারে অন্দরে পৌঁছে দাওয়ার উপর দোলায় উঠে, খুব জোরে দোল খেতে শুরু করলাম, আর সুমুখেই তাদের বৌ ঝি, গিন্নী সবাই মিলে কাজ করছে। ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া দেখতাম, বড় বড় তোলোতে ধান সিদ্ধ করে উঠানে রৌদ্রে গুণ চটের উপর ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তারই মধ্যে একটি মেয়ে দাওয়ায় পান সাজতে বসেছে, পাশে তার ভাই ভাত খাচ্ছে—বেশ আনন্দের হাওয়া, শান্তির সংসার তাদের। কিন্তু এটা রোজ নয় ; ভাদ্র আশ্বিনে তাদের বড়ই কষ্ট, সে দুঃখ এখনকার দিনে কেউ বুঝবে না। তখন কোনো কোনো দিন দেখি যে, তাদের হাঁড়ি চড়ে নি। সকলকারই শুকনো মুখ। কি হয়েছে ? হবে আর কি, তাদের ঘরে আর চাল নেই, কোন প্রতিবেশীর কাছেও ধার পায় নি,—কারণ তাদেরও ঐ অবস্থা। এ বছর না কি সকলকারই দুর্বৎসর। তারা একদিন অন্তর একবেলা খাচ্ছে। কেমন ক'রে এরা একদিন অন্তর এক একবার খেয়ে থাকে !

দিদিমা ত কখনও দিনে ঘুমোতেন না ; তিনি ঐ সময়ে দুধ জ্বাল দিতেন, ঘন দুধের ক্ষীর—আর নারকেল-কোরা-সঙ্গে

চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, নানা রকম খাবার তৈরি করতেন। ঐ সময়টা প্রায়ই দেখতাম প্রজাদের কারো বৌ, কারো মা, কারো বোন এসে—হেঁই মা'ঠান দু'দিন উপোসী, দাও এক পালী চাল, এইসব বলছে। কেউ বা আগে যা নিয়েছিল দিতে পারে নি বলে দিদিমার কাছে তাড়া খাচ্ছে;—দিদিমা খুব কঠিন হয়ে তাকে তাড়ালেন, সে তার কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে চলল দেখে আবার তাকে ডেকে চাল দিলেন। এই রকমটা হ'ত বাড়ির ভিতরে—আর বাইরেও দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলত আর এক রকম ব্যাপার। পাঠশালা থেকে ফিরে এসে দেখতাম আটচালায় মেজ মামার সুমুখে ধান বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, তাঁর হাতে একটা বাড়ি,—আর তাঁর নির্দেশ মতো নিবারণ ধান মাপছে, রামে রাম, দু'য়ে দুই, তিনে তিন। আর গোমস্তাবাবু লিখছেন, মহেশ আট পালী,—দীনবন্ধু পাঁচ;—এই রকম। শেষে,—কেউ কেউ ধান পেলে না, মুখ চুন করে ফিরে গেল তাও দেখলাম;—তাদের বোধহয় আজ আর বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। সেই থেকে ধারণা হয়ে গেল ভাদ্রমাসটা গ্রামের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর, লক্ষ্মীছাড়া মাস।

চাষাদের বাড়িতে গোবর-মাটি দিয়ে ঘর নিকোনো তার সঙ্গে ধান সিদ্ধর গন্ধ মিশিয়ে কেমন কেমন একটা গন্ধ। একটি বৌ এসে,—হ্যাঁ গো বাবা ঠাকুর, শোনো না, তোমার দেশ কলকাতা, কেমন নয়? বল না ঠাকুদা, সেথা না কি গাড়ি-ঘোড়া আছে, বড় বড় ইটের বাড়ি,—টাং গাড়ি চলে রাস্তায়? সেথা না কি জল মাটি এসব কিনতে হয়?—না-গো, বাবাঠাউর?

এই রকম সব প্রশ্ন। হয়ত দোলায় তাদের শিশুটি ঘুমোচ্ছে,—আমায় দেখেই খোকাকে তুলে ঘরের ভিতর খাটে কিংবা মেঝেতে মাদুর পেতে শুইয়ে আমায় দোলাটা ছেড়ে দিলে। আমায় বসিয়ে রাজ্যের বিদঘুটে প্রশ্ন করতে থাকবে।

তাদের যে দোলা, তা আমাদের মতো দড়ির দোলাও নয় কিংবা

বেতের দোলাও নয়। গরীব চাষাদের ঘরে দোলা হয়, খুব পুরু গুণচটের ;—দু'পাটকরা, তার দুদিকে দু'টি ডাণ্ডা। এক দিকে দাওয়ার খুঁটি অন্যদিকে আড়কাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। অনেক দূর দোল তাতে চলে না যেমন দড়ির দোলায় চলে। দক্ষিণ আর পশ্চিম ভারতে যেমন দোলার ঐশ্বর্য, অবশ্য বড় হয়ে যখন দেশ-বিদেশে ঘুরে ছিলাম তখন দেখছি, এমন আমাদের বাঙলায় নয়। বাঙলায় দোলার দারিদ্র্য অপরিসীম। মাত্র শিশুদের জন্যই বাঙলার যত দোলা,—কিন্তু ভারতের সকল প্রদেশেই শিশুদের বাপ-মা, ভাই-বোন সবার উপযুক্ত দোলা প্রত্যেক গৃহস্থ ঘরেই আছে। দোলা একটি অল্প-ব্যয়সাধ্য স্ফূর্তি-জনক আরাম বা বিলাসিতা। গৃহস্থের ঘরে মনে হয়—দোলনারও প্রয়োজন আছে জীবনে। এ ধারণা এখনও সকল প্রদেশেই আছে, —কেবলমাত্র আমাদের এই বাঙলা—গার্হস্থ্য জীবনে কত বড় অধঃপতনের ফলে তা থেকে বঞ্চিত।

দুপুরে যখন একলা ঘুরে বেড়াই তখনই আনন্দ প্রাণে ভরা থাকে ; কিন্তু যখন কোন বাড়িতে যাই, কিংবা সঙ্গী জোটে আর সে সুখ থাকে না ; তখন চলে প্রবৃত্তির খেলা—নানা দুর্বুদ্ধি এসে এমন কাজে লাগায় যাতে শেষে হয়ত দণ্ড পেতে হয়। নিরো মোড়ল, অনুকূল, রসময় এক সঙ্গে পাঠশালায় পড়ি আমরা। তাদের সঙ্গে হ'ল দেখা—বুদ্ধি দিলে, হাড়ির বাড়ির আমগাছ থেকে কিংবা কাঁচামিঠে গাছ থেকে আম, না হয় জামরুল, না হয় গোলাপজাম, না হয় ফলসা পাড়তে পাঠশালার ধারেই বাগানের ভিতর ঢুকে। আমি ত সব গাছে উঠতে পারতাম না, তারাই সব কাজ করত। কেবল, কিছুটা ফলের অংশ আর দোষের বোঝাটা আমার ঘাড়ে চাপাতে আমায় সঙ্গে রাখা। এটা আমি তখন না বুঝি এমন নয় কিন্তু এমনই সঙ্গ-মাহাত্ম্য তবুও যেতাম তাদের আনন্দ-উৎসাহ দেখে। আমি যে তাদের দলে ভিড়ে যেতাম,—তা

নিজেরই ভাল মনে হ'ত না ; কারণ, যখন ফিরে এসে নিজের কাজে লেগে যেতাম, তখন একটা গ্লানি মনের মধ্যে গোল পাকিয়ে উঠতো, লেখাপড়ায় মন লাগানো কঠিন হ'ত। এমন একটা কাজ যাতে কারো মনে ব্যথা লাগে, কিংবা কারো অনিষ্ট হয়েছে,—সে সব ব্যাপার কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। সেই কারণে একদিন দুপুরে ছেলেদের সঙ্গে বেরিয়ে দ্বিতীয় দিনে আর তাদের কাছেই আসতে পারতাম না। একলা একলাই সব চেয়ে বেশী ভাল লাগত আমার। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ,—সেই সময় বড় পুকুরের ধারে বাবাঠাকুরতলায় সেই পুরোনো বট গাছটা—তলায় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে থাকত একটা দিক—সেখানে যে কি অমৃত ছিল জানি না, আমায় টানত দুপুরে।

আমাদের পাঠশালাটা একটা আম বাগানের ধারে, রাস্তার ওপর—সেখান থেকে দু'দিকে মাঠ। মধ্যে সেই রাস্তা এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে পূর্বদিকে ঘাটেশ্বরার দিকে, যেখানে পোস্ট অফিস। পাঠশালার ধারেই নিচে একেবারেই মাঠ,—উমাচরণ মোড়লদের ধান জমি—বর্ষায় চাষ হয়। বেশীভাগ এখানে প্রজাদেরই ছেলেরা পড়ে,—কারণ, আগেই বলেছি লক্ষ্মীকান্তপুরে ভদ্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থ মোটে চার ঘর। চার ঘর হলেও সংসার কম নয়। এই যে চাষার ছেলে বলছি—নামেই তারা চাষা কিন্তু ব্যবহারে বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে কোনও প্রভেদ নেই। রূপের দিক দিয়েও তাই ; কারণ সত্য বলতে কি, ওখানকার বেশীভাগ ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গে চাষার ঘরের ছেলেদের রূপের পার্থক্য নেই। সময় সময় দেখা যায় কোন কোন বাবুর ছেলেদের চেয়ে চাষার ছেলেরা উজ্জ্বল এবং শ্রীমান, মেধাবীও কম নয় তাদের তুলনায়।

আমাদের পাঠশালা-ঘরের পূর্বদিকে একটা জানালা আছে—আমার মাদুর আসন ছিল ঐ জানালার ধারে। বড় চমৎকার ব্যবস্থা সেখানকার। ছেলেরা দুই শ্রেণীর ; ছোট যারা একদল,

তারা সংখ্যায় বেশী, তারা মেঝেয় বসে আর বড় দল তারা বসে বেঞ্চিতে। তিনখান বেঞ্চির মধ্যে একদিকে একটি পুরোনো সরু টেবিল, গুরুমশাই আমাদের একটা টুলে বসেন। আর ভাঙা হাতলওয়ালা চেয়ার একখানা, পণ্ডিতমশাইয়ের জন্য। চারধারে সার-বন্দি ছেলেরা বসে, কেউ চট কিংবা মাদুর পেতে। সেই আসন তারা বাড়ি থেকেই নিয়ে আসে। লেখে তারা তালপাতায়। এক প্রস্থ লেখা হলে গুরুমশাইকে দেখানো হয়,—তাঁর দেখা হয়ে গেলে তখন ভিজে কানি দিয়ে একেবারে মুছে সাফ করে ফেলে, আবার অন্য লেখা চলে। যখন তারা পাততাড়ি বগলে আসে—দেখতে চমৎকার লাগে আমার। তালপাতা, কুড়িখানেক গুছিয়ে চটের থলে কিংবা ছোট মাদুর একখানা, যার যা ব্যবস্থা হয় বাড়ি থেকে, —তাইতে সেই পাতার গোছা জড়ানো সেইটির নাম পাততাড়ি— বগলে, বাঁ-হাতে সেটাধরা, আর ডান হাতে মাটির দোয়াত ঝোলানো, তারা এসে নিঃশব্দে যে যার জায়গায় বসে। দেরিতে এলে হাত-ছড়ির ব্যবস্থা আছে। সর্দার পোড়োর ওপরেই সে সব বিচারের ভার। তার সঙ্গে যার ভাব থাকে তার হাতে বেতটা পড়ে মৃদু,—এটা সনাতন নিয়ম। যার সঙ্গে ভাবের অভাব,—তার কথায় আর কাজ কি!

রমানাথ গুরুমশাই, সরকারী ব্যবস্থা মতো সকালেই তাঁর গ্রাম থেকে চলে আসতেন তারপর ছুটি হলে মামাদের বাড়িতেই স্নানাহার ও বিশ্রাম করে বৈকালিক পাঠশালার পর সন্ধ্যায় আমাদের পড়াতে বসতেন। পড়ার পর আহারাদি সেরে একটি লণ্ঠন হাতে নিয়ে নিজ গ্রামে চলে যেতেন। তিনি থাকতেন গাববেড়ে গ্রামে, ওখান থেকে এক মাইলের কিছু কমই হবে। বড় ভাল মানুষ তিনি, মৃদুস্বরে কথা কওয়াই ছিল তাঁর অভ্যাস, কখনও ধমকাতেন না। তবে পাঠশালায় বসে যখন পড়াতেন হাতের কাছে বেতটি থাকত। রোজ তিনি ঝাড়ন দিয়ে সেটিকে নিজে মুছতেন টেবিলটি

ঝাড়বার সময়ে। তিনি ছিলেন দীনু গুরুমশাইয়ের একেবারে বিপরীত। পিছনে সুতো দিয়ে বাঁধা থাকত তাঁর চশমাটি, প্রায় নাকের ডগার ওপর বসানো দেখা যেত সামনে থেকে।

যতদিন মামার বাড়ি ছিলাম ইংরাজী পড়া বন্ধ ছিল; কারণ পাঠশালায় ইংরাজী পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। পড়াশুনা আরম্ভ হতেই দেখতাম, আমি একদিকে তাদের সকলের চেয়েই নিকৃষ্ট। শুভঙ্করীর অঙ্ক, গোড়া থেকেই যা কিছু নিয়ম তা আমি ছাড়া আর সকলকারই আয়ত্ত। আমায় অবশ্য তৃতীয় ভাগ বা শিশুশিক্ষা থেকেই আরম্ভ করতে হ'ল। আর শুভঙ্করীর পাঠ গোড়া থেকে আমার ভাল মতেই তখন ঐখানে শিক্ষা হয়েছিল। একটা ব্যাপার আমার সব চেয়ে আশ্চর্য লাগত, ঐ যে গরীব চাষাদের ছেলেরা, —মানসাঙ্কে এতটা দক্ষ, যা আগে কলকাতার পাঠশালায় কখন দেখি নি।

রবিবার আর পাল-পার্বণে যা ছুটি। পর্ব উপলক্ষে ছুটির আগের দিনে গুরুমশায়ের জন্য সিধা আনবার নিয়ম। আমি ত সিধা আনতাম না, বাবুদের বাড়ির ছেলে—আমার সিধা তিনি বাড়ি থেকে ঘরে যাবার সময়েই নিয়ে যেতেন।

একটা ব্যাপারে আমি সেজমামার কাছে ভারি মার খেতাম। চাষার ছেলেদের সঙ্গে বেড়ানোর অপরাধ আমার নিত্যই হ'ত। এরা চাষা বা ছোটলোক আর এরা ভদ্রসন্তান এটা আমি তাদের সঙ্গে খেলবার বা মিলবার আগে কিছুতেই বেছে নিতে পারতাম না। প্রজা চাষারা ত ভাল—গ্রামের চৌকিদার নোকড়ো কাওরার বাড়িতে গিয়ে আমি তার বৌয়ের কাছে আস্কে পিটে, চাপড়া পিটে —চালের গুঁড়ো দিয়ে বা চাল ভিজিয়ে বেটে পিন করে সেঁকে নিয়ে করতে হয়, মান্দ্রাজ অঞ্চলে তার নাম দোসে—চেয়ে খেতাম নোকড়ো কাওয়ার বউ আমায় ভালবাসত কিন্তু বামুন বলে কিছুতেই তাদের ঘটিতে জল খেতে দিত না, মনে করত—পাপ লাগবে।

পড়াশুনা বেশ মন দিয়েই চলছিল। পদ্যমালা ধরানো হয়েছিল। তার মধ্যে কি অপূর্ব রস পেতাম। পাঠশালায় যেটুকু পড়া দিত তাতে মন উঠত না, বাড়িতে খুব খানিকটা করে পড়ে নিতাম। এমন সহজ কবিতা, পদ্যমালার মতো আর কোথাও দেখি নি। আমার এখনও আগাগোড়া—সকলগুলি মনে আছে। তার মধ্যে 'রামেদের বুধী গাই প্রসব হইল,'—এইটি আমার প্রাণের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। বোধ হয় কবিতায় রসবোধ আমার ঐ প্রথম। আমি পড়তাম পদ্যমালা, আমার ন'মামা তখন ছাত্রবৃত্তির বা (মাইনের শ্রেণীর আগের) উচ্চ প্রাথমিক পড়ত,—তার ছিল যদুগোপাল চট্টোর পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ। পড়ার সময়, যখন পদ্য মুখস্থ চলত,—

'পর্বত-দুহিতা নদী দয়াবতী তুমি,
জন্ম তব অবনীর উপকার তরে।
সুমিষ্ট সলিল তব তৃষ্ণা দূর করে,
তব জলে উর্বরতা প্রাপ্ত হয় ভূমি।'

শুনতে শুনতে আমারও মুখস্থ হয়ে যেত। যখন পড়া চলত কখনও অন্যমনস্ক হই নি। কাকেও আমায় এগিয়ে যেতে দিই নি। ক্রমে যখন তৃতীয় ভাগ শেষ হ'ল তখন বোধোদয় আরম্ভ হ'ল। একমাত্র ছুটির সময় ছাড়া পড়ার বিরাম ছিল না। ক্রমে ক্রমে গুরুমশাইয়ের একটা বিশেষ স্নেহ আমার উপর পড়েছিল, আমি তাঁর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম।

আট

লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে সিংহেশ্বর ব'লে একখানি গ্রাম, সেখানে কোন পূজা উপলক্ষে বৎসরে দু'বার নিমন্ত্রণ হ'ত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে। বলা বাহুল্য—নিমন্ত্রণের দিনে বাবুদের সব কয়টি ঘরের ছেলেদের ছুটি। বেলা এগারোটা নাগাদ একবার ছেলেরা চারটি ভাত খেয়ে, দশ-পনেরো জন মিলে, সকলেই, বাঁড়ুজ্যে বাড়ি, মাঝের বাড়ির মামারা সবাই মিলে পনেরো বিশজন ছেলে ছোকরা বুড়ো—একটা বড় দল যাত্রা করত মাঠ ভেঙে। শিরীষমামা ঘোড়ায় যেতেন। পাঠশালার সুমুখ দিয়েই পথ আর সেইখান থেকেই মাঠে নামতে হয়। ছেলেরা চেয়ে চেয়ে দেখত জ্যৈষ্ঠমাসের এই প্রখর রৌদ্রে বাবুরা কেমন দল বেঁধে মহা-আনন্দে নিমন্ত্রণে চলেছে। আর আমরা দেখতাম, ওরা কেমন ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডায়—আরামেই বসে বসে এখন লেখা-পড়া করছে।

সিংহেশ্বর তালুকখানা ছিল জয়নগরের কালীমোহন মুখুজ্যের। তাঁকে আমি যখন দেখেছি তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তর। ছিপছিপে—সাত্ত্বিক চেহারা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ শরীর, অতি সুপুরুষ ছিলেন। দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো, গলায় ছোট ছোট রুদ্রাক্ষ, সঙ্গে স্ফটিকের মালা একটির পর একটি গাঁথা। তাঁর বড় ছেলে বিহারী-লাল, তাঁরও সুন্দর গৌরবর্ণ বুক পর্যন্ত লম্বা দাড়ি, দেখতে অনেকটাই রায় অর্থাৎ বিখ্যাত শিল্পী উপেন্দ্রকিশোর রায় মশাইয়ের মতো। অবশ্য বড় হয়ে যখন তাঁকে দেখি তখনই তুলনা করতে পেরেছিলাম। কালীমোহন ছিলেন আমার মাতামহের অতি বিশ্বাসী এবং প্রিয়তম ভাগিনেয়, সুতরাং সম্পর্কে আমার মামা।

মাতামহের অবর্তমানে যখন মামারা নাবালক, তখন কালীমোহন অনেক দিন তাদের বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তিও কম ছিল না। যখন দক্ষিণের ঐ সিংহেশ্বর তালুকখানি খরিদ করেন শুনেছি,—তাঁর বাড়ি-ঘর করতে ইটের জন্য একটা বড় পুকুর কাটা হয়। ঐ পুকুর কাটতে কাটতে পাথরের এক অপূর্ব মূর্তি উঠেছিল; সেই মূর্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশালাক্ষী নাম দিয়ে। পুকুরটির নাম হয়েছিল চৈতন্য-পুকুর। তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি, কাছারী, ঠাকুরবাড়ি তৈরি হয়ে গেলে পর তিনি স্বপ্নে দেখেন যেন দেবী বলছেন—ঐ বনের ধারে একটা গাছের তলায় মাটি চাপা আমার এক মূর্তি আছে তুমি তাকে প্রতিষ্ঠা ক'রে পুজো কর। সুন্দরবন তখনও অনেক দূরে ছিল না। দেবীর নির্দেশমতো তিনি ঐ মূর্তি আবিষ্কার ক'রে প্রতিষ্ঠা করলেন। এই দুইমূর্তি স্থাপনের দিন স্মরণ করে প্রতিবৎসর ঐ দু'টি তিথিতে পুজো ও উৎসব, সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি হয়ে থাকে। কালী ও বিশালাক্ষীর জন্মযাত্রা ব'লেই পত্রে নিমন্ত্রণ আসত। জন্মযাত্রাকে চলিত কথায় বলা হ'ত জাত;—কালীর জাত আর বিশালাক্ষীর জাত। ঐ উপলক্ষে কবির লড়াই, তরজা, যাত্রা, পুতুলনাচ—এই সব প্রথম প্রথম হ'ত।

কালীমোহন যতদিন জীবিত ছিলেন তাঁরা ছয়মাস জয়নগরে আর ছয়মাস সিংহেশ্বরে থাকতেন। তারপর আদায়-তশিলের সময় তিনমাস মাত্র ওখানে থাকতেন ঐ সময়েই ঐ দুই দেবীর জন্মযাত্রা-উৎসব সম্পন্ন হ'ত। তখন থেকেই ঐ দুই দেবীমূর্তি আর চৈতন্য পুকুর আমার মধ্যে একটা ভয় বিস্ময় আর আনন্দ এই তিনটি ভাবের ক্রিয়া করত। ছোটবেলা থেকেই অবাক বিস্ময়ে আমি দাঁড়িয়ে দেখতাম ঐ বিশালাক্ষীর পানে। পীতবর্ণা দেবীর বিশাল চোখ দু'টি যেন দৃষ্টিমাত্রেই সকলকে আকৃষ্ট করে।

মামার বাড়িতে দ্বিতীয় বৎসর, তখন বয়স সাত থেকে আটে

পড়েছি, তুই ক্রোশ মাঠ ভেঙে নিমন্ত্রণে যাবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম বোধ হয় সেই সময়, তাই দলের সঙ্গে সিংহেশ্বরে যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম দিদিমার কাছে। কি প্রবল উৎসাহ ছিল তখন ঐ স্থানের নামে! গিয়ে পৌঁছাবামাত্রই কালীমোহন মামা আনন্দে—'আরে দপ্পনারাণ! আমাদের সিঙ্গিশ্বরে এয়েচে, এ্যাঁ! এতটা মাঠ ভেঙে কেমন করে এলি রে। মুখটা রাঙা হয়ে গেচে—ইত্যাদি বলে আদর করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন।

প্রথমবারে কথা ঐ রকমই। দ্বিতীয়বার থেকেই আকর্ষণটা গুরুতর, সেখানে পৌঁছেই ছুটতাম চৈতন্য-পুকুরের পানে। খুব উঁচু পাড় আর একটা দিক জুড়ে এক বিশাল অশ্বত্থের সঙ্গে মিলিত বটগাছ, অনেকটা জায়গা জুড়ে তার ছায়া। সেই ছায়ায় দাঁড়িয়ে সুদূর দক্ষিণের দিক্‌চক্রবাল রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত মাঠ, ভয়ে ও বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে আসত আমার ভিতরটা—দেখতে দেখতে যেন জ্ঞান-হারা হয়ে যেতাম; দক্ষিণদিকের সেই বিশাল মাঠ, শুনেছি—আগে এসব সুন্দরবন ছিল এখন কোথায় চলে গেছে সেই বন। যখন এই সব বন কাটা হয় তখন কত কত দেবমন্দির, মজে-যাওরা বড় বড় দীঘি-পুকুর, গড়, বড় বড় অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বেরিয়েছিল। শোনা যায়—এসব স্থান জুড়ে হাজার বছর পূর্বে না কি এক বিশাল রাজ্য ছিল—কোন প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজ্য। এখনকার দিনে আমাদের প্রাণে কি অনির্বচনীয় একটা ভাবের প্রেরণা আনে ঐ হিন্দুরাজ্যের নামে যা কথায় বোঝাবার নয়। আমার কাছে তখন স্বপ্নের মতোই একটা কল্পলোকের ছবি উঠে মিলিয়ে যেত এই সকল দৃশ্য দেখতে দেখতে।

আমার মাতামহ নিমাইচরণের পিতামহ যখন এ অঞ্চলে জমিদারী খরিদ করেন তখনও সুন্দরবন সিংহেশ্বরের কাছে অর্থাৎ পাঁচ-ছয় ক্রোশের মধ্যেই ছিল। তখন সুন্দরবনের কথা দিদিমার মুখে শুনতে শুনতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। অজগর

বনের কত প্রকারের ছবি কল্পনায় মনের মধ্যে কত কত ভাব নিয়েই উঠত তার যেন শেষ নেই। গাছে গাছে দেখতাম একেবারে অন্ধকার, দিন-দুপুরে পাতার ফাঁকে ফাঁকেও একটু রোদের ছিটে নিচে পড়তে পায় না। আমার দিদিমার মুখে এই সিংহেশ্বরের কথা, সুন্দরবনের কথা শুনতে শুনতে তন্দ্রাভিভূত হয়ে কত রকমের বন জঙ্গলের স্বপ্ন দেখতাম।

ঐ সময়টা থেকেই দেখছি—মাঝে মাঝে আমার মেজমামা, দক্ষিণে তাঁদের চৌদ্দ নম্বর লাটের জমিদারীতে যেতেন, শুনেছি সুন্দরবন কাটিয়ে আড়াই হাজার বিঘার ঐ জমিদারীটা করে ছিলেন। সেখান থেকে হরিণ-মাংস, বাঘের নখ, চামড়া, মধু, গাওয়া ঘি প্রভৃতি মাঝে মাঝে অনেক কিছু পাঠাতেন। তা দেখতে আসত অনেকেই, ধুম লেগে যেত। দরেশ মিয়া ব'লে একজন লোক—সে ঐ সব নিয়ে আসত। তার কাছ থেকেও সুন্দরবনের নানা গল্প শুনেছি সন্ধ্যার পর তার কাছে বসে। তখন সিংহেশ্বর গেলেই মনে হ'ত সুন্দরবনের খুব কাছেই এসেছি।

আরও শুনেছি এই চৈতন্য-পুকুরে নাকি একটা যক্ষ বা যক আছে। দিন-দুপুরে একলা কেউ এসে জলে নামলে তার পায়ে শিকল পরিয়ে টেনে নিয়ে যায় সেই অতল জলের মাঝখানে—যেখানে অসংখ্য মোহরের ঘড়া শিকলে বাঁধা আছে। সেইজন্য ঐ পুকুরে কেউ কখনও স্নান করে না, কাপড় কাচে না, নামে না, কেবল খাবার জল নিয়ে যায় দূর-দূরান্তর থেকে যখন জলকষ্ট হয়। পুকুরের কোন দিকেই ঘাট নেই।

সিংহেশ্বর গ্রামে বাগদী আছে অনেক ঘর;—আর লক্ষ্মীকান্ত-পুরে আছে কাওরা। এই কাওরা আর বাগদী সারা দক্ষিণ বাঙলা জুড়ে, বোধ হয় প্রত্যেক গ্রামেই আছে। এরা লাঠিয়াল ভালো, এদেশের কাওরা ও বাগদীরা সবাই মাছ ধরে আর চাষবাসও করে আবার বাবুদের অর্থাৎ জমিদারদের হয়ে জমির দখল নেয় লাঠির

চোটে—আর পুজোর সময় ঢাক ঢোল, কাড়া, ঝাঁপা, নাকড়া, কাঁসী বাজায়, লাফ দিয়ে দিয়ে নাচে,—রণবাদ্য বাজাতে এরাই জানে।

আমাদের জাতির কেউ কখনও নিশ্চয়ই যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধের সময় এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করতে, রণবাদ্য বাজনা ত আমাদের সৈন্য বিভাগেরই ব্যবস্থা; এ সব কথা আমরা বিস্মৃত হয়ে বসে আছি। এখন কেবল দুর্গাপুজোর উপলক্ষে সেই পুরোনো রীতিতে রণবাদ্য বেজে থাকে। অন্তত তার আভাস খানিক পাওয়া যায়, তার সম্পূর্ণ ক্রিয়া অভিনয় না দেখতে পেলেও। দুর্গাপুজোয় দেখেছি হারা-কাওরার বাজনা। শুনে বুকটা গুরুগুরু করে ওঠে। সেকথা সময়ে বলবো। এখন কেবল এদের কথা এইটুকু বলে শেষ করি যে, বাগদীরা নাকি কাওরাদের চেয়ে উঁচু জাত, তাদের কৌলিন্য বা আভিজাত্য আছে এমন কি কাওরাদের সঙ্গে বসে তারা খায় না পর্যন্ত। বিবাহাদি ত দূরের কথা, বাগদীরা বলে, কাওরাদের জাতের অর্থাৎ উৎপত্তির ঠিক নেই, আমরা কিন্তু রাজার জাত।

গ্রীষ্মকালটি বড়ই মনোরম। বেল, জুঁই, চাঁপা, গন্ধরাজ, আর পলাশ,—আর ওদিকে কাঁচা আম, গোলাপজাম, লিচু, জামরুল, আর ঠাকুরকে ঝারায় বসানো এই কয়টি নিয়েই যেন এসেছিল। প্রত্যহ প্রভাতে স্নান ক'রে, সাজিটি নিয়ে ন'মামা যখন ফুল-বাগানে ঢুকত, আমি ঠিক তার পিছনে আছি। ছুঁসনি, ছুঁসনি, আমার তোলা হলে তুই তুলবি, ব'লতে ব'লতেই ঝাঁপটা বন্ধ করে দিত। দরকার মতো পুষ্পচয়ন শেষ করে বেরিয়ে এলে পর আমি গাছ উজাড় করতাম। স্বর্ণচাপা আঁকশি না দিয়ে পাড়া যেত না। যে-ই পড়া অমনি আমিই আগে তুলে নিতাম, এইভাবে জ্বালাতন। সেই অতগুলি ফুল নিয়ে করতাম কি? বাঁড়ুজ্যে বাড়ির হরিমতি যমপুকুর পুণ্যিপুকুর করতে আসত আমার বোন রাণীর সঙ্গে, তাদের দু'টিকেই সব দিয়ে দিতাম।

দেখতে দেখতে গ্রীষ্ম কোনখান দিয়ে সরে গেল,—ঘোর ঘনঘটা করে এসে গেল বর্ষা। মামার বাড়ির যেমন ঘোর ঘন বরষা এমনটি কলকাতায় নয়। একাদিক্রমে যে আড়াই বৎসর ওখানে ছিলাম,—সব কয়টি ঋতুই ভোগ করেছিলাম যদিও তখন যথার্থ ঋতু শব্দের অর্থবোধ ছিল না আর তাদের বৈচিত্র্য বর্ণনার শক্তিও ছিল না। পদ্যমালার 'আইল ঋতু বরষা, চাষার হোলো ভরসা', এতে যেটুকু বোঝা গেল তার সঙ্গে আসল বর্ষা উপভোগের সম্বন্ধ অল্পই ;—কিন্তু এই ঋতুটির প্রভাব আমার মধ্যে কম ছিল না। কলকাতা শহরে, ছেলেবেলায় দেখেছি বর্ষাতে কোন ছেলেই এমন করে মাঠে পথে ভিজতে পায় না, আর আকাশ ও মাঠ জুড়ে গাছপালার দোলানির সঙ্গে এমনটি বাদল নামার মধ্যে বরষার যে গভীর রূপ তা দেখার ভাগ্যও প্রায়ই তাদের হয় না। পাঠশালার পাশেই চাষ চলছে। মোড়লেরা কয় ভাই মাথায় সাসি দিয়ে জোড়া গরুর ল্যাজ মলতে মলতে মৈ মাড়নে লেগেছে এক হাঁটু জলকাদায় ডোবা মাঠে।

ভাদ্রমাসে যখন পুকুর ভাসে, তখন কি মজা! রাত্রে খেতে বসেছি সবাই মিলে, খাওয়াটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় নিবারণ এসে খবর দিলে যে, খিড়কীর পুকুর ভেসেছে, মাছ সব পালাচ্ছে। মেজমামা উঠে পড়ল, ন'মামা উঠল, বড় মামা ছাড়া সকলেই উঠে পড়ল, আমিও বাদ গেলাম না। তিন চারটে লণ্ঠন এল, সব চলল খিড়কীর পুকুরে। কি মজা, চুবড়ি হাতে মেয়েরাও সব আনন্দে কলরব করতে করতে এসে হাজির। কই মাছগুলো সারি সারি কান বেয়ে চলেছে, তালগাছের গোড়া অবধি পৌঁছেছে। দু'টো তিনটে ছোট তালগাছের গোড়া থেকে কান বেয়ে ডালের খাঁজেও ঢুকছে তারা। দুই তিনটে ঝুড়ি ভরতি হয়ে গেল। পুকুর ভেসে সে-রাত্রে কইমাছদের দল বেঁধে অভিযান কি চমৎকার! পরদিন আগাপাশতলা কইমাছের কাণ্ড হেঁশেলে।

বর্ষার আরও একটা মজা, জোনাকির প্রাদুর্ভাব ওখানে খুবই। পেঁপের ডাল ভেঙে তার একটা দিক খুলে,—আর জোনাকি ধরে ধরে পুরে দেওয়া গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত। তারপর মুখ বন্ধ করে অন্ধকারে ঐ হীরা-মাণিক্যের কাঠি নানাভাবে সাজানো। জ্যোতির ভক্ত কে নয়? খদ্যোতের অঙ্গজ্যোতি, নীলাভ মৃদু উজ্জ্বল সেই বিন্দুগুলির নড়াচড়া ঐ ঈষৎ স্বচ্ছ হরিৎ পিঙ্গল পেঁপের ডালের মধ্যে,—অন্ধকারে কি চমৎকারই দেখাত! অন্ধকারের সঙ্গেই ত জ্যোতির সম্বন্ধ; কাজেই জোনাকি বাতি বেশী অন্ধকারেই দেখায় ভাল, যেন ইন্দ্রজালের মতোই আমার কাছে এর প্রভাব ছিল।

এই যাত্রায় মামার বাড়িতে যা দেখেছিলাম, তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির বালাই অত ছিল না—কাজেই দোষের কিছু চোখে পড়ে নি। কিন্তু পরবৎসর যখন দেখি তখন অনেক কিছুই বিস্বাদ লেগেছিল। এবারে যেটা গুণ, পরে সেটা দোষের ব্যাপার মনে হয়েছিল। এই সময়টা এখানকার সকল কিছুই অবাক হয়ে দেখতাম। ঠাকুর দালানের কার্নিসে, আটচালায়, চারদিকেই পায়রার বাসা। সে যেন কি অদ্ভুত ব্যাপার তাদের ধান খাওয়াটা।

তারপর বর্ষার সময় ভাদ্রমাসে মামাদের পুণ্যে। তখন এক অদ্ভূত অভিজ্ঞতা।

গত বছরের ফসল ত হয় নি, প্রজাদের ঘরে ঘরে দারিদ্র্য হাহাকার, তবুও অনেকেই পুণ্যে করতে এসেছে। আটচালায় ফরাস পাতা হয়েছে, তাকিয়া পড়েছে। বাড়িতে বড় মামা নেই, তিনি কি জানি কি কাজে গেছেন ডায়মণ্ডহারবারে, মেজমামা গেছেন দক্ষিণে। তাঁদের চৌদ্দ নম্বর লাট একমাত্র মেজমামার ব্যবস্থা মতোই চলে, সেজমামা আছেন লক্ষ্ণৌতে মাসিমার কাছে, সেইখানেই কুইন্স স্কুলে ভর্তি হয়ে তিনি পড়াশুনা করছেন—। কেবল মাত্র ন'মামা এখানে আছে। তখন তার বয়স চৌদ্দ পনেরো হবে। তাকেই জমিদার হয়ে গদিতে বসে পুণ্য উপহার গ্রহণ করতে হবে

এই গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে। একটা নূতন কলসী সিন্দুরে স্বস্তিক-চিহ্ন দেওয়া—তার মধ্যেই পুণ্যের টাকা সব ফেলা হ'ল।

প্রথাটি জমিদারদের, নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক প্রজার গলায় এক ছড়া মালা পরিয়ে দেওয়া। তখন ফুলের মালার যোগাড় নেই,—তাই হাট থেকে শোলার মালা আনা হয়েছে। শোলার মালা দেখে আমি হেসে বাঁচি না ; লম্বা লম্বা শোলার পাতের মালা। কেন যে এত হাসি, তা জানি না। প্রজারা কেউ আট আনা, কেউ এক টাকা, কেউ দু'টাকা—এক সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশী কেউ কলসীতে ফেলতে পারে নি, ভয়ঙ্কর দুর্বৎসর বলে। এইসব দেনা-লেনা হয়ে গেলে পর তাদের নিয়ম মতোই খাওয়ানো হ'ল। যা দেওয়া হ'ল তাদের পাতে, তার পরিচয়ও ঐ রকমই। সারি সারি বড় বড় পদ্মপাতা এক একখানা ;—তাইতে ধামা করে চিঁড়ে পরিবেশন করে গেল নিবারণ, তার ওপর খাল ক'রে জোলো দই ঢেলে দেওয়া হ'ল, তারপর কলা আর একো গুড় এইসব মিলিয়ে মাটিতে বসেই হাপুস নয়নে তারা খেতে লাগল। এইসব দেখে আমার যে কেন এতটা লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল তা জানি না ;—এতটা হয়ত ন'মামারও হয় নি। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা, যখন ভাল অবস্থা থাকে তখন পুণ্যে কেমন হয় ?

তখন ডাল, চচ্চড়ি, মাছ, ভাত, অম্বল, দই, নারকেল নাড়ু এই সব হ'য়ে থাকে, এখন আড়াই-তিনশো বাইরের লোক—খাওয়াবার মতো ধান গোলায় নেই, আর এরা ত কেউ কম খায় না ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে এক এক জন প্রায় এক পালী চাল খায়। তাই মেজদা (মেজমামা) চিঁড়ের ফলারের ব্যবস্থা করেছেন। এ বছর সত্যই এমন দুর্বৎসর যে. কালেক্টারী খাজনা ঋণ ক'রে দিতে হয়েছিল। শুনেছিলাম সেই ঋণের চেষ্টায় বড় মামা না কি ডায়মণ্ডহারবারেই গেছেন কোন জমিদারের কাছে। দেখলাম প্রজারা কেউ কেউ এ

শুভদিনেও দুর্বাক্য শুনে মুখ বিরস ক'রে ঘরে গেল। অনেক খাজনাই নাকি তাদের বাকি পড়েছে। ন'মামা এদিকে এত ভাল মানুষ, তা হলেও গদিতে বসে কোন কোন প্রজার সঙ্গে কি কঠোর ব্যবহারই না করলে। যে গালাগাল তাঁর মুখ থেকে বেরুল তা আগে কখনও শুনি নি। কাল থেকে যে শুভ পুণ্যাহের কথা শুনে, না জানি কি আনন্দের উৎসবই হবে কল্পনা করে রেখেছিলাম, আজ এই পুণ্যের দিনে আমার মনটা গেল খারাপ হয়ে,—ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখে।

মামাবাড়িতে দুর্গাপুজো ; এবার মামাদেরই পালা। নিয়মমতো এই পুণ্যাহের পরদিন কাঠামোতে ঘা পড়ল, অর্থাৎ দুর্গা-প্রতিমা নির্মাণের প্রথম কাজটি শুরু হ'ল।

পোটোদার বলে তাদের—যারা প্রতিমা গড়ে এখানে। খড় দিয়ে তারা আগে কাঠামো করলে। মুণ্ড ছাড়া আর হাত পায়ের তালু ছাড়া সকলকার শরীরের সকল অঙ্গই খড়ের গোছার ওপর দড়ি দিয়ে এঁটে বেঁধে ঠিক করে সাজিয়ে নেওয়া হ'ল। তারপর মাটি গোবর আর ধানের তুঁষ মিশিয়ে একদফা খড়ের ওপর মাটি চাপানো হ'ল, এসব আমি আগাগোড়া ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম,—এতই চমৎকার লাগত যে খেলা ফেলেই দেখতাম। এই মাটি চাপানোর পর অনেক দিন ফেলে রেখে দিলে প্রায় পনেরো কুড়ি দিন বা মাসখানেক তাদের দেখাই নেই। তারপর এসে তারা এবার ভাল করে ছাঁকা মাটি চোস্ত করে মাখিয়ে, তার ওপর কাপড়ের ফালি জড়িয়ে ফাটার দায়-অব্যাহতির ব্যবস্থা করলে আর এই সঙ্গে মুণ্ড, হাত, পা, সব ঠিক করে লাগিয়ে দিলে যথাস্থানে। মুণ্ড প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্, আর নানা ভঙ্গির হাতগুলি সুন্দর নিখুঁত করে তারা ঘর থেকে গড়ে নিয়ে এসেছিল। তারপর থেকে দ্রুত কাজ চলতে লাগল। বেশ পুরু এক দফা সাদা খড়িমাটির সঙ্গে গঁদের বা জিউলীর কিংবা বাওলার আঠা মিলিয়ে

পোঁচড়া দিয়ে লাগানো হ'ল। তারপর ধীরে ধীরে রং আরম্ভ হ'ল সেই সাদা ভাল করে শুকুলে পর।

প্রথম কয়েক বৎসর ডাকের সাজই লাগানো হ'ত, প্রতিমার গড়ন হয়ে গেলে—তার পর থেকে মাটির সাজই চালু হয়ে গেল। আমার মাটির সাজ বেশ ভাল লাগত যদিও ডাকের সাজের জলুস বেশী।

পুজো এল। প্রতিপদের দিনেই এখানকার কল্পারম্ভ। মামাদের পুরুত যিনি, তিনি বৈদিক; বেশ সাত্ত্বিক মূর্তি তাঁর। শাস্ত্রজ্ঞ, ধীর এবং বিচক্ষণ মানুষ তিনি, তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং প্রীতি দুইই জন্মেছিল তাঁর ব্যবহারে।

দুর্গাপুজোর কথায়—প্রতিমার কথাই আগে। পোটোদের সকল কাজই নিজের চোখে বসে বসে দেখেছি আর তা খুবই ভাল লাগত। বিশেষত রঙের কাজ আরম্ভ থেকে আর তাদের কাছ ছাড়া হই নি।

তাদের তুলি সবই ছাগলের লোমে, নিজেদের হাতে তৈরি, রংও সব গুঁড়ো রং। মূর্তির মধ্যে অবশ্য এক একটা খাঁটি রং আর সাজ মটুক সব সোনালী। বেলের আঠা, গঁদ, আর হাঁসের ডিমের শ্বেত অংশ নিয়েই তাদের সকল কাজ হ'ত। ঠিক ষষ্ঠীর আগের দিন ঘামতেল মাখানো হ'ল। বার্নিশের দেশী নাম হ'ল ঘামতেল। সব শেষ হলে মনে হ'ল যেন প্রতিমা জীবন্ত হয়ে উঠল। সকলেরই আনন্দের আর সীমা রইল না।

মামাদের বংশের নিয়ম:—প্রতিপদের দিন থেকেই কল্পারম্ভ কিনা বোধন। সুতরাং, তাঁদের পুরোহিত হরেকৃষ্ণ ভট্টাচার্যমশাই অমাবস্যার দিন থেকেই এখানে আছেন। চণ্ডীপাঠ, ভোগ-রান্না সবই চলেছে প্রতিপদের দিন থেকে। ষষ্ঠীর দিন রাত্রে আরতি হ'ল,—সেই সঙ্গে হারা কাওরার বাজনা; সে একটা দেখবার জিনিস, শোনবারও বটে। সবসুদ্ধ দলে তাদের পনেরো জন হবে। একদিকে লম্বা পালক গোঁজা প্রথমেই বড় বড় দুটো জয়ঢাক,

তারপর দুটো ঢোল, তারপর কাড়া দুটো, বড় ধামার মতো, উপরটা চামড়া দিয়ে ঢাকা ; পৈতের মতো কাঁধ থেকে কোমর অবধি ঝোলানো, আর দুটো মোটা মোটা বেতের কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়। তারপর আরও দুটো প্রকাণ্ড মালসার মতো, উপরে চামড়া, তার এক ধারে লম্বা-চওড়া চাঁপ দাড়ির মতো ঝুলছে,—হারা নিজে এই বাজনাটি বাজায়। বুক গুরুগুরু ক'রে ওঠে, সেই জয়ঢাক থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ কাঁসিদার পর্যন্ত সার দিয়ে দাঁড়িয়ে সব গুলি যখন একসঙ্গে বাজায় আর তালে তালে লাফিয়ে লাফিয়ে হারা যখন নাচতে থাকে যেন ঠিক যুদ্ধ হচ্ছে। এর আগে যা শুনেছি আমার ততটা মনে নেই, এবারে মামার বাড়ির দুর্গাপুজো আমার মধ্যে একটা গভীর রেখাপাত করেছিল, কারণ এবারে এখানকার সবই যেন আমার কাছে একটা নতুন ভাবেই এসেছিল। যতই আমি চেষ্টা করি না কেন কোন রকমেই আমার অনুভবটা ঠিক বলতে পারবো না। আরতির বাজনা কে আর না শুনেছে আমাদের দেশে,—কিন্তু এই হারা কাওয়ার বাজনায় এমনই মাদকতা একটা, জীবন্ত, ভয়ঙ্কর এবং ভাবের সৃষ্টি করে—এমন আর কোথাও দেখি নি। বড়বাজারে গাঙ্গুলী বাড়িতেও পুজো, আরতি ত দেখি, যখন কলকাতায় থাকি—কিন্তু সে এরকম ভাবই নয়—সে একটা ঢাকী বা ঢুলির দল বাজাতে হয় বাজিয়ে যায়। ধূপ-ধুনা, শাঁক কাঁসর ঘণ্টার শব্দ, সকলের একাগ্র হয়ে দাঁড়ানো এই সব মিলিয়ে একটি ভাব,—তারও বৈশিষ্ট্য আছে—কিন্তু, এই যে হারার বাজনা এর তুলনা নেই। হারার ভাল নামটি হারাধন কিন্তু হারা নামই তার প্রসিদ্ধ।

আরতির সময় এই কয়দিন হারার বাজনা শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে এমন একটা ভাব এনে দিত যার রেশ অনেকক্ষণ থাকত, সেটা বেশ অনুভব হয় গভীরভাবে। আমার মনে আছে প্রায় একঘণ্টা চলে তার বাজনা। যেই থামল, সেই থামার সঙ্গে

সঙ্গেই যেন একটা গভীর, নিস্তব্ধ, অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গেলাম, শরীর অবসন্ন কিন্তু তার মধ্যে তালের নাচনটি অন্তরে সর্বক্ষণ বিরাজমান। আমার বুকের ভিতরে যেন কে নাচছে।

এই বছরের পুজোয়—অন্যান্য বারের তুলনায়—ভাল করে অনেক কিছুই দেখেছিলাম বলেছি। বাড়িতে, সদর থেকে সারা বাড়ি ভরে, খিড়কীর দরজা পর্যন্ত লোকজন, সকল বয়সের নর-নারীর নানাছন্দে যাতায়াত আর কলরবে মুখরিত হয়ে আছে। রান্না-বাড়িতে আর ভিতরের চালায়, আর অন্দর বাড়ির মধ্যে রান্না আর ভিয়ানের গন্ধে আর সব কিছুই যেন ঢাকা পড়েছে। সদরে, সপ্তমী পুজোর দিন সকাল থেকে প্রকাণ্ড সরায় খই-মুড়কি, আর একটায় ভোদো ;—একসরা ক'রে খই-মুড়কি আর চারটে ক'রে নাড়ু সকললেই দেওয়া হচ্ছে যারা ঠাকুর দেখতে আসছে।

কয়দিন গুড়ের ভিয়ানের গন্ধে সারা বাড়ি মাত করেছিল। চালভাজা গুঁড়ো ক'রে, তার সঙ্গে নারকেলকোরা আর মরিচ প্রভৃতি মসলা মিশিয়ে গুড়ের সঙ্গে পাক ক'রে নাড়ু পাকানো এই একরকম, আর একরকম হ'ল খই চূর্ণ, তার সঙ্গে ঐ সব মিলিয়ে গুড়ে পাক ক'রে নাড়ু পাকানো,—এর নাম হ'ল ভোদো। পুজোর সময় প্রতি বছরই মামার বাড়িতে এই জিনিসটা খুব বেশী তৈরি হ'ত। ভগবান জানেন, পল্লীগ্রামে আরও কতরকমেরই গুড়ে-পক্ক মিষ্টান্ন আছে—কিন্তু আমি দেখেছি, আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেকে এ জিনিস কত ঘৃণার চোখেই দেখত, যদি কখনও পাঠানো হ'ত মামার বাড়ি থেকে। কিন্তু আমাদের তখন বেশ লাগত।

যাই হোক আমি সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম তারপর ছুটলাম পশ্চিম পুকুরের দিকে, যেখানে মাছ-ধরা হচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা বাঁশের ভেলা বা ভরা,—লম্বায় প্রায় ছ' আট হাত, চওড়ায় তিন হাত হবে, ধারে ধারে কলসী উপুড় করা বাঁধা, সেইটে পুকুরের

মাঝখানে, তার উপর নিবারণ আর তৈলখ্য দুজনে দুদিকে দাঁড়িয়ে জাল ফেলছে। ভরার উপর থেকে জাল-ফেলা দেখতে বেশ লাগে। পাড়েতে নবীন হালদার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে, দরকার মতো দড়ি ছাড়ছে আর টানছে। একটা প্রকাণ্ড মাছ পড়ল,—নিবারণ জাল টানতে টানতে থেমে গেল। তৈলখ্যকে বললে টান। সে দড়ি গুটোতে লাগল, যখন আস্তে আস্তে কাছে এল তখন নিবারণও আস্তে আস্তে জালটা গুটোতে লাগল, তারপর ঝপাৎ শব্দ করে একটা বড় মাছ জাল ছিঁড়ে তীরের মতো বেরিয়ে গেল। যাঃ গেলরে! তখনও আর একটা আছে, পাড়ের কাছে জলটা তোলপাড় করতে লাগল। জাল ধরে নিবারণ লাফিয়ে ডাঙায় উঠল তারপর জাল টেনে তুললে—চার-পাঁচ সের হবে দু'টো কাতলা। মেজমামা কোত্থেকে হনহন ক'রে এসে বললে, ছেড়ে দে, আট-দশ সেরের চেয়ে ছোট মাছ মারবি নি, বলে চলে গেল তেমনি হনহন ক'রে। আবার ভরা ভাসল দূরে,—এবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই দুজনের জালেই বড় মাছ পড়ল। যখন ভরা কাছে এল— তিনটে বড় বড় রুই পড়েছিল, দুটো সট সট করে পালাল, একটা ধরা গেল। কি জানি মাছটা লাফাতে লাগল ঘাসের উপর— একপাল ছেলে-মেয়ে জড়ো হয়ে আনন্দ আরম্ভ করলে।

আমার ভাল লাগল না, আমি সেখান থেকে ঐ পুকুর পাড়েই অক্ষয়দের বাড়ি গিয়ে উঠলাম, একটু দোলায় বসবো বলে। দোলায় বসে পায়ের টিপ দিয়ে কসে বার কতক দোলা খেয়েছি, এমন সময় অক্ষয়ের বৌ এসে, হ্যাঁ গো ঠাউরমশায়, আজ মামার বাড়ি পুজো না দেখে হেথানে যে? আমি বললাম, আমার ইচ্ছে হ'ল এলাম? এমন সময় অক্ষয়ের মা এসে বললে, ও বৌমা, ঝাও না, এবেলা ত আর আন্না-বান্না নি, ঝপ ক'রে পুকুর থে ডুবটো দিয়ে এসো।

আমি বললাম, কেন রে বুড়ী, রান্না নেই কেন? সে ঠাট্টা করে

বললে—ক্যানো, ত্যোর মামাদের বাড়িতে পেসাদ খেতে হবে না ? আজ পুজো যে ! আমি বললাম, কৈ তোমাদের ত নেমন্তন্ন হয় নি। প্রজামহলে নবমীর দিন পুরুষদের নেমন্তন্ন হবে এ কথা আমি শুনেছিলাম, মেয়েদের কোন দিনও নয়।

আমি বললাম, যাঃ সত্যি বল না বুড়ী,—কেন রান্না হবে না। সে কিছু বললে না। তার বৌ বললে, এক বেলার মতো চাল আছে, তাই এ বেলা নয় ও বেলাই রান্না হবে।

আজ সপ্তমী পুজোর দিন—এদের ঘরে চাল নেই। বুড়ীর ছেলে অক্ষয়, বাবুদের বাড়ি খাটতে গেছে, সে ওখানে দু' বেলাই খেতে পাবে—কিন্তু এরা ? অক্ষয়ের মেয়ে আর ছেলে বাবুদের বাড়ি থেকে খই মুড়কি নিয়ে এসে দাওয়ায় খেতে বসল, আমি উঠে চলে এলাম। আর উৎসবের আনন্দ রইল না।

আমার মধ্যে সব যেন গোলমাল হয়ে গেল। এ রকম কেন হয় ? আজ পুজোর দিনে সকলেই আনন্দে ভরপুর—তার মধ্যে এদের মতো একজনের ঘরে অন্ন নেই অন্য সময় হলে হয়ত এরা দুঃখ পেত আজ কিন্তু ওদের মুখে বিষাদের চিহ্ন নেই, পুজোর দিন বলে। বুড়ীর কথা ভারি মিষ্টি, সে বললে, দুঃখ কি ? মা যেমন যখন দেবেন আমরা তেমনি থাকবো। তাঁর কি অবিচার আছে, বল না ঠাদ্দা ! কানে গেল বটে কিন্তু আমার বুদ্ধিতে গেল না তার কথা কারণ আমি এতটা বুঝতে পারি নি—ছেলেমানুষ ত ? মনে হয় এ যেন এ একটা অন্যায় নিয়ম—এমনই জটিল ব্যাপার যা বুঝবার সাধ্য নেই, বোধ হয় আমি ছেলেমানুষ বলে এখন বুঝতে পারি না, বড় হলে বুঝবো। আবার মনে হয়—আচ্ছা আমি যেন ছেলেমানুষ ; কিন্তু বড় মামা, মেজমামা, এরা ত বড়—এরাই-বা কি বুঝছে ছাই ! এই ত পরশুদিন দরোয়ান চৌথীকে দিয়ে মোনা নস্করকে মার খাওয়ালে, কত বিশ্রী বিশ্রী গালাগাল দিলে,—দে, এখুনি টাকা দে,—না হলে, আরও কত কি ! তাহলে বোধ হয়

এরাও কিছু বোঝে না, জানেও না। কেবল জানে মার-ধ'র ক'রে খাজনা আদায় করতে যে সহজে দিতে না পারবে।

বাড়ির ভেতরে মেয়েরাই সব রকম রান্না-বান্না করেছে, আঁশ, নিরামিষ যতরকম—চৌষট্টি প্রকার ব্যঞ্জন অন্ন পরমান্ন সব। দেবী পুজোর ভোগ-রান্না যেখানে হচ্ছে সেখানে ছেলেপুলেদের যাবার অধিকার নেই, যে পথ দিয়ে ভোগ নিয়ে গিয়ে ঠাকুর দালানের পাশে ভোগের ঘরে রাখা হবে সেখানেও ছেলেদের যারার অধিকার নেই, ভোগের ঘরের চৌকাঠের কাছে পর্যন্ত দাঁড়াবার অধিকার নেই। ভোগ রাঁধতে দূর-দূরান্তর থেকে কত মেয়ে আত্মীয়কুটুম্বেরা এসেছে —তার মধ্যে ঘটকপুরের অঘোর দাদার মধ্যবয়সী বিধবা ভগ্নী এলোকেশী আর শিখর মাসিমা, এই দুই জন অগ্রণী ; সকল দিকেই এরাই প্রধান। এঁদের দাপটে আর 'ছুঁয়ে ফেলবি' রবে ওদিকে আর আমাদের ঘেঁষবার যো নেই। একে আমার দিদিমা একের নম্বর শুচি-বায়ুগ্রস্ত, তার উপর এঁরা দুজনে এসে ছোঁয়া-ছুয়ির ব্যাপারে সকলকেই যেন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছেন।

ছোট্ট, বড় মামীটি আমার আরও সমবয়সী তিন চারজন পড়শী নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে বসে পান সাজছেন। বড় মামীর সঙ্গে আমার বড়ই ভাব, দুরন্ত ছিলাম অতিরিক্ত উৎপাতও যথেষ্ট করতাম। অনেক কঠিন কঠিন অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতে তাঁর জুড়ি নেই কেউ। দিদিমার পবিত্রতা, বিশেষ করে কথায় কথায় হাত ধোয়াটা ঠিক ঠিক বজায় রাখতে পেরেছিলেন বলেই দিদিমা তাঁকে ভাঁড়ারের জিনিসে, আচারে, পুজোর সামগ্রীতে হাত দিতে অধিকার দিয়েছিলেন। চালের ঘরের চাবি তাঁরই কাছে থাকত তা আমি জানতাম। এখন আস্তে আস্তে তাঁর কাছে বেশ ভাল মানুষের মতোই গিয়ে বসেছি। দেখেই বড় মামী বললেন, এই যে ধপু, কিছু খাও নি, কত বেলা হবে খেতে, ইত্যাদি।

আমি বললাম, সে জন্যে নয়, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে,

শুনবে ? বড় মামী আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলেন, আমি কি বলবো, কি আমার কথা ? মুখে আর হাসি নেই। বড় দুষ্টু ছিলাম, বুঝতেই পেরেছিলেন অসঙ্গত কিছু হবে, না হলে এতটা ভালমানুষের মতো এসে আগেই তাঁর স্বীকৃতি চাইছি কেন ?

ভেবে-চিন্তে কিছু ঠিক করতে না পেরে শেষে বললেন,—কি বল না আগে শুনি ? মেয়েরা সকলেই কাজে ক্ষান্ত দিয়ে একবার তাঁর দিকে, একবার আমার দিকে চেয়ে দেখছে। দেখে আমার ভারি রাগ হ'ল, আমি আর সঙ্কোচ না ক'রে একেবারেই জিজ্ঞাসা করলাম, চালের ঘরের চাবিটা আছে তোমার কাছে ? অপ্রত্যাশিতভাবে আমার পক্ষে একান্তই অসঙ্গত এই কথাটা শুনে সকলেই হোহো ক'রে হেসে উঠল। বড় মামী কিন্তু খানিকক্ষণ ভাবলেন, কেন আমি হঠাৎ আজ তাঁর কাছে চাইতে এসেছি। অবশেষে না হেসেই বললেন, আজ আর চাবি আমার কাছে নয়, আজ চাবি আছে পালানের কাছে।

পালানে হ'ল দিদিমার শুদ্ধাচারী শুচিসিদ্ধ অতি প্রিয় ভাঁড়ারী। সে প্রাতে স্নান করে, পবিত্র কাপড় পরে এসে ভাঁড়ারে ঢোকে আর সেই কারাগার থেকে খাওয়ার সময় একবার বেরোয়, আবার বিকেলে স্নান ও বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে ঢোকে আর কর্মশেষে রাত্রে বেরোয়। পুজোর সময় এবং বিশেষ কোন ক্রিয়া কর্মে তার এই কাজ। এই পালানেই আমায় ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিল, এর কেঠো আঙুলের চড় আমি বিস্তর খেয়েছি আর ওদিকে ওর দাড়িও তেমনি ছিঁড়েছি অনেক। আমি আর কাকেও কিছু না বলে পালানের কাছে গেলাম। দেখি, দিদিমা তাকে উপরের তাক থেকে গুড়ের নাগরী পাড়তে তুলতে ওঠ-বোস করাচ্ছেন। এটি তোল, ওটা পাড়, সেটা থো, আর ওটা দে ধরুণীকে ভিয়ানশালে, আজই পাক করবে, এই সব। আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নেই দেখে চলে গেলাম বাইরে। সোজা পথে কিছু চাইলে

ত কেউ উদ্দেশ্য বুঝে আমায় দেবে না, কাজেই অ-সোজা পথে কিছু চালের যোগাড়ে ছিলাম, একটা কাপড়ে বেঁধে যদি অক্ষয়দের বাড়ি দিয়ে আসতে পারি। তা আর হ'ল না।

ছোট হওয়ার অশেষ দোষ, একে ত কেউ কথা শোনে না, ছোট ব'লে তারপর সবার ধারণা করাই আছে যে আমি দুষ্টু, আর দুষ্টু বলেই কিছু ভাল কাজ করতেও যেন অধিকার নেই। যাক, ও সব ছেড়ে দিলাম, এখন হাতে যেটা আছে সেইটে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে সংকল্প করলাম। সদরে সেই যে খই-মুড়কির ওড়া বসানো আছে—যা প্রতিমা ও পূজাদর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে, সেইখানেই গিয়ে দেখি তৈলখ্য একাজে। আর ওড়াও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি কোঁচড় পাতলাম। সে ভাবলে ঠাট্টা করছি—দিলে এক সরা। আমি বললাম—আরো দে। সেও রগড় দেখতে আরও এক সরা দিলে। আরো দে; তখন সে বললে—অত কি হবে? আম রাগ দেখিয়ে বললাম, দে না আমার খুশি; আমি নেবো। সে বলে, কি করবে তুমি, নিশ্চয় নষ্ট করবে। না, তুই দে। সে আবার দিলে, কোন রকমে আরও দু'সরা নিয়ে প্রকাণ্ড হয়ে গেল কোঁচড়, ভোদোর নাড়ু তিন চার মুঠো তুলে নিয়ে তার ভিতর ফেলে, সেটাকে বেশ সামলে গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সদর দিয়ে, শীঘ্র হবে বলে। ঐখানেই ভুল করলাম, যদি পিছন দিয়ে যেতাম তাহলে বোধ হয় এমনটা হ'ত না। মেজমামা সুমুখেই।

—এত খই-মুড়কি নিয়ে চলেছিস কোথা? আমার মুখ চুন, আর রা নেই মুখে।—বল না কোথা যাচ্চিস নিয়ে? মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—খাবো। এ্যাঁ এতগুলো তুই খাবি? এ্যাঃ! তৎক্ষণাৎ আমার কানটি ধরে টেনে আটচালায় সকলের সামনে এনে হাজির। হায় হরি, সে দুঃখের কথায় কাজ নেই, থাক।

সকালকার কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে লজ্জায় কোথায় গিয়ে

মুখটা লুকাবো তার জায়গা পাই না। খানিকক্ষণ লুকিয়ে কাটিয়ে তারপর যখন পুজোর কাছে এলাম তখন শুনলাম—এইবার বলিদান, বলিদান হবে, এই রব তুলে ছেলের পাল নাচতে আরম্ভ করেছে।

গোটা তিন-চার পাঁঠা, চান করিয়ে এনে সারি সারি বেঁধে রেখেছে থামের পাশে। দেখলাম, ভয়ে তাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, লোমগুলো খাড়া তাদের গায়ে। প্রতিমার কাছে ধুনা দেওয়া হচ্ছে। পুজোর আসনে পুরোহিত তখন খাঁড়া পুজো করছেন। পুষ্প-চন্দনাদি দিয়ে সে বিশাল খড়্গ পুজো করা হ'ল,—তারপর সেটা নিয়ে তিনি কামারের হাতে দিলেন, সে হাড়কাঠের কাছে নিয়ে এসে বসল। তারপর পুরুতমশাই কোষাকুষি, চন্দন, তামার থালায় ফুল-দূর্বাদি নিয়ে এসে যূপকাষ্ঠ পূজা করলেন; পাঁঠার মাথায় সিঁদুর ফোঁটা দিয়ে উৎসর্গ করা হ'ল,—তখন হুকুম হ'ল বলির। বাজনদারেরা সারি সারি এসে দাঁড়াল। বলিদানের কাছে যারা ছিল, তারা অতিমাত্রায় দক্ষ। এমনভাবে পাঁঠার সামনের দু'টো পা, দু'পাশ দিয়ে টেনে নিয়ে পিঠের দাঁড়ার উপর এককরে জোরে ডান হাতে ধরলে আর বাঁ-হাতে পিছনের দু'পা টেনে ধরলে। দেখে আমি কেমন একটা ভয় আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম—দেখছি, কিন্তু যেন কোন বোধ নেই। দেখলাম হাড়কাঠে যথাস্থানে তাকে ফেলা হ'ল, সে, ম্যাঁআঁ-আঁ বলে একবার প্রাণপণে বিকট চেঁচালে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর এক দক্ষ যুবা তার মুখ চেপে মুণ্ডটি দু'হাতে এমনভাবে টেনে ধরে রইল যে তার আর নড়বার শক্তি রইল না। তারপর ছোট বড় সকলে মিলে একবার জলদগম্ভীর স্বরে, মা-আ-আ, বলে চিৎকার ক'রে উঠল।

যেইমাত্র কোপটা পড়ল, সঙ্গে সঙ্গেই যতগুলি বাজনা ছিল এমনভাবে বেজে উঠল যে কানে তালা ধরবার যোগাড়, কোপ হয়ে যেতেই বাজনা থেমে গেল। তখন যার হাতে মুণ্ডটা ছিল, সেটা

নিয়ে দৌড়ে পুজোর জায়গায় দিতে গেল, আর এদিকে যার হাতে ধড়টি, তখনও পিচকারী দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে গলা থেকে, একটা বড় সরার উপর ধরে সেই রক্তে পূর্ণ হলে সরাটা দেবীর কাছে দিয়ে এল একজন। তারপর সেই ধড় থেকে বিশেষ এক অংশের একটু মাংস, খাঁড়ার গোড়ার দিক দিয়ে কেটে একটা কলাপাতে রেখে পুজোর স্থানে দিয়ে আসা হ'ল।

এইভাবে তিনটি বলি সেদিন হয়ে গেল। প্রথম বলি হয়ে যেতেই আমার শরীর এমন অবসন্ন বোধ হ'ল যে ভিতরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শুনেছিলাম যে, বলি যদি বাধে, কোন রকমে এককোপে কাটা না যায় তা হলে নাকি খুব অমঙ্গল হয়। সে অমঙ্গল মানে সেই সংসারের কেউ মারা যায়। আমার কিন্তু এই কথাই মনে হ'ল এত ধুমধাম করে বলি দেওয়াটাই ত অমঙ্গল, যদি অমঙ্গল কিছু হয় ত ঐতেই হবে, বলি বাধলে আর কি হবে? পুজোর মধ্যে বলি যদি না হয় তা হলে নাকি তন্ত্রমতে পুজোই হ'ল না। কি ভয়ঙ্কর পুজো। আগে মোষ বলি হ'ত এখন আর হয় না। তন্ত্রমতে পূজা—! সে আবার কিরকম মত? তা ভগবানই জানেন।

বেলা আড়াইটে কি তিনটের সময় ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'ল। আশপাশের গ্রাম থেকে ভদ্রসমাজ, মামাদের সমপদস্থ যাঁরা, তাঁরাই নিমন্ত্রিত আর সেই সঙ্গে প্রতিবেশী জ্ঞাতি-কুটুম্বগণ নিয়েই ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'ল। প্রায় সন্ধ্যার আগে তখন চাকর-বাকরেরা খেতে পেলে। এ কয়দিন তাদের বিশ্রাম নেই। তাদের খাওয়া শেষ হতেই ঝাড়লণ্ঠন জ্বালার ধুম পড়ে গেল। যত বেলোয়ারী ঝাড়, বেল লণ্ঠন, দেয়ালগিরি এসব জ্বালা কি সহজ? রেড়ির তেল আর টিনের নলে ন্যাক্ড়ার পলতে প্রত্যেকটিতে লাগিয়ে জ্বালাতে হবে সেই বড় বড় ঘড়াঞ্চের উপর উঠে।

সন্ধ্যারতির সময়। আরতির সময় আবার হারার সেই যুদ্ধের বাজনা। এইটিই যথার্থ একটা কিছু।

এইভাবে সপ্তমী অষ্টমী কেটে গেল,—নবমীর দিনেই বড় বেশী কাজ। ন'টা বলি, আর সেদিন প্রজাদের প্রসাদ পাবার দিন।

নিমন্ত্রিত লোক অনেক বেশী হবে বলে আজ আর মেয়েদের রান্নায় কুলোবে না। বৃহৎ কাজকর্মে পল্লীগ্রামে বিশেষত মামার বাড়ির গুণ ছিল অনেক। পাঁচ-সাতশো বা হাজার লোকের আয়োজনে কখনও পাচক ব্রাহ্মণ আসতে দেখি নি। নবমীর দিন ভাত ছাড়া তরকারী ব্যঞ্জন বাড়ির ভিতরে রান্না-মহলেই সব হ'ল, কেবল প্রজাদের জন্য ভাত আর ডালটা গোলাবাড়িতে রান্না আরম্ভ হ'ল বেলা দশটা থেকে। মামাদেরই জ্ঞাতি হরিনাথ মামা, বিপিন-মামা আর বাঁড়ুজ্যে বাড়ির সতীশমামা এই তিনজন কোমর বেঁধে আর মাথায় গামছা জড়িয়ে লেগে গিয়েছেন। লম্বা চুলিকাটা, কাঠের উনান তার উপরে সারি সারি হাঁড়িতে ভাত হচ্ছে। আর চাতালের উপরে, মেঝেতে নিচে কাপড়, তার উপরে কলাপাতা পাতা অনেকটা চৌকো জায়গা,—উনান থেকে নামিয়ে ফ্যান গালা হয়ে যাবার পর সেইখানে ভাত ঢালা হচ্ছে। লম্বা একটা নর্দমা কাটা, একেবারে খানা অবধি; সেইখানে ফ্যানের ধারা বইছে। প্রকাণ্ড একটা চুলায় প্রকাণ্ড এক কড়ায় ডাল ফুটছে, প্রকাণ্ড এক খুন্তি হাতে একজন নাড়ছে পাছে ধরে যায়। হাঁড়ির পর হাঁড়ির ভাত জমে উঠল পাহাড় হয়ে—যেন অন্নকোট। এমন কখনও দেখি নি। ফোটা ভাতের একটা মিষ্টি গন্ধ সেখানকার চারদিকের হাওয়ায় ভরা। এইভাবে পুজো বাড়িতে কতক্ষণ, একবার ভিতরে শেষে গোলাবাড়িতেই বহুক্ষণ নানারকম ক'রে কাটিয়ে দেখি, ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হ'ল। বেলা চারটে নাগাদ প্রজাদের খেতে দিলে। বারবাড়ির আটচালার রকের উপরে,—শেষে ঘাষের উপর মাঠে তারা সব খেতে বসল। আমার, পরিবেশন করতে ভারি ইচ্ছে, কিন্তু ছেলেমানুষ, তার উপর দুষ্টু, নিশ্চয়ই কিছু নষ্ট করবো, কাজেই আমার দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কোন অধিকার নেই।

যারা এসেছে, ছেলে-মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাবুদের বাড়ি প্রসাদ খেতে। অবশ্য খুব বেশী পরিমাণে ভাত তারা অনেকেই খেলে কিন্তু ভারি তৃপ্তি ক'রে খেলে,—বোধহয় একটি ভাতও তারা নষ্ট করলে না। আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখেছি। প্রথমে পাতের সমস্ত ভাত গুছিয়ে নিয়ে মধ্যে একটা বড় গর্ত করলে, সেইখানে ডাল দিয়ে গেল, তার পাশে চচ্চড়ি, ভাজা এই সব। সেটা হয়ে গেলে আবার ভাত নিয়ে মাছের ঝোল,—তারপর একটু করে মহাপ্রসাদ দিয়ে গেল—খুব কম ক'রে অবশ্য, শেষে আনল দই আর রসকরা, ব্যস্। সন্ধ্যার পরও খাওয়া চলেছিল অনেকক্ষণ। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে পা ধুয়ে একেবারে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভোরে বাজনার আওয়াজে ঘুম ভাঙল।

নয়

আজ বিজয়া। কি জানি কেমন একটা দুঃখের, উৎসবের শেষে অবসাদের ভাব সকাল থেকেই মনে মনে ছিল। দেখ, দেখ, মা দুর্গার মুখ দেখ, যেন বিষাদ-মাখানো, ঐ মুখ কাল অবধিও এমন হাসি-হাসি মুখ ছিল,—না ?—সত্যি। প্রতিমার মুখে কেমন একটা বিষাদ,—যেটা কাল উজ্জ্বল ও আনন্দময় মনে হচ্ছিল, আজ সেই প্রফুল্লতা, চাকচিক্য ম্লান, বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আটটার মধ্যে বাসি ভোগরাগ ক'রে দর্পণ বিসর্জন হয়ে গেল। তারপর শান্তি-জলের পালা। এবার হারার বিসর্জনের বাজনা বাজতে লাগল, তাতে আর কিন্তু তেমন উল্লাস নেই। তবুও সারা দিনটা একরকম ছিল, বৈকালে যখন প্রতিমাটি নামিয়ে মা, মাসি, বড় মামী মেয়েরা সবাই বরণ করে নানাভাবে, চোখের জল মুছতে মুছতে বিদায় দিলে

আমার ত তাই দেখেই কান্না এসে গেল। এ যেন সত্য সত্যই এক অতি আপনজনের বিদায়, এই তিনদিন যাকে পেয়ে আমরা সব পেয়েছিলাম। এমনভাবেই পেয়েছিলাম, পাবার যে আরও কিছু থাকতে পারে বা আছে তা আমাদের কারো মনেই ছিল না। এই তিনটি দিন যেন আমাদের সর্বার্থসিদ্ধি। আজ একেবারেই তার বিপরীত, যেন সব কিছুই হারিয়েছি।

প্রতিমা নিয়ে চলল সবাই বড় পুকুরে ভাসাতে বা ডোবাতে। সেখানে নামালে পর—মেজমামা একে একে কার্তিক, গণেশের গা থেকে কাপড় খুলে নিলে। একখানা বেশ ভালো কালো পেড়ে তাঁতের ধোয়া কাপড় ছিল কার্তিকের, মেজমামা সেটা আমায় দিয়ে বললেন, এটা তোমার, মায়ের কাছে রেখে এস। কাপড়ের চেয়ে আমার ঐ ধনুর্বাণটার উপর লোভ ছিল, সেইটি চেয়ে নিলাম। দেখতে দেখতে প্রতিমাকে একেবারে নেড়া ক'রে যে যেদিক থেকে পারল মটুক রাঙতা সব খুলে নিতে আরম্ভ করলে,—শেষে কাঠামোকে উল্টে জলের উপর একপাল লোক চুবিয়ে ধরলে, বোধহয় পনেরো মিনিটের মধ্যে খড়জড়ানো কাঠামো ছাড়া আর কিছুই রইল না।

সন্ধ্যার পর, বিসর্জনের পাট শেষ হয়ে গেলেই তখন কলাপাতে দুর্গানাম লিখে আর সিদ্ধি পান করে, জনেজনে কোলাকুলি, প্রণাম চলতে লাগল, তারপর এবাড়ি ছেড়ে মাঝের বাড়ি, তারপর বাঁড়ুয্যে বাড়ি, গ্রামের মধ্যে কাটানো, সিদ্ধির প্রভাবে ভীষণ হাসাহাসি, ধুমধাম অনেক রাত পর্যন্ত! তারপর শেষ ভোজ খেয়ে যে যার স্থানে প্রস্থান। পরদিন থেকে সেই গতানুগতিক জীবনারম্ভ।

মধ্যে কোজাগর পূর্ণিমা, সেও বেশ ধুমধাম করে হ'ল। একদল তাসপাশা খেলে, হোহো করে সারা রাত জেগে কাটাল।

মামার বাড়িতে কালীপুজো, একেবারেই বিপরীত,—উৎসবের কোন সম্পর্ক নেই, রাত্রের পুজো, সন্ধ্যা থেকেই যা কিছু লোকের

আনাগোনা। প্রতিমা তৈরিও দেখেছি, কালো রং ছাড়া আর কিছুই খারাপ নয়। সুন্দর মুখ, চোখ, নাক, অলঙ্কৃত কান,—আর সব যেমন হয়ে আসছে সেই রকম। মূর্তির মুখখানি দেখলে তত ভয় হয় না, যত ভয় মুণ্ডমালা, কটিবেড়া, হাতের মুণ্ডটা দেখলে। তারপর এ পুজোয় অত লোকজন আসে না—পুজো করেন মামাদের গুরুপুত্র ঠাকুরমশাই নিজে, আর, পুরোহিত যিনি, তিনি হন তন্ত্রধারক। কালীপুজোর কয়েকদিন আগে ঠাকুরমশাই আসেন তাঁর মায়ের সঙ্গে আর পুজো শেষে দু'-তিন-চারদিন পরে চলে যান। গুরুঠাকুরের মান্য অবশ্যই সকলের উপর। কর্তাদের আমল থেকে কিছু জমি দেওয়া আছে তাঁদের, যখন শ্যামাপুজো উপলক্ষে তিনি আসেন তখন, সেই জমির উৎপন্ন ধান চাল সব, তাঁর ভাগের যেটা তা নিয়ে যান। ঠাকুরমশাইয়ের বয়স বেশি নয়, কুড়ি-বাইশ হবে। আমায় দপাই বলেই ডাকতেন—ভালবাসতেন।

মামাদের শক্তি মন্ত্র—তাই কালীপুজো যখন হয় তখন ততটা বাহ্য উৎসবের আড়ম্বর থাকে না। দিদিমা সারারাত দালানের এক কোণে বসে জপ করেন। সন্ধিপুজোর সময় বলি হয়—পরদিন সকালে সেটা ভোগে লাগানো হয়। মনে আছে, রাত্রে সদরের দরজা পেরিয়ে সুমুখের পথটা, বাঁশের তিনটে ঠ্যাংএর উপর একটা সরায় তেল আর ন্যাকড়া দিয়ে জ্বালানো হয়, সারি সারি সে গুলি অনেক দূর অবধি জ্বলে। তার নাম মশাল—সন্ধ্যেয় কতকগুলি তুবড়ি আর হাওয়াই ছোঁড়া হ'ল। সন্ধ্যে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আমি জেগেছিলাম, সন্ধিপুজো দেখবো বলে, সেটা রাত বারোটার পর। শুনেছিলাম, সেই সময়ে মা কালী আসেন, আর প্রতিমার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করেন। একটা ভয়, কেমন ছম্‌ছমানি পথের উপর দাঁড়ালেই বোধ হচ্ছিল। গভীর রাত্রে যত ভূতপ্রেত, দানব আজ নাকি সব বেরিয়ে অন্ধকারে পথেঘাটে শ্মশানে-মশানে ঘুরে ঘুরে নেচে বেড়াবে। দেখা যায় তাদের—গভীর রাত্রে বেরোলে।

আমার ঐ সব দেখবার জন্যে ততটা নয়, সন্ধিপুজোর সময় যে মা কালী দেখা দেন, সেই দেখবার জন্যেই জেগে থাকা। এগারোটা বাজল আর এক কি দেড় ঘণ্টা থাকতে পারলেই হয়, কিন্তু আর পারি নি, সারা দিন দৌড়াদৌড়ি, একটু বসি নি—এখন চক্ষু যেন জড়িয়ে এল, ভাবলাম এখন একটু ঘুমিয়ে নি, তারপর বারোটার সময় উঠে পড়বো। ন'মামাও বললেন : হ্যাঁ, তুই একটু শো, আমি ডেকে দেবো ঠিক সময়। বৈঠকখানায় গিয়ে সেই যে শুলাম—একেবারেই রাত ভোর ক'রে উঠলাম পরদিন—সন্ধিপুজো দেখা আর হ'ল না।

পূজার পরও কিছু দিন আর পড়ায় মন বসল না। কেমন একটা শোকের মতো দুঃখ মনের মধ্যে চেপে রইল—কিছু দিন, তারপর মনটা আবার ধীরে ধীরে সহজ হয়ে এল। এখানে আমার লেখাপড়ার দিকে বড়দের নজর থাক না থাক আমার নিজের নজর ছিল, আর সহজভাবেই ছিল, চেষ্টা ক'রে নয়। যখন বোধোদয় আরম্ভ হ'ল, মনে হ'ল বুঝি-বা লেখাপড়ায় পাঠশালের মধ্যে, অবশ্য পণ্ডিতের ক্লাস ছেড়ে দিয়ে—আমিই সবচেয়ে বেশী এগিয়ে পড়েছি। প্রত্যেক পাঠ যখন দেওয়া হ'ত—এমন আনন্দে বুঝে নিতাম যেন সেইখানেই সেটা তৈরী হয়ে যেত ; তারপর ছুটি হলে সারা পথ, পড়াগুলি ভাবতে ভাবতে আসছি। পরদিন যখন যাচ্ছি তখন বোধ হয় প্রত্যেক শব্দটি তার মানে বা প্রতিশব্দ সব আবার মনে জ্বলজ্বল করত। পড়ায় এত আনন্দ, খেলার মতোই আনন্দ অত ছোট বয়সে আমি ঐখানেই পেতাম। তখন একটা এমন স্ফূর্তি, শরীরে মনে পেয়েছি যা সারা জীবন আমার মনে আছে।

পাঠশালে আমার সঙ্গে যারা পড়ত তারা সবাই কৈবর্ত চাষাদের ছেলে, তারাও পরিশ্রম কম করত না। তার মধ্যে চমৎকার তাদের স্বভাব প্রকৃতি, রাগ হিংসা দ্বেষ মোটেই নেই। বাড়িতে তারা যতক্ষণ থাকত ঘরের কাজ কিছু না কিছু রোজই

তাদের করতে হ'তই, পড়াটা যে কখন তৈরি করত ভগবানই জানেন। শ্যামা কয়ালের ছেলে অনুকূল, ডাকনাম ওনো, আমারই সমবয়সী—সেও বোধোদয়ের ছাত্র। মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি যেতাম। যখনই গিয়েছি, দেখেছি—কোমর বেঁধে, কোঁচড়ে মুড়ি হয় খড় কাটছে না হয় গরুকে জাব্না দিচ্ছে—না হয় একটা না একটা কাজে লেগে গিয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম: হ্যাঁ ভাই, তুই পড়িস কখন রে? সে বলে, যখম পাই তখনই পড়ি। যখন পাই, —এর মানে হ'ল কাজে ফুসরত যখনই সে পায় তখনই পড়ে। কেউ তাদের পড়ায় না। পাঠশালে পড়া দেবার সময় যখন গুরুমশাই পড়া বলে দেন, সে তখন শুনে নেয় আর বাড়িতে সময় পেলে বানান আর মানে মুখস্থ করে, অঙ্ক তাদের চেষ্টা করে করতে হয় না, যেন মা সরস্বতীর বরে আপনি হয়ে যায়। বাড়িতে কাজ করতে একচোট খেলেও নিলে। হয়ত খেলায় রয়েছে, তার বোন এসে ডাক দিলে—ও দাদা মোচাটা পেড়ে দিয়ে গেলে না, মা বসে আছে যে? দাঁড়া, আসচি—বলে সে ছুটল দা হাতে ক'রে; এই রকম সব ওনোর ব্যাপার। ওনো, কিনা অনুকূল কয়াল।

সকলেই অবশ্য ওনোর মতো নয়; কেলো, ধরণী, ধেড়ে-ভজা প্রভৃতি ম্যাদামারা ছেলেও ছিল কয়েকজন। কিন্তু আশ্চর্য দেখেছি ভজার বেলা। তার ভালো নাম ভজহরি, সেও কৈবর্তদের ছেলে। আমাদের চেয়ে চার-পাঁচ বছরের বড়, বয়স তার বার, তেরো হবে; আমাদের সঙ্গেই পড়ে—তাই তাকে সকলে বলত ধেড়ে ভজা। এমন বোকা স্মরণশক্তিহীন ছেলে, গুরুমশাই বলেন, জীবনে কখনো দেখেন নি। সে ছিল তেমনি নোংরা, আর সর্দি তার লেগেই থাকত, মাথাটা তার ঝুপি জঙ্গল। পড়ায় লেখায় ত সে মোটেই ভাল ছিল না, তার উপরে সে ভারি মুখচোরা। পড়ার জন্যে সে ঠায় দাঁড়িয়ে বিষম মার খেত, একটু উ আঁ শব্দ তার মুখ থেকে বেরুত না। বেত ভেঙে যেত কিন্তু ভজার চোখ দিয়ে জলও বেরুত না অথবা

একটুও নড়ত না। সেই যে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়াত মারতে মারতে হাঁপিয়ে গুরুমশায় ক্লান্ত হয়ে হাত গুটোলে তখন সে কোন দিকে না চেয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসত। তারা ভারি গরীব। তাকে কখনও রাগ করতে দেখি নি কারো উপর। কারো সঙ্গে কথাও সে বড় কইত না। কেন যে সে পাঠশালে আসত জিজ্ঞাসা করলে মুখ দিয়ে তার কথাই বেরুত না।

আমি ওখানে তখন থাকতে থাকতেই তার বাপ মারা গেল। অশৌচ হয়ে গেল, —পড়া ত ছেড়েই দিলে, তারপর কিছুদিন আর দেখা পাই নি। আরও মাসখানেক পর দেখি, ছাতা বগলে, চাদর গায়ে, চটি হাতে খাতা বগলে সে চলেছে, হাটের দিকে। পথে কাদা থাকলে চটি হাতে ক'রে যাওয়াই নিয়ম। কোথা যাচ্ছিস রে ভজা! অনেকক্ষণ কথাই কয় না—শুধু মুখটি নিচু ক'রে মৃদু হাসি। শেষে সে বললে: তারিণী সরকারের ধান চালের আড়তে ছোট কয়াল হয়েচি। কয়াল মানে হিসাব রাখার কাজ। জিজ্ঞাসা করলাম,—মাইনে পাস? সে বললে,—ছ'টাকা, আর একবেলা খাওয়া। তার চার-পাঁচ মাস পরেই বোধহয় দেখি, ভজা চলেছে হন্‌হন্ ক'রে হাটের দিকে। আর দেখা পাই নি কেন রে, কেমন আছিস, এখন কি করছিস ভজা? সে বললে—কয়াল হয়েচি—বাবু—এখন পেন্নাম, আসি—তাগাদায় যাবো কিনা। মাইনে?—দশটাকা হয়েচে!

এরপর প্রায় দু'বছর পরে যখন আবার মামার বাড়ি যাই, তখন ভজা হালদার বেশ উন্নতি করেছে—দু'পয়সা হাতে জমিয়েছে। লোকে তার কাছে জমী রেখে দু'দশ টাকা ধার করে। ছেলেবেলা যারা বোকা দেখেছি তারা প্রায়ই বড়বেলা আর বোকা থাকে না; লেখাপড়া বিশেষ না করলেও বুদ্ধির জোরে একটা এমন পথ পেয়ে যায় যাতে তার বেশী বিদ্যার দরকার হয় না। আবার আমাদের সহপাঠী আর একজন—নিরো মোড়লকেও দেখেছি,—ওখানে

আপার প্রাইমারীর শেষ পর্যন্ত না গিয়েও বদ্দিপুরের জমিদারের ভদ্র গোমস্তা হয়েছে। তবে মোটা বুদ্ধি নেহাত যাদের তাদের কিছুই হবার নয়,—মা সরস্বতীর মন্দিরের দুয়ার একেবারেই বন্ধ, যাদের মাথায় কিছুই ঢোকে না তারাই পরিণামে গরুর ল্যাজে মোচড় দিতে দিতে মাঠে নামে অথবা মজুর হয়ে কারো বাড়িতে খাটতে যায়। আমার সহপাঠী এমন কয়েকজনও ছিল দেখেছি যারা লেখা-পড়ার খাতিরে চাষবাসের কাজ, নিজেদের পেশার কথা ভোলে নি। জমি-জমাই তারা বোঝে ভাল।

যাই হোক, এখন এই দীর্ঘকালের ভিতর দিয়ে মামার বাড়ির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। পড়াশুনো আর খেলাধুলোয় যে সুখে ভাসতে ভাসতে চলেছিলাম তাতে বর্তমান ছাড়া আর কোনদিকে লক্ষ করবার মতো বুদ্ধি জাগে নি। আর সেই সুখ সম্পূর্ণ হ'ল আরও একটা ব্যাপারে। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এক ভদ্র প্রবীণ ইনস্পেক্টর অফ স্কুলস্ এসে উপস্থিত হলেন লক্ষ্মী-কান্তপুর গ্রামে। জমিদারদের বাড়িতেই অবশ্য তাঁকে আদর আপ্যায়িত ক'রে রাখা হয়েছিল। একটি পুরো দিন ও একটি রাত্রি তিনি ছিলেন।

একদিন সকালেই দেখি—আমাদের পাঠশালায় একটা অপূর্ব ভাবের সাড়া পড়ে গেল। এসে দেখি সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝাড়া-মোছা আরম্ভ হয়ে গেছে। গুরুমশাই আছেন, পণ্ডিতও আছেন—ছেলেদের দিয়ে সব বেঞ্চি, টেবিল, চেয়ার সরানো হচ্ছে ; কাল ইন্স্পেক্টর এসে সব এগজামিন করবেন। আজ তিনি ঘাটেশ্বরা স্কুলের কাজ শেষ করে, দেখে-শুনে আসবেন, কাল,—আমাদের এখানে হবে। গুরুমশাই বলে দিলেন—কাল সবাইকে স্নান করে—ফরসা কাপড়-জামা সব প'রে আসতে হবে। আর সবাই সকাল সকাল আসবে, যেন দেরি না হয়। সকলেরই উৎসাহ—ফূর্তি যেন উপচে উঠেছিল, সেদিন আর পড়াশুনো কিছুই

হ'ল না। বেলা বারোটা পর্যন্ত সব সাফসুতরা ক'রে আমরা চলে এলাম। অবশ্য আমায় কিছুই করতে হয় নি।

পরদিন সব ছেলেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়েই এল বটে কিন্তু যেটা ঠিক যেমন হওয়া উচিত ছিল সেটা হয়েছিল কি না সন্দেহ। অনেকেই স্নান ক'রে এসেছে বটে, ফরসা কাপড়ও পরেছে, কিন্তু, সে ধোপার বাড়ির ফরসা নয়;—ঘরে সাজিমাটি দিয়ে অত্যন্ত ময়লা কাপড় কাচা।. লালচে সামান্য ফরসা কাপড়। কেউ ফরসা কাপড়, কেউ ফরসা শার্ট জামা একটা পরেছে বটে কিন্তু তার না আছে গলার, না আছে হাতের বোতাম। কারো পায়ে জুতো নেই, সব খালি পা কারণ জুতো বা চটি পরা সাধারণত কারো অভ্যাস নেই। বড়রা কাপড়ের উপর চাদর একখানা গায়ে জড়িয়ে এসেছে। কারো মাথায় চিরুনি পড়ে নি, চুলের অবস্থা বিষম। এই সব দেখে আমার মনে হ'ল,—তাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ফরসা কাপড় জামা পরে আসতে না বললেই যেন ভাল হ'ত।

আমরা সকাল সকাল, বলতে যতই আগে যাই না কেন—পণ্ডিতমশাই ও গুরুমশাই দুজনেই অনেক আগে এসে সেদিন বসে আছেন দেখলাম। সবার বসা হলে তিনি উঠে, বেতখানা হাতেই আছে,—এই তুই ওরকম করে বসেচিস কেন, এই রকম ক'রে বোস, একটু ফাঁক ফাঁক হয়ে বোস্, দপ্তরটা ওখানে কেন, পাশে রাখ, দোয়াত ওখানে নয়, এখানে রাখ—বই খুলে বোস, ইত্যাদি, শেষে বললেন, যেই তিনি আসবেন অমনি সবাই দাঁড়িয়ে উঠে প্রণাম করবি, তারপর তিনি যখন বলবেন, তোমরা বোসো, তখন সব বসবি। এই সব বলে ঠিক ক'রে রাখা হ'ল। এখন সবাইকে আস্তে আস্তে পড়তে অনুমতি দিয়ে গুরুমশাই উদ্বিগ্ন চিত্তে সুমুখ দরজার কাছেই পায়চারি করতে লাগলেন আর পণ্ডিতমশাই তাঁর জায়গায় বসে রইলেন।

প্রায় বেলা আটটার সময়, তিনি এলেন। বড়মামা তাঁকে

সসম্মানে নিয়ে এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, সঙ্গে আরও অনেকেই ছিল। তিনি পাঠশালায় প্রবেশ করতেই তাঁরা আর ভিতরে এলেন না, বাইরেই রইলেন, কেবল বড়মামা ভিতরে এলেন তাঁর সঙ্গে। শেষে বড়মামা তাঁকে বসিয়ে নমস্কার ক'রে চলে গেলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে পণ্ডিতমশাই কতক্ষণ কথা কইলেন, তিনি সব খাতাপত্র দেখালেন, তারপর পণ্ডিতমশাইয়ের ছাত্রগুলিকে পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। প্রায় এক ঘণ্টা চলল সে কাজ। ইতিমধ্যে আমরা যে যার জায়গায় বসে বইয়ে চোখ বুলোতে আর এক একবার তাঁর হাব-ভাব দেখতে লাগলাম। তিনি খুব মৃদু কথা কন, হাঁক-ডাক মোটেই নেই, মধ্যবয়সী গৌরবর্ণ সুন্দর—ভারি গম্ভীর মানুষটি। উঁচু শ্রেণীর ছেলেদের হয়ে গেলে তিনি গুরুমশাইয়ের সঙ্গে কিছু কথা কইলেন, তারপরই আমার ডাক হ'ল। আমার ভারি উৎসাহ —না জানি কেমন করে আমায় পরীক্ষা;—কিনা এগজামিন করবেন। ভয়, সঙ্কোচ এসব আমার কিছুই ছিল না। একেবারে, সুমুখে গিয়ে নমস্কার করে দাঁড়ালাম। প্রথম প্রশ্ন, তোমার নাম কি?

বোধোদয় থেকে গোটা কতক কথা, আর তার মানে ও বানান হয়ে গেলে—পদ্য পাঠের কয়েকটা কবিতা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। আবার বোধোদয় থেকে খানিকটা সোজা পড়তে দিলেন। সব শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য স্বরূপ, এটা পড়ে কি বুঝেছ?

আমি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ভাবছি। গোড়া থেকেই তিনি, সব প্রশ্নের উত্তর চটপট পেয়েছেন—এখন ভাবতে দেখে বোধহয় মনে করলেন, এটা বোধহয় আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আমার দেরি হচ্ছিল একটু গুছিয়ে বলতে। তিনি তখন একটু ধরিয়ে দিতে বললেন, ঈশ্বর বলতে কি বোঝো?

বললাম, ভগবান।

নিরাকার বলতে কি মনে করেচ ?

তাঁর কোনো আকার নেই, তাঁকে চোখে দেখা যায় না।

সে কি রকম ? একটা দৃষ্টান্ত দাও দিকি, যেমন ?

হাওয়া—আকাশ,—

বেশ। এখন, চৈতন্য স্বরূপ, বলতে কি বুঝেছ ?

আমাদের মধ্যে তিনি জ্ঞান হয়েই আছেন।

তিনি আমার কাঁধটি ধরে দু'বার চাপড়ে বললেন, বেশ বেশ, কামিনীবাবুর ভাগনে তুমি ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাও, তুমি বসগে যাও।

সব শেষ হতে বেলা সাড়ে এগারোটা হ'ল, তারপর সেদিন ছুটি।

মামার বাড়িতে বিকেলে সেদিন এক ভোজ লেগে গেল। শুনলাম, ইনস্পেক্টার গোপালবাবু নাকি তাঁর মন্তব্যের মধ্যে আমার কথা বিশেষ উল্লেখ করেছেন। সেই জন্য একটা গট্ অর্থাৎ ভোজ হবে। আর সেই দিনই কলকাতা থেকে বাবাও একখানি পত্রে জানিয়েছেন যে শ্রীমানকে ওখানে আর বেশী দিন রাখা তাঁর অভিপ্রায় নয়, পৌষ মাসের আগেই যেন তাদের জোড়াসাঁকোয় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, সে স্কুলে পড়বে।

মাঝের বাড়ির গোপাল দাদামশাই—পাকা চুল, পাকা গোঁফ, আবক্ষ পাকা দাড়ি, ভারি স্নেহপ্রবণ, মিষ্টভাষী। মামাদের জ্ঞাতি খুড়ো, পাঁচটি ছেলে, সবাই আমার মামা। তার ছোট ছেলেটির নাম ননী, আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছরের ছোট হলেও আমার মামা। তার বর্ণপরিচয় মুখে মুখে আরম্ভ হয়েছে : একদিন বিকেলে গিয়ে দেখি, ননীমামা গোপাল দাদামশাইয়ের কাছে বসে ক, খ, মুখস্থ করছে। এ এক নূতন পদ্ধতি, দেখে আমি বসে গেলাম,

শুনতে। আমায় শ্রোতা পেয়ে মামাটির উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠল! এ শুধু বর্ণপরিচয় নয়, গ্রাম্য কবিতা বা ছড়ার মতো, এতে বেশ ছন্দজ্ঞানেরও সুযোগ আছে। এখন দুলতে দুলতে এবং মহা উৎসাহে সে যা মুখস্থ বলছে তা এই রকম;—

কক্ককানি, ককন্নানি, কক্‌মক্ বিলাসিনী,—
ককরাজা করে পূজা, কক্ কক্

তারপর খ, ঐ ধারায়ই:

খখ্যখানি, খখন্নানি খখ্‌মখ্ বিলাসিনী,—
খখ্‌রাজা করে পূজা, খখ্‌খখ্

তারপর গ:

গগ্‌গগানি গগন্নানি, গগ্‌মগ্ বিলাসিনী,—
গগরাজা করে পূজা, গগ্ গগ্।

এইভাবে ব্যঞ্জনবর্ণের সারা বর্গের সকল বর্ণই পর পর ছন্দে ছন্দে মুখস্থ আবৃত্তি হ'ল। কেবল ঙ, আর ঞ প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণ বাদ। পাঠশালায় প্রবেশ করবার আগে, মুখে মুখে বাড়িতে এই ভাবে বর্ণপরিচয়ের প্রথা পল্লীগ্রামে আছে, তবে সব জায়গায় একই রকম নয়। ননী মামার এভাবে মুখস্থ আবৃত্তি একরকম অপূর্ব,— চমৎকার লাগল। মনে হয় এভাবে নানা ছড়ার মধ্যে দিয়ে সহজ শিক্ষা—আমাদের গ্রাম্য-সমাজের অতি প্রাচীন প্রথা।

শিশু-মেয়েরা সে ছড়ায় দক্ষ একথা আমাদের দেশে সকলেই জানে। আমার নিচে যে বোনটি তার নাম রাণী। তার ভাল নাম কি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলত অন্নপূর্ণা। বলেই সে আরম্ভ করত,—

অন্নপুন্না দুধের সর,
কাল যাব মা পরের ঘর;
পরের বেটা মারলে চড়,
কাঁদতে কাঁদতে খুড়োর ঘর;

খুড়ো দিলে বুড়ো বর,
ও খুড়ো তুই পড়ে মর।

এতটা বলে তবে তার শান্তি। সে এত বক্‌তে ভালবাসে, তার বক্‌বকানী, ছড়ার জ্বালায় আমরা অস্থির! কলমী শাক একঝুড়ি আনা হয়েছে, সকলে মিলে কোটাবাছা করছে। সে এসে যেই দেখলে যে ওটা কলমী শাক,—কেউ শুনুক বা না শুনুক সে অমনি আরম্ভ ক'রে দিল তার ছড়া :

হেদেলো কলমালতা!
জল শুকুলে থাকবি কোথা?
মামাদের তেঁতুল তলায়,—
বাগদি মোলো,—আমাদের যেতে হোলো।
সারি সারি সবাই যায়, হাত পেতে মেগে খায়।
রাজা যান রাজ্য পাটে, তিনশো টাকার গুরজি হাটে।
দেনা রাজা পথ খরচা, বাঁধাবো নাল দরজা,—
আসিবেন রাজার মেয়ে, দেখিবেন চেয়ে।
চাউনীটা তার বড্ড গোল; পিছনেতে বাজে ঢোল;
গোলে-মালে চণ্ডীপাঠ, শেষ করেদে ঢোলার হাট।

তার ছড়ার বাহুল্য মামারা, দিদিমা, এঁরা সকলেই উপভোগ করতেন। আমার সঙ্গে তার ভাব মোটেই ছিল না। কোন একটা ফরমাস করলেই সে, তুমি কি আমার সঙ্গে ছড়া শোনো, আমি তোমার কথা শুনবো কেন?—যেদিন ইনস্পেকটার আসেন সে সব খবরই জানত। সেদিন সকালে পাঠশালায় যাবার আগেই সে আমায় ধরেছে, দাদা, একটা কথা শোনো?—কী? তুমি আজ খুব ভাল করে পড়া বলতে পারবে যদি আমার একটা কথা শোনো। কি কথা? জিজ্ঞাসার উত্তরে, নারকেল গাছে একটা সাদা-গলা শঙ্খচিল বসে ছিল সেটাকে দেখিয়ে সে বললে,—ঐ যে শঙ্খচিল না? হাতজোড় ক'রে ওকে বলো,—

শঙ্খচিল গদাধর, তোমার পায়ে নমস্কার,
তুমি রইলে ডালে, আমি রইলাম আলে,
তোমার সঙ্গে দেখা হবে সেই মরণের কালে।

এই কথা বলে নমস্কার ক'রে যেয়ো,—যদি ভাল চাও।

আমি বললাম, দূর্ দূর্—তাই নাকি হয়; আমি ভাল ক'রে পড়া না করলে ওকি আমায় জোর ক'রে মন্তর দিয়ে পড়া বলিয়ে দেবে নাকি?—ব'লে চলে গেলাম। সে হারবার পাত্র নয়। শুনতে পেলাম সে বলছে—হ্যাঁ, ও দেবতা, ও পারে তোমার পড়া বলিয়ে দিতে। আচ্ছা, শুনলে না যখন আমার কথা, তখন দেখো, ও তোমায় শাপ দেবে, তুমি আজ কিছুই বলতে পারবে না পড়া, দেখো না!

এ কথা শুনে আমায় ফিরে এসে তাকে এক ঘা চড় মারতেই হ'ল, কারণ এত কথা ছোট বোনের মুখে শুনে চুপ ক'রে সহ্য ক'রে চলে যাওয়াটা একজন মরদের আত্মসম্মানে বাধে। তাতেও তার মুখ বন্ধ হ'ল না, সে আরম্ভ করলে,—আমায় যে মারলে, কি সুখটা পেলে? তোমারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে!—ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমার আর সময় হ'ল না তাকে শাসন করতে—কাজেই চলে গেলাম। পরীক্ষার সময় আমার মনেই ছিল না তার কথা। শেষে যখন ফিরে এলাম পরীক্ষার পর, সকলের মুখেই ও শুনেছিল যে আমার বলা ভালই হয়েছিল, তারপর বড়মামা যখন প্রচার ক'রে দিলেন যে আজ একটা গট্ হবে (ফিস্ট), সে তো আহ্লাদে আট-খানা,—তার মুখে তুবড়ি ফুটতে লাগল;

লেখা পড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।
লিখলে পড়লে তুদি ভাতি, না পড়লে মাগের লাতি।
মোটা হবে বেশী পড়ে, কাপড় পাঁচ গজ,
পাশ করে হবে দাদা হাইকোর্টের জজ।

সেটা অগ্রাণ মাসেই হবে, বহু দূর প্রসারিত ধান জমিতে যেন

হালকা হলুদ রং ঢালা, এখন সব ধানই প্রায় পেকে উঠেছে, বোধ হয় কোথাও কাটাও আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকবে। গোড়া থেকেই মাঠের রং দেখে আসছি সেই প্রথম চাষের সময় থেকে। আষাঢ় শ্রাবণ কি চমৎকার চোখ-জুড়ানো সবুজ, সেটা একটু ফিকে;—কি কোমল তার অঙ্গ। তারপর হ'ল ঘোর সবুজের সাগর, দূর প্রান্তে গাঢ় নীল নানা আকারের বৃক্ষলতাপূর্ণ গ্রামের ঘন রেখা। মাঠের যে দিকেই চাইবে কেবল শ্যামহরিতের স্নিগ্ধ প্রসার, নেশা লেগে যায় চোখে সে সবুজের তরঙ্গ দেখতে দেখতে। খণ্ড খণ্ড জমিগুলি তখন অখণ্ড একটানা বিশাল হয়ে উঠেছে, কেবল মাঝে মাঝে প্রশস্ত ব্যবধানের জায়গায় একটু ঘন হয়ে উঠেছে। তারপর সেই ঘন সবুজ আবার হালকা হতে আরম্ভ হ'ল যখন ঐ আশ্বিনে, তখন গোছায়, ধবধবে সাদা ধানের শীষে দুধ হয়েছে। সেই কচি কচি শীষের গোছা ছিঁড়ে চিবিয়ে খেতাম, কি মিষ্টি! তখনও সোজা হয়েই উঠছে শীষগুলি। তারপর কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে গোছা মোটা হয়ে ডগাটা নুয়ে পড়ে আর তার ডগায় ডগায় শিশির বিন্দু ঝুলে থাকে। প্রভাতে সেই শীষগুচ্ছের দোলানি সে কি চমৎকার দেখ্‌তে। কবিতায় আছে,—শীষের উপর শিশির বিন্দু নাকে যেন ঠিক নোলক দুলিছে।

আমরা কলকাতায় এসব কিছুই দেখতে পাই না। সেখানে কেবল বাড়ি আর বাড়ি,—আর কঠিন রাস্তা আর গাড়ি-ঘোড়া—কি আশ্চর্য! সেখানকার লোক মনে করে, এমন স্থান আর নেই। মনে হয় তারা যদি এই সময় একবার এখানে এসে দাঁড়ায় তাহলে কিছুতেই বলতে পারবে না যে কলকাতা পল্লীগ্রামের মাঠের চেয়ে ভাল।

কী সুন্দর এই পাকা ধানের ক্ষেত। এক একটি ক্ষেতের রং হলুদ আর খয়েরি রঙের মেশামিশি। কাছে গিয়ে দেখছি, সেটা মোটা ধান যা থেকে বোগড়া চাল হয়, বোলতার টিপের মতো, যা

সব চেয়ে সস্তা। মামার বাড়িতে সেই লাল চালের ভাত জনমজুরদের জন্য রান্না হয় রোজ রোজ, আর আমাদের জন্য বাঁকতুলসী চাল। কখনও কখনও ঐ বোগড়া চালের ভাতও আমরা খেয়েছি,—ভারি মিষ্টি সে ভাত। মামার বাড়ির সব ভাতই মিষ্টি। কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে আমাদের বাড়ি বালাম চালের ভাত; কি বিস্বাদ লাগত এখান থেকে যাবার পর। কিন্তু ওখানে, ঐ চালের গুমর কম নয়;—চাকরদের কোন অপরাধ হ'লে,—ব্যাটাদের কলকাতায় এসে বালাম চালের রস বিঁধেছে। ভগবানই জানেন কি অদ্ভুত রস থাকে তাদের ঐ বালাম চালে।

মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস মামার বাড়িতে ছিলাম, মেয়াদ ফুরোল, চলে যেতে হবে এবার মামার বাড়ি থেকে; সেই দিন একথা যখন শুনলাম মনটা শুধু খারাপ নয় যেন বিস্বাদ হয়ে গেল। বাবা চিঠি লিখেছেন বড় মামার কাছে আগেই বলেছি,—এখানে আমার আর থাকবার দরকার নেই, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমায় স্কুলে ভর্তি করা হবে। একটু আনন্দ হ'ল ঐ স্কুলে ভর্তি হবার কথা শুনে, না হলে আর কোন সুখই ছিল না এই খবরটার মধ্যে। মা-ও যাবেন। দুর্গা-পূজার সময় তিনি এসেছিলেন, এই অঘ্রাণ মাসেই যাবেন।

দিদিমা আর বড়মামা পাঁজি নিয়ে দিন ঠিক ক'রে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দিদিমার ঝোঁক পড়ল আমাদের খাওয়ানোর উপরে। এটা খা, ওটা খা! মাছ, মাংস, কচ্ছপের মাংস, ডিম, হরিণ মাংস, দৈ, ক্ষীর, পায়েস, পিঠে, পুলি ইত্যাদি সে সময়ে যত সংগ্রহ হওয়া সম্ভব, দিন রাতে খাওয়া চলতে লাগল। দিদিমা ত জানতেন যে আমরা কলকাতায় গিয়ে রোগা হয়ে যাবো, ওখানকার খাবার ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়।

এ দিকে পাঠশালার সহপাঠী, নিরো মোড়ল, অনুকূল, বৈকুণ্ঠ, শ্যামা-তাঁতি প্রভৃতি সকলেই শুনেছিল এইবার আমি কলকাতায়

যাবো, সেখানে স্কুলে ভর্তি হব এখানে আর থাকবো না। তাই শুনে অবধি তারা এমনভাবে উৎসাহে আনন্দে কলকাতার কথা কইতে আরম্ভ করলে যেন আমি কি সুখের রাজত্বেই যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবে—এই সরল দুঃখী, পরিচ্ছন্নতাবর্জিত আমার শৈশব বান্ধবদের কথা মনে ভাবতে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠতে লাগল।

সত্য সত্যই যাওয়াটা যখন ঘনিয়ে এল কয়দিন পরে এক মধ্যাহ্নে—তখন আমার চোখের জল দেখে দিদিমা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, স্কুলের ছুটি হলেই তোকে নিয়ে আসবো আবার। জানতাম, দিদিমা কখনও আমায় ভুলে থাকতে পারবেন না। ছেড়ে যেতে, ভালবাসার স্থান ছেড়ে যেতে যে মায়া—তা অতি বাল্যেই আমার অনুভব তীব্র রকমই হয়েছিল।

দু'খানা পালকি, একখানায় মা আর খোকা আর একখানায় আমরা চার ভাই বোন। আর যত পোঁটলা-পুঁটলি। এসময় এখান থেকে ডোঙায় যাবারই কথা, তা না হয়ে কেন যে আমরা পালকিতে যাচ্ছি তা জানি না। ডোঙায় যেতে ভারি আনন্দ তাতে মগরা হাটে রেলে উঠতে হয়; আর পালকিতে সংগ্রামপুর স্টেশনে। সারা পথ পিঁজরাতে আবদ্ধ অবস্থায় যেতে হবে।

যাচ্ছি আপন বাড়িতে, সেখানে কিন্তু সুখ নেই। সুখটুকু এই যাবার পথটুকুতেই। পথ শেষ হলে আমার প্রাণে যে দুঃখ আসবে তা এখন থেকেই মাঝে মাঝে মনে হয়ে আমার কান্না আসছিল। আমার মনে কত ভাবের কথা, ওখানকার আত্মীয়-স্বজনদের, স্মৃতিতে ভেসে ভেসে উঠছিল। ঠাকুরদাদা, বাবা, পিসিরা ঠাকুর মা, বড় ও ছোট কাকাবাবুরা, বাবুয়া জেঠামশাই; যার কাছে যেমন ব্যবহার পেয়েছি—সেই সব কথা মনে মনে তোলাপাড়া করতে করতে চলেছি। উড়ে বেয়ারারা কত রকম বুলি বলতে বলতে তাদের কাঁধের ভার-বোধ এড়াবার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে,—বড় ভারি,

হুম্ হুম্, বাতলপু হুম্ হুম্,—বাকু সরা হুম্ হুম্, নাড়িয়া কড়া হুম্ হুম্, পাড়ি দিব হুম্ হুম্;—এ সব বলতে বলতে চলেছে, কখনও গ্রামের পথে কখনও মাঠের আল দিয়ে।

এইভাবে এসে পথের মাঝখানে বিশ্রামের জায়গা হ'ল মন্দিরের বাজার। বাবা কেশবেশ্বরের মন্দির আঙিনাতে আমরা নামলাম। মা পালকির বাইরে এসে মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করলেন, প্রসাদী ফুল নিয়ে মাথায় দিলেন, আমাদের প্রত্যেকেরই মাথায় ছুঁইয়ে দিলেন। এতক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকতে যে কষ্ট পেয়েছি তার বদলে খানিকটা খুব দৌড়াদৌড়ি ক'রে নিলাম। তারপর আবার বদ্ধ অবস্থায় যাত্রা। সংগ্রামপুরের বিশালমাঠ; সামনেই দেখি—কত দূরে নারকেল গাছের রেখা, ওপারে গ্রামের মধ্যে কত বড় বড় গাছ, কতটুকু দেখাচ্ছে এখান থেকে,—আকাশের নিচে তাই দেখতে দেখতে বেহারাদের কাঁধে চলেছি।

প্রায় চারটের সময় স্টেশনে আমরা পৌঁছে—মুক্তি পেলাম। মা পালকি থেকে নামলেন না। বল্‌করণ দারোয়ান লাঠি ঘাড়ে দাঁড়িয়ে রইল মায়ের পালকির কাছে একটু দূরে, আর আমরা ক'টিতে মিলে স্টেশনে প্লাটফরমের উপরে রাজত্ব আরম্ভ ক'রে দিলাম। মা কেবলই একজনকে পিছনে লাগিয়ে দিয়ে আমাদের খেলায় যতটা সম্ভব বাধা সৃষ্টি করতে ত্রুটি করছেন না, তা সত্ত্বেও আমার কাজ ঠিক চলছিল।

স্টেশনের এক দরোয়ান, বোধহয় ল্যাম্প-ম্যান না পয়েন্ট-ম্যান অথবা পোর্টার কেউ হবে, আমায় বাবু সম্বোধন ক'রে বকশিশ চাইলে। তার ঐ সম্বোধন, আমার মনে বাবু বোধটা এমনই জাগিয়ে দিলে,—খেলা ফেলে পকেট থেকে দু' আনাটা সুড়সুড় ক'রে তার হাতে তখনি বার ক'রে দিলাম। একটা বেগুনি পেন্‌সিল কেনবার জন্য ওটা দিদিমা দিয়েছিলেন। বাবুর অধিকারেই দেবার পরে কেবল এই কথাটি জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যা করেগা পয়সা লেকে?

ভাং খায়েগা বাবু—বলে তার মোটা গোঁফের ফাঁক দিয়ে একটু হাসলে। ভাং জিনিসটির সঙ্গে আমার তখনও পরিচয় হয় নি,—কিন্তু তা হবারও দেরি নেই বেশী, তা তখন জানতাম না। মা বললেন—বেগুনি পেন্‌সিল কিনবি কি দিয়ে? মা লোকটার উপর বিরক্ত হয়েছিলেন, ছেলেমানুষকে ভুলিয়ে পয়সা নেওয়াটা তাঁর ভাল লাগে নি মোটেই।

রাত আটটা, আমরা বাড়িতে পৌঁছে গেলাম। মা আমার ভাবান্তরটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠেই লক্ষ্য করেছিলেন, যখন কলকাতা শহরের হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ির ঘড়র ঘড়র শব্দের সঙ্গে অপরূপ দোকান-পাট পথের ধারে ধারে দেখতে দেখতে আসছি বোধহয় চোখ আমার কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে আসছিল, আমার একেবারে শান্ত ভাবটা দেখে মা বললেন, কি রে, তুই অমন হয়ে গেলি কেন, মন কেমন করছে বুঝি?

তারপরে যা হ'ল আর কাজ নেই, সে কথায়। এখন ঐখানে গাড়ি থামতেই পিসিরা সবাই খিড়কির দরজার এসে মাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। হায় কোথা থেকে কোথায় এলাম। দাদামশায়ের কাছেই আমি প্রথমে গিয়ে নমো ক'রে দাঁড়াতেই—এস ভাই ব'লে তিনি আমায় তাঁর পাশে বসালেন। আমার মুখ দেখেই তিনি আমার দুঃখ বুঝলেন, বললেন,—ভয় কি ভাই, তুমি আমার কাছেই থাকবে। আমি তোমায় ওর কাছে আর যেতে দেবো না। তাঁর সান্ত্বনা আর অভয় বাণী মনের মধ্যে একটা সাহস এনে দিলে। আমার মধ্যে যে অবসাদের ভাবটা আসছিল তা'র অনেকটাই কেটে গেল।

সে রাত্রে বড়ই ক্লান্তি,—যেন কোন রকমে শুতে পারলে বাঁচি। যা হোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। যা খেলাম তা মোটেই রুচিকর নয়।

দশ

ঠাকুরদাদামশাইয়ের ঘর থেকে সকালে যখন বেরিয়ে এলাম, তখন দেখি অন্দরে, নিচের দালানে সকলেই সমবেত হয়ে, আস্তে আস্তে নিচু গলায় বোধ হ'ল যেন কোনও একটা গুরুতর বিষয় নিয়েই জটলা চলেছে। সকলকার মধ্যেই যেন একটা ভয় আর উদ্বেগ! বড়পিসি বলছেন, বড় সাংঘাতিক দাঁড়িয়েছে এখন অবস্থা, কি হবে যোগীন ?

জেঠামশাইকে বাবুয়া বলেই জানতাম, বড় হয়ে তখন তাঁকে জেঠামশাই বলে জেনেছি। না হলে তিনিও আমায় সারা ছেলে-বেলাটা বাবুয়া বলেই ডাকতেন, আমিও তাঁকে বাবুয়া বলেই জানতাম। আজ এতদিন পরে তিনি আমায় তাঁর আদরের যে বৈশিষ্ট্য, আমার দাড়িটি ধরে, সেই মধুর হাসির সঙ্গে একবার 'বাবুয়া' বলে ডাকলেন বটে, কিন্তু কি জানি আজ তাঁর মুখে কেমন বেশ একটা ভীষণ উদ্বেগের চিহ্নই দেখলাম। তাড়াতাড়ি তিনি চলে গেলেন নিচে, বড়পিসির ঘরের দিকে।

আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে বড় পিসির ঘরের দরজায় গিয়ে দেখলাম,—নিঃশব্দ ঘরের মধ্যে তিন-চারজন ভব্যযুক্ত লোক গম্ভীরভাবে বসে, তাদের কাকেও আমি চিনি না। আর ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর মহেন্দ্রনাথ, বাবুয়ার ছোটভাই, আমার বড় কাকাবাবু শুয়ে আছেন। বড় ছটফট করছেন—আর বাবুয়ার মা, মেজঠাকুমা পাখা হাতে বাতাস করছেন মাথায়, তাঁর মুখে যে কি উদ্বেগের চিহ্ন বলবার নয়। মাথায় কাপড়, তাঁর গৌরবর্ণ ম্লান, ক্ষীণ মুখ, যেমন সারা রাত জাগলে হয় সেই রকম। চোখ দুটি লাল।

বড় কাকাবাবুর কলেরা, শুনলাম, এসিয়াটিক্ কলেরা হয়েছে। মেঝেতে যাঁরা বসে, তাঁদের মধ্যে একজন অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি, দীর্ঘ শরীর—ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ বর্মণ, বড় কাকাবাবুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাঁর পাশেই—আমাদের পাড়ার লক্ষ্মী ডাক্তার। আমাদের ডাক্তার হলেন জয়কৃষ্ণবাবু, তাঁকে কিন্তু দেখলাম না। জেঠামশাই নির্বাক, কেবল বড় কাকাবাবুর ছট্‌ফটানি দেখছেন। আর মাঝে মাঝে বরফের টুকরো নিয়ে মুখে দিচ্ছেন। বাবুয়ার মা, আমার মেজ ঠাকুরমাকে সকলেই গভীর শ্রদ্ধা করত, বিশেষত, বড় কাকাবাবুর বন্ধুরা তাঁকে ঠিক নিজ নিজ মায়ের মতোই দেখতেন। ডাক্তার বর্মণ তখন বলছিলেন,—আপনি নরুর জন্য কিছুই উদ্বিগ্ন হবেন না, মা। আমাদের উপরে যিনি আছেন তিনিই সব শান্তি ক'রে দেবেন। আপনারা আমাদের উপর নির্ভর ক'রে আছেন, আমরা তাঁর উপর নির্ভর করি। লক্ষ্মী ডাক্তার বললেন, এখনও পর্যন্ত সমস্ত লক্ষণই ভাল আছে,—কিছু ভাববেন না।

এ রকম নানা ভাবের কথা, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম।

দেবতুল্য ডাক্তার বর্মণকে আমার এই প্রথম দেখা ;—এমন গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নি। এমন অল্প কথা, অথচ প্রত্যেক শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ, ছোট হলেও তখনই আমার আকর্ষণের বিষয় হয়েছিল। অবশ্য এর পর আরও অনেকবার ডাক্তার বর্মণকে দেখেছি, তাঁর পুত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে, এমন কি এই বর্মণ গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার জীবনের বড় গুরুতর সম্বন্ধ ঘটেছিল এই বাল্য-জীবনেই স্কুলে একত্র অধ্যয়ন থেকে শুরু। যার কথা আমার জীবনকথায় বাদ দেওয়া অসম্ভব। যাই হোক এই ভয়ঙ্কর পীড়ার সময়ে শুধুই যে ডাক্তার বর্মণকে দেখলাম তা নয়, অভিজ্ঞতাও কম হ'ল না। মা কালীকে ষোড়শোপচারে পূজার মানৎ প্রত্যেক পিসির কি ব্যাকুল, হে মা কালী, হে মধুসূদন, বলে মানৎ করা,

—সত্যনারায়ণের শিন্নি দেবার প্রতিশ্রুতি। সকলকার উপর জেঠা-মশাইয়ের ভ্রাতৃস্নেহের পরিচয় যা পেলাম তার তুলনা বিরল। তিনি মা কালীর কাছে, বুক চিরে রক্তদানের মানসিক করলেন এবং তা দিয়েও ছিলেন যথা কালে।

চমৎকার কথা এর মধ্যে এই, যে ডাক্তারীর চূড়ান্ত হ'ল আগাগোড়া। তার উপর টোটকাও হ'ল, আবার মা কালীও হ'ল, বাবা তারকনাথ এবং সত্যনারায়ণের শিন্নিও হ'ল, মানসিকেরই ব্যাপার, কেবল হোমিওপ্যাথী বাদ! বড় কাকাবাবুর অসুখ সেরে গেল,—সাত আট দিনে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠতেই সকলে নিরুদ্বিগ্ন হলেন। প্রথম পূর্ণিমাতেই হ'ল শিন্নি, তারপর অমাবস্যায় হ'ল কালীঘাটে যাওয়া।

ঠাকুরদাদামশাই কম উদ্বেগ ভোগ করেন নি, তবে বড় গম্ভীর মানুষ তিনি, বাইরে চঞ্চল হন নি। এ কয়দিন বাড়িতে যেন কেমন একটা আতঙ্কের ভাব জমাট হয়েছিল।

ইতিমধ্যে ঠাকুরদাদামশাই আমাকে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এবার মামা বাড়িতে থাকবার সময় কেমন পড়াশুনা হ'ত সেই সব বিষয়। কিন্তু যখন শুনলেন যে আমি কেবলই বাংলা পড়েছি, ইংরাজী বই কিছু পড়ি নি, তিনি যেন একটু অসুখী হলেন। কেন, সেখানে পড়াবার কেউ ছিল না? আমি যখন বললাম, সেখানে গুরুমশাই ইংরাজী জানেন না,—কেউ সেখানে ইংরাজী পড়ে না, শুনে তিনি বললেন, তাই নাকি? বলে যেন কতকটা বিস্মিত, কতকটা ক্ষুব্ধও হয়ে পড়লেন। এতদিন কেবল বাংলাই পড়েছি এ যেন সময় নষ্ট হয়েছে, বোধহয় এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর এই মনোভাবের কারণটা তখন ঠিক বুঝি নি কিন্তু পরে ভাল মতেই বুঝেছিলাম। তখনকার দিনে ইংরাজীকে রাজ ভাষা বা দেবভাষার সম্মান দেওয়া হ'ত; এক কথায় বলতে—তাঁরা সবাই ইংরাজীর শুধু ভক্ত নন, একমাত্র ইংরাজী ও ইংরাজদের উপাসক ছিলেন।

আর একটা কথা আমার তখনই মনের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, ঠাকুরদাদা আমার বাংলা জানতেন না ; না লিখতে না পড়তে। নিমন্ত্রণ পত্র যদি ছাপার অক্ষরে লেখা থাকত, তাঁর কাছে এলে, তিনি সেখানি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে শেষে আমার হাতে দিয়ে বলতেন, পড় ত ভাই।

তার চেয়ে আরও আশ্চর্য আছে। সে আরও ছোটবেলার কথা বলছি।—বাবার কাছে মার খেলে,—সে প্রহারের চিহ্ন সর্বাঙ্গেই থাকত,—মাথায় ত বিশেষ রকম,—বড় বড় ফুলো নিয়ে সহানুভূতির আশায় যখন তাঁর কাছে যেতাম, তিনিও জানতেন, ভালই বুঝতেন আমি কেন এসেছি তাঁর কাছে। সেই ঘরের মেঝেতে ছোট বিছানায় বিকালে তিনি শুয়ে থাকতেন। কতই না স্নেহে আমায় পাশে শুইয়ে তিনি সেই সব জায়গায় হাত বুলিয়ে দিতেন। এমন কোমল মধুমাখা সে পরশ—আমার বেদনা অর্ধেক সুস্থ হয়ে যেত কখনও কখনও ঘুম আসত। যখন ঘুমিয়ে পড়তাম না তখন ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেন। তখনই মৃদু-মধুর সুরে ছড়া বলতে আরম্ভ করতেন। মামুলী ছড়া সে সব, মেয়েদের মুখে হামেশাই শোনা যায়। ছেলেদের ঘুমপাড়াতে এখনও মায়েরা বা মেয়েরা ব্যবহরে করে থাকেন ;

আয়রে ছেলের পালেরা মাছ ধরতে যাই,
মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ'পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাই,
ছোট শাঁখাটি বড় শাঁখাটি ঝুমুর ঝুমুর করে···ইত্যাদি

এই সব শুনতে শুনতে আমি কত কত বারই না ঘুমিয়েছি। সেক্‌শপীয়ার, মিলটন, বায়রন, এডিসনের ভক্ত তখনকার ইংরাজী-নবীশ একজন, যিনি বাংলা জানেন না ; তা বলে তাঁর কোন ক্ষোভই ছিল না আমার বিশ্বাস ;—সেই মানুষ মেয়েলী ছড়া ব'লে নাতিকে ঘুম পাড়ান,— এটা বিচিত্র নয় কি ? আরও এক বৈচিত্র্য

ছিল তাঁর মধ্যে, বিশ্রামবেলায় রাত্রে, তিনি আপন মনে শুয়ে শুয়ে গান করতেন, সেকালের গান, কেন মা তোর পাগলিনী বেশ, গলে দোলে মুণ্ডমালা, চরণে মহেশ, ইত্যাদি। দাশু রায়ের পাঁচালি এবং সেকালের সাধকদের গান দু'একখানি তাঁর জানা ছিল তাইতেই চিত্ত বিনোদন করতেন।

আরও পরের কথা, যখন আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি নাইন্থ ক্লাসে, বাংলা কথামালা, আর পদ্যমালা, চাণক্য শ্লোক পড়া হ'ত। ঠাকুরদাদামশাই আমার মুখ থেকে বাংলার পদ্য, গান, ছড়া এসব শুনতে সত্য সত্যই এত ভালবাসতেন, ভাবতে তখন আমার কি যে আশ্চর্য মনে হ'ত তা আর বলবার নয়। তিনি আগ্রহ ক'রে পদ্যমালার প্রত্যেক কবিতা আমার মুখে আবৃত্তি করিয়ে শুনতেন। এমন কি চাণক্য শ্লোকের প্রত্যেক শ্লোকটি, আবার তার বাংলা পদ্যানুবাদ তাও আদ্যন্ত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন, ঐ সময় থেকেই আবৃত্তিতে উৎসাহ পেয়েছিলাম।

তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা এলে ঐ সময়ে প্রবীণ, গম্ভীরাত্মা বিচক্ষণ কর্তাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, গভীর আনন্দের সঙ্গেই চলত, —দেখেছি। তাঁদের মধ্যেও পরস্পর যে সব কথা হ'ত তার মধ্যে পনেরো আনা ইংরাজী। ক্লাসিক্যাল লিটারেচার কবিতা থেকে বহুতর আবৃত্তি। তাঁদের আসল কথা শেষ হয়ে গেলেই,—আমি ত সর্বক্ষণই এটেণ্ড করতাম,—আমার নাতি কেমন চাণক্য-শ্লোক পড়ছে শোন; ব'লে, আমায় বলতেন, বল ত ভাই, সেই শ্লোকটা, যাতে, ঘরে যার মা নেই আর সেই যে? আমি তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে ঠিক সেইগুলি আবৃত্তি করতাম। তাঁর বান্ধবেরাও তাঁর মতোই মনোযোগ দিয়েই শুনতেন;

মাতার্যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চা প্রিয়বাদিনী,
অরণ্যম্ তেন গন্তব্যম্ যথারণ্যম্ তথা গৃহম্।

ক্রমে বড় হলে পর তাঁর অবর্তমানে তাঁর কথা যখনই মনে

করেছি, আমার ধারণা এই হয়েছিল যে তিনি অন্তরে বাংলার ভক্ত হয়ে আসছিলেন, শেষ অবধি বাংলা ভাষার উপর তাঁর একটা গভীর প্রীতি জন্মেছিল, তাই তিনি আমাদের মুখ থেকে পদ্য গদ্য প্রভৃতি শুনে বিশেষ রকমই উপভোগ করতেন।

আমার মুখে কবিতা, পদ্যমালার পাঠ্য চাণক্য শ্লোকেরও সব কিছু যা আমাদের পড়া হ'ত, তাঁকে না শোনালে অব্যাহতি ছিল না। এইভাবে তাঁর বন্ধু-বান্ধবকেও তাঁর যেটি ভাল লাগত, শুনিয়ে তাঁর শান্তি হ'ত। তিনি যে কবিতাপ্রিয় ছিলেন তা তাঁর দৈনন্দিন আমাদের সঙ্গে ব্যবহার দেখলেই বুঝতে পারা যেত। তার মধ্যে, মুখে মুখে ছড়া তৈরি করা তাঁর এক সহজ আনন্দ। আমার নিচে যে বোনটি, নাম ছিল বাণী, সে বড়ই রোগা ছিল। সে কাছে এলেই, তিনি তাকে সম্ভাষণ করতেন—নন্দ ভগনি, ভগনি। খেতে না পেরে তুমি হয়েছ শুকনি।

সকালে চারখানি ইংরাজী কাগজ তিনি পড়তেন, স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান মিরর আর হিন্দু প্যাট্রিয়ট্। হিন্দু প্যাট্রি-য়টের কৃষ্ণদাস পালমশাই ছিলেন তাঁর সহপাঠী এবং বাল্যবন্ধু। তাঁর আরও দুটি বন্ধুর কথা আমি তখনই জানতাম, প্রথম গণেশচন্দ্র চন্দ্র, উকিল, আর সীতানাথ দাস, দুজনেই এটর্নী—আমি এঁদের দেখেছি। কৃষ্ণদাস পালকে আমি দেখি নি, তবে তাঁর ছেলে রাধাচরণ পালকে আমাদের বাড়িতে অনেকবার দেখেছি। কাঁসারী পাড়ার বাড়িতে কয়েকবার নিমন্ত্রণেও গিয়েছি ছোটবেলা। অনেক কাজেই তিনি ঠাকুরদাদামশাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসতেন, তাঁকে তিনি বাপের মতোই শ্রদ্ধা করতেন।

এঁরা সবাই ইংরাজী ভক্ত, আলাপ-আলোচনা সবই ইংরাজীতে। মাসকাবারে, একটা মোটা বাঁধা তোড়া, তাঁর মাইনে আসত, বেশ ভারি সেটা। সেটা রবিবার পর্যন্ত তার বড় টিনের হাতবাক্সে তোলা থাকত। রবিবারে দুপুরে, খাওয়া-দাওয়া বিশ্রামের পর

তিনি সেই টিনের বাক্সটির চাবি খুলতেন। তখন তাঁর কাছে আমি ছাড়া আর কেউ থাকত না। একখানি খাতা ছিল, একসাইজ বুকেরই আকার, তবে লাইনটানা পাতা নয়। খাতার বেশ মোটা সাদা কাগজ, প্রত্যেক পাতাকে চার ভাগ করা মাঝে লাইন দিয়ে। প্রত্যেক ঘরে মাসিক মোটমুটি খরচ লেখা থাকত। এক পৃষ্ঠায় চার মাসের হিসাব। সরু সরু ইংরাজী অক্ষরে প্রত্যেক দফা লেখা আর তার শেষে ড্যাস দিয়ে টাকার পরিমাণ। স্টিল পেন তাঁকে কখনও ব্যবহার করতে দেখি নি—সাদা সাদা লম্বা গুস্ কুইল পেনে তিনি লিখতেন। তাঁর খরচের মধ্যে, চাল, ডাল, মাসিক মাছ ও বাজার খরচ, ঝি চাকর মেথর দারোয়ানের মাইনে, রোজ দশ পয়সা হিসাবে ট্রাম ভাড়া, লোক-লৌকিকতা, ঠাকুমা ও পিসিদের হাত খরচ,—তা ছাড়া প্রতিমাসে কাপড়-চোপড়ের জন্য কতক টাকা জমা। এই সব নিয়ে প্রায় বারো দফায় বারোটি লাইনে সারা মাসের খরচ লেখা হয়ে গেলে, বড়পিসি, ঠাকুমা, মেঝ ঠাকুমা, জিতু ঠাকুমা এঁদের সকলকে ডেকে যাঁর কাছে সে সকল খরচের ভার থাকত, তাঁদের হাতে তখনই বিতরণ ক'রে নিশ্চিন্ত।

একটা মিসমিসে কালো বাক্স, জাপানী পালিশ, তার উপরে ঝিনুকের প্লেটের উপরে পালিশ ঝকঝক করছে, কতরকমের উজ্জ্বল নক্শা উপরের ডালার মাঝখানে। বোধহয় এক ফুট লম্বা আর কিছু কম চওড়া। সেটা পুরু প্রায় তিন ইঞ্চি, সেইটি তাঁর সেভিংস ব্যাঙ্ক। তার মধ্যে থাকে-থাকে নোট থাকত। রেশমের সবুজ ফিতায় বাঁধা তাড়াগুলি। দশ টাকার নোট তার মধ্যে নেই—একশ' টাকা, পাঁচশ' টাকা আর হাজার টাকার, এই তিন রকমের তিনটি থাকে ভরা। তিনি কখনও ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন না। তাঁর ব্যাঙ্ক সেই অপূর্ব জাপানী কাঠের বাক্সটি। সেইটি থাকত তাঁর লোহার সিন্দুকে। প্রতি মাসে একবার ক'রে তার চেহারা দেখতাম। আমার ভারি ভাল লাগত তাঁর সেই বাক্সটি দেখতে।

তিনি সে কথা জানতেন। সেটি বার ক'রে আমার দিকে চেয়েই হেসে বলতেন, সেভিংস ব্যাঙ্ক। কথাটা তাঁর কাছেই প্রথম শুনি।

ঠাকুরদাদার নিত্য-কর্ম-পদ্ধতি ঘড়ির মতোই চমৎকার সুনির্দিষ্ট ছিল। মামার বাড়ি থেকে এসে অবধি আমি তাঁর কাছেই শুতাম। সামনের দেয়ালে উঁচু ব্রাকেটের উপর একটা পুরোনো ম্যাকেবের ক্লক, দাঁড় করানো ছিল, তাতে চারটে বাজলেই তিনি উঠতেন, তারপর ঠাকুমা উঠতেন। পরিষ্কার খড়ির গুঁড়ো দিয়ে মুখ ধুতেন। কাপড়-গামছা সব ঠিক করা থাকত, তিনি তাই নিয়ে গঙ্গাস্নানে চলে যেতেন। এক এক দিন আমি তাঁর সঙ্গে যেতাম। তিনি বেরিয়ে গেলে ঠাকুমাকে নিয়ে মেয়েরাও একদল নিত্যই ভোরে গঙ্গাস্নানে যেত, তাদের সঙ্গেও কখন কখনও আমি যেতাম। দারোয়ান গয়াপ্রসাদ যেত তাদের সঙ্গে।

ঠাকুরদাদা প্রায় সব জায়গায়ই, অবশ্য অফিসটি ছাড়া,—আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতে ভালবাসতেন। তিনি যে গঙ্গাস্নানে যেতেন তা শুধুই স্নান নয়। তিনি একেবারে পোস্তায় যেখানে তাঁর আড়ত সেখানে গিয়ে উঠতেন, তখনও বেশ ফরসা হয় নি। নাগুয়া ব'লে একজন চাকর,—সে তৈরী থাকত। একটা চৌকির উপর তিনি বসলে সে তেল মাখাতে শুরু করত। কেনারাম আর প্রাণনাথ মণ্ডল বলে দুজন তাঁর কর্মচারী, তারা খাতাপত্র তৈরী ক'রে রাখত। লণ্ঠনের আলোর সামনে প্রত্যেকেই তাদের খাতার হিসাবটি, অর্থাৎ পূর্বদিনের আমদানি কেনা-বেচার হিসাব তাঁর সামনে পড়ে যেত; তিনি শুনতেন আর মাঝে মাঝে প্রশ্নোত্তরে যা যা জানবার জেনে নিতেন। টাকার দরকার হ'লে রবিবার যেতে বলতেন আর টাকা জমা দেবার বারও ঐ রবিবারে; তারা ঠিক সময়টা জানত। কখন কখন হঠাৎ রাত্রে তারা বাড়িতে গিয়ে টাকা নিয়ে আসত দেখেছি। যাই হোক হিসাবও দেখা শেষ হ'ত আর তেলমাখাও শেষ হ'ত। তারপর তিনি জলে নামতেন, প্রায়

একঘণ্টা আরামেই স্নান করতেন ; পিতৃপক্ষে তর্পণের সময়ও তিনি ঐ সময়েই তর্পণ করতেন। যখন মাথায় পাটকরা গামছাখানি দিয়ে বাড়ি আসতেন কি সুন্দর দেখাত তাঁর মূর্তি !

তখন সূর্যোদয় হয়েছে কি হয় নি। তার খবরের কাগজ ক'খানি নিয়ে বসতেন। ঠিক নটার সময় ভাত খেতেন, সাড়ে নটার সময় বেরুতেন। তখন ঘোড়ার ট্রাম ছিল, যাতায়াতের ট্রাম ভাড়ার দশটি পয়সা মাত্র সঙ্গে নিয়ে, অফিসের পোষাক পরে, একছিলিম তামাক খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। গয়াপ্রসাদ দারোয়ান ছাতি ধরে নতুন বাজারের নন্দ মল্লিকের গলির মোড় পর্যন্ত সঙ্গে গিয়ে তাঁকে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে আসত, আবার বৈকালে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় সেইখান থেকে নিয়ে আসত। এই ছিল তাঁর নিত্যকর্মের হিসাব। রবিবার বা কোন ছুটির দিন হলে তিনি বৈকালে আমাদের খিড়কির দিকে গলির মোড়ে, গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ির সম্মুখে,—জোড়াপুকুর স্কোয়ারে বেড়াতে যেতেন আমায় সঙ্গে নিয়ে। খোঁড়ার মাঠ বলেই আমরা তখন জানতাম। এই খোঁড়ার মাঠ এখন গিরীশ পার্ক হয়েছে, তার যেখানে এখন নাট্যাচার্য গিরীশ ঘোষের মর্মর-মূর্তি বসেছে, তখন ঠিক তার সামনে ছিল ডোমপাড়ার বস্তি আর চিত্তরঞ্জন এভিনিউ তখন ছিল জোড়াপুকুর স্কোয়ার লেন মাত্র। সেখানে পথের ধারে অনেকগুলি ডোমদের মেয়ে মরদ, ছেলেপুলে বাঁশের চ্যাচাড়ি দিয়ে নানারকমের জিনিসপত্র বুনছে দেখা যেত। এইখানেই প্রসিদ্ধ সানাইওয়ালা বাবুরাম ডোমের ঘর। আমাদের বাড়িতে প্রত্যেক কাজেকর্মে ঐ বাবুরামই সানাই বাজাত। সে ছিল হাজারী মিয়ার সাগরেদ,—তার বাজনা ছিল উঁচুদরের। ঠাকুরদাদা-মশাই তার বাজনাই ভালবাসতেন। দেখেছি, যতদিন সে বেঁচে ছিল আমাদের বাড়িতে আর কারও নহবত হয় নি।

আমি সব সময়েই ঠাকুরদামশাইয়ের কাছে থাকতাম বলেছি। যখন কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, যতদিন আমাদের

বাইরে উপরের বৈঠকখানা হয় নি, তিনি সকলকেই তাঁর নিজের ঘরে আনিয়ে আলাপ করতেন। কেবল সাহেব-সুবো এলে তিনি ঐ খাটো ধুতি পরেই বাইরে যেতেন। রাধাচরণ পাল অনেকবারই এসেছেন, অমরেন্দ্র চাটুজ্যে, অক্ষয় ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই আসতেন তাঁর কাছে। তাঁরা এলে তিনি আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠতেন। যত্ন ক'রে কাছে বসিয়ে নানা বিষয় আলোচনা করতেন। তাঁদের সঙ্গে এই সব বিষয়ে আলাপ করতে তাঁর যে আনন্দ দেখেছি সে রকম আর কোন সময়েই দেখি নি। তখন ছোট হ'লেও আমি সারাক্ষণ চুপ ক'রে তাঁর কাছেই থাকতাম, তাঁদের কথা বোধহয় প্রত্যেকটি শুনতাম। কোথাও যেতাম না, আমার খিদে-তেষ্টাও মনে থাকত না। তাঁর কাছেই আমি তখন গ্ল্যাডস্টোনের নাম শুনি। তিনি গ্ল্যাডস্টোনের ভক্ত ছিলেন। কাগজে বিলাতের খবর যা বেরুত, তখনকার প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনের বক্তৃতা, আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শুনেছি—তাঁর মতো বক্তা নাকি ইংলণ্ডে আর কেউ ছিল না। কত ছোট ছোট গল্প তিনি বলতেন ঐ বিরাট মানুষটির সম্বন্ধে। কুইনের কথা আর ঐ গ্ল্যাডস্টোনের কথা তিনি যে কি উৎসাহে আলোচনা করতেন না শুনলে কেউ বুঝতে পারবে না যে তাতে কি আনন্দ তিনি পেতেন।

অমরেন্দ্র চাটুজ্যে অনেকবার কমিশনার হয়েছিলেন আমাদের ৬নং ওয়ার্ডের। সেই সম্পর্কে তিনি অনেকবারই এসেছিলেন। তিনি এলেই এডিসনের প্রসঙ্গ আলোচনা আরম্ভ হ'ত, তার পর এডিসনের স্পেকটেটার থেকে কত কত কথা উদ্ধৃত ক'রে দুইজনেই মত্ত হয়ে উঠতেন। একবার এলে তিনি দু'ঘণ্টার আগে উঠতে পারতেন না। বরাবরই দেখেছি তাঁদের আলোচনা আরম্ভ হ'ত কুইন আর গ্ল্যাডস্টোনের কথা নিয়ে—আর শেষ হ'ত তখনকার ভাইসরয়, লেফটেনাণ্ট গভর্নরদের কর্মধারা নিয়ে। সবশেষে হাইকোর্টের চিফজাস্টিস স্যার বার্নেস পিককের কথা ও কাহিনীতে।

আমি যে ছোট একটি ন' বছরের ছেলে আমার তখন তা মনে হ'ত না। মোটকথা আমি যে কি রস পেতাম তার মধ্যে তা জানি না কিন্তু আমি তাঁর পাশে তাদেরই একজন হয়ে তাঁদের আলোচনা শুনতাম অবাক হয়ে। তাঁদের উৎসাহের ছোঁয়াচ আমার মধ্যে লাগত আর আমায়ও উৎসাহিত্ ক'রে তুলত। কখনও কখনও আমার উপর তাঁদের দৃষ্টি যে পড়ত না তা নয়, একবার হয়ত ওঠবার সময়—শেষে অমরেন্দ্র চাটুজ্যেমশাই বললেন—তাইত—মহবাবু, তোমার এই নাতিটি ত বেশ দেখচি, এতক্ষণ বসে বসে এই সব শুনেছে? ঠাকুরদাদমশাই প্রফুল্ল মুখে আমার লজ্জিত, নতমুখের দিকে চেয়ে বলতেন,—হাঁ, ও ঐ রকম শোনে সব, ঠিক যেন ও কতই বুঝেচে! এইভাবে তাঁর সদালোচনার সঙ্গী যাঁরা তাঁদের সকলকারই পরিচিত হয়ে ছিলাম। সেই সঙ্গী, ব্যতীত কখন কখনও অন্য লোকের সঙ্গেও তাঁর আলোচনা চলত।

এই সময় ঠাকুরদাদামশাইয়ের একবার লো-রেমিটেণ্ট ফিভার হয়েছিল। তাতে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ম্যাক'ওলেনকে ডাকা হয়। লম্বা শরীর, প্রশান্ত মুখখানি তাঁর, তিনি এসে রোগীর পাশে চেয়ারে যখন বসলেন;—ঠাকুরদাদার মুখে এমনিই একটি প্রফুল্ল ভাব ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন একটি সুন্দর ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করলেন, ডাক্তার তাই শুনে প্রীত হলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের হাওয়াটা যেন প্রফুল্লতায় ভরে উঠল। অল্পক্ষণ রোগ সম্বন্ধে কথা নয়, অন্য কথা চলল।

আমার যখন আরও একটু জ্ঞান হ'ল,—তাঁদের বড় বড় কথার মধ্যে কিছু কিছু ভাব যেন ধরতে পারছি মনে হ'ত। তখন থেকেই দেখতাম যে, ঐ সময়কার লেখাপড়া জানা লোকদের পরস্পর দেখাশুনা হলেই তাঁদের অধিগত বিদ্যার পরিচয় দিতে হ'ত আর সে পরিচয়ের রীতিই হ'ল, সেই সময়োপযোগী কোন ভাব, ইংরাজী বড় কবির উক্তি বা নাটক বা কাব্য থেকে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া।

আমাদের সময়ে, ও রীতির পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু ঐ পুরোনো রীতিটির মধ্যে একটা জিনিস বড় সুন্দর ছিল,—সেটা তখনকার শিক্ষিত ভদ্রসমাজের মানুষ যাঁরা তাঁদের সরলতাপূর্ণ আবৃত্তিগুলি!

বড় কাকার নাম নরেন, আর ছোট কাকার নাম নগেন। বাবা ও জেঠামশাই তখন মুরুব্বি, তাঁরা বড়র দলে, নরেন ও নগেন এই তুটি ছিল বড় ছেলেদের মধ্যে। তুজনেই সুদর্শন, তুজনেই সৌখীন, ভবিষ্যতের বাবু প্রকৃতির আভাষ তাঁদের তুজনের মধ্যেই বর্তমানেই বেশ-প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট ছিল। বাড়ির পিসিরা, কর্তারা সকলেই সেকথা প্রসন্নমনে উল্লেখ ক'রে যেন গৌরব বোধ করতেন।

নরেন্দ্র, বড় কাকা ছিলেন যথার্থই রূপবান, আমাদের বংশে। নিকট, দূর সকল আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যেই তার রূপের খ্যাতি ছিল। চোখ তুটি একটু কটা ছিল, নাহলে নাকি নিখুঁত সুন্দর। লেখাপড়া আমাদের বংশে ঠাকুরদাদাদের পরে তাঁদের সাক্ষাৎ বংশধরগণের মধ্যে অর্থাৎ তাঁদের তুই ভায়ের চারিটি ছেলের কারও পরিচয় দেবার মতো বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। বাবার কথা আগেই বলেছি—জেঠামশায়েরও তাই, নরেন্দ্র বড় কাকা তারও তাই। তবে তিনি এখনও পড়ছেন, আর সকলে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন।

এখন বড় কাকা অসুখ থেকে উঠে সম্পূর্ণ নীরোগ হতেই জেঠামশাই তাঁর এগার-বারো বছরের ছেলেটিকে নিয়ে এলাহাবাদে চলে গেলেন। সেইখানেই তিনি কাজ করতেন। তাঁর ওখানকার কাজের একটু পরিচয় দেবার আছে। এলাহাবাদের বিখ্যাত ডাক্তার অবিনাশ বাঁড়ুয্যে তাঁর আপন মাসতুত ভাই। আমরা তাঁকে ডাক্তার জেঠামশাই বলেই ডাকতাম, যখন তিনি আমাদের বাড়িতে আসতেন। প্রথমে নাকি ডাক্তারী পাস করবার পর তাঁর অবস্থা ভাল ছিল না।

তাঁদের মামা বেচারাম রায়চৌধুরীমশাই, ঠিক ঋষির মতোই তাঁর অপরূপ মূর্তি। পেনেটিতেই তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি। বিখ্যাত

সাবর্ণ চৌধুরী বংশ ওখানকার দশে গণ্যমান্য। তাঁর কিছু পুঁজি ছিল ;—রিটায়ার করবার পর তিনি এলাহাবাদে থাকবার জন্য যান। মামার সেই মূলধন, আর ভাগনে অবিনাশের ডাক্তারীতে পসার এই দুইয়ের যোগাযোগে, সাবর্ণ কোম্পানির— 'কলভিন মেডিকেল হল' নামে একটি বেশ বড় ডিসপেনসারি গড়ে উঠল। জেঠামশাই তখন অনেক দিনই পড়া ছেড়ে ঘরে বসে আছেন, মামা তাঁকেই হেড কম্পাউণ্ডার হিসাবে নিযুক্ত করেন। ডাক্তার ভাগনের খ্যাতি প্রসার ও প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য কারবারটা সেখানে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

মাঝে মাঝে বেচু দাদামশাই, কখনও কখনও তাঁর ছেলেরা আমাদের বাড়িতে আসতেন। আমার ঠাকুরদাদা ও তিনি, এই বৃদ্ধ দাদামশাই দুটি এক সঙ্গে বসে যখন আলাপ করতেন আমার সেটা বড় আকর্ষণের বিষয় ছিল। একজন ঋষি তুল্য মূর্তি— অপরটি কলিকাতা শহরবাসী প্রবীণ গৃহস্থ—সম্ভ্রমপূর্ণ বাবু মূর্তির অপূর্ব যোগাযোগ। ডাঃ অবিনাশ জেঠামশাই এলেই বাড়িতে বাবা, কাকাবাবুদের মধ্যে, অবিনাশ দাদা এসেছে, বেশ ধুমধাম পড়ে যেত। সে উৎসাহের মূল কারণ ডাঃ জেঠামশাই খাওয়া-দাওয়ার জন্য ফিস্ট বাবদে বেশ কিছু খরচ করতেন। তিনি মাঝে মাঝে তখন কালীকেষ্ট ঠাকুরের বাড়িতেই আসতেন এবং তারই অতিথি হতেন।

জেঠামশায়ের মুখেই শুনেছি, প্রথমে যখন অবিনাশ ডাক্তার-মশাই এলাহাবাদে যান তখন তাঁর নাকি অবস্থা ভাল ছিল না। সেখানে তখন রামলাল চক্রবর্তী—সরকারী ডাক্তারের বিশাল প্রতিপত্তি। কোন একটা বিশেষ, গুরুতর কারণে, ব্যাপার এমনই দাঁড়াল যাতে, রামলাল ডাক্তারকে ওখান থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যেতে হয়। তিনি লক্নৌ চলে যান। তখন থেকেই আমাদের অবিনাশ ডাক্তার জেঠামশাইয়ের অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'ল। তাঁর ভাগ্য

পরিবর্তনের সম্বন্ধে আর একটা কথাও শুনেছি। দরিয়া সা বলে একটি সিদ্ধ যোগী বা ফকির তখন এলাহাবাদে ছিলেন। অবিনাশ শুনেছিলেন তিনি বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ,—যাকে যা বলেন তার তাই হয়। কোন রকমে তাঁর আশীর্বাদ পেলে তাঁর অবস্থা ফিরে যাবে। বড় কষ্টে পড়ে একদিন এক সুযোগে নিরালায়, ফকির দরিয়া সাকে পেয়ে অবিনাশ ডাক্তার একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে ধরেন, বাবা, হামকো কৃপা করো। তাতে দরিয়া সা প্রসন্ন হয়ে,—যা বাচ্চা! তু ধুলী মুষ্ঠী ধরোগে বো সোনে মুষ্ঠী হো যায় গা, বলেছিলেন। এই মহাপুরুষের আশীর্বচনেই পরে অবিনাশ ডাক্তার মহাধনবান হয়েছিলেন।

এগারো

তখন জেঠামহাশয় এলাহাবাদে থাকতেন। এবারে জোড়া-সাঁকোতে এসে বাবুয়াকে দেখতে পাই নি, বাবাও হাইকোর্টে কাজ করতেন। ছোট কাকা আর্যমিশনে ফোর্থ ক্লাসে উঠেছেন। এমনি যখন ব্যাপার ১৮৯৪ সালে এই জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় দিনে বাবা আমায় আর্যমিশনে ভর্তি করে দিলেন। পরীক্ষা করে তাঁরা আমাকে নাইন্থ ক্লাসের 'এ' সেকশনে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। শুধুই যে ছোট কাকাবাবু ওখানে পড়তেন বলেই আমায় আর্য-মিশনে ভর্তি করা হয়েছিল তা নয়। আর্যমিশন তখনকার দিনে একটি বড় স্কুল বলে প্রসিদ্ধ হয়েছিল সেজন্যও বটে তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে স্কুলের আরও একটু গভীর সম্বন্ধ ছিল। সম্বন্ধ যাকে নিয়ে ঐ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চানন ভট্টাচার্য সকলকারই তিনি হলেন—ঠাকুরমশাই। তিনি ছিলেন ঠাকুমার পিসতুত ভাই, আর

প্রিয়নাথ বন্দ্যোঃ ছিলেন রেকটার তিনিও ঠাকুরমার খুড়তুত ভাই। বেলঘরে, নিমতে ছিল তাঁদের বাড়ি। ছোট কাকাবাবু, তাঁদের পাঁচু মামা ও প্রিয় মামা বলেই ডাকতেন, আমি ঠাকুরমশাই বলেই ডাকতাম। স্কুলে দেখা হলে আমায় বলতেন, ওহে রাজপুত্র তুমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করবে কবে? আমি রাজপুত্র যেহেতু আমার বাবার নাম রাজা।

পঞ্চানন ভট্টাচার্যমশাই আর এক দিকেও একজন মহৎ ব্যক্তি। তিনি বিখ্যাত যোগী, কাশীর শ্যামাচরণ লাহিড়ীমশাইয়ের প্রিয় শিষ্য। আর্যমিশনের আফিস-ঘরে ঠাকুরমশাইয়ের যেখানে বসবার প্রকাণ্ড গদিআঁটা চেয়ার, তার পিছনে মাথার উপর দেয়ালের একদিকে শ্যামাচরণ লাহিড়ী অপরদিকে ঠাকুরমশাইয়ের নিজের পদ্মাসনে বসা ছুখানি রঙিন ফটো ছবি ছিল। সে ছবির বৈশিষ্ট্য এই যে ছুজনেরই চোখ খোলা নয় আর একেবারে বোজাও নয়। কেমন একরকমের মিটমিটি চাউনি। পরে শুনেছিলাম ঐরকম ভাবে দৃষ্টিকে সংহত করেই নাকি তাঁরা কুটস্থ হয়ে থাকেন, আর সেইভাবে আত্মজ্যোতি দর্শন করেন। ইনি গুরুর কাছ থেকে অনেকগুলি কঠিন রোগের ঔষধ পেয়েছেন, তার প্রচারও কম নয়। বিকালে স্কুলের ছুটি হয়ে গেলে বাইরে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চি পড়ত। সেইখানেই তিনি বসে অনেকগুলি রোগী দেখতেন এবং ঔষধ ব্যবস্থা করতেন। তাঁর অবধৌতিক মতের চিকিৎসা তখনকার দিনে চারিদিকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বর্তমান ধন-ভাণ্ডার সকল পরিচিত ব্যক্তিবর্গের লক্ষ্যের বিষয়ও হয়ে উঠেছিল।

পল্লীগ্রামের খড়ছাওয়া, মাঠের ধারে বাগানের ভিতর ছোট্ট পাঠশালা থেকে এসে যেদিন ভর্তি হলাম, সেই বিশাল তিনতলা বাড়ি দেখে প্রাণে গুরু-গম্ভীর আনন্দ ও ভয় মিশিয়ে একটা অনির্বচনীয় ভাবের আলোড়ন শুরু হয়ে গেল আমার মধ্যে। এখানে সবই প্রকাণ্ড, সকল দ্রব্যই প্রচুর। প্রত্যেক দেয়ালের

উপর দিকে সাদা রঙের টিনের পাতের উপর কালো কালিতে বেশ বড় বড় ছাপার হরপে কত কত নীতি উপদেশ,—শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করে কত লেখা নীচের একতলা থেকে উপরে ত্রিতলে সেই ফার্স্ট-ক্লাসের হল পর্যন্ত ভরা। দুই-তিন দিনেই সেগুলি সব মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। কোন প্লেটে, সত্ত্ব, রজ, তম, প্রকৃতির এই তিনটি গুণ, সত্ত্ব গুণই সর্বশ্রেষ্ঠ লেখা, সত্যাশ্রয়ী না হইলে মানুষ জ্ঞানের অধিকারী হয় না,—সত্য আলোক,—মিথ্যা অন্ধকার,—জীবে দয়া সত্ত্বগুণ হইতে। পিতা মাতার প্রতি ভক্তিমান সন্তান, কখনো দুঃখ পায় না। আবার কোথাও, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ইত্যাদি আবার তার পাশেই একটিতে পিত্যুরপধিকা মাতা, গর্ভধারণপোষণ অতোহি ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মাতৃ সম গুরু। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী এই সব। এমন কি যেখানে ছেলেরা বাইরে যায় সেখানেও নীতি কথা,—দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা, লেখা আছে। সুমুখেই যাতে সকলের চোখে পড়ে—এমন স্থানে দেয়ালে মারা আছে।

আর্যমিশনের তখন বড় গৌরবের সময়। এর কিছুদিন পরেই কলেজ বিভাগ খোলা হয়েছিল। কলেজ হবার আগে যখন আমি ভর্তি হই, তখন পঞ্চানন ভট্টাচার্য ঠাকুরমশাই ছিলেন একমাত্র স্বত্বাধিকারী, প্রিয়নাথ বাঁড়ুয্যে রেক্টার; হরিদাস দত্ত ট্রেজারার, রামদয়াল মজুমদার মশাই হেডমাস্টার—প্রসাদদাস বসু সেক্রেটারী। আর লোয়ার ও হায়ার ক্লাসের সমস্ত শিক্ষকই ভাল, তার মধ্যে ত্রিগুণাবাবু ও রামত্রাহী চক্রবর্তী,—মহেন্দ্রবাবু,—ননীবাবু (অঙ্ক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাইন্থ ক্লাসের ফার্স্ট বুক আর চাণক্য শ্লোক এই দুইটি আমার পক্ষে নূতন। আর অঙ্ক হ'ত ইংরেজীতে। এইখানে আমি যে কয়টি বন্ধু পেলাম তার মধ্যে তারকনাথ দাস। এখন তার ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও সে একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান কর্মী মানুষ,

ভারতের একটি সুসন্তান। এখন ইণ্টারন্যাশান্যাল পলিটিক্‌সএর প্রফেসার, আমেরিকা এবং জার্মানী। থাক সে কথা এখন, আমার প্রথম প্রথম ক্লাসে একটু ভয় করত, সেটা তারক বুঝেছিল, মামার বাড়ির পাঠশালা থেকেই এখানে এসে উঠেছি তাদের সঙ্গে—আলাপ প্রসঙ্গে তা·সে জেনেছিল। তাই প্রথম থেকেই তারক আর আমি কাছাকাছি বসতাম,—সে যে আমার বন্ধু একথা যেন প্রথমেই ঠিক মনে মনে টের পেয়েছিলাম। আরও একটা ব্যাপারে তারকের গুণগ্রাহিতার পরিচয় পেয়ে আমি তার প্রীতিতে বাঁধা পড়েছিলাম। সেটা আমাদের হাতের ইংরেজী ও বাংলা লেখা। আমাদের হ্যাণ্ড রাইটিং দেখে একদিন আমাদের টিচার উপেনবাবু সকলকে জোর গলায় জানিয়ে দিলেন তোমরা হাতের লেখার বেলা কেউ যত্ন করো না, এ ক্লাসের এদের তুজনের লেখা তোমাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত। সেদিন ছুটির পর সকলে চলে গেল যখন তারক আর আমি ছিলাম;—তারক বললে, দেখ প্রমোদ, আমরা তুজনেই ক্লাসে অন্তত এই লেখার বিষয়ে একই মন্তব্য পেয়েছি, আজ থেকে আমরা এক হয়েই থাকব, ব'লে আমার হাতখানা ধরে আনন্দে হ্যাণ্ড্‌সেক করলে। তারপর,—দেখি একবার তোমার খাতাটা, ব'লে আমার খাতাটা খুলে দেখল, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাতাখানাও খুলে আজকের লেখাটা বার করে ফেললে। আমার মধ্যে তুটি ভুল বা কাটা ছিল, তার মধ্যে একটা মাত্র, এটাও মিলিয়ে দেখা গেল। দেখা শেষ হয়ে গেলে আমরা তুজনে প্রফুল্ল অন্তরে যে যার স্থানে চলে গেলাম। এইভাবে আর্যমিশনে প্রবেশ করে প্রথম তারককেই বন্ধু পেলাম। বয়স আমার তখন নয় বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। তারকেরও বোধহয় তাই।

আরও একজনের কথা না বলে থাকতে পারব না। তার নাম ছিল সত্যকিঙ্কর দত্ত। আমাদের চেয়ে তিন চার বছরের বড় হবে, জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ দোয়ারী ময়রার নাতি, না কে যেন হ'ত।

অতবড় ধেড়ে ছেলে আমাদের ক্লাসে আর একজনও ছিল না ; সে আর কোন বিষয়েই ভাল ছিল না, এক অঙ্ক ব্যতীত। ক্লাসে যে অঙ্কগুলি কষতে হবে সেগুলি প্রথমে ব্ল্যাক বোর্ডে খড়িতে লিখে দেওয়া হ'ত। বোর্ডে অঙ্কগুলি লিখে দেওয়া সম্পূর্ণ হলে তখন আমরা টুকে নিয়ে কষতে আরম্ভ করতাম। সত্যকিঙ্কর যা করত তাতে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। উপেনবাবুর অঙ্ক লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্কগুলি সব কষা ত হয়ে যেতই, নাম লেখা পর্যন্ত শেষ করে সেইই প্রথমে টেবিলের উপর শ্লেট রাখত। আমি শত চেষ্টা করে কখনও তাকে এগিয়ে যেতে পারি নি, তারকও পারে নি। আরও চমৎকার কথা এই যে তার একটা অঙ্কও ভুল যেত না কখনও।

স্কুলে যেতে কি আনন্দ ছিল আমার। ছোট কাকাবাবু আর আমি একই স্কুলে পড়তাম, দারোয়ান গয়াপ্রসাদ আমাদের বই নিয়ে সঙ্গে যেত পৌঁছাতে, আবার চারটের সময় নিয়ে আসত। জোড়াসাঁকোর বাড়ির বড় কড়া নিয়ম ছিল। একলা কোনও ছেলের বাড়ির চৌকাঠ পার হবার হুকুম ছিল না। সেইজন্য, যেখানেই আমরা যেতাম সঙ্গে পেয়াদা ঐ দারোয়ান গয়াপ্রসাদ তুবে, পিছনে পিছনে চলত।

আমাদের পাড়ায় বসাকদের বড় বাড়ির নিচের তলায় একটা মেয়েদের ফ্রি স্কুল ছিল ; সেটা ক্রীশ্চান মিশনারীদের। আমাদের দুর্গাদিদি সেই স্কুলে পড়ত। ফ্রি স্কুলের ছাত্রীরা সবাই পুতুল প্রাইজ পেত। আমার পরেই যে ভগিনী তার নাম অন্নপূর্ণা, ডাক নাম ছিল চোখী, তার বাবার মতো প্রকাণ্ড বড় বড় চোখ ছিল ব'লে। তার ইচ্ছা দুর্গাদিদির সঙ্গে সেও স্কুলে যায়। বাবা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। মেয়েমানুষ আবার লেখাপড়া শিখবে কি ? এখনকার দিনে মনে করতেও সঙ্কোচ হয় বাবার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল।

বৈশাখ মাসের প্রথমে যখন কিছু দিন মর্নিং স্কুল হ'ল সে কি আনন্দ সকালে স্কুলে যাবার। তার পর গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি গেলাম। ঐ সময়ে সেজমামা এসেছে লক্নৌ থেকে, ন'মামাও এল কলকাতা থেকে।

আমার মায়েরা তিনটি বোন,—ছুটি বড় বৈমাত্রেয় বোন, মোক্ষদা ও সারদা, তাঁদের আমি আপন বড় মাসি বলেই জানতাম। অনেকটা বড় হ'লে টের পেয়েছিলাম যে তাঁরা বৈমাত্রেয় বোন। বড় মাসিমা আর বড় মেসোমশাই কাশীবাসী হয়েছিলেন আর মেজো সারদা মাসিমার স্বামী বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লক্নৌ সেক্রেটারিয়েটে,—পি, ডবলিউ ডি-তে কাজ করতেন, মোটা মাইনে পেতেন। লক্নৌ-এর প্রসিদ্ধ রামলাল ডাক্তার মামাদের বন্ধু ছিলেন, সেজমামা সেখানে থেকেই লেখাপড়া করতেন। আর ন'মামা থাকতেন বৌবাজারে মতিলালদের বাড়ি। ৺ বিশ্বনাথ মতিলালের, কনিষ্ঠ পৌত্র আমাদের ছোট মেসোমশাই ;—দিদিমার ছোট বোন, তাঁদের মাসি। সেখান থেকেই ন'মামার পড়াশুনার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমিও মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকতাম। মামার বাড়ি ছাড়া আমার বাল্যকালের একটি বড় সুখের কাল ঐ মতিলালদের বাড়িতেই ছিল। কারণ ওখানে সবাই আমায় ভালবাসত। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই একত্র হলাম, আনন্দের হাট বসে গেল মামার বাড়িতে।

সেজমামা আর ন'মামা লম্বায় একটু খাটো হলেও দু'জনেই জিমন্যাস্টিক করতেন ; কি সুন্দর তাদের শরীরের শ্রী, দেখলে আমার মনে আনন্দের ঝড় বইত কারণ আমি ছিলাম রোগা। সেজমামার ঝোঁক চাপল এখানে গোলাবাড়িতে কুস্তির আখড়া হবে। প্যারালাল-বার পোঁতা হ'ল। খানিকটা চৌকো জায়গা তৈরি করা হ'ল কুস্তির জন্যে। তেল ঢেলে সেই জায়গার মাটি উত্তম মসৃণ করা হ'ল,—সারা সকালবেলা দশটা পর্যন্ত ব্যায়াম

চর্চা করে তারপর অন্য কাজ। খাওয়ার নানা রকম ফরমাস—সকালে ভিজে কল বার করা ছোলা, পেস্তা, বাদাম, খেজুর প্রভৃতি, —আর তিনবার করে দুধ। বিকালে ঘিয়ে ভাজা কত রকমের খাদ্য—মাংস ডিম এই সব হিসাবমতো খাওয়ার ব্যবস্থা। আমায় মোটা করে ছাড়বেন—এই ছিল সেজমামার উদ্দেশ্য। জোড়াসাঁকোয় আমরা ভালরকম খেতে পাই না এটা এখানকার সবারই জানা কথা।

দুপুরবেলা কিন্তু আমি একটু ফাঁক খুজতাম, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাশুনা আছে। তাদের কারো কারো বাড়িতে গিয়ে দোলায় বসা, চোর চোর খেলা, আম পাড়া ইত্যাদি। ৺বাঁড়ুয্যেদের ছেলে নলিন,—ডাকনাম নলে,—মাঝের বাড়ির দোলেন, এই সব সহপাঠীদের সঙ্গে প্রীতি বা সম্বন্ধ বজায় রাখা, এসব না হলে শুধু জিমন্যাস্টিক করে আর পেস্তা বাদাম খেয়ে আমার চলবে না। সেজমামা আবার এমন কড়া দৃষ্টি রেখেছেন যে কোথাও যেতে দেবেন না। ফাঁক খুঁজে কোথাও একটু গিয়েছি—কেমন করে জানি না, ঠিক ধরেছেন।

এই কোথা গিয়েছিলি? সন্তোষজনক উত্তর না পেলেই আর কোন কথা নেই, মার আরম্ভ হয়ে যাবে। তাঁর রাগ বড় ভীষণ,—একেবারে বাবার দোসর বললেও হয়। একদিন দিদিমা, সহ্য করতে না পেরে বললেন, একেবারেই ওকে মেরে ফ্যাল, আপদ চুকে যাক্। সেখানে বাপের কাছে মার খাবে, দু'দিনের জন্যে এখানে এসেও আবার মার খেয়ে মরবে? ওর বেঁচে সুখ কি? একথা ঠিক অবশ্য মারের ভয়ে আমি পুরোনো সঙ্গীদের ভুলি নি। বরং আরও একধাপ এগিয়ে ছিলাম তাদের সঙ্গে।

পূব পাড়ায় কুমোরদের বাড়ি, রামচাঁদ কুমোর যখন দুপুরবেলা বিশ্রাম করত খাওয়া-দাওয়ার পর,—তখন, নলে, দোলেন প্রভৃতি গিয়ে তার চালার একপাশে কিংবা দাওয়ার উপর যেখানে

সে মাটির কলসীগুলি গড়ে আগুনে পোড়াবার আগে শুকোতে দিয়েছে, তারই পাশে তামাক খাওয়ার আড্ডা জমাত। কড়িবাঁধা বামনদের একটা হুঁকো থাকত সেখানে, আমিও হাজির দিতাম। কোনদিন বা মোড়লদের বাড়ি, নিরোর সঙ্গে তাদের দাওয়ায়; সে না থাকলে তাদের অন্দরে গিয়ে দোলায় বসা, মাঝে মাঝে চলত। এইভাবে ক্রমে ছুটি ফুরিয়ে এলো। সেজমামার বেশীদিন ছুটি, আমি আর ন'মামা একসঙ্গে যেদিন ওখান থেকে আসব—তার আগের দিন রাত্রে রামচাঁদ পালের সর্বনাশ হয়ে গেল।

রামচাঁদের একমাত্র ছেলে, প্রায় বত্রিশ বছর হবে বয়স—কি হৃষ্টপুষ্ট বলবান চেহারা, তার নাম ভুতো পাল। ওখানে কুমোরদের উপাধি পাল,—রামচাঁদ পাল, ভুতো পাল এই রকম ভাবেই তাদের ডাকা হ'ত।

তখনও আমাদের খাওয়া হয় নি,—নিবারণ ছুটে এসে খবর দিলে ভুতো পালকে সাপে কামড়েছে। তখনই মেজমামা, সেজ-মামা, ন'মামা, আরও সব কত কে চলল;— নিবারণ লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে,—আর আমি কোঁচার কাপড়টা গায়ে দিয়ে সকলকার পিছনে—পাছে সেজমামা দেখতে পান, কারণ দেখতে পেলে বাড়ি ফিরতেই হবে জানতাম, তাই নিঃশব্দে সকলের পিছনে অন্ধকারে চলেছি।

গিয়ে দেখি ভুতো গোঁ গোঁ করছে—একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কব্জির উপরে একটা, উপর হাতে একটা, এই দু'টা বাঁধা,—ফুলেছে। সেই হাতেই কামড়েছে। রামচাঁদ বুড়ো মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। বাবুরা যেতেই জোড়হাতে প্রণাম ক'রে ভেউভেউ ক'রে কেঁদে উঠল। সন্ধ্যাবেলা জাল নিয়ে ভুতো তাদের খিড়কির দিকে ডোবাটায় জাল ফেলেছিল। এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে সে যখন আস্তে আস্তে জলের ভিতরে জাল টানছিল, তখনই ডান হাতের কব্জির উপর কামড়েছে। তাড়াতাড়ি সে উঠে এসে বাপকে

ডাক দিয়েই জালটা ফেলে, সেই জালের দড়ি দিয়েই তার হাতটা বেঁধে দিতে বললে। বাপ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ রোগা দুর্বল। তার উপর ভুতো যখন বললে, বোধ হয় কেউটে। এই শুনেই সে থরথর ক'রে কেঁপে বসে পড়ল। লোকজন আশপাশ থেকে এসে যখন তার হাত বাঁধলে, তখন সে শুয়ে শুয়েই জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, কাটা-ছাগলের মতো ছট্‌ফট্‌ করছিল। কতক্ষণ কে জানে দয়ারামপুরে রোজা ডাকতে গেছে—এখনও এসে পোঁছায় নি। এখন ভুতো আর ছট্‌ফট্‌ করছে না ধীরে ধীরে এক একবার ওঁ ওঁ করছে। ভিতরে তাঁর বৌ রান্না ফেলে ছোট ছেলেটাকে কোলে নিয়ে কাঁদছে।

একছিলিম তামাক সাজ দিকি—ব'লে মেজমামা উবু হয়ে বসলেন। সেজমামা রেগে উঠে, মেজদা', এখানেও তোমার তামাক না হলে চলে না? ব'লে একবার রোষকষায়িত নেত্রে মেজমামার দিকে চাইতেই, একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে, তাতে হয়েচে কি, এখন এখানে ত থাকতে হবে,—ব'লে মেজমামা, বসলেন। কতক্ষণ গেছে রোজা ডাকতে জিজ্ঞাসা করলেন। একজন বললে, এই কতক্ষণ গেছে, এতক্ষণ পৌঁছে থাকবে। দয়ারামপুর প্রায় দেড় মাইল লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে।

এদিকে ভুতো ক্রমশ চুপ করল, আর স্থির হয়ে এল। তখন সেখানে কেউটে, গোখরো প্রভৃতি নানা প্রকার সাপের নাম হ'তে লাগল। কি সাপে কামড়েছে তার অনুমান চলতে লাগল। আমি একটু ভাল করে দেখতে মুখটা বাড়িয়েছি, সেজমামার নজরে পড়ে গেলাম। তুই কেন এখানে, কে আসতে বলেছে তোকে—ব'লে নিবারণের সঙ্গে তখনি আমায় পাঠিয়ে দিলেন বাড়িতে। সঙ্গে ন'মামাকেও আসতে হ'ল। পথে ন'মামা বলল—বিষ মাথায় চড়ে গেছে আর ও বাঁচবে না। কালো হয়ে গেছে সর্বশরীর, দেখলি না? সত্যি—যখন আমি দেখলাম, কালো হয়ে এসেছে তার শরীর। ওরা তাকে বলছে নীল। এইটিই নাকি কেউটে সাপের

কামড়ানোর লক্ষণ। একঘণ্টার মধ্যে ভুতো কালো হয়ে—একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল, দেখে আমরা ফিরে এলাম। সেরাত্রে আর খাওয়া-দাওয়া কিছুই হ'ল না। ভুতোর সেই ভরাট মুখখানা,—কালো গোঁফ, তিন-চারদিন না কামালে যেমন অল্প অল্প দাড়ি বেরোয়—সেই রকম মুখখানা, কেবলই সুমুখে ভেসে উঠতে লাগল। ভুতো মারা গেল,—আর বুড়ো রামচাঁদ,—হা ভগবান! আর তার কেউ নেই, ঐ ভুতোর ছোট ছোট দু-তিনটি অপোগণ্ড শিশু।

গরমের ছুটিতে লক্ষ্মীকান্তপুরে এবার যা দেখে এলাম বালক হলেও তাতে আমার জীবনের মধ্যে বেশ একটু নাড়া পেলাম! সংসারের বিকট রূপ ফুটে উঠেছিল। জোড়াসাঁকোতে ফিরে এসে দেখলাম বাড়িতে একটা বিয়ে লেগেছে। চাঁপদানীর বাবুদের অগ্রণী বেণীবাবু, যিনি রাজকিষণ মুখার্জি, সিপ্‌স ব্যানিয়ান ও টুভিডোরের কাজ চালাচ্ছিলেন তাঁর দুই ছেলের একসঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন। আমার মেজপিসির বড় মেয়ে বিভা, সুন্দরী গৌরী, ছ'বছব বয়স, তাকেই বেণীবাবু তাঁর কীর্তিচন্দ্র নামে মধ্যম পুত্রের জন্য মনোনীত করেছেন। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হ'ল। আমাদের ভগিনীপতিটি হ'ল বারো বৎসরের বালক একটি, আমাদের সঙ্গে মিলল ভাল। গত বৎসর সবে তার পৈতে হয়েছে, আমাদের কারো তখন হয় নি।

দাদামশাই তাকে শিবুদিদি ব'লে ডাকতেন। বিয়ের পরদিন যখন বর-কন্যা বিদায় হচ্ছে তখন ঠাকুরদাদামশাই জিজ্ঞাসা করলেন,—শিবুদিদি তুমি শ্বশুরবাড়ি চললে ভাই। সে ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

বারো

আগে থেকেই দেখছি আমাদের অর্থাৎ বাবার সংসারে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। আমাদের সংসার বলতে যদিও সব সংসারটাই ঠাকুরদাদামশাইয়ের কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে খাওয়া-পরার সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়া সব কিছুই প্রত্যেক নিজেদের সংসারের। ঐ বাড়ির বিরাট সংসারের মধ্যে প্রায় পাঁচটা সংসার ছিল—তার মধ্যে, তাঁদের ছেলেমেয়ে স্বামী, স্ত্রী, মা, বোন নিয়ে জেঠামশাইদের একটি বড় সংসার। তারপর প্রত্যেক পিসির ঐ রকম ছেলেমেয়ে নিয়ে আলাদা সংসার, সেই হিসাবেই বাবার ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে আমাদের একটা সংসার। নিত্য দুবেলা সাধারণ খাওয়া ছাড়া ছেলেদের দুধ, জল খাবার আলো ইত্যাদি সব নিয়েই বাবার একটা দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধের কথায় এখানে জেঠামশাই যোগেন্দ্রনাথের ব্যবহার আমাদের ঐ বাড়ির মধ্যে সবার পক্ষেই একটা দেখবার এবং শেখবার বস্তু। শিশুকাল থেকেই দেখে আসছি, এ পর্যন্ত তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠার তুলনা পাই নি। তাঁর আয় ছিল কম, কিন্তু তাঁর মিতাচারের গুণে, প্রয়োজনীয় সকল কিছু সংগ্রহের ব্যাপারে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় তাঁদের সংসারে সব কিছুই পর্যাপ্ত হয়ে উঠত,—কোন দিকেই দৈন্য বা টানাটানি কেউ কখনও দেখে নি। তাঁদেরও ছেলেমেয়ের সংখ্যা আমাদেরই মতো। আর আমাদের অদৃষ্টে বাবা ছিলেন একেবারেই জেঠামশাইয়ের বিপরীত। বাবার স্বভাবে, তাঁর ছেলেমেয়েদের মানুষ করার যে কর্তব্যজ্ঞান বা দায়িত্ববোধ, তাঁর অবহেলায় তারা কষ্ট পাচ্ছে এটা তাঁর লক্ষ্যের বিষয় কখনও ছিল না। সেইজন্য জেঠামশাইয়ের সংসারের ছেলেদের পাশে আমাদের দৈন্য বড় বেশিই চোখে

লাগত। বাবার দিকে চাইলে মনে হ'ত যে মানুষের কর্তব্যবোধ বলে যে একটা কিছু আছে সে বন্ধন থেকে তিনি চিরমুক্ত—তা সন্তান সম্পর্কেই হোক বা স্ত্রী, মা, বাবা যে কোন আত্মীয় হোক না কেন। কর্তব্য, তাঁর খেয়াল কিংবা খুশী মাত্র।

ব্যবহারিক জগতে তাঁর কর্তব্যবোধটি তখনকার দিনে তিনটি বিষয়ে দৃঢ় অর্থাৎ অবিচলিতভাবেই বর্তমান থাকত। প্রথম ও প্রধান তার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী ভোগ,—এমনধারা একধারে মাদকপ্রিয় ও ভোজন-বিলাসী মানুষ কমই দেখা যায়। নেশা তাঁর জীবন সহচর ছিল। পরে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সর্বদা কোনও একটা নেশায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আমাদের বংশের কারো কাছে এ-কথা গোপন ত ছিলই না পরন্তু এখনও অনেকে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর খাওয়ার কথা সগৌরবে প্রচার করে থাকেন। তাঁর দ্বিতীয় কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক দিন কোনরকমে অফিসে উপস্থিত হওয়া। অফিসে সবাই তাঁকে 'লেট লতিফ' বলেই জানত, এর জন্য তাঁর কিছু অগৌরব বোধ হ'ত না। উপরওয়ালা সাহেবরাও শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ব্যাপারটা উপেক্ষার চোখেই দেখতেন। তৃতীয়টি,—তাঁর হাত সচ্ছল থাকলে প্রতি শনিবারে ঘোড়দৌড় আর তা না থাকলে জলের খেলা, তুলোর খেলা ইত্যাদি জুয়ার আরাধনা। তাঁর কর্তব্যবোধ এই তিনটিতে বাঁধা,—বাকি যা কিছু, যা সমাজ সংসারে অপর প্রত্যেকেরই কর্তব্য ব'লে প্রচলিত—তাঁর পক্ষে সে-সব উপেক্ষার বস্তু।

কিন্তু এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, ঝঞ্ঝাট এড়াতে চাইলেই সব সব সময় এড়ানো যায় না। আমায় স্কুলে দিয়েছেন, মাসের শেষে মাইনেটি দিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়,—কিন্তু তা দেওয়া তাঁর নিয়ম নয়। নিয়মিত সকল কিছুই তাঁর অশান্তির কারণ, বিশেষত মাইনেটি। পঞ্চানন ভট্টাচার্যের স্কুলে আমাদের ডিফল্টার হলেও

ফাইন কখনও লাগে নি। কিন্তু তা ব'লে প্রতি মাসে এ রকম করলে চলে কি ? তবে এটা সত্য যে, মাসশেষে মাইনে পাবার কাজ তখন তিনি করতেন না। আমি জানতাম তা, তিনি করতেন ফুরনের কাজ সে কাজ সম্পূর্ণ হলেই পেমেণ্ট। সুতরাং মাস কাবারের পর পাঁচ তারিখে স্কুলের মাইনে চাইতে গেলেই বিপদ। এই সেদিন মাইনে দিলুম না ? এই ব'লে চোখ রাঙিয়ে মারতে আসতেন —এরই মধ্যে আবার মাইনে ?

এখন, সে দিন পুরোনো জমা মাইনেটা দিয়েছেন একথা বলতে গেলেই বিপদ। স্কুলে পড়া যে আমার অদৃষ্টে কত সুখের ছিল তা তখনকার দিনে বাড়ির সবাই জানত। স্কুল থেকে এসে যা কিছু জোটে, খাবার খেয়ে নিয়েই আমার নিত্যকর্ম ছিল সিদ্ধি বাট্‌তে বসা। সপ্তাহের শনিবার ছাড়া সকলবারেই সিদ্ধি ;— শনিবারে প্রায়ই অন্য কিছু এমন জিনিস খেতেন যা আমার বাটবার দরকার হ'ত না। সিদ্ধি বাটার তারিফ ছিল। প্রথমে মরিচ ও মৌরী কতকটা খুব মিহি করে বেটে নিয়ে শেষে সিদ্ধি বেটে সব কিছু প্রস্তুত করে রাখা—যাতে অফিস থেকে এসে নিজের হাতে এক গামলা শরবত তৈরি করে খাওয়ার পক্ষে তাঁর কোনও অসুবিধা না হয়। তারপর তাওয়া দিয়ে বড় এক কলকে তামাক সেজে রাখা এবং অপেক্ষা করা। তিনি প্রায়ই শনিবার ছাড়া ছ'টা নাগাদ অফিস থেকে আসতেন। কাপড় ছেড়ে আমায় পয়সা দিতেন, আমি চিনি আনতাম মুদির দোকান থেকে। তারপর চিনি আনা হলে তা পানা করে সিদ্ধির সঙ্গে কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে তৈরি সম্পূর্ণ হলে তখন আমার কোন কোন দিন ছুটি থাকত—না হলে বাজারে যেতে হ'ত তাঁর ইচ্ছামতো খাদ্যদ্রব্যাদি আনতে। এরকম রোজই। ঘরে কোন ব্যবহার্য বা আহার্য দ্রব্য তাঁর কেনা থাকত না। গরমের দিনে তিনি সিদ্ধি খাবার পরই ছাদে উঠতেন, অবশ্য সেখানেও বিছানাটা করে রাখতে হ'ত।

সাড়ে আটটা ন'টা নাগাদ আমি পড়তে বসতাম। একটা কেরোসিনের লম্প, ভর ভর করে ভুষো উঠে নাকে মুখে ঢুকছে, এই অবস্থায় আমার পড়া চলত। তার মধ্যেও মাঝে গিয়ে তাঁর তামাক সেজে ধরিয়ে গুড়-গুড়িতে বসিয়ে দিয়ে আসতে হ'ত। কলকে বেশি থাকলে তাতে এক সঙ্গে তামাক সেজে রাখা যায়, আমাদের সংসারে তা হবার যো নেই। কখনও একসঙ্গে দুটো কলকে বাবার ছিল না। খেতে আমার ডাক পড়ত যখন প্রায় দশটা—খাওয়া হলেই শোবার যো নেই, বাবার পা টিপতে বসতে হ'ত যতক্ষণ না তাঁর শেষ তামাক খাওয়া বা ভোজন শেষ হয়ে যায়। রাত এগারোটার আগে ত হ'ত না কোনদিন। সকালে উঠেই আবার তাঁকে বাতাস করতে হ'ত বসে বসে, যতক্ষণ না তিনি ঘুম থেকে উঠবেন। তাঁর নিয়ম এই রকমই ছিল, এক কলকে তামাক সেজে, ধরিয়ে, ঠিক ন'টার সময় তাঁকে এই ব'লে ডেকে দেওয়া—যে, এবার উঠুন, ন'টা বেজে গেছে। এই কথাটা জোরে বলাই ছিল নিয়ম যাতে ঘুমটা ভাঙে।

স্কুলের পড়া করি কখন? এই যে আমার দৈনন্দিন জীবনের ফিরিস্তি এর মধ্যে একটুও অতিরঞ্জিত কথা নেই বরং অনেক কম করেই বলা আছে। সকল অত্যাচার বা অনাচারের কথা পিতা-পুত্র সম্পর্কে লেখা যায় না, এ সকল শুনতে কারো রুচিকর হয় না। কিন্তু তবুও কিছু কিছু আমায় লিখতেই হবে কারণ আমার বাল্যজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে তা জড়িত ব'লে। আর তা ছাড়া তাঁর প্রকৃতির মধ্যে এমনই মহৎ, এমনই অদ্ভুত আর একটা দিক আছে আমার মনে হয়, সেইজন্য বিশেষ ক'রে আরও এসব কথা বলা উচিত।

ঠাকুর্দামশাইয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই রাখতে দেন নি বাবা,—তবে তাঁর সকল ব্যবহারই দেখতেন, শুনতেন। তাঁর আমলে ঠাকুরদা সাক্ষী মাত্র ছিলেন। তবে বাবার কাছে যখন গুরুতর প্রহার-ঘায়ে আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছোত তখন ঠাকুরমাকে

পাঠিয়ে দিতেন রক্ষা করতে। তবে তার ফল এই হ'ত—যদি প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সবে প্রহার শুরু করেছেন এমন সময় ঠাকুমা এলে অতৃপ্ত রাগটা বেড়েই যেত তাতে আমায় শাস্তিটা বেশিই পেতে হ'ত— আর শেষাশেষি এলে বরং অল্পক্ষণেই ছেড়ে দিতেন। এখন আমার স্কুলের কাজ বা ডিউটির কথা।

এদিকে বাড়ির ব্যাপার যাই হোক বই হাতে দারোয়ান আমাদের স্কুলে নিয়ে যেত। আবার চারটার সময় নিয়ে আসত। আমি এখন সেভেন্থ ক্লাসে পড়ছি। বেশভূষা অদ্ভুত। জুতা ছিঁড়ে গেলে সারানো, পরে সারানোর অযোগ্য হয়ে গেলে শুধু পায়ে যাওয়া। কারণ পূজার সময় ঠাকুর্দামশাই নূতন একস্যুট জুতো জামা-কাপড় দিতেন। তিনি চাইতেন যে অন্য সময়ে প্রয়োজনমতো ওসকল বাবাই যোগাবেন। বাবার কর্তব্য ত তাই-ই বটে। কিন্তু যেটা পৃথিবীর অন্য সকল বাবারই কর্তব্য আমার বাবার পক্ষে তা ত নয়।

বাবা আমায় পয়সা খরচ করে কিছু দেওয়াটা এড়াতেই চাইতেন। উদ্দেশ্যটা, এ সবও ঠাকুর্দামশাইয়ের ঘাড়ে চাপানো। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, দুজনেই একই কথা মনে করতেন; অর্থাৎ বাবা মনে করতেন যে আমার দুর্গতি দেখলে ঠাকুর্দামশাই না দিয়ে পারবেন না। আবার ঠাকুর্দামশাইও ঠিক ঐ কথাই মনে করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশে আমার দুঃখ অনুভবের প্রতিযোগিতায়, —কেউ পরাজিত হ'তে চাইতেন না। এইভাবে তাঁরা পিতাপুত্রে যখন নিজ নিজ মনোগত উদ্দেশ্য নিয়ে কর্তব্য সাধনে এতটা তৎপর তখন আমার শুধু পা, মলিন বোতামহীন ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়, —অসম্পূর্ণ পাঠাভ্যাস। এইভাবেই স্কুলে যাওয়া চলত আর লাস্ট বেঞ্চে বসা নিত্য কর্ম ছিল। নিত্য প্রেয়ারের পর ক্লাস বসলে প্রথম বেঞ্চের ছেলেরা পড়া বলতে শুরু করত, আমার মনোযোগটা সেইদিকেই থাকত, কাজেই পড়া তৈরি হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়।

এক ঘণ্টা মাত্র সময়,—সুতরাং সকল ছাত্রের পড়া নেওয়ার সুবিধা হ'ত না—প্রথম বেঞ্চে সবার পড়া বলা হয়ে গেল তখন এ বেঞ্চি ও বেঞ্চির কয়েকজনকে, এলোমেলোভাবে আট-দশজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে মাস্টারমশাই নূতন পড়া বুঝিয়ে দিতে লেগে যেতেন। যতটা সম্ভব পড়াটা ঐ সময়েই বুঝে নেওয়া হ'ত—বাকিটা তার পরদিনও ঐভাবেই হ'ত। গোলমাল বাধত অঙ্ক আর জিওগ্রাফির ব্যাপারে, ম্যাপ পয়েন্টের বেলা। জিওগ্রাফির পড়াটা ছাঁকা মুখস্থ ক'রে ফেলতাম ক্লাসেই—অঙ্কটায় মার খেতে লাগলাম। এ মার প্রহার নয়, নিজের ক্ষতিপূরণ করতে না পারাও ত এক রকমের মার খাওয়া, সেটা আমি ভালই বুঝতাম। দেড়টায় যখন টিফিনের ছুটি হ'ত,—তখন পেটে হুতাশন জ্বলছে—অথচ কোন ব্যবস্থাই নেই এ হতভাগ্যের জন্য। চোখের সামনে খাবার খাওয়ার দৃশ্য,—সবাই খাবার খায়, আমার মতো একজনের বাড়ি থেকেও আসে না, আবার কিনে খাবারও সংগতি নেই, হা অদৃষ্ট! বাবাকে তো কখনও এবয়সে এরকম দুঃখ পেতে হয় নি। ঠাকুর্দামশাইয়ের প্রথম প্রিয় সন্তান, স্কুলে তাঁর জন্য পর্যাপ্ত খাবার আর আধ সের দুধ পাঠানো হ'ত—তাঁকে মানুষ করা ঝিয়ের হাতে। ঠাকুমার মুখে একথা অনেকবারই শুনেছি। তবে এটা কি আমার দুষ্টামির দণ্ড? না আর কিছু? এইভাবেই আমার পাঠ্যজীবন চলছে। এর মধ্যে বৈচিত্র্য যে কম ছিল তা নয়।

একদিন রবিবার—আমাদের অন্দরের দালানে বেশ মশগুল সভা বসেছে। দুপুরবেলা প্রায়,—বাড়ির পুরুষ সবাই আছেন; বাবা সবে ঘুম থেকে উঠে বাইরের কাজ সেরে স্নানে যাবার আগে, আমায় এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যেতে হুকুম করে শুধু হুঁকো হাতে আরামে বসে, জেঠামশাই আছেন, ছোট কাকা, বড় কাকা, পিসিরা কেউ কেউ, ঠাকুরমা, বেশ সোরগোল করে থিয়েটারের কথাই বোধহয় চলছিল; আমি উপর থেকে তেল মেখে বাবার জন্য

এক কল্‌কে তামাক সেজে নিয়ে স্নান করতে নেমেছি। আমায় দেখেই জেঠামশাইয়ের যেন কি একটা কথা মনে পড়ল এমনভাবেই তিনি বাবার দিকে চেয়ে বললেন, হাঁ হে, রাজেন্দর! ও ইস্কুলের পড়া তৈরী করে কখন? সারাক্ষণই ত দেখি, ও তোমার কাজেই লেগে আছে?

আমারই সম্বন্ধে কথা,—কল্‌কেটা তাড়াতাড়ি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিয়েই আমি চট্ করে থামের পাশে সরে দাঁড়ালাম, আড়াল থেকে শুনতে হবে।

রাজেন্দর প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে বড়ই অস্বস্তি অনুভব করলেন, তা বেশ বোঝা গেল; তিনি সামলে নিতে একটু সময় কাটালেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন,—মন থাকলে ওরই ভিতর নিজের পড়াশুনা ঠিকই করে নেওয়া যায়। তার উত্তরে জেঠামশাই তর্কের দিকে না গিয়ে এমনভাবেই কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন যেন মেনেই নিলেন যে সত্যই মন থাকলে ওর মধ্যেই সব কিছুই করা যায় বটে, কিন্তু যেহেতু আমি অত্যন্ত দুষ্ট এবং পাঠে অমনোযোগী, সেইজন্যই আমাকে পড়ার জন্যে আরও কতকটা সময় নিশ্চিত দেওয়া দরকার। আর সেজন্যই একজন মাস্টার নিতান্তই প্রয়োজন। না হ'লে কি হয়? শেষে লোকে বলবে হয়ত বাপ যত্ন নেয় নি বলে ছেলের লেখাপড়াটা হ'তে পারলে না। ছেলেটা ত সত্যিই বোকা নয়? সব কথা বলা হয়ে গেলে জেঠামশাই জিজ্ঞাসুনেত্রে বাবার দিকে চাইলেন। তারপরেই বাবা বললেন, এখন মাস্টার কোথা পাওয়া যায়? কথাটা তিনি হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন।

বাবা জানতেন না যে জেঠামশাই সে ব্যবস্থা আগে করেই তবে একথা তুলেছেন। পেনেটি থেকে একটি ভদ্র সন্তান এসে এখানে আশ্রয় খুঁজছিলেন। পাড়ায় কয়েক ঘরের ছেলে পড়ানো, এক জায়গায় থাকা আর সকালের খাওয়াটা যোগাড় হয়েছে, এখন রাত্রের খাওয়ার যোগাড় হলেই তাঁর বেশ স্বচ্ছন্দে থাকা হয়।

রাত্রের খাওয়া, এমন কিছু বেশি কথা নয়—তার বদলে আমায় ছুবেলাই পড়াতে পারবেন। বাবা ত সঙ্গে সঙ্গেই রাজী। তবে পড়াবার স্থানটা হ'ল পাড়ায় এক নিকট প্রতিবেশী, শশধরদের বাড়ির নিচের ঘরে, সেইখানেই সব ছেলে তাঁর কাছে পড়তে আসে। ছুপুরে তাঁর অফিস—কাজেই সকালে সন্ধ্যায় আমায় সেখানে গিয়েই পড়তে হবে। ঐ সময়টা বাড়ির বাইরে থাকতে পাবো, আনন্দে প্রাণ আমার নেচে উঠল। জেঠামশাইয়ের কৃপায় আমার জীবনে একটু বৈচিত্র্য এল, দেখা যাক কতদিন এভাবে চলে।

পরদিন থেকে সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্ত হ'য়ে পড়াতে মন দিতে পারবো আর সকালে পাখা হাতে বাতাস করতে হবে না বেলা ন'টা পর্যন্ত এটা কি কম সুখ! পরদিন থেকেই শুরু হ'ল মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়া—সকালে ছু'ঘণ্টা সন্ধ্যার পর ছু'ঘণ্টা—শশধরদের বাড়িতে গিয়ে। রাত্রে ওখানে পড়া শেষ হয়ে গেলে মাস্টারমশাইকে সঙ্গে নিয়ে আসি—তাঁর সান্ধ্যভোজনের জন্য। বাইরে একখানি পিঁড়ি পেতে এক গ্লাস জল দিয়ে ঠাঁই করে—থালায় খাবার বাড়া থাকে, ভিতর থেকে তাই এনে ধরে দিই, সামনে একটা কেরোসিনের লম্প জ্বলে টিম্‌টিম্ করে, তিনি নির্বিবাদে খেয়ে যান। শেষে একটু গুড় এনে দিয়েই আমার ছুটি। কোনদিন তিনি কিছুই চেয়ে খান না। যে কখানা রুটি দেওয়া হয় তাইতেই হয়ে যায়। পিসিরা বলে যে খাওয়া ত বেশি নয় অতবড় শরীর। বোধহয় দশ বারোখানা পাতলা রুটি তাঁকে দেওয়া হ'ত।

গৌরবর্ণ দীর্ঘ শরীর, সাড়ে ছ'ফুট হবে লম্বায়, কোঁকড়ানো মিশমিশে কালো চুল মাথায়, বিরাট কপালখানা, ভ্রূ নেই বললেই হয়, চোখের পাতায়ও চুল নেই। ছুদিকে চার-ছয়টি চুল তাঁর গোঁফে, দাড়ি কামানো, কিন্তু ঠোঁট ছুটিই অসাধারণ পুরু। দাঁড়ালে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে থাকে শরীর। নামটি তাঁর পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। ভয়ানক তার্কিক মানুষ, পড়াতে পড়াতে ছেলেদের

সঙ্গেও যেন তর্কের ধরনে কথা আরম্ভ করে দেন। সেইজন্য আমরা সবাই একটু ভয় করতাম, তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে। তাঁর যেন একটু স্নেহ আমাদের উপর ছিল মনে হ'ত।

দিনমানে প্রায় অন্ধকার এমনই একখানি ছোট তক্তার উপর মাদুর পাতা, পুরাতন, বালিঝরা চতুষ্কোণ ঘরে সাত-আটজন পড়তাম আমরা এক জায়গায় বসে। সবাই এক ক্লাসে, একই স্কুলের ছাত্র সুতরাং পরিশ্রম তাঁর খুব বেশী হ'ত না। তিনি এক-ধারে আসন-পিঁড়িতে বসে, লম্বা লম্বা ঠ্যাং নাচাতে নাচাতে এমন ভাবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখতেন যেন আমরা কিছু ষড়যন্ত্র করেছি তাঁর বিরুদ্ধে আর হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছি। এই! তুমি ওদিকে চাইছ কেন? তুমি? তুমি ছটফট করছ কেন? গুঁইগাই করে পড়ছ কেন, স্পষ্ট উচ্চারণ করে পড় না? এই রকম তীক্ষ্ণদৃষ্টি সবার উপর।

ইংরাজী শব্দ কথায় কথায় বলতে অমন আর কাকেও দেখি নি। পড়তে পড়তে কেউ যদি একটু অন্যমনস্ক হয়েছে,—কিংবা তিনি যখন আর কারো সঙ্গে কথা কইছেন আমাদের কেউ পড়া ফেলে সেইদিকে মন দিয়েছে, তাঁর লক্ষ ঠিক আছে,—এই তুমি এদিকে দেখছ কি? Mind your own, বলে খানিক গুঁইগাই করে বলে ফেললেন, generosity, বলে গর্বিতভাবে ঠোঁটটা এমন বাঁকালেন যেন কি অসাধারণ একটা ব্যাপারের কত সহজ মীমাংসাই করে দিলেন। যদিও শেষ কথাটার মানে বুঝি নি। আমি ভাবলুম কি অসাধারণ ইংরাজী জ্ঞান আমাদের মাস্টারমশাইয়ের। আমার মনে কিন্তু ঐ mind your own, generosity কথাটার মানে কি হ'তে পারে একটা প্রশ্ন জেগে রইল?

আর একদিন রাত্রে খেতে বসেছেন, আমি এ্যাটেণ্ড করছি যথারীতি! ছোট কাকাবাবু এসে হাজির। তিনি ফার্স্ট ক্লাস অবধি পড়ে সবে আউট হয়েছেন, সুতরাং তর্কশাস্ত্রে তাঁর অধিকার

সম্বন্ধে প্রশ্নই নেই। দেখা হতেই আরম্ভ হ'য়ে গেল। একথা সে কথার পর যে কথাগুলো চলতে লাগল তা বেশ একটু গরম গরম ঠেকল আমার কানে। কেউ আর থামে না, কেউ হটেও না—দেখে আমি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর একটু গুড় আনবো কি?

কে শোনে গুড়ের কথা,—কুলীন সম্বন্ধে তর্ক চলছে। কাকাবাবু বলছেন, কুলীন হ'ল ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একেবারে সবার উঁচু ক্লাস, আপনারা কুলীন নয় ব'লে কুলীনের সুপিরিয়রিটি স্বীকার করছেন না।

একথায় মাস্টারমশাই চীৎকার করে বললেন,—কি বলছেন আপনি? কুলীন, what is কুলীন? কুলীন, means generation,—এই তো? আমরা তা মানি না। বলেই উঠে পড়লেন।

সে দিনের generosity, আজকের এ generation—আমি অবাক। দিন আট-দশ পরের কথা,—সকালে ন'টার সময় পড়ে এসে বাবাকে এক কলকে তামাক সেজে যেমন ঘুম থেকে তুলে দিই তেমনি দিয়েছি, তিনিও উঠেছেন। কাল থেকে দেখছি বাবা যেন আমার প্রতি একটু বেশি লক্ষ্য করছেন যখনই তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা হচ্ছে। মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলাম। এটা বুঝেছিলাম যে আমার ঐ পড়তে যাওয়াটা তিনি পছন্দ করছেন না, অবশ্য তাঁর সেবার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, রাত্রে পা টেপা আর সকালে বাতাস করা ছাড়া আর ত কোন কাজই বাদ পড়ে নি। আজ কিন্তু একেবারেই আমায় দমিয়ে দিলেন, অফিস যাবার সময় আমার দিকে রোষকষায়িত নেত্রে চেয়ে,—আজ অফিস থেকে আসি, এসে যমের বাড়ি পাঠাব এই বলে শাসিয়ে রাগে গস্ গস্ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

আমার ত ঐ কথাটাতেই যমের বাড়ির দৃশ্যটা দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। এখন মাথায় বিনামেঘে বজ্রাঘাত—আমায় যেন তখনই

যমের বাড়ি রেখে গেলেন। কি হ'ল এমন যার জন্যে এই আদরের নিমন্ত্রণ! কিছুই ত বুঝলাম না! মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল ব্যাপারটা? কি জানি, মাও কেন কাঁদছিলেন। তিনি বললেন, কে নাকি ওকে বলেচে যে তোমার ছেলে যত বদ ছেলেদের সঙ্গে ডোম পাড়ায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কথা শুনে ভেবে দেখলাম, ডোমপাড়ায় বাবুরাম সানাইওয়ালার সানাই শুনতে গিয়েছিলাম পরশুদিন, অবশ্য পাড়ার ছেলেরাও কেউ কেউ ছিল সঙ্গে। তবে বদ ছেলে যাকে বলে এমন কেউ ছিল না। সবাই ভদ্র বংশের ভদ্র সন্তান, যাদের সঙ্গে আমি একই শ্রেণীতে পড়ি। আসলে, মাত্র আটদিন ইণ্টারভ্যালের পর ঐ প্রহার যে কি ওজনের হবে ভেবেই আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হয়ে গেল তখনই।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি যে, আমার প্রকৃতিতে ভয় যখন চরমে পৌঁছোয় তখনই একটা দুঃসাহসিক কাজ সম্ভব হয়ে যায় আমার দ্বারা। তখন পৌষ মাস। কি যেন একটা সঙ্কল্প মনের মধ্যে তখনই ঠিক হয়ে গেল। কোনরকমে তাড়াতাড়ি নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজে, জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম স্কুলের দিকে। দরোয়ান ছিল না,—কি জানি ঠাকুমাদের নিয়ে কোথায় গেছে। ক্লাসে সারা দিন কি করে কাটিয়েছি তা ভগবানই জানেন। মনের ভিতরে যেটা সঙ্কল্প হয়ে আছে তা ভাষা পেলে সারাদিনের পর যখন ছুটি হয়ে গেল। পথে এসে দাঁড়িয়ে ঠিক করলাম বাড়িতে আর যাবো না, বাবার হাত থেকে আজ আমি মুক্ত। একটা আনন্দের হাওয়া,—অন্তরে মুক্তির একটা উদ্যম—সে যে কি সুখের অনুভূতি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুক্তির আস্বাদ সেই প্রথম অনুভব করে পথে পা বাড়ালাম।

একটা নেশার মতো উত্তেজনায় মনটা ভরে ছিল। পথ চলতে চলতে কত রকমের চিন্তার যেন ঝড় বইছিল ভিতরে,—তখনও ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছু বোধই ছিল না। ক্রমে ক্রমে চোরবাগান থেকে

মুক্তারামবাবু স্ট্রীট দিয়ে এসে পড়লাম কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে,—তারপর উত্তর দিকেই চলতে শুরু করলাম। প্রথম, স্কুলে সেই ভর্তি হওয়া থেকেই কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। এই রাস্তাটা ছিল উদার—আমার সেই ছোটবেলা থেকেই এ রাস্তাটির ওপর এমন একটা শ্রদ্ধা, তেমনি অশ্রদ্ধা ছিল জোড়াসাঁকোর ঐ চিৎপুর রোডের উপর। এমন কুশ্রী সঙ্কীর্ণ, রাস্তা বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই এই শহরে—সারাদিন গাড়ি ঘোড়া আর মানুষের ভিড়। এখন চলতে চলতে গুরুদাস চাটুজ্যে লাইব্রেরী ছাড়িয়ে হেদোর ধারে এসে পড়েছি। রাস্তার ধারেই হোটেল, আমিষ রান্নার গন্ধে ক্ষুধাবোধটা বেশ উগ্র হয়ে উঠল। ক্রমে পীড়ন শুরু হ'ল পেটের মধ্যে। সকালে ত খাওয়া একরকম না হওয়ার মধ্যে, আর টিফিনের বালাই ত আমার নেই,—কাজেই পেটের খামচে খামচে ওঠা নিয়েই এ-পথে চলেছি। ভরসা ছিল এ-পথে বাড়ির কারো সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই।

অবিরাম একটা উদ্বেগপূর্ণ চিন্তা, তা ছাড়া এখন ক্ষুধাবোধ এসে আমার গতি দ্রুততর করে দিলে। মনে চিন্তা আর পথে পা, এ দুটো একই সঙ্গে খুব ভাল চলে, তার পরিচয় আরও আগে থেকেই পেয়েছিলাম,—মামার বাড়িতে থাকার সময়, মাঠ পেরোতে। ভবিষ্যৎ জীবনেও বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবেই ও সম্বন্ধে জেনেছিলাম দীর্ঘ ভ্রমণে। এখন ঐ চিন্তা আর পা দুয়ে মিলে দ্রুত গতিতেই, দেখি আমায় এনে ফেলেছে মানিকতলা স্ট্রীটের মধ্যে দুর্গাদিদির শ্বশুর-বাড়ির কাছে। আমার পিসতুত, বড় বোন দুর্গাদিদি, আমাদের ঐ বাড়ি থেকেই তার বিয়ে হয়েছিল দুই তিন বছর আগে। গরীব ব'লে কুলীন পিসি ভাল পাত্রটি দেখে অঘরে, ভট্টাচার্যদের বাড়িতেই বিয়ে দিয়েছিলেন। এ নিয়ে কুটুম্ব স্থলে একটা ক্ষোভের ব্যাপার ছিল পাত্রীপক্ষে, জানতাম। ছোট ছোট আমাদের মতো ছেলেরা ছাড়া বড়োরা কেউ এঁদের বাড়িতে অন্নগ্রহণ করতেন না। যাই হোক আমার এখন বেশী বিচারের সময় ছিল না; সসঙ্কোচে

গিয়ে উঠলাম দুর্গাদিদির শ্বশুরবাড়িতে। বাইরে ছিল তার দেওর,—আমায় সঙ্গে করেই ভিতরে একেবারে যেখানে আমার দিদি নিজ ঘরের মধ্যে কাজে ব্যস্ত সেইখানে 'দেখ বৌদি, কে এসেছে,' ব'লে পৌঁছে দিয়ে গেল।

দিদিকে নমো করে দাঁড়াতেই ;—হাঁরে এমন সময় যে,—ইস্কুল থেকে বাড়ি যাস নি ? আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে শুধু বললাম, ভারি খিদে পেয়েছে। যাই হোক, খানকতক গরম গরম পরোটা, তরকারী, মিষ্টি এইসব খাইয়ে দিদি আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতে উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। পাছে, তাঁর মামা অর্থাৎ আমার বাবা অফিস থেকে এসে আমায় বাড়িতে না দেখে রুষ্ট হন। মামাকে ত সবাই ভাল জানে,—বিশেষত তাঁর মন মেজাজ।

আবার পথে এসে চলতে শুরু করলাম। এখন একটা অন্য চিন্তা মনের মধ্যে খোঁচা দিতে লাগল,—রাত্রে কোথায় থাকবো ? শীতের সময়, গায়ে আমার মোটা ছিট্ কাপড়ের কোট একটা মাত্র,—পশমের কিছু নয়। দিনে তা নিয়ে স্কুলে যাওয়া চলে কিন্তু রাত্রে কোথাও পথে যেতে চলে না। গরমের দিনে হলে অন্য কথা—শীতের সময়—এইটিই সম্বল করে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু রাত কাটাবো কোথা ? ভাবতে ভাবতে একটি জায়গার কথা মনে পড়ল ; সেটা যদিও আমাদের পাড়ায়,—ওদিকটায় লোকের যাতায়াত কমই ছিল আর রাত্রে কেইবা দেখতে আসছে ?—আমাদের চাষা-ধোপা পাড়া স্ট্রীট বলে যে রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে বড় রাস্তার দিকে চলে গিয়েছে তারই মাঝ বরাবর বিখ্যাত বুড়ো কৃপণ শ্যাম মল্লিকের বাড়ি। বাড়িখানা খুব পুরোনো,—আর বিশেষত্ব এই যে রাস্তা থেকে উঁচু ফ্লোরের উপর ঐ বাড়িতে ঢুকতে, পথ থেকে চার পাঁচটা ধাপ সিঁড়ি, তার দু দিকে লম্বা বারান্দা—উপরে ছাদ আর রাস্তার দিকটা বড় বড় থাম, তার মাঝে মাঝে রেলিং। অনেকটা দেউড়ির মতো। রাস্তা থেকে ঐ সিঁড়ি দিয়ে

উঠেই বড় সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়। রাত্রে সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে বাইরের বারান্দার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। রাত্রে সাড়ে নটার তোপ পড়ে গেলে ও রাস্তায় আর লোক চলাচল বড় থাকে না। আর বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে পর কেউ দেখতেও আসবে না—কে কোথায় শুয়ে আছে না আছে। তাইই ঠিক করে ফেললাম, ঐখানেই রাত কাটানো যাবে। এখন, ভাবতে ভাবতে বিডন গার্ডেনে এসে একটা বেঞ্চির উপর বসেছি।

মনে মনে ভাবছি, ছেলেমানুষ হয়েই মুশকিল হয়েছে, সাহস করে কোথাও যাবার যো নেই। কলকাতায় অনেকই ত আপনার লোক,—কিন্তু কারো বাড়ি যেতে মন চায় না, কারণ সবাই বাবাকে ভয় করে। যেখানেই যাবো ধরে এনে বাবার হাতেই তুলে দেবে। কাজেই পরিচিত কারো কাছে যাওয়া হবে না।

একটি বৃদ্ধ লোক, তাঁর নাতিই হবে, তার হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে আমার বেঞ্চে এসে বসলেন। পাকা আমটির মতো চেহারা। রক্তাভ গৌড়বর্ণ, ভ্রূ দুটি কালো আর এক মুখ সাদা দাড়ি, মাথার চুলও সাদা তবে ছোট ছোট করে কাটা। চেহারাটা আমার ভালো লাগলেও একটু ভয়ও আছে। খাতা-বই হাতে স্কুলের ছেলেকে এই সাঁঝ বিকালে এভাবে কোম্পানির বাগানে বসে থাকতে দেখে কিছু প্রশ্ন না করে বসেন। উঠবো কি বসে থাকবো ভাবছি, এমন সময়ে তিনি একটু কেশে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলেন,—তোমাদের বাড়ি কোথা? সত্য উত্তরই দিলাম। শুনেই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—ওখানে গুপ্তদের বাড়ি আছে না? তার কোন দিকে তোমাদের বাড়ি? বললাম, গুপ্তদের বাড়ির পশ্চিম দিকে। শুনে একেবারে ঠাকুরদাদামশাইয়ের নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাপ্রিয় চাটুজ্যেমশাইয়ের বাড়ির কোন দিকে?

আমার মুখ চুন হয়ে গেল, কিছুতেই যেন আর সাহস আনতে পারি না। তা সত্ত্বেও বললাম, আমরা নূতন এসেছি কিনা সবাইকে

ত চিনি না। তিনি দেখি ছাড়বার পাত্র নন, আবার বললেন, ও, তা আগে কোথা ছিলে তোমরা? ভেবে চিন্তে বললাম, সিমলে। সিমলে? কোনখানে?—বললাম, হেদোর কাছে,—তারপর তাড়াতাড়ি উঠে, আমায় একবার ঐখানে যেতে হবে, বলেই এম, এন, বাড়ুজ্যের বাড়ির দিকে দেখিয়ে সটান সরে পড়লাম। তখন বেলা গেলেও সন্ধ্যা হয় নি। রাস্তার গ্যাস জ্বেলেছে। গেটের কাছে এসে পিছনে চেয়ে দেখি ভদ্রলোক আমার দিকেই চেয়ে আছেন। তাঁর যেন একটু সন্দেহ জেগেছে আমার সম্বন্ধে।

তাড়াতাড়ি বিডন ষ্ট্রীট দিয়ে চলতে আরম্ভ করলাম। মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে এসে দেখি, নাট্যাচার্য গিরীশচন্দ্র ঘোষের নূতন বই পৌরাণিক নাটক, জনার বিজ্ঞাপন প্রকাণ্ড হরপে লেখা আর অনেক লোক টিকিট করছে। দূর থেকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ঐসব দেখলাম। সন্ধ্যার পর, অন্ধকার হয়ে গেলে হেদোর মধ্যে ঢুকে একখানা বেঞ্চিতে শেষদিকে বসলাম। সব বেঞ্চিই ভরা। আমি যে-খানায় বসলাম তাতেও দু'জন মুসলমান লুঙ্গিপরা বসে বিড়ি টানছে আর কথা কইছে। জীবনে এই প্রথম রাত্রে বাড়ির বাইরে।

এতক্ষণ বাড়িতে নিশ্চয়ই একটা হৈচৈ পড়ে গেছে। বাবা অফিস থেকে এসে আমায় না দেখে রেগে আগুন হয়েছেন। অনুমান করতে পারি ঠাকুরদামশাই ও ঠাকুরমা'র মনে একটা গভীর দুঃখ, পিসিদের নানাবিধ কল্পনা-জল্পনা, জেঠামশাই উদ্বিগ্ন,—আর মা মহাদুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে আছেন আমার পরিণাম ভেবে। শশধরদের বাড়ি, আমাদের পড়বার আড্ডায় নিশ্চয় কিছু কথা হচ্ছে আমার অনুপস্থিতিতে। মনের মধ্যে এক চোট এই সব ভাবনা হয়ে গেল, তারপর ভাবছি, আমার মন দুঃখ চায় না মোটেই,—ও বাড়িতে যা কিছু দুঃখ বাবারই জন্য। আমার সহ্য গুণ কত কম তাই না আজ পথে পালিয়ে এসেছি! কেন আমি সহ্য করে থাকতে পারি নি? —কারণ বাবার হাতে ঐ প্রহার, ঐ মারকে আমার বড়ই ভয়।

শিশু বয়স থেকেই অবধি ঐ মূর্তির সঙ্গে কেবল ভয়ের সম্বন্ধই গড়েছে। বাবা যতক্ষণ বাড়ি থাকেন,—মনে সর্বদাই একটা আতঙ্ক,—কখন ডাকবেন,—ধোপে—এ—ব'লে, সেই ভয়ঙ্কর ডাক শুনলে বুক ধড়ফড় করে ওঠে। এমন কি ঠাকুরদা ও ঠাকুরমারও অশান্তির সীমা নেই আমার জন্যে।

এই আমার প্রথমবার বাড়ি থেকে পালানো, বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ কাটাতে পারলে যে আনন্দের হাওয়া লাগে মনে, সেই মুক্তির আস্বাদ এই প্রথম অনুভব করে একরকম আনমনা অবস্থা এতক্ষণ কাটিয়ে শেষে এক এক করে পরিণাম চিন্তা এসে মনকে অধিকার করল। আজ রাতটা না হয় শ্যাম মল্লিক মশাইয়ের বারান্দায় কাটিয়ে দিলাম, তারপর কাল সকালে? ভাবতে পারি না আর। বই ক'খানা আর খাতা দু'খানা হাতে ওঠালাম বেঞ্চি থেকে। গ্যাস লাইট জ্বেলেছে, তারপর বড় বড় আলোতে রাস্তায় আলোর সীমা নেই,—কেবল বাবার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ মাঝে মাঝে মনকে দোলালেও ক্রমে ভিতরটাও আমার অন্ধকার হয়ে আসছিল। তা হোক সব মিলিয়ে একটা এমনই, যেন আচ্ছন্ন অবস্থা আমার চলছিল তখন, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

রাস্তায় এক বাড়িতে বৈঠকী গান চলছিল। রাস্তা থেকেই জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বসে সেখানে রাত দশটা অবধি কাটিয়ে, শ্যাম মল্লিকের বারান্দায় এসে চোরের মতোই ঢুকলাম। কোঁচা দিয়ে কতকটা জায়গা ঝেড়ে নিয়ে ভেতরে দেওয়ালের দিকে ঘেঁষে বই ক'খানা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঠাণ্ডা মেঝেতে বেশ কতক্ষণ কন্‌কনানি ছেঁকা সহ্য করে যখন একটু গরম হয়েছে তখনই ঘুম এলো। মাঝরাতে কাঁপুনি লাগতে কাপড়খানা খুলে কতক নীচে আর কতক মুড়ি দিয়ে রাতটা কাটিয়ে ভোরে উঠে দুই হাঁটু এক ক'রে বসে বসে চিন্তা শুরু করলাম,—আজ কোথায় যাবো!

ক্রমে বেলা হ'ল। কি জানি কি মনে করে চোরবাগানের

দিকেই পা চালালাম। মনের ভাবটা এই যে দশটার সময় নিয়ম-মতো স্কুলেই ঢুকবো। তা ছাড়া—একটা টান আছে আমার এদিকে, বোধহয় ঐ অঞ্চলটায় স্কুলের আশেপাশে ঐ সব জায়গায় একটু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ব'লে,—যেহেতু আমাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলের বাড়িও এই দিকেই ছিল আর তাদের দু' একজনের বাড়িতে যাওয়া-আসাও হয়েছিল। এখন, তাদেরই একজনের বাড়ি লক্ষ্য করে পাড়ি দিয়েছিলাম। শচীন্দ্রনাথ সরকার,—আমাদের ক্লাসেরই একজন ছেলে ভারি ভালমানুষ, শান্তপ্রকৃতি। যখন তাদের বাড়ির দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছি তখন প্রায় আটটা হবে। ঠিক সামনের ঘরেই তারা বেশ সোরগোল করে পড়ছিল,—দেখে আর এগিয়ে না গিয়ে ফিরব কিনা ভাবছি, শচীনের দৃষ্টি পড়ল আমার দিকে,—ওরে এই যে, এসেছে, ব'লে সে উঠে এসেই একেবারে আমার হাতখানা ধরে বললে, তুই কাল থেকে বাড়ি যাস নি—কোথায় ছিলি বল। কি করে সে জানলে? জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে ফড়ফড় করে ইতিহাসটা ব'লে গেল। কাল সন্ধ্যার পর আমাদের মাস্টারমশাই শশধরকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে এসেছিলেন এখানে। তারপর সুরেনদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন ইত্যাদি। তারপর আজ সকালে এই একটু আগেও এসেছিলেন। শুনে আমি কম অবাক্ হই নি। মাস্টারমশাই খুঁজতে বেরিয়েছেন? কালও বেরিয়ে ছিলেন? এ নিশ্চয়ই ঠাকুরদামশাইয়ের প্ররোচনা। যাই হোক আমার আর এক্ষেত্রে বেশীক্ষণ কাটানো মোটেই উচিত নয়, —তাড়াতাড়ি এ অঞ্চল পেরিয়ে অন্য দিকে যাওয়া দরকার। এত সকালেও আবার যখন এখানে খোঁজ করতে আসা হয়েছে তখন, জানি না—কোনদিকে গেলে ঠিক নিরাপদ হতে পারব। এইসব ভেবে,—আমি এখুনি আসছি, ব'লে তার হাত ছাড়িয়ে দৌড় লাগালাম। আমার পক্ষে হ'ল ভাল যে সে আমার পেছনে না দৌড়ে অবাক্ হয়েই দাঁড়িয়ে রইল। আমি সরকার লেন পেরিয়ে, আমাদের

স্কুল বাড়ি পেরিয়ে একেবারে ঠনঠনে কালীবাড়ির দিকেই জোরে জোরে পা চালিয়েছি। মিনিট চার-পাঁচের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। তারপর মা কালীর সামনে দাঁড়িয়ে, রাস্তা থেকেই দেখছি,—ভিতরের অন্ধকার থেকে যেন ফুটে উঠছে ঐ কালী-মূর্তি। হাতজোড় করে একেবারে বৌবাজারের মতিলালদের বাড়ির দিকে পাড়ি দেব সংকল্প করে হাতে মাথাটি ঠেকিয়েছি—অমনি কাঁধের উপর দিয়ে একখানা হাত ঘাড়ে এসে পড়ল, তারপর, এই—বলে এক আওয়াজ। যেন পরিচিত শব্দটি। ফিরে দেখি পূর্ণ মাস্টারের পুরু ঠোঁট আর কুটকুটে চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি। আমি ত আর নেই। সেই বিশাল পাঞ্জার কড়া আবেষ্টনী প্রথমে ঘাড়, তারপর হাতের মধ্যে সারা পথ অনুভব করতে করতে পৌঁছে গেলাম সেই আমার যমের বাড়িতে,—যম তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। হৈ চৈ যা পড়ে গেল তা আর বলে কাজ নেই।

কেউ আমায় কোন কঠিন কথা বলে নি। ঠাকুরদামশাই, শুনেছিলাম, বাবাকে কঠিনভাবেই তিরস্কার এবং এমন কিছু বলেছিলেন যাতে আমি ফিরে এলে আর আমার প্রতি কোনপ্রকার নিষ্ঠুর পীড়ন হয় নি। যাই হোক আমি যথাসময়ে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে গেলাম। বিকালে এসে নিত্যনিয়মিত কর্ম সকল কিছু সম্পন্ন করবার পর ঠাকুরদাদামশাই ডেকে পাঠালেন।

ঠাকুরমা ছিলেন সেখানে আর কেউ ছিল না। তিনি আমায় প্রথমে গতকাল স্কুল থেকে আজ বাড়ি আসবার পূর্ব পর্যন্ত সকল কথা তন্ন তন্ন প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে শেষে বললেন,—তোমায় আর তোমার বাবার কাছে যেতে হবে না, এখন থেকে তুমি তোমার পড়াশুনা খেলাধুলা নিয়েই থাকবে,—আর যেন তোমার ও বুদ্ধি না হয়, কেমন? আমি স্বীকার করলাম ঘাড় নেড়ে। ভাবলাম, বাঁচা গেল এখন থেকে একটু শান্তিতে থাকা যাবে। ঠাকুরদামশাই কিন্তু তখনই ছেড়ে দিলেন না। তিনি এক অদ্ভুত বিষয়ের অবতারণা

করলেন। তিনি বার বার প্রশ্ন করতে লাগলেন, যদি আজ মাস্টার মশাইয়ের চোখে না পড়তাম তা হলে কি করতাম, কোথায় যেতাম এইসব। আমি যখন বললাম যে আমার কিছুই ঠিক করা ছিল না, শুনে তিনি বললেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে ওটা ভাল কথা নয়। মারের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবো, কোথা থাকবো, কোথা খাবো, কোথা শোবো, কি কাজ করবো এসব নিশ্চিত না ভেবে শুধু ভয়েতে পালিয়ে যাওয়া কোন মানে হয় না। এরকম অবস্থায় পড়ে অনেক ছেলে উৎসন্ন গিয়েছে, কারণ ঐ অবস্থায় মন্দ সঙ্গী জোটা খুবই সম্ভব আর সেই দলে ভিড়ে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। শেষে বললেন, তুমি কাল সন্ধ্যার পর চুপি-চুপি আমার কাছে যদি এসে সব কথা বলতে—আমি সব সুবিধা করে দিতে পারতাম—আর সেইটিই হ'ত বুদ্ধিমানের কাজ। এ কাজটা তোমার খুব বোকার মতোই হয়েছে। মর্মে মর্মে সেটা আমিও বুঝেছিলাম।

বাড়ি থেকে পালাবার অপরাধে বাবা যে শুধু ঠাকুরদামশাইয়ের কথাতে বিনাদণ্ডেই নিষ্কৃতি দিতেন তা মনে হয় না। কিছুদিন আগে থেকেই আর একটা ব্যাপারের সব কিছুই ঠিক হয়েছিল। আমার এই ব্যাপারের পরেই দুই এক দিনের মধ্যে সবাই, বাবা, জ্যেঠামশাই, ঠাকুরদাদামশাই পর্যন্ত মেতে উঠলেন। তাইতেই বাবার মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, আমিও দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেলাম। লেগে গেল ছোট কাকাবাবুর বিয়ে। প্রায় এক হপ্তা ধরে যে কি ধুমধাম চলল তার ঠিক নেই—চারদিন ত বাবুরামের সানাই বাজল,—বৌভাতের খাওয়া দু'দিনের মধ্যে মেয়েদের দিনে খ্যামটা নাচ পর্যন্ত হয়ে গেল। ঝাড় লণ্ঠন দেয়ালগিরির ঠণ্ঠনানী, আর কলম ভাঙা নিয়ে আমাদের কারো কারো খুচরো রকমের দণ্ডও হয়ে গেল। নূতন কাকীমাকে পেয়ে এদিকে পরম লাভবান হয়েছিলাম আমরা অর্থাৎ বাড়ির ছেলেরা। অপর দিকে ঠাকুমা ও পিসিদের মনে পরম দুঃখ,—বৌটি তাঁদের পছন্দ হয় নি। তাঁদের

কথাটা এই যে কাকাবাবুর ঐ রকম সুন্দর চেহারা তার তুলনায় এ বৌ একেবারেই অযোগ্য। এমনকি বিবাহের পরদিন বর-কনে যখন এসেছে ঠাকুমা কোলে করে বৌ তুলতে গিয়ে প্রথমে ঘোমটা তুলে কনে বৌয়ের মুখ দেখেই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে এলেন মেজ ঠাকুমার কাছে,—কি বৌ হ'ল দিদি,—আমার নগেনের। সকলেই ঠাকুরদামশাই, বাবা, জেঠামশাইকে দোষ দিতে লাগল, তাঁরা কি চোখে দেখে বৌ পছন্দ করেন নি? তাঁরা সবাই বললেন, আশীর্বাদের দিন—রাত্রে এমন করে পাত্রী সাজিয়ে পেণ্ট করে এনেছিল যে তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেন নি, তা ছাড়া আলোর মধ্যেও একটা কায়দা ছিল যার জন্য কনের আসল রং ধরা পড়ে নি। তখনকার দিনে বাড়ির মেয়েরা গিয়ে কনে পছন্দ করবার রীতি ছিল না, কাজেই এই রকম একটি শ্যামাঙ্গিনীকে রাত্রে সাজানোর জোরে গৌরী ব'লে চালাবার সুবিধা হয়েছিল। বিলাতি পছন্দ হিসাবে কিন্তু এ কাকীমা কিছু অসুন্দর ছিলেন না,—লম্বা চেহারা আর গড়নও বেশ, সপ্রতিভ চালচলন। আর লেখাপড়া-জানা একটি বেশ বড়-সড়ো মেয়ে এই প্রথম এ বাড়ির বৌ হয়ে এল। তখনকার দিনে,—যখন ঘোড়ার ট্রাম, পালকি, পালকি-গাড়ি, উৎসবে ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, দেয়ালগিরি, বিয়েতে খাস্ গ্লাসের ঝাড় রোশনাই, টেবিলে বাতিদানের চলন,—মেয়েদের লেখাপড়া, গান, নাচ ইত্যাদি কুলীন হিন্দু গৃহস্থসমাজে অচল। বৌমানুষেরা সবার সামনে একগলা ঘোমটা, কেউ সেই ঘোমটা তুলে মুখ দেখবার সময় চোখ বুজে থাকার রেওয়াজ—সেদিনের হিসাবে আমাদের কাকীমাটি আপ-টু-ডেট বলা চলে।

সবচেয়ে আমার আনন্দের বিষয় ছিল, তাঁর কাছ থেকে গল্প শোনা। এমন চমৎকার গল্প করতে কাকেও শুনি নি। প্রথম গল্প তাঁর কাছে যা শুনেছিলাম তার প্রতিটি অক্ষর আজও মনে আছে। বাণভট্টের সেই কাদম্বরীর গল্পের একটা এমনই মোহ আমায় পেয়ে

বসেছিল যে কয়েকদিন সকল কাজের মধ্যেও তা ভুলতে পারি নি তারপর দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী পর পর শুনে পড়াশুনায় এক ধাপ এগিয়ে গেলাম। তারপর থেকেই গল্পের বই পড়বার ঝোঁক হ'ল আমার মধ্যে। বঙ্কিমের উপন্যাস-সাহিত্য প্রথমেই কাকীমার মুখে শুনে তবে জানতে পারি। কাকীমাই আমার উপন্যাস পাঠের নেশা ধরিয়ে দিলেন। অবশ্য তখন শুধু গল্পের উপরেই আকর্ষণ ছিল। আমাদের পাড়ায় মিনার্ভা লাইব্রেরী নামে একটি লাইব্রেরী ছিল, ছোটকাকাবাবু তার মেম্বার হলেন; দু'খানা করে বই আসত তা আমাদের জ্বালায় হয়তো কাকীমার ঠিকমতো পড়া হয়ে উঠত না।

বাবা পড়তেন ইংরেজী বই, ঠাকুরদাদামশাইকে ইংরেজী খবরের কাগজ ছাড়া আর কিছু পড়তে কখনও দেখি নি। বাবাও গল্প ভালবাসতেন। তাঁর মুখের গল্প যে শুনেছে সেই জানে তাঁর কি মিষ্টি বলবার ভঙ্গি! তবে তাঁকে পৌরাণিক গল্প করতে শোনা, সে এক ভাগ্যের কথা, তার যোগাযোগ মাসের দু'তিন দিনের বেশী কখনও ঘটে নি। বাবা বলতেন বাংলায় আবার ভাল গল্প কোথা? বাবার ঘরে একদিকের একটা খাটালের চারটি তাক বইয়ে ভর্তি ছিল। এখন থেকেই তারই মধ্যে হাতড়াতে শুরু করলাম। তাঁর সবই ইংরেজী! রেনল্ড, স্কট, লিটন ইত্যাদির বই তখন ত পড়তেই পারতাম না, তবে ছবি দেখে অনেকটা আশা মেটাতাম। বাবার শেল্‌ফে ঠাকুরদাদামশাইয়েরও কয়েকখানা বই ছিল তা কিন্তু নভেল নয়। সেক্সপিয়ারের কমপ্লিট ওয়ার্কস, মিলটনের তিনখানা আর প্রকাণ্ড মোটা একখণ্ড স্পেক্টেটর। উত্তরাধিকারসূত্রে বহুদিন পরে অবশ্য সেগুলি আমি এক সময়ে দখল করেছিলাম।

ছোটকাকাবাবুর শ্বশুর যিনি তিনিও আমাদের ভালবাসতেন। এমন সরল সহজ বৃদ্ধ, জীবনে দেখি নি, বিচিত্র তাঁর জীবন। তাঁর নাম মাধব বাঁড়ুজ্যে। তাঁর প্রায় কেশশূন্য মাথাটি, অনেকটা হ্যানিমানের মতো। তখন তিনি রিটয়ার্ড; বেঙ্গল অফিসের পুরানো

কেরানি, মোটা টাকা পেনসান পান। আমাদের কাকীমা তাঁর ছোটমেয়ে। সুতরাং সৎপাত্রে দেবার চেষ্টা এবং সেইসূত্রে খরচটাও কম করেন নি। জামাইকে নগদ টাকা প্রায় দেড় হাজার, তা ছাড়া রদারহামের সোনার প্রায় আড়াই শো টাকা দামের ঘড়ি, উপযুক্ত বরাভরণ ইত্যাদি আর জাঁকালো তত্ত্ব এসব করেছিলেন। এই মাধববাবুর কথা আমার একটু বলতেই হবে; কারণ তিনি ছিলেন, শুধু তখনকার দিনের নয় সেই সরল দৃঢ় চরিত্র এবং উদার এখনকার পক্ষেও এমনই একটি টাইপের মানুষ, যা, চিরদিনই দুর্লভ। সেকালের সিনিয়ার স্কলারসিপ পাস ছিলেন, তাঁর বিদ্যা ও পদমর্যাদা তিলমাত্র অহমিকার সৃষ্টি করে নি, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মসূত্রে পরিবার-মধ্যে বা সমাজের-সঙ্গে ব্যবহারে কোথাও তাঁর কথায় বিনয়ের কৃত্রিমতা ছিল না। অথবা দম্ভের লেশমাত্র ছিল না। যাকে সেলফ-লেস বলে প্রকৃত-পক্ষে তিনি তা ছিলেন, সেইজন্যই আমার বাল্যজীবনে তাঁর আকৃতি এবং প্রকৃতি একটি গভীর দাগ রেখে গিয়েছে। হ্যালা-খ্যাপার মতো চালচলন, অতি পুরানো তলা-ক্ষয়া ধুলায়-ভরা এক চটি, না হয় উপরটা মলিনকালো কাপড়ে পেনলা জুতা, ফরসা কাপড় একখানা তার উপর লংক্লথের গলাকাটা চায়না কোট, সবগুলোর বোতাম নেই, এলোমেলোভাবে নেওয়া দেশী উড়নি, এই তাঁর পোষাক। সামনের চারটি দাঁত তাঁর ভাঙা ছিল, —আর কথা কইতেন এত দ্রুত যে তার অর্ধেক কথাইই ধরা যেত না। ছেলে তিনটি আর মেয়ে তিনটিতে তাঁর বংশধারার ব্যালান্স একদিকে ঠিক ছিল বটে কিন্তু অন্য দিকটা বড় অদ্ভুত মনে হ'ত। গিন্নি যিনি, তাঁর একটি পা ভাঙা সেইজন্য লাঠি নিয়ে চলাফেরা করতেন, কিন্তু অখণ্ড প্রতাপ ছিল তাঁর সংসারে। ছেলেরা সবাই আউট, এবং ফ্যামিলী ম্যান। একটু মাথায় ছিট্ ও বাড়ির সবারই মার্কামারা বিশেষত্ব। শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও পড়াপড়সী-দের ঐ ধারণা প্রবল। রোজগারের যেন দরকারই ছিল না কারও,

মাসের শেষ নাগাদ সবাই হিসাব করছেন কতক্ষণে ২রা তারিখে পেনসানের টাকাটা বাবা আনবেন। সেই টাকা ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধার্ত হয়ে কুকুর শেয়ালের মতো হাঁ হাঁ করে এসে দাঁড়ানো, —যার যতটা বরাদ্দ পাওয়ার পরও কিছু একট আদায়ের ফিকিরও আছে,—যেমন এমাসে আমার তুটো বা চারটে আদ্দির পাঞ্জাবি অর্ডার দেওয়া আছে—পাঁচ দশ টাকা আরও চাই। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে ছেলে এবং মেয়েদের সবার দাবি মেটানো হ'ত। মেয়েরা শ্বশুরবাড়ি থাকলে বৃদ্ধ নিজে তাদের টাকা ঠিক সেখানে পৌঁছে দিতেন। কর্তা গিন্নি তুজনেই সন্তানগতপ্রাণ, বিশেষত গিন্নির মতো এমন তুটি দেখি নি।

কিন্তু মেয়েদের অদৃষ্ট, জীবনের ফলাফল দেখে বাপ, মা, তুজনেরই মর্মপীড়ার সীমা ছিল না। সুখের বিষয় চরম তুর্গতি দেখবার আগেই তাদের মা পরলোকের যাত্রী হতে পেরেছিলেন, শেষ অবধি যত কিছু তুর্ভোগ ঐ বৃদ্ধই সহ্য করেছিলেন। মেয়ে তুইটি ছিল শ্যামা আর অত্যন্ত ভাল মানুষ, সরল প্রকৃতি,—এই ছিল তাদের অপরাধ। তারা সুন্দরী ছিল না, তা ব'লে কুশ্রী বা দৃষ্টিকটুও ছিল না। কিন্তু তাদের মা, সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী যিনি, পছন্দ করে যে তুটি জামাই করেছিলেন, বিশেষত তাঁর বড়টি বাগবাজারে ৺তুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়ের বংশধর, এবং যথার্থই রূপবান। রূপের দিক থেকে জামাই তুটি বুড়ো-বুড়ীর বড়ই মনোগত হয়েছিল। কিন্তু তুটি মেয়েই বড় ঘরে পর্যাপ্ত সোনাদানা, অলঙ্কার ভূষণে খুসী হলেও রূপবান পতিলাভের সুখে সুদে আসলে বঞ্চিত হয়ে,—অকালে যেভাবে এই সুখের জগৎ থেকে তিরোহিত হলেন তা এমনই অদ্ভুত যার দৃষ্টান্ত নাটক নভেলেও কম দেখা যায়। শেষ অবধি, আমার মতো হতভাগ্যের সঙ্গেই শ্মশান পর্যন্ত সম্বন্ধ ছিল ব'লেই আমার জীবন-কথার মধ্যে ছোট কাকীমার একটু বিশেষ স্থান আছে।

তেরো

আমার মনে হয়,—শিশুকাল থেকেই কতকগুলি পারিপার্শ্বিক মধুর স্মৃতিকে আশ্রয় করে সময় সময় অন্তরক্ষেত্রে এমনই এক একটা কাজ হয়ে যায়, যা সংস্কারের মতোই প্রবল হয়ে একজনের ভবিষ্যৎ জীবনের রুচি এবং প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। যেমন মামার বাড়ির স্মৃতি একদিকে জীবনে শক্তি ও রস যুগিয়েছে, অন্য দিকে আমাদের কলিকাতার বাড়ি সম্পর্কে গাঙ্গুলী বাড়ির স্মৃতিও শিশুকাল থেকে কম প্রভাব বিস্তার করে নি আমার মধ্যে। বাল্যজীবনের কতকটা পর্যন্ত একটি শিশুস্মৃতি কথা,—যা দুই অথবা আড়াই বছর বয়স থেকেই আমার মধ্যে ধরা আছে এবং হয়তো তারও একটা সার্থকতা আছে যদিও এখন সেটা উপেক্ষার বস্তু। কিন্তু দেখা যায় তার মধ্যে দিয়েও এক অপূর্ব প্রীতি এবং সৌন্দর্য-বোধ আমার অন্তরক্ষেত্র পূর্ণ ক'রে তা এক বিচিত্র অনুভূতির উপাদান হয়ে আছে, —হয়তো তাই-ই সংস্কার।

তারপর এখন বড় হয়েছি। প্রকৃতিও বদলেছে, আর মেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে গাড়িতে যাই না, সেই মধুমাখা কথাও আর ত শুনতেই পাই না। সে-সব ব্যাপার অনেকদিনই শেষ হয়ে গেছে, এখন আমি বালক—বারো-তেরো-বৎসর বয়স। কিন্তু স্মৃতির মধ্যে ঐ প্রীতিমূলক সম্ভাষণগুলি একত্র হয়ে আমার অস্তিত্বের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাতে প্রয়োজন আছে,—একথাটা যেন জানিয়ে দেয় যে, আমি এক সময় তাদের স্নেহের অধিকারী ছিলাম, না হলে এতটা আদরযত্ন করে কেন? আমাকে দেখতে এত আগ্রহ কেন এদের। অহংকারকে (গর্ব নয়) যথার্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবার পক্ষেই,—এই যে শিশু এবং তারপরে আদি বাল্যের

প্রীতিমূলক যত অনুভূতি পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে তার জীবনে উপস্থিত হয়,—তার ফলে অহংবোধ গভীর হতে থাকে যাতে করে আমি যে একটি বিশেষ সত্তা এবং আমার এই অস্তিত্ব সবারই প্রীতিপদ এবং বাঞ্ছিত—অতএব আমার এই জীবনে একটা গভীর প্রয়োজন আছে ; এই ভাবটিই অন্তরে বদ্ধমূল হতে থাকে। আমাদের সমাজে অসাধারণ যাঁরা, আমার বোধহয়, তাঁদের আত্মশক্তি বিকাশের সহায়তা করেছে এই পারিপার্শ্বিক আত্মীয়-স্বজনের আদরযত্ন। ভালবাসার পরিচয় প্রথম থেকে বরাবর নিরবচ্ছিন্ন পাওয়াতেই তাঁদের বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব বা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করেছে, পরিণামে তা আত্মবিশ্বাসেই পরিণত হয়েছে। আমার জীবনে ঐ দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত এটা ছিল, তারপর যখন থেকে আমার মধ্যে চাঞ্চল্য এবং আপন-পর বিবেচনাশূন্য হয়ে নীতি-বহির্ভূত কর্ম প্রচেষ্টা শুরু হ'ল—যাকে বলে দুষ্টামি,—তখন থেকেই ঐ প্রীতি-সম্ভাষণ আদর-যত্ন স্নেহ-প্রীতি প্রকাশের অভাব অনুভব, তারপর ক্রমে ক্রমে যেন গণ্ডীতে ঘেরা আপন জনের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্পর্কই স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে লাগল। এখন দেখি,—আত্মবিশ্বাস আর পরমুখী হয়ে আমার মধ্যে ক্রিয়া করে না। আমার গুণ,—যা ভবিষ্যতে আমাদের সংসারে স্বার্থের অনুকূল হবে তারই কদর—নিজ বুদ্ধি বা প্রীতির বশে কিছু করতে গেলে, তাতে কারো কোন ক্ষতি না হলেও আমি মন্দ, আমার ভবিষ্যৎ মন্দ, এই ভাবেরই একটা ধারণা এরা যেন বদ্ধমূল করে দিতে চায় আমার মধ্যে। তারপর,—শৈশবের পরে বাল্যে, ও-বাড়ির আকর্ষণটা ঐখানকার বৈভবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল,—গৃহসজ্জা আসবাবপত্র আর সর্বত্রই একটা পরিচ্ছন্নতা যা আমাদের বাড়িতে ছিল না। বাহ্য সৌষ্ঠবের চমৎকার মিতাচার, কোথাও কোন বিষয়ের বাহুল্য নেই, অভাবও নেই। আমার বয়সী ছোটদেরর সঙ্গে কখনও কখনও মেশামেশিও হ'ত, অবশ্য অল্পক্ষণের জন্যই, তার মধ্যে দেখা যেত সব বাড়ির ছেলেরা

একরকম নয়। কিন্তু আমার মতো বালকের সঙ্গেও সকল বাড়ির বড়দের ব্যবহার, একই রকম, স্নেহ-প্রবণতার মধ্যেও যেন একটা সংযমের আভাস পেতাম। মেয়েদের ব্যবহারে উচ্ছ্বাসই প্রবল, কিন্তু পুরুষদের ব্যবহারে সেটা অত্যন্ত সংযত। যখনই যে বাড়িতে গিয়েছি যেন বাড়িখানি হাসছে। তখনকার দিনে কর্তাদের মধ্যে মিলনের একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাঁদের বাড়ি ঘর সব পৃথক ভাগ-ভিন্ন হয়ে যাওয়াতেই বোধহয় একত্র মিলনের কোন সুযোগই তাঁরা ছাড়তেন না যখনই কারো বাড়িতে কোন কাজ কর্ম উপস্থিত হ'ত। ভাগে হয়ত সকলকার অংশ সমান হয় নি, কাজেই গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর কর্তাদের বাড়ি সবার সমান বড় নয়,—কিন্তু তার মধ্যে চমৎকার ব্যাপার একটা লক্ষ্য করতাম বড় বাড়ির তুলনায় যে বাড়ি ছোট, সেখানে আসবাব-পত্র অথবা দেওয়ালে শিল্পরচনার পারিপাট্য, ঘড়ি, ছবি, আলো প্রভৃতি সজ্জায় কোন বিষয়ের ন্যূনতা নেই মোটেই, অথচ বড় বাড়িতে একমাত্র স্থানের প্রাচুর্য ব্যতীত অপর কোন বিষয়েরই বাহুল্য বা আড়ম্বর নেই অথবা ছোট বাড়ির যা কিছু বড় বাড়ির তুলনায় কম মূল্যবান নয়। মনে হ'ত সব বাড়িই যেন একই অধিকারীর সম্পত্তি। এতে তখনকার ও-বাড়ির কর্তাদের মন ও রুচির একতার পরিচয় পাওয়া যেত যা এখন আমার আত্মীয়বর্গের মধ্যে অথবা কুটুম্বস্থলে কোথাও দেখি না। সব মিলিয়ে ও-বাড়িই ছিল আমাদের আদর্শ। অবশ্য তখন অতি বালক অবস্থায় এটা বুঝবার শক্তি ছিল না যে ও-বাড়ির সঙ্গে এক অবস্থায় অর্থাৎ পদ-মর্যাদায় পৌঁছবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না আমাদের,—তার প্রধান কারণ ও-বাড়ির কর্তারা বহুকালসঞ্চিত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী,—তিন পুরুষ ধনবান্। স্বকৃতকর্মা যাকে বলে তাই। তবেই আমরা ও-বাড়ির মতো ঐশ্বর্য বা ধনবান যদি না হতে পারি, তাতে আমাদের অগৌরব কিছু নেই।

দুর্গা পূজার সময় আমার মামার বাড়িতে যাওয়া না হ'লে, সে বছর ঠাকুরদাদামশাইয়ের সঙ্গে দিনমানে পূজার তিন দিনই ও-বাড়িতে

যেতাম। ওখানকার ঠাকুর, অর্থাৎ প্রতিমা নির্মাণের বৈশিষ্ট্য তখন থেকেই আমার বালকমনে একটি গভীর রেখাপাত করেছিল। এমন সুন্দর কারুকলার নিদর্শন আর কোথাও দেখা যায় না মনে হয়, এখনও। বড় বড় প্রকাণ্ড মূর্তি, বহু শিল্প অলঙ্কারে সমৃদ্ধ, বিরাট বিরাট দুর্গা প্রতিমা, যেমন শিবকৃষ্ণ দাঁয়েদের, শোভাবাজার রাজ-বাড়ির, ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ির বা খেলাৎ ঘোষেদের, এমন বহু ধনৈশ্বর্যবান সম্ভ্রান্ত ঘরের বিখ্যাত ঠাকুরের কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে অনেকেই জ্ঞান, শুনে এবং বড় হয়ে দেখেও এসেছি, কিন্তু গাঙ্গুলী বাড়ির ঠাকুরের মধ্যে এমনই একটি মধুর বৈশিষ্ট্য আছে যা আর কোথাও নেই। তার প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, প্রতিমা খুব ছোট অথচ তার মধ্যে গঠন এবং নিখুঁত চিত্র পারিপাট্য একটি আকর্ষণের বিষয়। তার চালচিত্র আছে কিন্তু তা অন্য সকল সাধারণ প্রতিমার চালচিত্র যেমন হয়ে থাকে সে রকম নয়, একেবারেই ভিন্ন পদ্ধতিতে সাজানো। রূপার গিল্টি করা থামওয়ালা সিংহাসনে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। দুর্গা মূর্তি, এক হাত মাত্র উঁচু, অন্যান্য মূর্তি সব সেই পরিমাণেই ছোট। যে সকল কারিগর ঐ মূর্তি গড়ে তারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। গাঙ্গুলীদের দুই বাড়িতেই দুর্গা, কালী এবং কার্তিক পূজা দেখেছি,—ঐ একই ছাঁচে তৈরি প্রতিমা,—আর কোথাও এমন দেখি নি। শুনেছি কর্তাদের আমলে,—যখন পূজা প্রবর্তিত হয় তখন নাকি কুলগুরু তাদের নিয়ম ক'রে দিয়েছিলেন যে দুর্গা মূর্তি এক হাতের মধ্যেই হবে, তার চেয়ে না বড় হয়—হলে অমঙ্গল হবে। আরও একটি বৈশিষ্ট্য যে দর্পণ বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এদের ঠাকুর দুর্গা, কালী এবং কার্তিক সকল প্রতিমাই গঙ্গায় ভাসান দেওয়া হয়। বৈকালে বা রাত্রে বিসর্জনের কোন ধুমধাম নেই।

এতো গেল ও-বাড়ির বাৎসরিক পূজার কথা। তখনকান দিনে এই ও-বাড়ির পিছনেই আমাদের এবাড়ির যেন সকল কিছুই করবার বিধি, বরাবরই জিতু ঠাকুমার অকাট্য নিয়ম ছিল। বিধবাদের

আচার প্রতিপালন, আহার এবং ব্যবহারবিধি, লক্ষ্মীপূজা, ষষ্ঠি, মাখাল যত কিছু পূজা এবং বিবাহ, উপনয়ন, শ্রাদ্ধাদি সংস্কার সব কিছুই ঐ ও-বাড়ির অর্থাৎ গাঙ্গুলী বাড়ির ধারায় এবং ওখানকার অশূদ্রযজী ভট্টাচার্যের দ্বারাই নির্বাহ করতে হবে, অন্যথায় ধর্মহানি অনিবার্য। যতদিন আমাদের জিতুঠাকুমা বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন ধর্ম-মন্ত্রী, তাঁর মতে সব কিছু চলত, তাঁর নীতি পূর্ণ মাত্রায় সক্রিয় ছিল। তারপর আমাদের পিসিদের হাতে এসে পড়তেই ও-বাড়ির ধারার পরিবর্তন শুরু হ'ল, তারপর আমাদের সময়ে ও-বাড়ির কথা বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে যাবার যোগাড়। আর ও দিকেও কালে কালে গাঙ্গুলী বাড়ির অবস্থান্তর প্রাপ্তি! যা হয়েই থাকে,—এক স্থানে ঘনীভূত শক্তি নানাস্থানে বিস্তৃত চারদিকে ছড়িয়ে পড়া দানার মতো অবস্থাই হয়েছে। তবে এখনও সেই সংস্কার যেন পিছনে আছে মনে হয় আমাদের—নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়া সংসারের মধ্যেও। তবে এটা ঠিক আমাদের সন্তানরা সেদিকে অনেকটা সংস্কার-মুক্ত হয়েই থাকবে।

ও-বাড়ির সকল কিছুরই একটা প্রভাব সত্ত্বেও গুরুকরণের ব্যাপারে এক ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ গাঙ্গুলী পরিবারে গুরুকরণ করেন নি। ঠাকুরদাদামশাই দীক্ষা নেবার জন্য একবার আমাদের কুলগুরুর অনুসন্ধান করেছিলেন, আমাদের পিতৃভূমি খালিয়ায়—কাশীরাম ঠাকুরদার কাছে। কিন্তু আমাদের কুলগুরুর বংশ-লোপ হওয়ার খবর পেয়ে তিনি দীক্ষা নিতে পারলেন না। ঠাকুমা কিন্তু নাছোড়বান্দা হয়ে ঠাকুরদাদামশাইকে ধরে বসলেন। অতি গোপনেই তাঁদের মধ্যে যে কথাটা হয়েছিল তা আমি শুনেছিলাম, কারণ আমি তাঁদের কাছেই তখন ছিলাম। ঠাকুরমা,—সেদিন যেন একটু বিশেষ সঙ্কুচিতভাবেই, ভয়ে ভয়ে কতকটা, কথাটা এই বলেই আরম্ভ করলেন,—

হ্যাঁ কর্তা, তুমি আজ যেন আমার উপর রাগ করেছ?

কর্তা, যথার্থ ই কর্তা কিনা,—তিনি একেবারেই ব'লে বসলেন,—এখন আসল কথাটি তোমার বল দিকি, কিছু বেয়াড়া ফরমাজ আছে কিনা কি ? ঠাকুরমা সেকালের বিদ্যাহীনা গিন্নি হলেও কোনপ্রকারেই বুদ্ধিহীনা ছিলেন না। ঠাকুরদাদামশাই তাঁর উদ্দেশ্যমূলক কথারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কাজের কথাটা জানতে চান বুঝে তখনই বললেন, মন্তর নেবার কথাই বলছিলাম। মেয়েমানুষ জন্ম আমার,—মন্ত্র বিনা ত গতি হবে না, কখনও বন্ধন দশা ঘুচবে না, এইটিই কি তুমি চাও ?

ঠাকুরদাদামশাই বললেন, দেখো মন্তর-ফন্তর আমি বুঝি না, ভগবানকে ডাকতে হয় মনে মনে, এর জন্য গুরু কেন ? তা ছাড়া আমাদের কুলগুরু যখন নেই তখন বুঝতে হবে মন্তর নেবার দরকার নেই। শুনে ঠাকুমা বললেন, আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না, কুলগুরু নেই ব'লে আমার কানে মন্ত্র যাবে না ? আমার হাতের জল শুদ্ধ হবে না, মেয়েমানুষ জন্ম ত পশুজন্ম, আমাদের পশুজন্ম ঘুচবে না? আমায় তুমি অনুমতি দাও আমি অধোনের মায়ের গুরুর কাছেই মন্ত্র নেবো।

অধোন,—প্রসিদ্ধ কলাবেত্তা, শিল্পরসিক, আইনজীবী শ্রীযুক্ত বাবু অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মশাইয়ের ছেলেবেলার ডাক নাম। ওঁর মা আমার ঠাকুমার সম্পর্কে জা হতেন। উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও ছিল।

ঠাকুরদাদামশাইয়ের ধারণা বোধহয় কুলগুরু ছাড়া আর কারো কাছে মন্ত্র নেওয়া যায় না তাই তিনি বললেন, গাঙ্গুলীদের কুলগুরুর কাছে মন্তর নিলে তোমার হবে কেন, আমরা চাটুজ্যে, ভিন্ন বংশ,—ভিন্ন গোয়াল—ভিন্ন গরু—নয় ?

এ বিষয়ে ঠাকুমা জ্ঞানী,—বললেন, কেন হবে না—যাদের কুলগুরু নেই তাদের কি পশুজন্ম নিয়েই থাকতে হবে নাকি ?

ঠাকুরদামশাইয়ের সন্দেহ তবু যায় না ; তিনি বললেন, আচ্ছা তুমি রমেশ ভটচাজ্জিকে জিজ্ঞাসা কোরো দিকি ?

ঠাকুমা, একটু উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, গুরুর কথা, মন্তরের কথা, ভটচাজ্জিকে আবার কি জিজ্ঞাসা করবো? তোমার যেমন কথা, কোথায় গুরু, যিনি ইষ্টিদেব, আর কোথা পুরুত ঘণ্টা নেড়ে পুজো করে—তারা এ বিষয়ে মতামত দেবে কি আবার?

শেষে ঠাকুরদামশাই, বোধহয় ঘুম আসছিল তখন, বললেন, তা নাও না মন্তর, নিয়ে সগ্‌গে যাও না। আমি কিন্তু নেবো না বলে দিচ্ছি, তুমি তখন চাপাচাপি কোরো না। কত খরচ?

ঠাকুরমা বললেন, একশোর মধ্যেই হবে,—মেজঠাকুজ্জি অর্থাৎ জিতু ঠাকুমা জানে সব। তবে জেনে রেখো তোমায় আমার পাশে বসে অনুমতি দিতে হবে। মাত্র মুখে বলে দিলেই হবে না।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর কিছু শুনি নি।

মোট কথা বোধ হয় দশ-পনেরো দিনের মধ্যেই দীক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুমার গুরু, দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট প্রৌঢ় এবং প্রশান্তমূর্তিটি। সে ঘরে আমাদের কাকেও ঢুকতে দিলে না। জানলাগুলোও বন্ধ করা হ'ল। তবে ঠাকুরদামশাইও ছিলেন তখন ঘরের মধ্যে। বোধ-হয় তিনিও মন্ত্র নিয়েছিলেন, কারণ তারপর থেকে প্রত্যহই ভরা সন্ধ্যাবেলা, দিদিমণি আসন পেতে কোশাকুশী দিয়ে যেতেন তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় এক ধারে। দেখতাম তিনি বসে জপ করতেন। গায়ে একখানি নামাবলী থাকত আর বুকের মধ্যে ডান হাতটি রেখে আঙুল দিয়ে জপ করতেন, মালা ছিল না সে সময়ে। তখন ওদিকে কেউ যেন না যায় সবার ওপর আদেশ দেওয়া ছিল। কখনও কখনও আলো জ্বালবার আগে আমি ঠিক চুপি চুপি আবছায়া অন্ধকারে গিয়ে থামের আড়াল থেকে দেখতাম। আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে তিনি প্রণাম করে উঠতেন। একদিনও বাদ যায় নি। তবে উপরন্তু কখনও কখনও দেখেছি দিনমানে, ছুটির দিনে চিত হয়ে শুয়ে বুকের ওপর হাতটি রেখে আঙুল নাড়ছেন, ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে চেয়ে।

পরে জেঠামশাই যোগীন্দ্রনাথও মন্ত্র নিলেন। কাশীর যোগানন্দ সরস্বতী তাঁর গুরু। তাঁকে আমরা দেখেছিলাম, পক্ক কেশ সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী; সামান্য দাড়ি আছে। গৈরিক বস্ত্র জড়ানো কোমরে, কাছা কোঁচা নেই। তিনি খুব উচ্চস্তরের সাধু বলেই জেঠামশাই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আরও তাঁর পরিচিত বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁদেরই মুখে গুরুদেবের কথা শুনে সঙ্কল্প করেছিলেন স্বামীজীর কাছেই দীক্ষিত হবেন।

বাড়ির মধ্যে দেখলাম, এই সৎকর্মের পিছনেও প্রথমে ফুসফাস্ প্রতিবাদের সাড়া পাওয়া গেল। এমন কি তাঁর জননী, মেজ ঠাকুমাও, তার সঙ্গে আমার ঠাকুমা এবং বড় বড় পিসিরাও ছিলেন প্রতিবাদের সভায়। ওমা সে কি কথা, গৃহীলোকের সন্ন্যাসী গুরু,--সে আবার না কি হয়? গেরস্তের সন্নিসি গুরু মহা অমঙ্গলের কারণ, ইত্যাদি। জেঠামশাইকে একাজ কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না। তাঁকে বারণ করতে ঠাকুরদাদামশাইকে পর্যন্ত অনুরোধ করা হয়েছিল। আমি নিজের কানে শুনেছি ঠাকুমাকে বলতে। কর্মস্থান থেকে এসে ঠাকুরদাদামশাই যখন বিশ্রাম করছেন, ঠাকুমা বললেন,—কর্তা! তুমি একবার যোগীন্দরকে বারণ করো একাজ যেন না করে। গেরস্তর অমঙ্গল হয় সন্নিসি গুরু করলে,—এ হতে নেই। শাস্তোরে আছে।

এখন ভাগ্যক্রমে ঠাকুরদাদামশাই বোধহয় প্রথম যেদিন তিনি এসেছিলেন সেদিন তাঁকে দেখেছিলেন এবাড়িতে, তাঁর মূর্তি দেখে শ্রদ্ধার উদ্দীপনাও হয়েছিল বোধহয়। তিনি বললেন,—তোমরা যেমন শাস্তোর জানো আমি তাতো জানি না—তবে আমার নিজেরই ইচ্ছা হচ্ছিল ওঁর কাছে দীক্ষা নিতে। কুলগুরুর চেয়ে সন্ন্যাসী ঢের ভালো। বারণ ত করবোই না বরং এই কথা বলবো কারো কোনও কথা কানে না তুলে তুমি ওঁর কাছ থেকেই দীক্ষা নাও।

গিন্নি তো শুনে স্তম্ভিত। হেরে গিয়ে ঠাকুমা, ওমা একি কথা গো,—এমন ছিষ্টিছাড়া কথা ত শুনি নি কোথাও, ব'লে আক্ষেপ করতে লাগলেন। জেঠামশাই এদিকে, শুভদিনে দীক্ষিত হয়ে নিজ জীবন সার্থক করলেন।

কিন্তু ঐযে তাঁর প্রতি দাদামশাইয়ের শ্রদ্ধা হয়েছিল তার ফল অনেক দূর গেল।

এক মাস পরেই পূজার ছুটি পড়ল, সেই সময়ে একদিন দেখি ঠাকুরদাদামশাইয়ের ঘরে মন্ত্রণা-সভা। জঁাকালো সভা, কারণ একমাত্র বাবা ছাড়া বাড়ির বড় যারা, মেয়ে-পুরুষ সবাই বিগুমান। আমিও বসে গেলাম ঠাকুরদামশাইয়ের কাছ ঘেঁষে। ব্যাপার বুঝতে দেরি হ'ল না। জেঠামশাই ছিলেন গরুড়াসনে বসে,—বললেন, তাহলে রাজেন্দরকে সঙ্গে নিচ্চেন? ঠাকুমা বললেন, ওকে সঙ্গে নেওয়াই যে দরকার যোগীন,—বুঝে দেখ না, ওকে রেখে গেলে কাকে খুন করবে, কার মাথা খাবে কে জানে, বৌমা আর— ছেলেটার হাড় জুড়ুক দিন কতক। ছেলেটা, বলতে বলতে আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার বুঝলাম পিতৃকর্ম করতে ঠাকুরদামশাই এই দু মাস পূজার ছুটিতে গয়া যাচ্ছেন। দুর্গা পূজার পর সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশীতে যাত্রা করবেন; সঙ্গে যাবেন জেঠামশাই, বাবা,—আর ঠাকুমা তিনজন,—চাকর মাত্র থন্ন চাপরাশী। আর সব কে কে যাবে—তখন শুনলাম না। সব শেষে ঠাকুরদামশাই বললেন,—তোমার গুরুদেব তো আসছেন, যোগীন্দর। জেঠামশাই বললেন, খবর তো এই রকমই পেয়েছি।

ঠাকুরদামশাই আরও তারপর কি কি সব বললেন, ভাল বুঝতে পারলাম না। সে সবই শাস্ত্রীয় কথা, কেবল একটা কথা যেন শুনলাম, চান্দ্রায়ণ। কথাটার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই আছে।

যাই হোক আমাদের স্কুলের ছুটি তখনও হয় নি, যদিও ঠাকুরদামশাইদের হাইকোর্টে ছুটি হয়ে গেছে, বোধহয় মহালয়ার দিন

থেকেই। আমাদের ঐ দিন মাত্র ছুটি ছিল বটে, স্কুল বন্ধ হ'তে এখনও তিন চার দিন। কেমন একটা গন্ধ, দুর্গাপূজার সময়, আনন্দ-মাখানো হাওয়াতে ভেসে আসে। আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় যেন স্ফূর্তিতে ভরে গিয়েছে ঐ নীল আকাশ। নানা আকারের সাদা সাদা রূপালি মেঘ, তাতে বৃষ্টি হয় না। হলেও একটুখানি হয়েই আবার রোদ উঠে তখনই চারিদিক হাসতে থাকে। সব যেন হাসছে, স্কুলে গেলেও মনে হয় যেন ছুটি। কি আনন্দের হাওয়া এই পূজার সময়ে ভরে যায় আমাদের দেশের সর্বত্র।

রামত্রাহী চক্রবর্তী, মুখখানি তাঁর যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, একেবারে ঠিক ফটোতে যেমন তাঁকে আমরা দেখতে পাই সেই রকমই। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তাঁর পায়ে চটি জুতো, গায়ে হাত কাটা ব্যনিয়ান তার উপর লংক্লথের বড় চাদর জড়ানো—পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ঠাকুরমশাইয়ের স্টাইল এটা হুবহু। তাঁর মুখে হাসি, আর সদানন্দ ভাবের ব্যতিক্রম কখনও আমরা দেখি নি কোনদিন। সেদিন যেন তাঁরও একটা বিশেষ আনন্দময় ভাব দেখলাম। তিনি ঠাকুরমশাইয়েরই শিষ্য। কিন্তু কেন জানি না ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ ছিল না—রামত্রাহীবাবুর সঙ্গে ছিল, আমরা তাঁকে ভালবাসতাম। ইংরাজী পড়া আর কারো কাছে এত চমৎকার হ'তে পারত না তাঁর কাছে না পড়লে।

সেদিন তিনি ক্লাসে এসেই বললেন, আজকে আর নিত্য এবং নৈমিত্তিক কাজ হবে না, আজ তোদের পড়ার ভিতর দিয়ে কেমন করে ছুটির আনন্দ পেতে হয় সেইটে দেখিয়ে দেব। খোল্ ইংরেজী বই,—অমুক পাতা, বেন্‌জিম্ অন দি রাইন, রয়েল রিডার চতুর্থ ভাগ। আরম্ভ করলেন,—নেপোলিয়ানের সময়,—ফ্রান্স আর জার্মানির যুদ্ধের কথা, ঘোরতর সেই যুদ্ধে এক জায়গায় একটি বীর যুবা পড়েছে। এমনভাবে আহত হয়েছে সে, যে তার দেহত্যাগের

আর বেশী বিলম্ব নেই। সেই সময়ে এক বান্ধবের কোলে মাথা রেখে সে তার মাতৃভূমি, রাইন নদীর উপর বেন্‌জিম গ্রামখানির কথা বলছে, সেখানকার যা কিছু তার স্মৃতিতে উদিত হয়ে তাকে ব্যথিত করছে। এই সময়, বাল্য জীবন ও যৌবনের লীলাভূমির প্রতি কী প্রবল আকর্ষণ তার, যত কথা, প্রাণের স্নেহ ও প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ যারা, তাদের প্রতি তার বিদায় বাণী পাঠাচ্ছে সেই বান্ধবের গলা জড়িয়ে। সে এক শোকের বড়ই করুণ কাহিনী তিনি আরম্ভ করলেন। কি মিষ্টি তাঁর আবৃত্তি তেমনি মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা তাঁর। ছুই একজন ছাড়া আমাদের সবার কান্না রোধ করবার সাধ্য ছিল না। কখন ঘণ্টা বেজে গেল খেয়াল নেই, পরের ঘণ্টায় সংস্কৃত, গীতার পণ্ডিতমশাই এসে দাঁড়িয়ে আছেন, হুঁশ নেই কারো। হঠাৎ গলা খাঁকরীর আওয়াজে রামত্রাহীবাবু চমকে উঠে বললেন, ওহো সময় হয়ে গেছে, আসুন এই যে—শুনে পণ্ডিতমশাই, না, না, আমিও শুনছিলাম, আপনি শেষ করুন। কাল হবে ব'লে তিনি উঠে পড়লেন বটে কিন্তু কর্কশকণ্ঠ পণ্ডিতমশাইয়ের পাঠ সেদিন মোটেই জমল না।

বাড়িতে ফিরলাম স্কুল থেকে একটা যেন শোকের বেদনা নিয়ে, এমন কখনও আগে হয় নি। বাড়িতে এসে শুনছি ঠাকুরদাদা মশাইয়ের গয়া যাত্রার কথা। কোথাও দূর পথে রেলে যেতে যে কি সুখ, মন আমাদের কল্পনায় তোলপাড় চলছিল কাল থেকেই। কিন্তু আজ আর সেসব কিছুই ভাল লাগছে না। সন্ধ্যার পর নিত্যকর্ম যা কিছু শেষ করে ঠাকুরদামশাইয়ের কাছে হাজির দিতে প্রায় নটা বাজল। সেদিন আর পড়তে না বসে তাঁর কাছে সকাল সকাল উপস্থিত হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাই, আজ যে বড় পড়তে বসলে না, ব্যাপার কি ?

আমি বললাম, স্কুলে, ক্লাসে আজ একটা পোয়েট্রি পড়ানো হয়েছিল এমনিই ছুঃখের সেটা, ভাল লাগছে না আজ আর অন্য কিছু পড়তে।

তিনি আর কিছু বললেন না,—খানিকক্ষণ পর আমার মাথায় তাঁর সেই কোমল হাতটি বুলোতে বুলোতে বললেন,—আমি চলে যাব ব'লে তোমার কি মন খারাপ হয়েছে দাদা ?

আমি বললাম, তাও আছে বোধ হয় ঐটের সঙ্গে !

চৌদ্দ

তখন বেলা সাড়ে আট, কি ন'টা হবে,—বই নিয়ে বসে আছি, পড়তে ভালই লাগছে না, দুদিন বাদেই স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, এবারে মামাদের পূজা নয়, মামার বাড়িতে যাওয়া ত হবে না এইখানেই কাটাতে হবে, এইসব ভাবছি, ঠাকুর দালানের বাইরের চাতালে বসে বসে। কাল বিকালে বড় মামা এসেছেন কোন মামলা মোকদ্দমার তদবিরে,—আমাদের এখানেই আছেন। এখন তিনি সামনে বসে বসে তামাক খাচ্ছিলেন আর কথা কইছিলেন। এমন সময়ে, রাজেনবাবু আছেন, বলতে বলতে, রোগা হলেও বিশালকায় পুরুষ মূর্তি, হাতে পাতলা একটা বাঁশের ছড়ি, সামনে এসে হাজির ! দাঁড়িয়ে উঠলাম,—বললাম, ঘুমুচ্ছেন বাবা।

লোকটি যেন চেনা মনে হচ্ছে। ছোটবেলায় যেন একে অনেকবার এ বাড়িতেই বাবার সঙ্গে নীচেকার বৈঠকখানায় দেখেছি। থিয়েটার সম্পর্কেই এঁর সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ। খুব বাবুয়ানা তখন ছিল,—বাবারও ছিল,—তাই জানতাম যে একই দলের লোক তাঁরা। নামটিও মনে পড়ছে যেন, গিরীন ভদ্র। তখন এর বাবুয়ানী পোষাক, মাথার টেরী থেকে পায়ের বার্নিশ করা জুতো পর্যন্ত একটা দেখবার জিনিস ছিল। চেহারাও গৌরবর্ণ, গোলাপের মতো রং, বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বলেই মনে হয়। তখন

দুর্দান্ত মাতাল ছিলেন,—আর দুজনেই থিয়েটারের উপাসক ছিলেন। শনিবার শনিবার ইনি সেজেগুজে এসে বসতেন আমাদের নীচেকার ঘরে,—খবর পেয়ে ভিতর থেকে বাবাও আসতেন। তারপর কিছুক্ষণ কথাবার্তা কয়ে দুজনেই বেরিয়ে যেতেন; মনে পড়ছে, সেইসব কথা। এখন একি মূর্তি, সামনের মাথায় চুল নেই, এক মুখ দাড়ি গোঁফ,—রং তামাটে, পেটটা মোটা, হাত পা সরু সরু, গামছার মতোই ময়লা একখানা চাদর গায়ে, পায়ে চটিজুতো, শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে আর আগাগোড়া জমা ধুলোয় ভরা, গোড়ালী প্রায় অর্ধেক বেরিয়ে আছে,—হাতের ছড়িটাতেও তেলচিটে ধরা। মনটা খারাপ হয়ে গেল এই পরিবর্তন দেখে। যাই হোক, বাবা ঘুমুচ্ছেন শুনে, তিনি বললেন, এখনও ঘুমুচ্ছেন, অফিস যাবেন না? বললাম, হাইকোর্ট ছুটি হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে। ভাবলাম, এইবার চলে যাবেন। তিনি তা করলেন না—বললেন, ওহো,—কখন উঠবেন, বলতে পার? রাজেনবাবুর ছেলে বুঝি?

বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ,—ছুটির দিনে তিনি অনেক বেলায় ওঠেন কিনা? এবারে নিশ্চয়ই চলে যাবেন তাই মনে করে বললাম—বারোটা, একটা। ও হরি, যাওয়ার নামই নেই, উল্‌টে তিনি বলে বসলেন,—আচ্ছা, আমি একটু বসছি,—কেমন, এইখানেই বসি? বললাম,—বসুন না। মনে মনে এই ভয় প্রবল হ'ল, যদি বাবাকে খবর দিতে বলেন? সে এক বিপদ। দুই একবার এমন হয়েছে, কোন ভদ্রলোক এসে খবর দিতে বললেন, খবর দিতে গিয়ে মহা অশান্তি, গালাগাল মন্দ শেষে মার খেয়ে মরি। সেই থেকে বাবার ঘুমের সময় কেউ এসে খবর দিতে বললেই আমার মরণ।

মামারা মাঝে মাঝে একটা বিষয়-কর্ম উপলক্ষে আসতেন। কলীঘাটেই থাকবার বন্দোবস্ত ছিল। তবে মায়ের কাছে এলে আমাদের বাড়িতে দুই একদিন রাত্রি বাস করতেন। এখন কাল তিনি এসেছিলেন বলেছি; তাঁর জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল

তামাক আর গল্প করা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে। এখন তিনি তাঁকে নিয়ে বেশ আরম্ভ করে দিলেন আমিও বাধ্য হয়ে বাবাকে খবরটা দিতে গেলাম বাড়ির ভিতরে।

উপরে বাবার ঘরের সামনে মাকে দেখতে পেলাম। মাকে সব কথা বলতেই মা বিপদের বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে বললেন, আ মলো, এতদিন পরে আবার ঐ গিরে ভদ্দোর? সব তো উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে ভিকিরী হয়েছিল আবার এখানে কেন বাপু? দাঁড়া, আমিই বলে আসছি; বলে বাবাকে গিয়ে জানালেন। আশ্চর্য ব্যাপার, বাবা তৎক্ষণাৎ উঠে, সহজভাবেই কোন উচ্চবাচ্য না করে, একেবারেই বাইরে, ভদ্দোর মশাই যেখানে বসে বড় মামার সঙ্গে কথা কইছেন সেইখান গেলেন,—তাকে দেখে চমকে উঠলেন। বললেন,—এই যে গিরীন—একি চেহারা তোমার, অসুখ-বিসুখ কিছু নাকি, বড্ড খারাপ দেখছি যে, কি ব্যাপার?

গিরীনবাবু বললেন, অসুখ আর কি এমন, কিছুই ত নয় তবে বিষয়-আশয় আর তো কিছুই নেই জানো ত সবই। বিষয়-আশয় আত্মীয়-স্বজন যা কিছু ছিল সব, নিজ হাতে আহুতি দিয়ে এখন পথে এসে দাঁড়িয়েছি। কেমন? ভাল করি নি? হা হা হা হা—করে হেসে একটু পরে বললেন,—হ্যাঁ, এখন আজ দেখ ভাই, তোমার এখানে চাট্টি খাব। তুমি বলে দাও। দেরি হলেও ক্ষেতি নেই।

শুনে বাবা যেন দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন। কিন্তু সামলে নিয়ে বললেন,—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি একটু বোস, এই মাত্র ঘুম থেকে উঠলাম কিনা, আমি আসছি। এই কথা বলে, বাড়ির ভিতরে যাবেন বলে ফিরেছেন,—এমন সময় গিরীনবাবু আবার ডেকে, শোন রাজনবাবু, বলে উঠে এসে, একটু চাপা গলায় বললেন,—আমি একটু বেশী খাই, একথাটাও ভিতরে বলে দিও যেন। আচ্ছা আচ্ছা, —সে হবে, ব'লে বাবা চট্ করে বাড়ির ভিতরে গেলেন। পিসিকে ডেকে বলে দিলেন, আজ আমার একটি বন্ধু খাবে, একটু বেশী করে

যোগাড় করো। পিসিও আচ্ছা, ব'লে কাজে মন দিলেন। বাবাকে চমকে উঠতে দেখলাম কি কারণে তখনই বুঝলাম। বোধ হয় তাঁর একটা দুর্গতি হতে পেরেছে, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। আমাকে বললেন, দেখ্, তৈরী হলে, পিসি যখন বলবে তখন বাইরে ঠাকুর দালানে, ঠাঁই করে আসন পেতে, সব ঠিক করে পরিবেশন করে খাইয়ে দিবি। তিনি আর একবার দেখাও করলেন না তাঁর সঙ্গে যতক্ষণ ভদ্রলোকটি ছিলেন।

আমার কিন্তু বাবার এই ব্যবহারটা মোটেই ভাল লাগল না। হাজার হোক, বন্ধু ত? আমার মনে হলো হয়ত এই উপেক্ষা ভদ্রলোক সহ্য করতে পারবেন না,—অপমানে লজ্জায় তিনি আমার কাছেই হয়ত এখনি এই বলে চলে যাবেন যে, আচ্ছা থাক, আমি চললাম এখানে খাব না,—তোমার বাবাকে বলো। এই ভেবে সত্যই তাঁর কাছে যেতে সঙ্কোচ বোধ হ'ল আবার কিন্তু না গিয়েও পারি না। আশ্চর্য, দেখলাম,—বেশ সপ্রতিভভাবেই বসে বড় মামাকে ধরে গল্প আরম্ভ করেছেন। কথা কইতে বড় মামা আমার বড়ই দক্ষ,—গল্প করতে অদ্বিতীয়।

দেখলাম এই গিরীন ভদ্র বেশ শিক্ষিত লোক, কাব্য নাটকাদি চর্চা যথেষ্ট করেছেন; তখনকার যারা প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার,—সবার রচনার সঙ্গেই পরিচিত। আবৃত্তিও মধুর। চমৎকার কণ্ঠস্বর, ৺কেদার চৌধুরীর রচিত স্তোত্র একটি এমন সুন্দর আবৃত্তি করলেন, যা শুনে আমার মতো একটি বালকের মনেও গভীর রেখাপাত করেছিল। যাই হোক প্রায় একটা নাগাদ আমি ঠাকুর দালানেই তাঁর ঠাঁই করলাম। বড় থালায় ভাত তরকারী যা ভিতর থেকে গুছিয়ে দিলে এনে তাঁকে খেতে ডাকলাম। মাত্র দুটি বাটি ছিল, একটিতে ডাল আর একটি ঝোলের। ভাতের পরিমাণ ছিল, দুজন চাকরের উপযুক্ত। অবশ্য বয়ে আনতে আমার কষ্ট হয়েছিল। গিরীনবাবু বসে গেলেন, আমি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

আসনে বসে খাবার সময় দেখলাম ভদ্রমশাইয়ের চেহারাটা যেন বদলে গেল,—চোখ দুটি বিস্ফারিত আর অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোন দিকই দৃষ্টি নেই, কোন কথা নেই এমন ভাবে খেতে আরম্ভ করলেন যেন কতদিন তাঁর পেটে অন্ন যায় নি। আর প্রত্যেক গ্রাস মুখে তুলতে, এমন একটা হিস্‌হিস্ শব্দ বেরিয়ে আসছিল এমন কখনও শুনি নি। প্রথম দফায় বাটি দুটিতে তিনি হাত না দিয়েই ঐ থালার মধ্যে যে তরকারী ভাজা, শাক ইত্যাদি দেওয়া ছিল তাই নিয়েই থালার সব ভাত শেষ ক'রে হাত গুটিয়ে কেমন ভাঙা ভাঙা আওয়াজে বললেন দেয়ালের দিকে চেয়ে,—আর দুটি ভাত। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বলতেই পিসি রান্না ঘরের ভিতর থেকে যতটা প্রথমে দেওয়া হয়েছিল প্রায়ই ততটা একখানা বড় থালায় আমার হাতে দিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁরে, তরকারী চাই না। বললাম, এখনও ডাল ঝোল খাওয়া হয় নি।

ভদ্রমশাই এই ভাতগুলি মাত্র ডাল দিয়েই শেষ ক'রে সেই ভাবেই দেয়ালে দিকে চেয়ে বললেন, আর দুটি ভাত। আমি আবার গিয়ে পিসির কাছে দাঁড়ালাম,—এতক্ষণ দেখি নি, বাড়ির মেয়েরা, বউ, ঝি সব গিয়ে বড় পিসির ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে বাইরের দালানে ভদ্রমশাইয়ের উপযোগ পরিষ্কার দেখা যায়। ছোট কাকীমাও তাদের মধ্যে ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি এসে বললেন,—ওর ব্যামো হয়েছে,—ও রোগ একটা,—আমি জানি আমার বাপের বাড়িতে দেখেছি ও একটা ভয়ানক ব্যামো—ওর পেটে একটা জানোয়ার আছে, সেই সব খাচ্ছে। যাই হোক আবার ঐরূপ প্রায় দুজনের ভাত ভদ্রমশাই ঝোল দিয়ে শেষ ক'রে হাত গুটিয়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, আর দুটি ভাত, একটু অম্বল দিয়ে খাবো। ভিতরে আঁশ হেঁশেলে অম্বল ছিল না, ঠাকুরমাদের নিরামিষের দিকে ছিল। একটি ছোট পাথর বাটিতে দেওয়া হ'ল, এবার একজনের মতোই ভাত। কিন্তু ভদ্রমশাই

ভাত দেখেই বললেন, আরও দুটি নিয়ে এস তো? আবার আরও একজনের ভাত এনে দিলাম। তিনি সেটা ঐ অম্বলটুকু দিয়ে খেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, শেষপাতে একটু দুধ মিষ্টি খেয়ে থাকি,—একটু দুধ আর কলাটলা থাকে যদি, না থাকে ত একটু গুড় আর চাট্টি ভাত নিয়ে এসো।

পিসির আঁশের দিকে হাঁড়ি প্রায় খালি হয়েছিল,—যে ক'টি ভাত ছিল, তা একজনের মতোই;—শেষে নিরামিষ হেঁশেলের আতপচালের ভাত অতটাই, একটা বাটিতে দুধ আর গুড় দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর লাগবে কি? আগে খাই, বলে তিনি আরম্ভ করলেন। এমন সময় বাবা ভিতর থেকে চীৎকার ক'রে আমার নাম ধরে ডাকলেন, গিয়ে দেখি তিনি তেল মেখে কলতলায় যাচ্ছেন স্নান করতে, বললেন, আর যেতে হবে না ওর কাছে, তুই ওপরে যা।

ওপরে ঘর থেকে খড়খড়ির পাখি তুলে দেখতে আরম্ভ করলাম, তখনও খাচ্ছেন। খাওয়া হতেই উঠে পড়লেন, পেটটা ডবল হয়েছে —উঠে কলেই আঁচাতে গেলেন, সামনেই উঠানে কল ছিল। সেদিন আমরা বেলা তিনটার সময় ভাত পেলাম। যাই হোক বড় মামাও এটা লক্ষ্য করেছিলেন—তিনি বললেন, এ একটা রোগ, এ রোগের নাম তীক্ষ্ণাগ্নি। মুর্শিদাবাদের গঙ্গাধর কবিরাজ কর্তৃক এই রোগের চিকিৎসার কথা তিনি শুনেছেন,—যখন কবিরেজ মশাই কোন বড় জমিদারের চিকিৎসা করতে মুর্শিদাবাদের বাইরে গিয়েছিলেন তাঁর কন্যাই নাকি চিকিৎসা করেছিলেন। তখন সেই গল্পটি করেছিলেন আমাদের কাছে।

ভদ্রমশাই চলে গেলে, বাবা বাইরে এলেন, তখন বড় মামা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোকের কি এমন কেউ নেই যে ওঁর চিকিৎসা করায়, উনি ত আর বেশীদিন বাঁচবেন না। বাবা সব শুনে বললেন, ওকে বললে শুনবে না, ও যথাসর্বস্ব এমন কি

আত্মীয়-স্বজন সব বিসর্জন দিয়েছে, একটুও মিথ্যা বলে নি। এক সময় ও কত লোককে পয়সা দিয়ে চিকিৎসা করিয়েছে, ওর প্রাণে দয়া খুব। অর্ধেক বিষয় ত দান করেই গেছে, ও এক অদ্ভুত মানুষ, পয়সা হাতে থাকলে ওর কাছে এসে যে যা চাইবে তাই দিয়ে দেওয়াই ওর স্বভাব। ও বলে পয়সা কারো একলার নয়,—আমার পয়সা, ব'লে কোন কথা নেই। আমার কাছে আছে যতক্ষণ, কারো অভাব দেখলে আমি দিতে বাধ্য। দান আবার কি? ও ত অহঙ্কারের কথা,—মানুষ মানুষকে দান করবে কি, দাতার চেয়ে গ্রহীতা ছোট কি বড় এ হিসাব করবে কে? সব পয়সা মা লক্ষ্মীর —তিনি যার কাছে রেখেছেন সে মনে করছে আমার। ঐ আমার মনে করার চেয়ে ভুল আর কোন কিছু নেই।

বড় মামা বললেন, এ নীতি এখনকার দিনে অচল। কত রকমের মানুষই আছে দুনিয়ায়, সকলকার ত একই রকম ধারণা নয়? তা ছাড়া সম্প্রতি আমরা পয়সাকে বড্ড বড় ক'রে দেখতে শিখেছি—পয়সার জন্য মানুষ সব কিছুই করতে পারে এখন। আচ্ছা উনি বিয়ে করেন নি? ছেলেপুলে নেই?

বাবা বললেন, ওর পারিবারিক জীবন এক অদ্ভুত ব্যাপার,— বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল, তারপর, ও ধুমধাম ক'রে বিয়ে করতে গেল,—তারপর ছাঁদনাতলায় দাঁড় করিয়ে স্ত্রী-আচারের সময় ওর পায়ে যখন দই ঢেলে দেওয়া হ'ল তখনই ওর মাথা গেল বিগড়ে। ছাঁদনাতলা থেকে দৌড়,—এরা আমার পায়ে দৈ দিয়েছে, বলে। সেই থেকেই ও আর সহজ অবস্থায় আসে নি। কেউ কেউ বলে ওকে নাকি গুণ ক'রে নিয়েছিল কোন মেয়েমানুষ। কিন্তু ওকে আমরা যতটা জানি অত ঘনিষ্ঠভাবে আর কেউ জানে না। ও বেশ্যাবাড়ি গিয়েছে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে—বসে মদ খেয়েছে কিন্তু কখনও কোন নারীসঙ্গ দূরের কথা তাদের মুখের দিকে লক্ষ্যও কখন করে নি বা সারারাত বাইরে কাটায় নি। আমরা অনেক

প্রলোভন দেখিয়ে কোন রকমে ওকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করাতে পারে নি। মদে ওর নেশা হয় না। এমন কাকেও দেখি নি যে ওর সঙ্গে বসে সমান তালে মদ খেতে পারে। আমরা ওকে গুরুজী বলতাম। শেষে কিছুদিন এক তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তার সঙ্গে ভিড়ে কিছুদিন সাধন হয়ত করেছিল কিন্তু বেশী কিছুই হয় নি। শেষে ঐ সাধুর একটা কিছু সিদ্ধাই দেখে ভয়ে আর গেল না। বলে, সিদ্ধাই এসে ঘাড়ে চাপলে নামানো দায়। সিদ্ধাই থাকলে লোকের সর্বনাশ করার প্রবৃত্তি হবেই আর সেই সঙ্গে নিজেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। দূর দূর, ও ছাই সাধনা আবার মানুষে করে? সে সাধুকে আমরা দেখেছি। তিনি বলেন, ও চক্রে উলঙ্গ মেয়েমানুষ নিয়ে বসা দেখেই পালিয়ে এল। ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে কোন-রকমেই আর আনা গেল না। প্রায় হাজার দুই টাকা ঐ সাধুকে দিয়েছিল। ও তাকে বলেছিল যে মেয়েমানুষ না নিয়ে সাধনার ফল যদি কিছু দেখাতে পার ত দেখাও আমি নেবো। কিন্তু সেই তান্ত্রিক বলে, প্রথমে মেয়েমানুষ চাই, না হলে সাধনাই হবে না। ও বললে, আমার এমন সাধনে কাজ নেই; আমার বেদান্ত সাধন সবচেয়ে ভালো। সেই থেকে ও এখানে-সেখানে বেড়ায় শুনতে পাই, তবে পড়াশুনাও খুব করেছে। প্রায় সাত আট বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা নেই, এতদিন পরে আজ হঠাৎ এসেছিল। বড় মামা বললেন, আপনি ওর সঙ্গে কিছুই কথা বললেন না কেন? বাবা বললেন, হয়ত কিছু টাকা-কড়ি চেয়ে বসবে— মাস কাবার, হাতে পয়সা-কড়ির টানাটানি চলছে।

সারাদিনই ঐ গিরীন ভদ্রের কথা সারাক্ষণ ভেবেছি, রাতে শুয়ে শুয়েও। কি অদ্ভুত মানুষ!

আমার কিন্তু গিরীন ভদ্রকে মহাপুরুষ বলে মনে হয়েছিল। যদি আর একবার দেখা পেতাম ত একবার ভালো ক'রে দেখতাম মুখখানি তাঁর। অতি কোমল কণ্ঠস্বর—এখনও যেন কানে ধরা আছে।

স্কুল থেকে এসে, বড় মামার সঙ্গে বসে বসে ঐ গিরীন ভদ্রমশাই-এর অদ্ভুত জীবন এবং অসুখের কথাই হচ্ছিল,—কি সুন্দর সরল নিঃসঙ্কোচ মানুষটি। আমি বললাম, যদি আবার একদিন আসেন ত বেশ হয়। বড় মামা বললেন, তা হ'লে তোর বাবা রাগ করবে।

এমনই সময়, দেখি আমাদের পাড়ারই—রান্নুকাকা।

আমি জানতাম যে বাবা থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক দিনই ছেড়ে দিয়েছেন, সেদিন কিন্তু জানলাম যে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করলেও আসলে ভিতরের গূঢ় সম্বন্ধ যেটা অর্থাৎ গিরিশ ঘোষের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতির সম্বন্ধ সেটি ঠিক আছে, তা যাবার নয়। আজ বিকালে রান্নুকাকা, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—মিনার্ভা থিয়েটারের ড্যান্সিং মাস্টার, তখনকার বিখ্যাত নৃত্যসিদ্ধ লোক, আমাদের প্রতিবেশী, একই শ্রেণীর লোক, বাবার বন্ধু, সবাই জানত ইনি খুব রসিক লোক, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি কথা কন, ঝড়ের মতোই এমন তাড়াতাড়ি, এসেই,—এই, তোর বাবা কোথা? জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর পিছনে দেখি আরও একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, ঘোরালো মুখ, ঘন কাঁচা-পাকা চুল মাথায়, বাঁদিকে টেরী, কামানো দাড়ি, মুখের নীচের দিকে ভারী, বেশ মানানসই গোঁফ, মোটাসোটা, বিরাট মূর্তি, প্রসন্ন মুখে কথা কইতে কইতে এসে ঢুকলেন আমাদের সদর দরজায়।

এখন বাবা কোথায়? উত্তর দেওয়া সহজ নয়,—তাঁর প্রীতি-অপ্রীতির ব্যাপার আছে এর মধ্যে, কাজেই আমি বললাম, দেখে আসছি।

রান্নুকাকা বললেন, বল, গিরিশবাবু এসেছেন, শীগ্‌গির শীগ্‌গির যা দৌড়ে।

আমি নামটি শুনেছিলাম, মূর্তি আগে কখনও দেখি নি। এখন দেখলাম, হাঁ গিরিশই বটে মহাদেব যেন। দৌড়ে গিয়ে বাবাকে খবরটি দেওয়া মাত্রই শশব্যস্ত হয়ে বাবা হাজির হলেন। আমিও

একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। গৌরববোধ, বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কে? না—গিরিশ ঘোষ, বাঙলায় থিয়েটারের পিতা বলে সর্বত্র পূজিত।

বাবাকে দেখেই গিরিশবাবু প্রসন্নবদনে, জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, এই যে, রাজুবাবু। তোমার মূর্তিটি যে বড়ই সুন্দর দেখছি আজ, এখন বসো ত,—বলে বাইরের ঘরের সামনের লম্বা রকে নিজেই তিনি বসে পড়লেন। ভারি শরীর,—বাবাও বসলেন। রানুকাকা এই তক্কে, একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসছি, বলে চলে গেলেন। বাবা যেন কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে গিরিশবাবু, —আমাদের একেবারে ত্যজ্যপুত্তুর করলে নাকি রাজু?—ক' বছর হবে বলতো, দেখা নেই, বাবুর সঙ্গে? তারপর হঠাৎ বড় মামাকে দেখে পরিচয় নিলেন,—তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, ছেলে? বাবা বললেন, আজ্ঞা হাঁ। এমনই ময়লা একখানা কাপড় পরেছিলাম, আদুড় গায়ে—লজ্জা হ'ল এখানে থাকতে। এই রকম ভাবে পরিচয়ের পর চট ক'রে এখানে থেকে চলে আসাও যায় না, —কি করি,—দাঁড়িয়েই রইলাম।

বাবা বললেন,—অফিস থেকে খেটেখুটে এসে আর কোথাও যেতে ইচ্ছা হয় না। শুনে হেসে গিরিশবাবু বললেন,—ওহোঃ, সত্যি নাকি? তাই ত রাজু, বাপের সুপুত্র যাকে বলে, তা হ'লে তাই তুমি হয়েছ এখন; এটি কি ঠিক? তা যাই হোক, একটি সুখবর তোমায় দিতে এসেছি। তোমার শত্রু নিপাত হয়েছে,— তোমার সেদিকে আর ভয়ের কারণ নেই! বাবা হাসতে হাসতে বললেন, শত্রু? আমার না আপনার? গিরিশবাবু একটু চোখ টিপে বললেন, প্রথমে আমার তারপরে তোমার। ঐ হ'ল ধরে নাও না কেন? তারপর শোনো, এটা অবশ্য প্রথম খবর,—দ্বিতীয় খবর এই যে কাল শনিবার ছুটোর সময়, তোমায় একবার যেতে হচ্ছে,—কোন ওজর-আপত্তি চলবে না, রানু এসে তোমায় নিয়ে

যাবে। একটা দিনের জন্য। তোমায় একটু—এ পর্যন্ত বলেই গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ঠিক যাওয়াটা হবে ত?

বাবা বললেন,—আপনি এতটা কষ্ট করে এসেছেন যখন আমি ঠিকই যাব। তারপর আমাকে ওখান থেকে, বোধহয় সরিয়ে দেবার জন্যই উঠে এসে একটু তফাতে ডেকে ইশারা করে বললেন, যাও তুমি তাড়াতাড়ি তাওয়া দিয়ে এক ছিলিম তামাক সেজে আন। আমি তখনই সুড়সুড় ক'রে চলে এসে যথাকর্তব্য সকল কিছুই শীঘ্র সমাধা ক'রে বাবাকে খবর দিলাম। বাবা এসে নিজ হাতে কলকেটা গুড়গুড়িতে বসিয়ে নিয়ে চলে গেলেন, আমি আর গেলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গিরিশবাবু চলে গেলেন।

পরদিনও বড় মামা ছিলেন,—যখন রানুবাবু বাবাকে নিয়ে যেতে এলেন প্রায় দেড়টার সময়, সদরের রকেই আমরা ছিলাম। বড় মামা কালকের কথাবার্তা সবই শুনেছিলেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে বড় মামার পরিচয় করে দিয়েছেন। রানু খুড়োকে এখন বড় মামা ধরে বসলেন; বললেন,—দেখুন রানুবাবু, কালকে গিরিশবাবু ঐ যে চাটুজ্যে মশায়ের শত্রু নিপাতের কথাটা বললেন, সে রহস্যটা ত ভেঙে দিতে হচ্ছে। অবশ্য কতকটা আভাস কাল পেয়েছি, কিন্তু সবটা না শুনলে— কেমন যেন।

রানুবাবু বললেন, আগে রাজেনদাকে খবরটা পাঠিয়ে দিন, তাঁর তৈরী হয়ে আসবার মধ্যেই আমি বলতে পারব। আমাকেই খবর দিয়ে আসতে হ'ল। গিয়ে দেখলাম—বাবা কলতলায় সাবান মেখে স্নান করছেন, আমার বোন রাণী তাঁর পিঠে সাবান ঘষছে, বুঝলাম, যার নাম আধ ঘণ্টা। আমায় বললেন, এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে আয় রেনোকে। ইতিমধ্যে তাঁরা কথা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন। আমায় ত সাক্ষাৎভাবে ওঁদের কথার মধ্যে থাকতে দেবার কথা নয়, অথচ শোনবার লোভ, করলাম কি তাড়াতাড়ি, তামাকটা দিয়েই আমি উপর দিয়ে ঘুরে বাইরের সিঁড়ির একেবারে নীচে নয়,

দু তিনটে ধাপ উপরে, যাতে না দেখা যায় অথচ সব কথা শোনা যায়, এমনভাবে বসে বসে গল্পটা সব শুনে নিলাম। এক নাটকীয় ব্যাপার যা আমার কল্পনায় আসে না, তখন অবশ্য আসবার কথাও নয়। সেটা কিন্তু বলতেই হবে, না বলেও থাকবার যো নেই কারণ এর মধ্যে বাবার চরিত্রগৌরবের কথা আছে। শুনে মনে এত আনন্দ হয়েছিল যে সেদিনটা মনে করলে এখনও সুখ হয়। ব্যাপারটা এই—আমার মতন করেই বলছি।

রাজেনের সঙ্গে গিরিশের সম্বন্ধটা অনেক দিনের। বড় ঘনিষ্ঠ। স্কুল ছেড়ে দেবার পর থেকেই গিরিশবাবুর কাছে যাতায়াত সে কথা আগেই বলেছি। তাঁর নাটক এবং কাব্যের ভক্ত রাজেন, দীর্ঘকাল তাঁকে ভক্তির চোখেই দেখতে অভ্যস্ত হলেও উভয়ের স্বভাব প্রকৃতির দুর্বলতা এবং বৈশিষ্ট্য উভয়ের কাছে কিন্তু গোপন ছিল না। সেই কারণেই গিরিশবাবুর কাছে অধিকার সম্পর্কে রাজেনের সর্বত্রই অবাধ গতি ছিল, যা তাঁর অন্যান্য সহযোগীর ছিল না। এখন শেষ দিকের কথা,—ঐ সময় গুরুমুখ সিং বা রায় ঠিক মনে নেই একজন, কলিকাতার প্রসিদ্ধ, সৌখীন, ব্যবসায়ী ধনী ব্যক্তি। বিলাস-ব্যসনের রাজ্যে তাঁর অখণ্ড প্রতাপ, গিরিশবাবু তাঁকে দলে টেনে নিয়েছিলেন সবাই জানত।

একজন ধনী না হলে থিয়েটার হয় না। গিরিশবাবু তখন স্টারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ক'রে নূতন মিনার্ভা গড়েছেন ঐ গুরুমুখকে নিয়ে। থিয়েটারের সংস্রবে এসে গুরুমুখ হয়ে উঠল ঘোরতর বিলাসী ও লম্পট। মিনার্ভা তখন জমে উঠেছে। গুরুমুখের এক বাগান ছিল সিঁথিতে। নির্বাচিত নটনটীদের নিয়ে গার্ডেন পার্টি, মাইফেল এই হত সেখানে। গিরিশচন্দ্রের প্রিয়পাত্র এবং গুরুমুখের সঙ্গেও তখনকার দিনে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ, নির্ভীক রাজেনেরও তার মধ্যে একটা স্থান ছিল। তবে সকলেই এটা জানত যে এ সকলক্ষেত্রে রাজেনের লোভ ওখানকার উৎকৃষ্ট মদ্য ও ভোজ্য বস্তুর উপরেই

প্রবল ছিল, তার এত যত্নের স্বাস্থ্য যাতে নষ্ট হয় রাজেনের সেকাজে কখনও লোভ ছিল না।

এমনই এক মাইফেলে একদিন রাজেন সব শেষে, সন্ধ্যার পর উপস্থিত! কি কারণে তার যেতে দেরি হয়েছিল তা জানা নেই কিন্তু দেরিতে আসার জন্য হয়ত বিধাতার অভিপ্রায়কেই দায়ী করা যেতে পারে; কারণ তার ঐ দেরিতে আসার জন্যই ঐ ব্যাপারটার, ঐ ভাবের পরিণতি বিধাতার ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছিল। রাজেন ফটকে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে এসেই দেখতে পেলে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে, পথের পাশেই গোটা কতক গুণ্ডা শ্রেণীর লোক এক সঙ্গে বসে যেন কিছু পরামর্শ করার মতোই, বেশ সাবধানে কথাবার্তায় ব্যস্ত। রাজেনের দৃষ্টিটা ঐ দলের মধ্যে সলকারই মুখের উপর ঘুরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একজন তদের মধ্যে থেকে রাজেনকে দেখেই সোজা উঠে এসে হাসতে হাসতে সেলাম করলে। রাজেনের দেরি হ'ল না গোলাপ সিংকে চিনে নিতে। এই গোলাপ সিং এক সময় রাজেনের শরীররক্ষক ছিল, যখন প্রথম দিকে তার অত্যাচারে, তার পিতামাতাই কঠিন উদ্বেগে দিন কাটাতেন। পল্টনের কালীচরণ আসার পূর্বে গোলাপ সিংকে কিছুদিনের জন্য রাখা হয়েছিল তাকে সামলাবার কাজে। কাজেই সে খুব ভালই চিনত। এখন রাজেনকে সেলাম ক'রে দাঁড়াতেই, রাজেন—আরে গোলাপ সিং যে বলে, প্রফুল্লভাবে তার কাঁধে হস্তার্পণ করে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিলে। আদরে গলে গোলাপ সিং কথা কইতে কইতে রাজেনকে তাদের দল থেকে অনেকটাই দূরে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে এল, তারপর বললে,—বাবু একটা কথা বলবো, যেন আর কাকেও বলবেন না। আজ, রাত বারটার আগেই যেন এখান থেকে চলে যান, কোন প্রকারেই এখানে থাকা না হয়। কৌতূহলী হয়েও বটে আর একটা কিছু মারাত্মক বিপদের আশঙ্কাতেও বটে রাজেন তাকে ধরে বসল, ব্যাপারটা তোমায় বলতেই হবে।

তার এখনকার মনিব ঐ গুরুমুখের সে যতই নিমকহারামি না করবার প্রতিজ্ঞা করুক শেষ পর্যন্ত রাজেনের নির্বন্ধে পড়ে কথাটা না জানিয়েও পারল না। আজকে এই মাইফেলের উদ্দেশ্যটা বড়ই ভয়ানক। বিশেষ দুজনের পক্ষে এটা চরম ও সাংঘাতিক। প্রথম গিরিশবাবু,—তারপর, তখনকার দিনে মিনার্ভা থিয়েটারের উজ্জ্বলতম রত্ন তিনকড়ি দাসীর পক্ষে; একথা গোলাপ সিং যতটা জানত রাজেনের কাছে কিছুই লুকোয় নি।

মোটামুটি তিনকড়ির উপর গুরুমুখের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়েছে একথা রাজেনও জানত তবে শ্রাদ্ধটা এতদূর গড়াবে একথা সে কল্পনাও করে নি। গিরিশবাবু নিজের হাতে তিনকড়িকে গড়েছিলেন, দেখতেও সে সুশ্রী ছিল সুতরাং বিপত্নীক গিরিশবাবুর সঙ্গে তার প্রণয়-সম্বন্ধ তখনকার সবারই জানিত গুহ্য। গুরুমুখ বুঝেছিল তিনকড়িকে অধিকার করবার পক্ষে প্রবল বাধা ঐ গিরিশবাবু, যেহেতু তিনি তাকে একরকম যক্ষের ধনের মতোই আগলে রেখেছিলেন, তার গৃহে অপর কারো যাবার অধিকার ছিল না। আর থিয়েটারের সংস্রব না ছাড়াতে পারলে তাকে ঠিক মনোমতো নিজস্বভাবে অধিকার করা যাবে না। ভেবেচিন্তে একদা গিরিশবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গুরুমুখ এক দূতকে পাঠালে তিনকড়ির কাছে,—যত টাকা চাও আগাম দেবো এবং যা চাও তাই দেবো, থিয়েটার ছেড়ে আমার কাছে এসো. এই প্রস্তাব নিয়ে। বুদ্ধিমতী তিনকড়ি সময় চাইলে, বললে দু-একদিন পরে এসো, ভেবে বলবো। অবশ্য তখন তার প্রথম প্রতিষ্ঠার মুখ, গিরিশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে গুরুতর কোন কাজই করতে পারে না সে।

তার পূর্ব জীবনের কথা সে তখনও ভুলে যায় নি। অসহায়া ব্রাহ্মণের বিধবা মেয়ে, পিতৃমাতৃহীনা, ভর্তা অবস্থাবৈগুণ্যে যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছিল—অসাধারণ নাট্য-প্রতিভা তখন তার কোথায়? ঘোর দুর্দিনের অন্ধকারে দুঃখ-দারিদ্র্যের পেষণে দুর্বহ

হয়েছিল তার জীবন। কেবল এক অসাধারণ মনোবল, স্বাধীনা প্রকৃতি এবং অদম্য আত্মবিশ্বাস ছাড়া তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রতিভার আর কোন বাহ্য নিদর্শনই তখন ছিল না। এমনই সময়ে কোন ব্যথিত বন্ধুর মধ্যবর্তিতায় তার মিনার্ভা থিয়েটারে প্রবেশ এবং গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তার প্রতিভার প্রথম পরিচয় ঘটল। এ যোগাযোগ সে দৈব বলেই মানত এবং গিরিশচন্দ্রও কম মানতেন না, কারণ তিনকড়িকে পেয়েই তখন তাঁর ম্যাকবেথ নাটক সার্থক হতে পেরেছিল, তারপর জনার অভিনয়ে মিনার্ভার প্রতিষ্ঠা চরমে উঠেছিল। এ সকল ঐতিহাসিক সত্য তখনকার সকলের জানা কথা। তারপরে এখন, তার প্রতিভায় সে সচেতন হলেও গিরিশবাবু সম্বন্ধে তার গুরুভাব যথার্থই ছিল। যাই হোক সে যখন গুরুমুখের দূত মারফত প্রস্তাবের সকল কথা গিরিশবাবুকে জানালে, বিচক্ষণ গিরিশবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, থিয়েটারই তাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, তার জীবনের সার্থকতা এই রঙ্গমঞ্চ থেকেই। দু একজন ধনবান সাময়িক খেয়ালের বশবর্তী হয়ে হয়ত তার ধন ঐশ্বর্য কিছু বাড়িয়ে দিতে পারবে, কিন্তু তার প্রতিভার সমুচিত মূল্য দিতে কখনই পারবে না সুতরাং সকল দিক দিয়েই বিচার করলে থিয়েটার ছাড়া তার উচিত নয়, পরন্তু জীবন অধঃপতিত হবে এ কাজ করলে।

আগেই সে বেশ গভীরভাবে দেখেছিল কারণ—তিনকড়ি যথার্থই বুদ্ধিমতী ছিল,—সে ঠিক ব্যাপারটা বুঝলে এবং সেই কথাই জানিয়ে দিলে গুরুমুখকে। এবার, সহজ পন্থায় কাজ হ'ল না দেখে গুরুমুখ জটিল পন্থার অনুসরণ করলে; নৈরাশ্যের ফলে তার জিঘাংসাবৃত্তি জ্বলে উঠল। আসলে সে অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, চট্ ক'রে কিছু একটা ক'রে ফেললে না,—যদিও গিরিশবাবু প্রমুখ ঘনিষ্ঠতম যাঁরা ভয়ানক রকমই একটা কিছু হয়ত আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু ধূর্ত গুরুমুখ একেবারেই চেপে গেল। দুরভি-সন্ধিটা প্রচ্ছন্নই ছিল, বাইরে গুরুমুখের ব্যবহারে সৌজন্যের সীমা

ছিল না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, যেমন মাঝে মাঝে বাগানে মাইফেল চলছিল তেমনই চলতে লাগল। এইভাবে তিনকড়ি ও গিরিশবাবুকে পর্যন্ত সে বাইরের ব্যবহারে ভুলিয়ে দিলে যে সে, তিনকড়িকে চেয়ে পায় নি বলে আশা ছাড়ে নি, পরন্তু গুরুতর অপরাধমূলক এক কৌশল সাফল্য-মণ্ডিত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে।

এইভাবে কিছুদিন চলে গেল। প্রায় দু' তিন মাস পরে,—এবারে সে মক্ষম আয়োজন করলে। কেউ কল্পনাও করতে পারে নি এইবারের এই পার্টিতে কি হতে পারে এবং কি উদ্দেশ্যে এর প্রবর্তন। আয়োজন ত্রুটিহীন, তার অধীনস্থ ঐ আটজন গুণ্ডা ছাড়া আর কেউ জানত না আজ রাত্রে এখানে কি হবে। ভাগ্যক্রমে গোলাপ সিং এর মধ্যে ছিল আর রাজেন্দ্রনাথও বিধাতার বিধানেই বড় দেরিতে পার্টিতে যোগ দিতে এল। এমনই সময়ে যখন, শীতের দিন বলে তখন পার্টির কেউ আর নীচের বাগানের মধ্যে ছিল না, সবাই দোতলার হলে সমবেত হয়ে নানাবিধ আনন্দ উপভোগে মগ্ন ছিল।

গোলাপের কাছে সব কথা শুনে নিয়ে রাজেন ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললে। গায়ের জোরের ভক্ত হলেও রাজেনের মধ্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় তার বন্ধুবর্গ অনেক সময়েই পেয়েছে। সে এখন গোলাপের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ ক'রে ফেললে, তারপর বন্ধুভাবে রাম রাম ক'রে সেখান থেকে চলে গেল। এ বাগানে সে বহুবার এসেছে এবং রাত্রি যাপনও করেছে সুতরাং সর্বস্থানই তার পরিচিত। তবুও উপরে উঠবার আগেই সে একবার বিল্ডিং-এর চারদিক ভাল ক'রে ঘুরে ফিরে দেখে নিলে।

রাত প্রায় সাড়ে নটা, যখন রাজেন ওপরের হল-ঘরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে সামনে দেয়ালের ঘড়ি দেখলে। কথা আছে রাত বারোটার মধ্যে সবাই চলে যাবে, সারা রাত্ আমোদ-প্রমোদে শরীর নষ্ট হয় বলে নিরীহ গুরুমুখ এবারে এই নিয়ম করেছে। নীচের বড় ঘরে প্রবেশ করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে

দেখলে চারজন চমৎকার ঝকঝকে পোষাক পরা গুণ্ডা সিঁড়ির গোড়ায় পথের পাশেই দাঁড়িয়ে। বুঝলে আজ আর গিরিশচন্দ্রকে উপর থেকে প্রাণ নিয়ে নীচে নেমে আসতে হবে না। কি ভেবে সে থমকে দাঁড়াল সিঁড়ির গোড়ায়,—তারপর একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে কি যেন কোন গুরুতর জিনিস কিছু হারিয়েছে এমনভাবে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে পকেট চাপড়ে চাপড়ে একটু ভেবে নিয়েই সে ফিরল যে পথে এসেছিল। বেরিয়ে এল সে, এবং মালী ও চাকরদের ঘরের দিকে চলল। পুকুরের ধারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতেই যাকে সে খুঁজছিল তাকে পেয়ে গেল।

তিনকড়ি এবং গিরিশবাবুর সঙ্গে একজন চাকর এসে থাকে, বরাবরই—মাইফেলে অথবা গার্ডেনপার্টিতে,—যেখানেই তাঁরা দুজনে যান। রাজেন জানে,—চাকরের নামটি ফকির। জিনিসপত্র কাপড়-চোপড়, পানদোক্তা তাদের যা কিছু দরকারী নিয়ে আসে, রাখে এবং তত্ত্বাবধান করে, ফিরে যাবার সময় নিয়ে যায়। এখন ফকিরকে দেখলে মালীদের সঙ্গে ঘাটের ধারে বসে। তাকে আড়ালে ডেকে রাজেন বললে, এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যা, কোন ছুতো ক'রে যাবি,—চৌমাথার মোড় থেকে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস, খুব ভাল তেজী ঘোড়া হবে, এমনি একখানা গাড়ি ভাড়া ক'রে, এই বাগানের পিছন দিকে যে সরু গলি, সেই গলির মোড়ে রাখবি। আর তুই ঐ গাড়ির কাছেই থাকবি, ওখান থেকে কোথাও নড়বি নি যতক্ষণ না আমরা কেউ যাই। ভাড়া নিয়ে দর কষাকষি করবি নি, যা চাইবে তাই স্বীকার করবি। যা তুই এখনই, জিনিস-পত্তর সব পড়ে থাক যেখানে যা আছে।

একে বাঙালী চাকর, চালাক, তার উপর নাপিত বাচ্ছা, হাঁ করলে সব বোঝে,—সে বুঝলে গুরুতর কিছু হ'বে, সে তৎক্ষণাৎ চলে গেল। এদিকে রাজেনও বেশ প্রফুল্লমুখে নীচের হলঘর পেরিয়ে উপরের সিঁড়িতে পা দিলে।

মজলিস সেখানে ফুল সুইং-এ চলছে, উপরে উঠে সে হলঘরের দিকে দেখলে একদিকে গুরুমুখ এবং তার মোসাহেব দল। মুসলমানী নর্ত্তকী, আসর জমানো রূপার আসবাব, আতরদান, গোলাপফুল, মসলা ও পানদানাদি ভরা আসরের মধ্যস্থান, আর ওদিকে থিয়েটারের দল, মেয়েপুরুষ কয়েকজন রয়েছে কিন্তু গিরিশ কিংবা তিনকড়ি সেখানে নেই। গম্ভীর গুরুমুখ রাজেনকে দেখেই সম্ভাষণ করলে,—এত দেরি যে রাজেনবাবু? যথাযোগ্য উত্তর দিয়ে রাজেন বসে পড়ল তার কাছে একটুখানি। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কই ম্যানেজারবাবুকে তো দেখছি না? গুরুমুখ বললে, এইমাত্র উঠে গেছেন, বোধ হয় ছোট ঘরের দিকে,—এখনই আসবেন। বসুন না, গান শুনুন।

মিনিট পাঁচ সাত গান শুনে মহাস্ফূর্তিতে রাজেন তার গায়ের শালখানা গুরুমুখের পাশেই ফেলে রেখে এমনভাবেই উঠল যেন তার আসনটি পাকা ক'রে রেখে গেল। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে দেখলে গিরিশবাবু আর তিনকড়ি ছোট একটা ঘরের মধ্যে কথা কইছে—সুমুখে টেবিলে বোতল গ্লাস, প্লেটে খাদ্য। রাজেন বুঝলে, ওখানে আসরে বিলাতি খানা মাংসাদি ও মদ চলবে না বলেই ছোট ঘরে ব্যবস্থা। রাজেনকে দেখেই গিরিশচন্দ্র মহাখুশী হয়েই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন,—এসো এসো রাজু, এতক্ষণ কোথা ছিলে হে, দেখি নি ত? রাজেন গিয়ে দাঁড়াতেই তার মুখ দেখেই গিরিশবাবু উঠে সোজা হয়ে বসলেন,—কি ব্যাপার, রাজেন, তোমার আজ? রাজেন তাঁর কাছেই একটা আসনে বসে, ধীরে ধীরে বললে, —খুব করে খেয়ে নিন, আর খেতে হবে না জীবনে।

আশ্চর্য হয়ে তিনি বললেন,—কি সব বলছো রাজু, রাগ হয়েছে নাকি বাবুর? রাজেন আর গৌরচন্দ্রিকা না ক'রে গোলাপ সিং-এর কাছে যা শুনছিল খুলে বললে। রাত বারোটার পর সবাইকে বিদায় ক'রে, কেবল আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা কথা আছে বলে

আপনাকে আর তিনকড়ি ঠাকরুণকে রেখে দেওয়া হবে। তারপর সকল আলো নিবিয়ে আপনাকে গুম খুন ক'রে শেষে মৃতদেহ বাগানে একস্থানে গভীর গর্ত ক'রে পুঁতে রাতারাতি সেখানে একটা গাছ বসাবার ব্যবস্থা হয়েছে। তারপর তিনকড়ি ঠাকরুণও উধাও হবেন, তবে প্রাণের ভয় নেই। আরও বললে, আপনি এখন বন্দী। আগে থাকতে জানতে পেরে যে নীচে নেমে পালাবার চেষ্টা করবেন সে সম্ভাবনাও নেই সিঁড়িতে চার জন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে, বুঝেছেন? তাই বলছিলাম বেশ করে খেয়ে নিন।

গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ আজ মাইফেলের উদ্দেশ্য এবং বারোটার মধ্যে সবাইকে বিদায় করে দেবার কথা বুঝতে পারলেন কারণ ইতিমধ্যে গিরিশবাবুকে গুরুমুখ বলে রেখেছিল, আপনি যেন চলে যাবেন না, একটা বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ আছে, আমরা সবশেষে যাব। এখন এইসব ভেবে তাঁর নেশা ত গেল ছুটে। কি হবে, রাজু,—বলে তিনি ভাবতে আরম্ভ করলেন। তিনকড়ি শোনা মাত্র কেমন একরকম হয়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে তার মূর্ছার ভাব। রক্ষার উপায় এখন কি হতে পারে বল বাবা তুমি, বলে গিরিশবাবু রাজেনের হাতে ধরলেন। করেন কি আপনি,--রাজেন তাঁকে বললে,—স্থির হোন, দেখা যাক কি করা সম্ভব।

রাজেন কল্পনাও করে নি যে গিরিশবাবু এতটা ঘাবড়ে যাবেন। যাই হোক সে বললে, এখন ও সব রাখুন, যা বলি তাই করুন, একটু ডাঁটো হতে হবে। তা না হলে সব মাটি হবে। তারপর তিনকড়িকে বললে, কেমন অভিনেত্রী বোঝা যাবে এবার। এখনি ভালমানুষের মতো বড় ঘরে যাও, আর গুরুমুখের পাশেই আমার শালখানা ফেলে এসেছি দেখতে পাবে, সেইখানে বসে পড়বে, আর ক্রমে ক্রমে আমার শালখানা গায়ে জড়িয়ে নেবে, যেন শীতের জন্যই ওটা করেছ, বুঝেছ? ও শালখানা আমার বাবার—ওর মায়া আমি ছাড়তে পারব না তোমাদের জন্যে। তারপর শোন,--যখন আমি গিয়েই

ঘরে ঢুকব, আমার দিকে না চেয়ে আমায় যেন দেখ নি এমনভাবে শালখানি গায়ে জড়িয়েই আস্তে আস্তে উঠে অন্য দরজা দিয়ে এই ঘরে আসবে। তারপর যা করতে হয় করা যাবে। তবে মনে থাকে যেন, আমার ঐ ঘরে যেতে একটু দেরী হলেও কিছু মনে করো না বা ঘাবড়ে যেয়ো না। যতক্ষণ ওখানে তুমি থাকবে মহাস্ফূর্তিতেই থাকতে হবে, গুরুমুখকে কোন রকমেই উঠতে দিও না। এইটি যদি করতে পার, তার উপরেই সবার নিরাপত্তা নির্ভর করছে। যাও, এখনই তুমি চলে যাও, আর কোন কথা নয়।

এই বলে তিনকড়িকে শান্ত ক'রে রাজেন তাকে ওখান থেকে বার করে দিয়ে গিরিশবাবুকে বললে, দেখুন একমাত্র বাঁচবার উপায় এই ঘরখানার পাশেই ঐ যে বারান্দা তার শেষে উপরের পাইখানা —তার উত্তর দিকে যে খড়খড়ি আছে তার গরাদ নেই। সেই জানলা দিয়ে কোন রকমে আপনাকে নামতে হবে নীচে। গিরিশ-বাবু ভয় পেয়ে বললেন, ওকাজ আমি পারব না, বাবা। রাজেন বললে, তাহলে আমায় নামতে হবে আপনাকে পিঠে নিয়ে, দেখি আপনাকে বইতে পারব কিনা, বলে রাজেন তাঁকে পাজা কোলা ক'রে তুলে ওজন বুঝে নিয়ে তারপর ঝপ্ ক'রে একটা সোফার উপর ফেলে দিল ; বললে তা হতে পারবে।

তা হলে তিনকড়ির কি হবে! রাজু?

তার ঐ গুরুমুখ ছাড়া গতি নেই—ব'লে মুচকে হেসে রাজু একটু রসিকতা করলে। তারপর বললে,—যদি আপনাকে নিয়ে নামতে পারি তাহলে তাকে নিয়েও নামতে পারব। এখন আর দেরি করে কাজ নেই, ওখানে সবাই বেশ মসগুল হয়ে আছে, এইটিই অবসর। এখন একবার দেখে আসি পাইখানার দিকে কেউ আছে কিনা। দু মিনিট পর ফিরে এসে রাজু বললে, আসুন।

ভাগ্যক্রমে, বাড়ির একতলাটা মাত্র দশ ফুট উঁচু ছিল আর দোতালাটা ষোল,—তখনকার দিনে পুরানো ধরনের বাগান বাড়ি

হ'ত সেই রকম। যাই হোক গিরিশবাবুকে পিঠে নিয়ে রাজেন, খুব মোটা একটা আম গাছের ডাল যা হাতের মধ্যে ছিল সেটা ধরে, ঐ গাছের ডালে পা দিয়েই আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পাঁচিলের উপর দাঁড়াল। তারপর গিরিশবাবুকে নামিয়ে দিলে পাঁচিলের বাইরে সেই সরু গলির মধ্যে—বলে দিলে নির্ভয়ে সোজা চলে যান, বড় রাস্তায় ফকির গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিনকড়িকে নিয়ে যাচ্ছি।

অবশ্য তিনকড়িকে নিয়ে যেতে তার আধ ঘণ্টাও লাগে নি। হলঘর থেকে আসতে যা দেরি, তাকেও ঐ ভাবে পার করে পাঁচিলের বাইরে নামিয়ে রাজেন নিজেও লাফিয়ে পড়ল গলিতে। তারপর সেই প্রায় অন্ধকার গলি-পথে দুজনে এসে গাড়িতে যখন বসল তখন গিরিশবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। সেই রাত্রে তাঁরা বারোটার আগেই কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। সেই থেকে গিরিশ বলতেন, ও আমার পূর্বজন্মের বাপ ছিল।

যাই হোক শেষে গুরুমুখ জানতে পেরেছিল যে ঐ রাজেনের জন্যই তার শিকার হাত ফস্কে গেছে এবং তার প্রতিহিংসাবৃত্তি রাজেনের উপর পড়ল। গুপ্তহত্যা ওদের বাধে না, সামনা-সামনি হলে কথা ছিল। সেই থেকেই রাজেন সাবধানে শুধু অফিস যাওয়া আসাই করত, থিয়েটারের সঙ্গে সকল সম্বন্ধই ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাছাড়া রাত্রে কখনও বাড়ি থেকে বার হ'ত না। এই সেদিন গুরুমুখ মারা গেছে তাই গিরিশচন্দ্র স্বয়ং শত্রু নিপাতের কথা শুনিয়ে গেলেন। রাস্তা ঘাটে রাজেনের আর প্রাণের ভয় নেই।

এই ব্যাপার সবটা রামুকাকার কাছে পাই নি, এখানে মোটামুটি কাঠামোটা পেয়েছিলাম। গিরিশবাবু মারা যাবার পর একদিন আমাদের পারিবারিক আসরে বাবার মুখেই সম্পূর্ণ খুঁটিনাটি বিবরণটি পেয়েছিলাম তাই এটি এমনভাবেই বলতে পেরেছি।

পনর

এবারে পুজোয় ঠাকুরদাদামশাইয়ের সঙ্গে ও-বাড়ি গিয়ে আরও একটি এমন জিনিস দেখলাম, এর আগে তাতে লক্ষ্য পড়ে নি, হয়ত তখন ছিলও না বোধ হয়।

গাঙ্গুলীদের বংশ প্রকাণ্ড, বাড়িগুলিও তাঁদের একস্থানেই গায়-গায় কিন্তু পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত—যোগাযোগের দরজা বন্ধ করলেই সব পৃথক বাড়ি। যে-সময়ে ঠাকুরদাদামশাই আমায় নিয়ে পৌঁছোতেন তার প্রায় দু ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা পর প্রসাদ পাবার ঠাঁই হ'ত, কাজেই অতটা সময় কি ক'রে কাটানো যায় আমার পক্ষে—একটা বিবেচনার কথা। ঠাকুরদাদামশাই, অবশ্য এখন বড় হয়েই বুঝতে পারছি, যেন সারা বছরের আত্মীয়তা এবং দেখাশুনা পরিচয় সব কিছুই এই পূজার তিনদিন প্রসাদ পাবার নিমন্ত্রণের অবকাশেই শেষ করতে চান। তিনি গিয়ে বসলেই তাঁর বাল্যবন্ধু এবং আত্মীয়বর্গ একে একে হাজির হন, এক জায়গায় বসেই তাঁদের কথাবার্তা, সারা বছরের কর্ম-পরিচয় তামাক খেতে খেতে হতে থাকে। আমার উপায় কি?

শ্রীঅব্জপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়িতে বসে কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কথা হচ্ছে ৺অর্কপ্রকাশের ছেলেদের পড়া-শুনোর কথা, বক্তা ইন্দিরবাবু। ইনিও এক সংসারের কর্তা, তবে অবস্থা তত ভাল নয়। গাঙ্গুলীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনবস্থা, নিরীহ ভদ্র ব্যক্তি। শুনেছিলাম ইনি বলেছেন,—অর্কবাবুর ছেলেদের মধ্যে ঐ অধোন, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ছেলেটি গাঙ্গুলী বংশের গৌরবস্থল, এমন গুণবান ছেলে আর কোন বাড়িতে নেই। কি বিছে না

জানে,—ঐ অতোটুকু ছেলে ত, তখন ১৬-১৭ বৎসর এনট্রেন্স পাস করেছে, এল-এ পড়ছে, আর কি হাত ছবি আঁকতে। এক প্রকাণ্ড দেওয়াল-জোড়া ছবি এঁকেছে যে দেখছে ধন্যি ধন্যি করছে। কে এক সাহেব এসেছিল বাড়িতে, ছবি দেখে সে ত একেবারে অবাক। বলে, আমার বয়সে কখনও এমন দেখি নি। এই পর্যন্ত শুনেই ফট্ ক'রে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছবিখানা কোথায় দাদামশাই! ইন্দিরবাবু বললেন, কেন, ওদের বাড়িতে ঐ উপরের ঘরের বাইরের দেয়ালের মাথায়, পেল্লায় ছবি। এই পর্যন্ত শুনেই —মন উচাটন হয়ে উঠল। ছবি-আঁকাটা দেখতেই হবে।

যে বাড়ির কথা হচ্ছিল সে বাড়িতে অন্য কোন পূজা হয় না কেবল কালীপূজাই হয়, কাজেই নিমন্ত্রিত হয়ে ঐ বাড়িতে গিয়ে ছবি দেখবার আশায় থাকা আমার মতো চঞ্চল লোকের চলে কি? দুর্গাপূজার সপ্তমীর দিন থেকে সেই কালীপূজা পর্যন্ত অপেক্ষা করা অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ মাথার মধ্যে প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল,—কথা কইতে কইতে ঠাকুরদামশাই প্রমুখ বৃদ্ধ ব্যক্তিরা একটু অন্যমনস্ক হওয়ার সুযোগেই বেরিয়ে পড়লাম। পথ খুবই ভাল জানা, কোন বাড়ির ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গাঙ্গুলী লেনে পৌঁছোতে হয়,—তারপর অধোনকাকাদের বাড়িতে গিয়ে ওঠা। সকল বাড়ির প্রায় সবাই চেনে, আট দশ বছরের পরিচয়। কোন অসুবিধাই নেই। সবে এ বাড়ির অন্দর মহল পেরিয়ে গলিতে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি একজন ঐ গাঙ্গুলীদের বাড়ির সম্পর্কের হরিদাস পিসেমশাই, —এই যে রাজপুত্তুর, এদিকে কোথায় যাচ্ছ বল দিকিনি? বললাম, —অধোনকাকার ছবি দেখতে।

ও, হাঁ? বেশ, বেশ, যাও। তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠলাম ওঁদের বাড়ি। উপরের বৈঠকখানা অথবা পড়বার ঘরে অধোনকা' আর অলিকা' দু'ভাই বসে এক ফটো তোলবার ক্যামেরা নিয়ে কি করছিল। আমায় দেখে, অধোনকা' বিজ্ঞের ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,

কি মনে করে? বলেই কাকা কোনদিকে না চেয়েই নিজ কর্মে মন দিলেন। আমি বললুম, তোমার ছবি দেখতে। কোথায় সেই বড় ছবি,—ইন্দির ঠাকুরদাদা বলছিল ও-বাড়িতে?

ঐ ওপর দিকে বলে অলিকা' দেখিয়ে দিলে। অবশ্য কল্পনা আর বাস্তবে যে তফাত সেই পার্থক্য নিয়েই দেখলাম। ছবিখানা বড় বটে কিন্তু পেল্লাই নয়। তারপর রং দিয়ে আঁকা নয়; পেনসিল আঁকা ড্রইং,—তারপর, বিলিতি একখানা ছবির অলিওগ্রাফ যা বাজারে বিক্রয় হয় তাই, পাতলা কাগজে ট্রেস ক'রে ড্রইং করা। ছবির নীচে ছাপার মতনই হরপে লেখা আছে, নেলসনস্ ডেথ্ অন দি বোর্ড ভিকট্রি। অবশ্য অতবড় একখানা ছবি ফ্রেমে বাঁধানো, তার একটা গাম্ভীর্য আছে।

হাঁ ক'রে কি দেখচ, বুঝচো কিছু? কাকার গলার স্বরটা বরাবরই গম্ভীর, তীব্র, যেন আঘাত করে একজনকে। বললাম, কি বুঝবো? পূজা-বাড়িতে বাজনা বেজে উঠল কাঁসর ঘণ্টা ঢাক ঢোল সব,—এবার যাওয়াই ভালো।

অনেকক্ষণ বাদে যখন চলে আসছি, তখন কাকা জিজ্ঞাসা করলেন,—এতক্ষণ ত দেখলে, কিছু বুঝলে? আমি কি যে উত্তর দেবো বুঝতে না পেরে বললাম,—রং দিয়ে আঁকলে, আরও ভালো হ'ত না? তাড়াতাড়ি পালিয়ে চলে এলাম।

সেবারে ঠাকুরদামশাই ও-বাড়িতে প্রসাদ পেতে দুদিন দিনমানে শেষ নবমীর দিন রাত্রে, একখানি গাড়ি ক'রে আমাদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে এলেন। এই ব্যতিক্রমটা অর্থাৎ কখনও যে ব্যক্তি দিনের প্রসাদ ত্যাগ করে না, ঐ একদিনের ব্যতিক্রম ও বাড়ির সবাই মহা উদ্বেগের সঙ্গেই লক্ষ্য করেছিল। সে রাত্রে অজবাবু বললেন, তুমি আজ দিনে এলে না কেন, মহু? আমরা তোমার জন্য পাতা পর্যন্ত রেখেছিলাম। তোমার পাতা খালি, আসন শূন্যই রইল—কাজটা ভাল হল না। জন্ম থেকেই তাঁর

আমার বাড়িতে বরাবর একভাবে দিনমানেই প্রসাদ তিনি পেয়ে এসেছেন ;—মহাপূজার অনুষ্ঠানটা দিনেই আসল, রাত্রে পূজা নয় আরতি আর শীতল। দিনে প্রসাদ অবশ্য যারা মানে তাদের কথা। ঠাকুরদামশাই বরাবর মানতেন বলেই ঐ এক শেষদিনে রাত্রে প্রসাদ নিতে যাওয়াই তাঁর শেষ প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল। তিনি বলেন, আজ বাষট্টি বৎসর ধরে প্রসাদ পেয়েছি ভাই, কখনও কোন বৎসর বাদ যায় নি। এটা কম কথা নয়।

পূজার বিজয়া, আমার বাল্যকাল থেকেই একটা শোকের দিন আগেই বলেছি। কি যে আমার হয় তা জানি না, বুঝতেও পারি না —ঐদিন সকালবেলা থেকেই শুরু। বাড়িতে সিদ্ধি হয় সেদিন, সবাই খায়, মেয়েরাও বাদ যায় না। শোকের ভাব আমার যায় না, যতক্ষণ না ঘুম এসে আমায় অজ্ঞান ক'রে দেয়। বাবার সিদ্ধি আমিই বাটি সুতরাং অনেক বারই খেয়েছি, নেশাও হয়েছে কিন্তু আজ লুকিয়ে চুরিয়ে বেশী খেলেও আমি মনের দুঃখ এড়াতে পারি না। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও আমি ঐ বিজয়ার দিন কখনও আনন্দ মনে যাপন করতে পারি না, যতই উৎসবের মধ্যে থাকি না কেন। সবাই আনন্দ করে, বাড়িতে ভালো খাওয়া-দাওয়া হয়,—সবার সঙ্গে সকল কাজে লেগেও থাকি কিন্তু ঐ দিনের সেই বিসর্জনের সুর অতীব করুণভাবে আমার অন্তরে বাজতে থাকে।

যাই হোক বিজয়ার পরদিন থেকেই ঠাকুরদাদামশায়ের গয়াধাম যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। হাওড়ার রেলে কাজ করেন আমাদের এক প্রতিবেশী, তাঁরই সাহায্যে জেঠামশাই একখানা কামরা রিজার্ভ ক'রে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেঠামশাই-এর গুরুদেব ঐদিন হোম করবেন তারও আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। এ যাগে এক সহস্র নিখুঁত বিল্বপত্র, করবীর ফুল প্রভৃতি দিয়ে হোম হবে। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদির ব্যাপার ও চান্দ্রায়ণও আছে প্রথমে।

এটা ত্রয়োদশীর দিন বৃহস্পতি-বারেই। ঐদিন প্রভাতেই স্বামী

যোগানন্দ এলেন, আমরা সব প্রণাম করলাম, তারপর—সবাই তাঁকে ঘিরে বসল। ঠাকুরদামশাই ঐদিন উপবাস করে রইলেন। হোমাদি যাগ শেষ হতে বেলা প্রায় দু'টো হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার পর ঠাকুরদামশাই আমায় কাছে নিয়ে অনেকক্ষণ তাঁর ঘরে ছিলেন। ঠাকুমা,—যত কিছু সঙ্গে যাবে, তাই নিয়ে ব্যস্ত। জেঠামশাই, বাবা, কাকাবাবুরা কেউ আর বসে নেই, সবাই ব্যস্ত কেবল দাদামশাই আর আমি তাঁর ঘরে; তিনি মেঝের বিছানায় শুয়ে আর আমি পাশেই চুপটি ক'রে বসেছিলাম।

অনেক কথাই তিনি সেদিন আমায় বলেছিলেন। তার মধ্যে গোটা তিন-চার কথা আমার মনে আছে। সে কথাগুলি ভোলবার চেষ্টা করলেও ভোলা যায় না, আমি এখনও ভুলি নি। একটা কথা এই যে,—স্কুলে পড়, কলেজে পড়, আসল শিক্ষা আরম্ভ হবে স্কুল ছাড়বার পর, যখন নিজের ঘরে নিজের মনোমতো বিষয় নিয়ে মনের আনন্দে পড়া আরম্ভ করবে। অধ্যয়নের আনন্দ তখনই পাবে। স্কুলে বা কলেজে, ভবিষ্যৎ বিদ্যালাভের জমি তৈরি ক'রে দেয় মাত্র।

আর একটা কথা, তোমার মতো একটি বালক যেমন ভগবান সম্বন্ধে কিছুই জানে না বা বোঝে না, আমার মতো একজন বুড়োও ঠিক তেমনিই কিছু জানে না! যারা মুখে প্রতি কথায় ভগবানের নাম করে তারাও কিছু জানে না। যখন আমরা কোন কিছুতে আনন্দ পাই কিন্তু সে আনন্দ থাকে না, উবে যায় কাজ কর্মের মধ্যে ডুবে গেলে, সাধু সন্ন্যাসীরাও তেমনি, কখনও ভগবান সম্বন্ধে মনে মনে কালচার করে, বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু কখনও নিরবচ্ছিন্ন রাখতে পারে না তাদের কালচারটা,—ঘুরে ফিরে মনে মনে ঠিক সংসারের ব্যাপারে টাকা-পয়সার মধ্যে এসে পড়ে।

তাঁর সামনের দেয়ালে একখানা লিথোপ্রিন্ট, (যাকে চক্ লিথো বলে) শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ফ্রেমে বাঁধানো মূর্তি ছিল, অতি বিশ্রী ছাপা সেখানা। কালো ভূতের মতো চেহারা, তখন ঐ রকমই পাওয়া

যেত। তখন ফটো থেকে হাফটোন প্রিন্টের প্রোসেস বাজারে আসে নি, ইউ রায় মশাই সবে আরম্ভ করেছেন মাত্র। প্রিয়গোপালের উডকাটই তখনকার সর্বোত্তম ইলাসস্ট্রেশান, ঐ ছবির দিকে দেখতে দেখতে তিনি বললেন,—কি জানি আমার একটা কথা কেবলই মনে হয়, আমরা এঁকে কাছে পেয়েও অবজ্ঞা করেছি ; তখন ধন উপার্জন আর ইংরিজী লেখাপড়া ছাড়া এই এতটা বয়স পর্যন্ত আর কিছুই করি নি। যখন তিনি আর নেই তখন আপসোস। যাদের কিছু হবার নয় তাদের ঠিক এই রকমই হয় জানবে। তবুও আমি যেন এঁর কিছু আশীর্বাদ পাই কখনও কখনও মনে হয়। কেশববাবুর লেখা ইংরিজীতে যেটুকু, আমি মাত্র সেইটুকুই পড়েছি,—তখন কিন্তু আমার এদিকে কোন আকর্ষণ ছিল না। তুমি এঁর সম্বন্ধে একটু খোঁজ কোরো বড় হয়ে। চিরকাল ইহকালের যা কিছু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সেই কথাই আমরা ভাবি,—ব'লে চুপ করলেন। একটু পরে বললেন, আমরা ক্যারাকটারটাই বুঝি বেশী—সত্য ব্যবহার, যথাসাধ্য পরের উপকার করা, কারো অনিষ্ট না করা—এইসব আমরা সবার বড় মনে করতাম। জীবনে তাই সফল হতে চেষ্টা করেছি,—অবশ্য সেটাও কম নয়—আর সেইটিই আমার সান্ত্বনা। ভগবানকে পাওয়া আমাদের কাজ নয়। যারা ওসব করবে তারা সেইভাবেই জন্মায়। আমার ত তাই মনে হয়।

আমি এখানে আমার মত করেই দাদামশাইয়ের কথাগুলি বলেছি। তিনি বাংলা মোটেই জানতেন না। তাঁর ভাষা ইংরিজী কিন্তু সেদিন তিনি আমাকে যা বলেছিলেন তা তাঁর নিজের চলতি বাংলা, সে ভাবে দিলে ভাল হ'ত না বলেই তাঁর ভাবটা ঠিক রেখে সহজে যাতে বোঝা যায় তাই করেছি।

রাত ন'টায় ট্রেন। বেলা পাঁচটায় মালপত্র নিয়ে থন্নু চাপরাশি চলে গিয়েছিল। যাই হোক লক্ষ্য করলাম যাত্রার আগে, গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত তিনি খুব গম্ভীরভাবেই ছিলেন। শীত পড়ে নি বেশী,

কার্তিক মাস,—কিন্তু সাবধান হয়েছিলেন তিনি অতিরিক্ত,—পাছে রাত্রে কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগে। মেয়েদের নিয়ে জেঠামশাই সন্ধ্যার আগে চলে গেলেন, শেষের গাড়িতে ঠাকুরদাদামশাই বাবা কাকাবাবু এরা সব গেলেন। বাড়ি যেন অন্ধকার হয়ে গেল। সেই বিজয়ার দুঃখ যেন আমার বুকের ভিতরে চেপে ধরলে। তিনি আমায় গোপনে পাঁচটি টাকা দিয়েছিলেন,—ইচ্ছামত বই প্রভৃতি কিনতে। ঠাকুরমা দু'টাকা দিয়েছিলেন যা ইচ্ছা ভাল খাবার-দাবার কিনে খেতে। কিন্তু পয়সা হাতে থাকলেও মন ভালো ছিল না। বাড়ির ভিতর অন্ধকার— বাইরে কেবল একটা গ্যাস জ্বলছে। আমরা ন'টা নাগাদ খাওয়া-দাওয়া ক'রেই শুয়েছি।

আমার তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ যেন বাবার গলা পেলাম আমাদের খিড়কির দরজায়। দরজা খোলরে,—তার পরেই সব চুপচাপ। পিসিরা সব গোলমাল ক'রে উঠল। আমাদের পাশে পূর্বদিকে একখানা বাড়ির পরেই গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ি। বড় ডাক্তার বলেই তাঁর খ্যাতি। ঠাকুরদাদামশাইয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। দুজনেই একই রকমের বুড়ো, কেবল ডাক্তারের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে। গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ির কাছেই বাবার গলার আওয়াজ —একবার নেমে আস্থন দয়া ক'রে। দেখতে দেখতে গাড়ি ক'রে মেয়েরাও এসে পড়ল। আমি এক দৌড়ে গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ির ধারে গিয়ে দেখি—ডাক্তার তখন নেমেছেন, তিনি পালকির সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, এখানে নয়, ওদিক দিয়ে একেবারে তোমাদের সদর বাড়িতে পালকিটা নিয়ে যাও, এখানে দেখা স্থবিধা হবে না, আমি ঐখানেই যাচ্ছি।

আমি আবার এক দৌড়ে ভিতর বাড়ির খিড়কির দরজা দিয়ে একেবারেই সদরে এলাম। তখন সদর আলোয় আলো হয়ে গেছে। কাকাবাবু এসেছেন, গোবিন্দ ডাক্তারও এসেছেন, তাঁর নির্দেশ মতোই পালকি এসে সদর দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে একেবারে

নিচেকার বৈঠকখানার সামনে নামালো। বাবা জেঠামশাই আরও সব জোয়ান বান্ধবেরা খুব যত্নে তাঁর শরীর বার করলে, আর সাবধানে ঘরের ভিতর কোমল বিছানায় শুইয়ে দিলে। দাদামশাই কথা কইছেন ইংরাজীতে কিন্তু গলার আওয়াজ আর একরকম, আর কথা জড়ানো জড়ানো। ডাক্তারকে কাছে ডেকে কি বলছিলেন তিনি। একদিকের হাত পা পড়ে গেছে,—প্যারালিসিস্। রাত দশটার সময় আমাদের বাড়ি একেবারেই জমজমাট। পাড়াসুদ্ধ সবাই এসে জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

বৃহস্পতিবার রাত্রে এই ঘটনা, শুক্র শনি এবং রবি এই তিনটি দিন তিনি বেঁচে ছিলেন, রবিবার সন্ধ্যায় তিনি দেহত্যাগ করেন। এই তিনটি দিনে চিকিৎসার ব্যাপার যা হ'ল তা অদ্ভুত। শুক্রবার বেলা দশটা নাগাদ তখনকার মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল রাসেল এলেন,—গোবিন্দ ডাক্তারও ছিলেন, নানাভাবে পরীক্ষার পর স্থির হ'ল দক্ষিণ অঙ্গ সম্পূর্ণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত,—এ অবস্থায় যা যা করবার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা হ'ল। বটকৃষ্ণ পাল ও স্কট টমশন থেকে নানারকমের ওষুধ এল। এনামা দিয়ে প্রয়োগ করা হ'ল ঔষধ পথ্য সব। আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তার জয়কৃষ্ণ চাটুজ্জ্যে তখন এলাহাবাদে গিয়েছিলেন। তাঁকে তার করা হ'ল,—সেদিন অবস্থার কিছু পরিবর্তন হ'ল না দেখে পরদিন জেঠামশাই এক কবিরাজ আনলেন। তিনি বললেন, প্রথমে আমি একটা নস্য দেব, তাইতে যা ফলাফল দেখে পরে ঔষধ প্রয়োগ করা হবে। সবারই আপত্তি হ'ল যদি ঐ নস্যর ঝাঁজে হাঁচির সময় কিছু বিপরীত কাণ্ড ঘটে? কাজেই তা হ'ল না।

কেষ্ট গণককে ঠাকুমার ভয়ানক বিশ্বাস, পিসিদেরও কম নয়, —দ্বিতীয় দিনে বৈকালে সবাই দৈবের উপর বেশী নির্ভর দেখা গেল। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জেলেটোলায় প্রতাপ পালের বাড়িতে থাকেন। তান্ত্রিক এবং জ্যোতিষীও বটে। তিনি এলেন, সব

দেখলেন, শেষে বললেন, বাঁচানোর কথা বলতে পারিনি তবে মায়ের পুজো করব, তার জন্য একটি নির্জন ঘর চাই, আর পাঁচ বছর বয়েসের কুমারী একটি চাই, তারই উপর মায়ের মহিমায় যা কিছু হবার,—পুজোর পর জানা যাবে। পুজো হবে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, আয়োজন সব আগেই করা হ'ল। যেখানে দাদামশাইকে রাখা হয়েছিল ঠিক তার উপরে যে বৈঠকখানা, তার মধ্যেই সব আয়োজন হ'ল। মেজপিসির দ্বিতয়া কন্যা লীলা, তার বয়স পাঁচ,—আচার্য তাকেই পছন্দ করলেন। দেখতেও তাকে চমৎকার, যেন একটি পুতুল,—কথা কয় অনর্গল। সে ঘরে আর কেউ থাকবে না, পূজক আর কুমারী, অবশ্য পুজো হয়ে গেলে কারো যেতে বাধা নেই।

যাই হোক রাত্র বারোটার আগেই ওঁরা ঘরের মধ্যে গেলেন, আমরা বাইরে রইলাম। তিন কোয়ার্টার প্রায় নিস্তব্ধ,—সব চুপচাপ। ঘণ্টার শব্দ,—অল্পক্ষণেই স্থির, নিস্তব্ধ হবার পর—ভিতরে এক রকমের আওয়াজ হতে লাগল। তারপর সব স্থির হলে আচার্য, কুমারীকে সম্বোধন করে বললেন, এই ঘটের দিকে দেখত, মা, তুমি কি দেখছ কিছু,—বলো তো? লীলা বললে, একটা আলো। আমরা সব শুনতে পাচ্ছি বাইরে।

একটু পরে আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন আবার; শুধুই একটা আলো দেখছো,—হাঁ মা—আর কিছু দেখছ না?

এখন দেখছি, মা কালী রয়েছেন।

তোমার ভয় করছে না? লীলা বলল,—না ভয় করবে কেন?

মায়ের মূর্তি কেমন দেখছ, বলত মা?

চমৎকার, সুন্দর, কালো নয়ত,—যেন,—বলেই চুপ করলে।

আচ্ছা মায়ের মুখখানি দেখত, ভালো করে দেখত, কি ভাব দেখছ?

হাসছেন, সুন্দর—আমার দিকে চেয়ে আছেন।

আচ্ছা দেখ তো মা, তোমার দাদামশাই, যাঁর অসুখ করেছে, তিনি কি ওখানে আছেন?

হাঁ এখন তাঁকেও দেখতে পাচ্ছি।

কোথায়? এই কথা শুনে লীলা চুপ করে রইল। আচার্য বললেন,—ভালো ক'রে দেখ তো তিনি কি মায়ের পায়ের তলায়? লীলা বললে,—না।

তবে কোথায়? লীলা বললে,—মায়ের কোলে।

ভালো করে দেখ তো মা, বলে আচার্য—এক কুষি জল ছিটিয়ে দিলেন ঘটের উপর। বাইরে থেকে কোষাকুষি ব্যবহারের শব্দ পেলাম।

লীলা বললে,—হাঁ মায়ের কোলেই তো দেখছি। শুনে আচার্য বললেন, মাকে প্রণাম কর।

লীলা প্রণাম করলে,—ভূঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে। তারপর উঠে যখন আসনে বসল, তখন আচার্য আবার জিজ্ঞাসা করলেন, এবার কিছু দেখছ? লীলা বললে, না—আর কিছু না।

শেষ হয়ে গেল পুজো, আচার্য সবাইকে বললেন,—মা কোলে নিয়েছেন, আর কারো অধিকার নেই সেখানে।

যাই হোক তৃতীয় দিন রবিবার—সন্ধ্যায় প্রাণান্ত হ'ল। বাড়িময় আত্মীয় কুটুম্ব, স্বজন-বন্ধুবান্ধবে ভ'রে গেল। আমার মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে আমার মনে ভয়ের ভাব একেবারে কেটে গেল। শ্মশানেও গিয়েছিলাম দলের সঙ্গে। পরদিন যখন স্নান ক'রে ফিরে এলাম তখন আটটা।

বাবা, কাকাবাবু, জেঠামশাই ও বড় কাকা এই চারজনেই কাছা গলায় দিয়ে বাড়িতে ফিরলেন। যদিও জেঠামশাই ও বড় কাকা তাঁরা ঔরস পুত্র নন তবুও তাঁরা ঠিক পুত্রের মতোই সব কিছু করলেন। এই উপলক্ষে একটা প্রবল কর্মপ্রেরণা সবার মধ্যে দেখা দিয়েছিল।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ঠাকুরদাদামশাইয়ের পূর্ববঙ্গে বিবাহিতা বড় ভগিনীর সন্তান, সুতরাং তাঁর ভাগনে। বাড়ির সবারই গোবিন্দ-দাদা। তিনি ছিলেন করোটিয়া স্টেটের সুপারিণ্টেডেণ্ট। ভাগ্যক্রমে

তিনিও এখানে ছিলেন, তাঁর আসবার কথা নয় কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনি হঠাৎ এসে পড়লেন। তিনিই এ বাড়ির সর্ববিষয়ে এখন এঁদের পরামর্শদাতা, যেহেতু বয়োজ্যেষ্ঠ। শ্মশান থেকে ফিরে যখন সদরে আমরা ঢুকছি, দেখা গেল গৃহ চিকিৎসক জয়কৃষ্ণবাবু চাদরখানি মুখে ঢাকা দিয়ে অশ্রুপাত করছেন। টেলিগ্রাম পেতে তাঁর দেরি হয়েছিল।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ ক'রে বাইরে থেকে সবাই ভিতরে এসে ঠাকুরদাদামাশাইয়ের ঘরে ঢুকলেন, গোবিন্দ গাঙ্গুলী সবার আগে। সবাই বসল, ঠাকুমা চাবি দিলেন, ছোট কাকাবাবু লোহার সিন্দুক খুললেন এবং ঠাকুরদাদামশাইয়ের উইলখানি বার ক'রে গোবিন্দ জেঠার হাতে দিলেন। তিনি খুলে সেখানি সর্বসমক্ষে পাঠ করলেন। ইংরাজীতে লেখা। প্রথমে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ, তারপর দান —ভদ্রাসন, ভবনীপুরে পাঁচ কাঠা জমি, পোস্তার কারবার ও নগদ সব মিলিয়ে মূল্য আশি থেকে পঁচাশি হাজার। পাঁচ কাঠা জমি পাঁচ মেয়েদের নামে, দুই ছেলেকে দুশো টাকা মাত্র কারণ তাঁরা কৃতী,—বাকী যা কিছু সবই ঠাকুরমার অধিকারে।

দাদামশাই-এর মৃত্যু তারিখ পর্যন্ত আমার মনে গাঁথা আছে। রবিবার ৩০শে অক্টোবর ১৮৯৮ ইংরাজী সাল,—১৫ কার্তিক ১৩০৫ বাংলা। এই যে তাঁর তিরোভাব, শুধুই যে আমাদের সংসারের পরিবর্তন তা নয়, আমাদের সংসারের প্রত্যেক পুরুষের জীবনে, পরিবর্তন এনেছিল। বিশেষত আমার—এখন সে কথাই বলবো।

ঠাকুরদাদামশাইকে হারিয়েছি,—এই জ্ঞান যখন থেকে অন্তরে ক্রিয়া করতে আরম্ভ করলে তখন থেকেই আমার মধ্যে প্রকৃতির পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। এতাবৎ আমার প্রকৃতিগত ব্যবহারের অনেক কথাই বলা হয় নি এখন সেই কথাই বলছি। আমি যে অত্যন্তই অস্থির প্রকৃতি এটা আমার চেয়ে কে বেশী জানে?

ষোল

জীবনে শোক প্রথম অনুভব করলাম ঠাকুরদামশাইয়ের মৃত্যুতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নয়। এই অনুভবও একটু বিচিত্র। সেই রাত্রে, হাওড়া থেকে তাঁকে নিয়ে আসা, অতঃপর চতুর্থ দিনের সন্ধ্যায় মৃত্যু পর্যন্ত যা যা ঘটেছিল সব কিছুই চোখের সামনে দেখলাম। মৃত্যুর পর যেন দর্শকের মতোই সবার কান্নাকাটি শুনলাম, সমবেত শোকের উচ্ছ্বাস সে বড়ই অশান্তিকর। সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তি এমন কি বড়দের দেখাদেখি ছোটদেরও কাঁদতে দেখলাম, এমন কেউ ছিল না এখানে যে কাঁদে নি, এক আমি ছাড়া। আমার সমবয়সী পিসতুত ভায়েরাও—দাদামশাই, ও দাদামশাই ব'লে কেঁদেছিল। এমন কি একজন তাদের মধ্যে আমার ভাব লক্ষ্য ক'রে একথাও বললে,—কি ছেলে তুমি বাবা, দাদামশাইয়ের জন্য তোর একটু দুঃখও হচ্ছে না, তোকে যে তিনি আমাদের সবার চেয়ে বেশী ভালবাসতেন।

সত্য সত্যই মর্মে মর্মে অনুভব করলাম কথাটা। কিন্তু কি বলবো—উত্তরে,— কি করবো ভাই, আমার যে কন্না আসছে না,—ব'লে উঠে গেলাম। অবশ্য তারা এটা অদ্ভুত ব'লে মনে করলে হয়ত,—কিন্তু তখন আমার মধ্যে শোক, দুঃখ অথবা একটা উদ্বেগ এসব কিছুই ছিল না। কেবল ছিল একটা গভীর বিস্ময় আর তার পিছনে অন্তর্মুখী যেন হাহাকার যা বাইরের সবার প্রভাব সেই হাওয়ায় ভরে উঠেছিল। এত চিৎকার, এত রকমের ডাক ছেড়ে কান্নার জন্যই বোধহয় আসল শোকের স্বরূপ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বলতে অবশ্যই বাধে, কিন্তু সত্যই তাঁর মেয়েদের মধ্যে যেন যথাসাধ্য ডাক ছেড়ে গলা ফাটিয়ে ফেলার প্রতিযোগিতা লেগে গেল,—বাবা

তুমি আমাদের বড্ড ভালবাসতে, আমাদের কার কাছে দিয়ে গেলে এই ছিল তাঁদের জিজ্ঞাসা ?

একটি কথা তখনই আমার মনে হয়েছিল যে,—তাঁদের ঐ উচ্ছ্বাসের মধ্যে যিনি মারা গেলেন তাঁর জন্য যে গভীর শোক, তার চেয়ে ভবিষ্যতে তাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব কার সেই প্রশ্নই ছিল প্রবল ও প্রধান অনুযোগ। ঐ সব কারণে, প্রবল চিৎকারে আর এক সঙ্গে এতগুলি মেয়েদের গোলমালে শোকের অনুভূতি আসতে পারলে না আমার ভিতরে, বরং শ্মশানে গিয়ে এক রকমের অনুভূতি আমার মধ্যে জেগেছিল সেটি শোক না হলেও এমন কিছু যা আমাকে অনুভবের দিক থেকে যেন অনেকটাই এক গভীর ভাবরাজ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল! সংসার সম্বন্ধে যেসব ব্যবহার পরিচয় আগে ভয়ের বিষয় ছিল, এরপর সে-সব হালকা আবার কতক উপেক্ষার বিষয় হয়ে গেল।

অশৌচের দিনগুলির মধ্যে চতুর্থ দিন সকালে ঘুম ভাঙলো ঠাকুরদাদামশাইকে স্বপ্নে দেখে। তিনি যেমন আদর করেন আমাকে —সেই ভাবের স্বপ্নটা, ঘুম ভাঙতেই মনে হ'ল তিনি ত নেই। এই মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণের ভিতরটা কেমন করে উঠল, বুকের মধ্যে তখনই এমনভাবে মোচড় দিয়ে উঠল—তারপর বেদনার সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল এল, এইবার শোক অনুভব করলাম। তখন থেকেই অবিচ্ছিন্ন কান্না আমার শুরু হ'ল।

গোড়া থেকেই আমায় কেউ কাঁদতে দেখে নি, কাজেই এখন চোখের জল কাকেও দেখানো হবে না। যত চেষ্টা করি সংযত হবার কিছুতেই মানা মানে না। যখন কিছুতেই চাপতে পারলাম না তখন হাল ছেড়ে দিলাম। লুকিয়ে লুকিয়ে যতটা সম্ভব সারা সকালটা ছাদের উপর কাটালাম। দেখি আমাদেরই একজন, যিনি তখন চোখে জল না দেখে সেই মৃত্যুর রাত্রে আমার অদ্ভুত প্রকৃতি নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, বিধাতার নির্বন্ধে এখন তিনিই ঘুড়ি

লাটাই নিয়ে ছাদে উপস্থিত। আমার ঐ অবস্থা দেখে তখনই আবার মন্তব্য করে বসলেন,—বাঃ বাঃ! বড় মজার ছেলে ত তুই, যখন লোকটা মারা গেল, সবাই কাঁদছে তখন তোর চোখে এক ফোঁটা জল নেই, দিব্যি ফুর্তিতে, এঁ্যা? আর এখন পাঁচদিন পর শোক উথলে উঠল, ছাদে এলি কাঁদতে—একখানি চিজ বাবা!

যাই হোক যথার্থ শোক বা বিয়োগ দুঃখ তখনই অনুভব করলাম। তাঁর প্রত্যেক ব্যবহারের কথা মনে আসে আর অশ্রুজল রোধ করতে পারি না। তখনই বুঝলাম যে আমি কি বস্তু হারিয়েছি। অসহায় এই কঠিন, পীড়িত বাল্য জীবনে তিনি আমার একমাত্র সহায় ও শান্তির প্রলেপ ছিলেন, আমার দুষ্ট চঞ্চল স্বভাবের জন্য যত অন্যায় যত অকর্মের নালিশ সবাই তাঁর কাছেই করত. আর তিনি ক্ষমা ক'রে সংশোধনের চেষ্টাই করেছেন। একখানা লম্বা বেত সর্বদাই থাকত তাঁর হাতের কাছে কিন্তু ভয়ঙ্কর রাগলেও আমায় তিনি কোনদিন মারতে পারেন নি। প্রতি রাত্রে, আহারের পর শুতে যাবার পূর্ব পর্যন্ত ঐ সময়েই তাঁর যত কথা আমার সঙ্গে। এইসব কথা মনের মধ্যে কাঁটার মতোই বিঁধতে থাকে আর অশ্রুজলের বেগও বাড়তে থাকে। যেদিন তীর্থযাত্রা করেন সেদিন যেসব কথাগুলি বলেছিলেন তার স্মৃতি আমার সারাজীবনব্যাপী, আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমার মর্মজীবনে সেইগুলিই সার এবং সম্বল হয়ে ভবিষ্যতের পথে গতিদান করেছে। আমার জীবনে যে গতি অবধারিত তা যেন তিনি ঐ অবস্থাতেই জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যই এখন ভেবে দেখি তাঁর ঐ কথাগুলি আশার বাণী হয়েই বরাবর দেখা দিয়েছে আমার জীবন পথে। যদিও তখন থেকে আরম্ভ ক'রে আঠারো বৎসর বয়স পর্যন্ত আমার জীবন বিপথগামী হয়েছিল সত্য কিন্তু তার পর থেকেই ঠিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল যা উত্তর উত্তর সেই ধারাতেই চলেছিল, যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন আমাকে গড়তে।

এখন থেকে অর্থাৎ তেরো বছর থেকে সতেরো আঠারো পর্যন্ত

আমার অধঃপতনের কাল। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর অনেক আমার সাহস এসেছিল,—অনেক কিছু অনুভব আমার মধ্যে এসে- ছিল যা হয়ত আমাদের দলের আর কারো ছিল না। দল বলতে দুটি বা তিনটি। প্রথম, পারিবারিক সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে বাড়িতে ব্যবহার ছিল, পিসিদের ছেলেপুলে, দ্বিতীয় স্কুলের, সহপাঠিদের একদল আর মামার বাড়ির একদল। যদিও এরপর মামার বাড়ির যাতায়াত অনেকটা কমে গিয়েছিল। বারে কম হলেও অবস্থিতিকালটা বেড়েছিল।

স্কুলে যাওয়া তখনও চলছে বটে কিন্তু লক্ষ্য অন্যদিকে গিয়েছিল। ক্লাসে সৎসঙ্গ ছিল না, লাস্ট বেঞ্চের ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ। আগে বলেছি, রামব্রাহ্মবাবুর মুখখানি দেখতে ঠিক রামকৃষ্ণদেবের মতো, আমার পক্ষে তা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণের বস্তু। তিনি একদিন ধরে ফেললেন যখন পড়ার সময় লাস্ট বেঞ্চে বসে তাদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছি তাঁর আসন থেকে লক্ষ্য করেই বললেন,— হাঁরে তুই আজকাল ঐদিকে বসিস কেন বল ত? এদিকে আয়।

লজ্জিত, ক্ষুব্ধ এবং জড়সড় হয়ে দাঁড়ালাম তাঁর কাছে। কানটি আমার আলতোভাবে ধরে বললেন,—তোর আবার এত উন্নতি হ'ল কবে থেকে? শেষে বললেন,—ঐখানে যা, আর যেন না ওখানে দেখি।

কিন্তু তা বললে কি হয়, টিফিনের ছুটি আছে, অন্য পিরিয়ড আছে। ঘনিষ্ঠতার কোন ব্যাঘাত হয় না। ঠিক চলেছে, তারপর ক্রমশ স্কুল পালানোও শুরু হয়ে গেল। স্কুলে না এসে পরামর্শ মতো গড়ের মাঠে না হয় হেদোর ধারে মিলন-বৈঠক বসে আমাদের কত কিছু হয়।

বাড়িতে তখন নভেল পড়া শুরু হয়ে গেছে। চৈতন্য লাইব্রেরী থেকে কাকীমার দু'খানা ক'রে বই আসে সুতরাং নভেলের অভাব হয় না। আর অন্যদিকে বাবার ইংরাজী নভেলের স্তূপ, রেনল্ড

থেকে শুরু করেছি। যোসেফ উইলমট চারখণ্ড পড়া হয়ে গেছে। এই প্রথম ইংরাজী নভেলের প্রভাব আমার মধ্যে ঢুকল। তুলনা-মূলক আলোচনাও চলে, যোসেফের বৈচিত্র্যময় জীবন কি চমৎকার। আমার ঐরকম জীবন ভালো লাগে। আঙ্কল্ ল্যানোভার যোসেফের প্রথম জীবনের অভিভাবক সেই ভয়ঙ্কর লোকটার বাবার কথা মনে মনে তুলনা করি,—খুড়োর ভয়ে যোসেফের বাড়ি থেকে পালানো —আমারও বাবার ভয়ে বাড়ি থেকে পালানো। ঠাকুরদামশাইয়ের দেহত্যাগের পূর্বে তিনবার হয়ে গেছে। তবে যোসেফের সঙ্গে তফাত এই যে আমার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়েছে। এবার ভেবেছি পালাবো দূর দেশে পশ্চিম অঞ্চলে, আর ফিরে আসবো না মানুষ না হয়ে।

যাক্ কার্তিক মাসের দিনগুলি আমার এক রকম উত্তেজনার ভিতর দিয়েই কেটে গেল ; বাবার ভাবটি কিন্তু আর একরকম দেখা গেল। ঠাকুরদামশাইয়ের উইলখানি পড়ার পর থেকেই দেখলাম তাঁর মধ্যে একটা চাপা অনুশোচনার ভাব ক্রিয়া করতে আরম্ভ করেছে, সময় সময়, অবশ্য শ্রাদ্ধশান্তি চুকে যাবার বেশ কিছুদিন পর,—সবার সামনেই মুখ ফুটে বলতেও শুনলাম যে, এইবার আমার দুঃখের দশা আরম্ভ হ'ল, ছাপোষা মানুষ আমি, আমার যে কি হবে, এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলাম কিছুই তখন বুঝি নি।

আশ্চর্য লাগে ঐ বাবার এ ভাবের অনুতাপ! চমৎকার আমাদের সংসারটি। এখন তার চেহারা বদল হয়ে গেল, নাটকীয় ভাষায় যার নাম পটপরিবর্তন।

বাচ্চা অবশ্য তাঁর অনেকগুলি বটে, তাদের পোষণের কাজ ত এতদিন ছিল না। এখন অবশ্য ঠাকুমাই সংসার চালাচ্ছেন কলসীর জল ঢেলে। তবে এভাবে বেশীদিন চলবে না, এই কথা মনে করেই বাবা কথাগুলি বলেছিলেন। শুনে ঠাকুমা চুপ করে রইলেন কিন্তু পিসিদের একজন তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন,—

এতদিন চালের কত দর, না—বাপের ভাতে আছি,—এখন থেকে ত আর তা রইল না, এখন বোঝ দাদা।

এত অল্প দিনের মধ্যে এই পরিবর্তন পিসিদের মধ্যে এসেছিল। না হ'লে বাবার মুখের উপর এভাবের উত্তর দেওয়া কয়েকমাস আগে কোন পিসিরই সাধ্য ছিল না।

দাদা কিন্তু বুঝলেন,—তবে সহজভাবে নয়। সেকথা পরে। এখন, আমার অবস্থার দিক দিয়ে পরিবর্তনের প্রথম এইটুকু দেখলাম, মাসখানেক হবে—আমার উপর কোন অত্যাচার হ'ল না, এই এক-মাস আমি যেন মুক্তির আস্বাদ কতকটা পেয়েছিলাম। তারপর বাবা নিজমূর্তি ধরলেন,—আর আমারও ভিতরে ভিতরে পালাবার পরিকল্পনা চলতে লাগল। দেখতে দেখতে ফাল্গুন মাস চলে এল। একদিন রাত্রে দেখি, ঠাকুরমার ঘরে জ্যাঠামশাইকে নিয়ে সভা বসেছে। বাবা সেখানে নেই, তিনি ছাদে বই ও গুড়গুড়ি নিয়ে শুয়েছেন, যেন এখানে তাঁর দরকারও নেই।

এখন উপনয়নের যোগ্য হয়ছি আমি, এই ফাল্গুনে উপনয়ন, কারণ ঠাকুরদামশাইয়ের সংকল্প ছিল এই ফাল্গুনেই পৈতে দেবেন। অনেকদিনই দশ বছর পেরিয়ে গেছে। কথা হচ্ছিল এই ফাল্গুন মাসেই হবে। ঠাকুমা এখন জিজ্ঞাসা করলেন, কত খরচ হবে যোগিন্দর ?

যোগিন্দর বললেন, রাজেন্দরকে ডাক না, তারই ত ছেলের পৈতে। অমনি একজন ভাগনে ছুটলো ছাদে সমাচার নিয়ে, আমিও পিছনে পিছনে গেলাম, কি হয় দেখতে।

মামা, মামা, তোমায় দিদিমা ডাকছে।

বিরক্তভাবে, বই থেকে চোখ তুলে, মুখ থেকে গুড়গুড়ির নল না নামিয়ে, মামা বললেন,—কেন ?

ধনের পৈতে হবে তাই—কথা—

ঐ অবধি শুনেই, মামা বললেন—যা, যা।

ব্যাস। মামার উত্তর নিয়ে ফিরে এল ভাগনে।

—কি চমৎকার, আমার পৈতে হবে, আমি ব্রাহ্মণ হ'ব, সন্ধ্যাহ্নিক করবো, গায়ত্রী জপ করবো। কি আনন্দ যে হ'ল।

একটা কথা এখানে ব'লে রাখা ভালো—ঠাকুরমার কলসী থেকে প্রতি মাসে দেড়শ' ক'রে সংসার খরচ হচ্ছে, তা ছাড়া নানাদিকে নানা খরচ লোক-লৌকিকতা ইত্যাদি সবও ঐ ঠাকুমার কলসী থেকেই হচ্ছে। এখন আর একটা দমকা খরচ এই উপলক্ষে। জেঠামশাই বললেন,—কাকী! নমো নমো করে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে সেরে দাও, এখন আর তোমায় তো কেউ কিছু দেবে না।

ঠাকুমার কথা বলবার আগেই পিসিরা একবাক্যে জেঠামশাইকে সমর্থন করলেন। কিন্তু ঠাকুমা ও কাকাবাবু একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন। ওমা তাও কি হয়, তাঁর পোউত্তুর,—সবে চার মাস তিনি গেছেন স্বর্গে,—এরই মধ্যে একাজ নমো নমো ক'রে কি করে হবে, যোগিন্দর?

কাকাবাবু বললেন,—এই চার পাঁচ মাস তিনি মারা গেছেন, এরই মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে নমো নমো? ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে যে। লোকে বলবে কি?

অতএব ইজ্জত রক্ষা ক'রে ধুমধামের সঙ্গে আমার উপনয়ন হয়ে গেল। ঠাকুরমার কলসী থেকে দমকা হাজার টাকা জল হয়ে বেরিয়ে গেল।

মেজ পিসেমশাই আমায় সন্ধ্যার মন্ত্র দেখিয়ে দিলেন, আমি দণ্ডীঘরের মধ্যেই আগাগোড়া মুখস্থ ক'রে ফেললাম। এই উপনয়নের সময় হোমের পর যখন সন্ধ্যা-ক্রিয়ার সূর্যোপস্থান; প্রসারিত দুই হাতের মধ্যে, আঙুলে যজ্ঞসূত্র জড়িয়ে,—উদুত্যমিতস্য প্রস্কণ্ণ ঋষি-গায়ত্রীছন্দঃ ইত্যাদি মন্ত্রে, সামনেই সূর্যোদয় যেন সেই জ্যোতির্ময় মণ্ডল লক্ষ্য ক'রে দেখাতে এবং বলতে হয়, তার নাম

সূর্যোপস্থান। তখন সত্য সত্যই যেন হৃদয়ে আমার সূর্যোদয় অনুভব করলাম। কেমন এক অদ্ভুত ভাবাবেশ হয়েছিল যা বলবার নয়, সর্বশরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠল। নিজের মধ্যে এক অপরূপ অস্তিত্বের অনুভূতি নিয়ে দণ্ডী ঘরে প্রবেশ করলাম।

যাই হোক এখন থেকে পৈতের সুযোগে কিছুদিন নতুন গৈরিক কাপড় আর ব্যবহারের স্বাচ্ছন্দ্য উপোভোগ করা গেল। নূতন ব্রহ্মচারীর সর্বত্র আদর। এই উপনয়ন আমার মধ্যে এক পরিবর্তন আনলে, কয়েক মাসের মতো। এখন থেকেই আমার আন্তরিক চেষ্টা হ'ল কোন প্রকারে নিয়ম-ভঙ্গ না ক'রে এক বৎসর খাঁটি ব্রহ্মচারী থাকবই,—এবং থাকবার চেষ্টাও হয়েছিল ঠিক। ত্রি-সন্ধ্যা—ঠিক নিয়মেই চলেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে একই দিনে আমাদের নিকট সম্পর্কীয় সাথী একজনের পৈতে হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; কাজেই কয়দিন পর যখন দেখা হ'ল, জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধ্যা মুখস্থ হয়েছে তোর?

সে বললে, দূর দূর ও সব কে মুখস্থ করতে যাবে? তুইও যেমন,—দণ্ড ভাসান দিয়ে সেইদিনই বৈকালে নারাণের হোটেলে চপ কাটলেট খেয়ে এসেছি। ওসব কি আমাদের কম্ম?

আমি ত অবাক। তারপর সে যেচে যেচেই, দণ্ডীঘরে কিভাবে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করছে যখন বলতে আরম্ভ করলে আমি স্তম্ভিত হলাম শুনে, এত হতশ্রদ্ধা ব্রাহ্মণের ছেলের কি ক'রে, কোথা থেকে এল, অথচ তার বাবা, আমার পিসেমশাই ত্রিসন্ধ্যা না করে জল গ্রহণ করেন না। অবশ্য তখন এর সমাধান পাই নি, পরে পেয়েছিলাম। আমার এক পিসির কাছে প্রথম শুনি, তিনি বললেন, জানিস নি রাবণ ছিল ঋষির ছেলে, সে রাক্ষস কেন? ও রকম দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ হয়েছিল কেন? মাতামহ বংশের গুণে। কথায় আছে, মাতামহর দোষে রাবণ রাক্ষস। তা অমন হবে না কেন, ওর মামারা কি রকম দেখিস নি? সত্য,—মামারা ওর দুর্দান্ত ও যথেচ্ছাচারী

বটে। কিন্তু এও ত আশ্চর্য কথা, মামারা খারাপ হলেও ভাগনে কেন খারাপ হবে? এর সমাধান অবশ্য তখন হবার কথা নয়।

ঐ কথা শোনবার পর থেকেই আমার মধ্যে এক কৌতূহল উদ্দীপ্ত হ'ল, পরিচিত যাদের সঙ্গে ব্যবহার আছে তাদের, মামারা কেমন, আর সেই সূত্রে ভাগনেদের স্বভাবই বা কেমন এই সব খোঁজ নিতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। মিলিয়ে দেখি সত্যই ত, মামা আর ভাগনের স্বভাব প্রায় ক্ষেত্রে একই ধারায় চলে। শতকরা অষ্ট-নব্বইটা ঠিক ঐ নিয়মনুবর্তী। প্রাকৃতিক নিয়মেই অবশ্য এটা হয়, বুঝতে হবে। কিন্তু কেন? এ এক অদ্ভুত রহস্য। বেশী খোঁজ নিতে হবে কেন আমাদের বাড়িতেই এর নিখুঁত দৃষ্টান্ত রয়েছে। যতগুলি ভাগনে অর্থাৎ পিসিদের ছেলেরা এবাড়িতে আছে, সংখ্যায় প্রায় ডজন খানেক হবে,—যদিও এই ফলগুলি এখন কাঁচা, তাহলেও প্রকৃতিগত ঐক্য এখনই অতি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। তারপর আজ শেষ বয়সে এখন মিলিয়ে দেখছি, শেষ পর্যন্ত তারা প্রত্যেকেই ভাগ্যের দিক থেকে না হোক স্বভাব প্রকৃতির দিক থেকে এ সংসারে ভোগের জীবন তাদের মামাদের মতো ঠিকই কাটিয়েছে।

এখন আমার মধ্যে কেমন এক অদ্ভুত সাহস, এ বাড়ির প্রত্যেক মানুষের উপর এক উপেক্ষার ভাব ধীরে ধীরে অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বসেছিল, অনুভব করতাম। যখন সন্ধ্যার সময় আসনে বসি তখনই বেশ মন দিয়ে সন্ধ্যার মন্ত্র উচ্চারণ এবং প্রাণে এক দিব্যভাবের অনুভূতি হতে থাকে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু প্রাতে ওটা কিছুতেই হয় না। বাড়িতে হট্টগোল, তারপর ঠিক সন্ধ্যাহ্নিকের স্থানের অভাব। যেদিন বেলায় ঘুম ভাঙে অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর যদি ঘুম ভাঙে তাহলে দেখছি একটা বিষণ্ণভাব এসে অধিকার করে আমার অন্তরে। মন স্থির বা ভালো মন্ত্র উচ্চারণ হয় না, আর প্রাণায়ামের কাজ গোলমাল হয়ে যায়। আমার মা কিন্তু কি চমৎকার কৌশলে নিজ কর্মটি সারেন, এই হট্টগোলের মধ্যে দেখে অবাক হয়ে যাই।

তাঁর প্রকৃতি, এটা ঠিক বুঝেছিলাম,—যথার্থই তাঁকে সাহায্য করে ধৈর্য রেখে ঐসব ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে। মাঝে মাঝে মায়ের পুজোর সময় কাছে ব'সে দেখেছি সারাক্ষণটা, তাঁর কোন নিয়মে এক চুল এদিক ওদিক হয় নি। ঘড়ির কাঁটার মতোই তিনি নিত্যকর্ম ক'রে যান, তাঁর সঙ্গে এ বাড়ির কারো কোন সংস্রবই নেই,—অপূর্ব মনঃসংযম।

এইভাবে পৈতে হওয়ার প্রায় ছ সাত মাস পরে এমন এক ব্যাপার ঘটল যাতে সব নিয়মই ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেল। তখন আমার ফোর্থ ক্লাস,—স্কুলে পড়াশুনো চলছিল বটে, কিন্তু তেমন আঁট ছিল না। কারণ মাইনে বাকী পড়েছিল তিন মাসের। নিয়ম হ'ল প্রত্যেক মাসের পনেরো তারিখের মধ্যে মাইনে দেবার। প্রথম থেকেই চাইতে চাইতে চোদ্দদিন কাবার হয়ে যেত; একথা স্মরণ করিয়ে দিলেও বিপদ। তিনি বলবেন, এই সেদিনে মাইনে দিলুম। ভারি বিতৃষ্ণা জন্মে যায় ঐ মাইনে চাইতে। এইভাবেই তিন মাসের মাইনে জমে গিয়েছিল, আমি স্কুলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারি নি। রেজিস্ট্রিতে ডিফলটার লেখা থাকে, আর যখন হাজরে নেওয়া হয় তখন রোজ একবার ক'রে শুনতে হয়—ডিফলটার।

সতেরো

একটা পরিবর্তন যখন আসে তখন সবদিকে একটা নূতন ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। আমার বোধহয় দশ এগারো বৎসর বয়স থেকেই, অর্থাৎ কলকাতায় আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশুনা আরম্ভের সময় থেকেই এটা শুরু হয়েছিল, অন্তরে বাইরে যদিও তখন স্পষ্ট হয়ে উঠে নি। আরও একটা কথা আছে এর মধ্যে,

নূতন আবহাওয়ার মধ্যে থেকে সেটা শুরু হয়েছিল বটে যদিও সে অবস্থাটি মোটেই আনন্দের ছিল না। ঠিক যেন একটা গাছকে অনুকূল মাটি জল হাওয়ার মধ্যে খানিকটা বাড়তে দিয়ে তারপর আর একরকম মাটি জল হাওয়ার মধ্যে পুঁতে বাড়তে দেওয়া হ'ল। কাজেই, এর ফলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন বা পরিণাম যা ঘটবার তা ঘটবেই। গাছ বাড়তে লাগল বটে কিন্তু সে বাড়ার মধ্যে দেখা গেল যে তার স্বাভাবিক তেজ, লাবণ্য নবীন জীবনের স্ফূর্তির নিতান্তই অভাব রয়েছে। তা সত্বেও কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যে রসবোধ ছিল। অন্তত এই ভাবকে আমি রসবোধ বলতেই চাইছি, সঙ্গতভাবে এবং সঙ্গত কারণে। যে রসবোধ নিয়ে এই জগৎ সংসারের প্রত্যেক জীব জীবন সার্থক করে, সেই আনন্দময় নিজ সত্তার অনুভব, যা বাইরের প্রকৃতির, বা বাইরের অথবা ঋতুর প্রভাবে সুন্দর কিছুর স্পর্শ পেয়ে সাড়া দেয় তাকেই রসবোধ বলছি সেটা কোথাও অনুকূল অবস্থা না পেয়ে পুষ্টির অভাবে ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে যেখানে প্রতিকূল অবস্থায় তাকে পড়তে হয় তার মধ্যে থেকেও সে ঠিক নিজ জীবনের পুষ্টির, আনন্দ রসের উপকরণ, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, মনোবল, এবং প্রবৃত্তির সাহায্যে সংগ্রহ করে চলে। আমার মধ্যেও ঠিক এই ভাবের জীবনধারা চলেছিল।

আবাল্য পীড়ন, এই যে কঠোর তাড়না, এ তাড়নার ফলটা বড়ই জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কারণ এই বেদম প্রহার লাঞ্ছনা, অপরাধ থাকলেও যা না থাকলেও তাই। অপরাধী সন্দেহেই তার পূর্ণ ফলভোগ করতে হবেই। এইটিই মূল কারণ ছিল ঐ জটিলতার। ফলে আমার মনের মধ্যে এই শ্রেণীর দণ্ডদাতাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব তখন থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল। এরা দোষীকে দণ্ড দেয় যে প্রবৃত্তির বশে, নির্দোষীকেও দণ্ড দেয় সেই প্রবৃত্তির বশে অর্থাৎ এদের দণ্ড দেওয়ার প্রবৃত্তিই প্রবল, দোষী নির্দোষী বিচারে

শক্তিহীন। একটি অপরাধের ধুয়ো উঠতে যা দেরি। তার বিচার নেই, বিবেচনা নেই অমনি দণ্ড দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল। নিশ্চিত অপরাধী সিদ্ধান্তই একমাত্র এদের মন বা বুদ্ধির সম্বল। দণ্ড দিতে এমন ভালবাসা ও আগ্রহ অথবা প্রবল উৎসাহ কোথাও দেখি নি যেমন আমাদের বাড়িতে বাবাকে ও মামার বাড়িতে সেজমামাকে দেখেছি। যাই হোক এর একটা তো প্রতিক্রিয়া আছেই। প্রকৃতির রাজ্যে, মানুষ রক্তের দম্ভ ভরে তাঁর সহজ নিয়মের ব্যতিক্রম করতে পারে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী ফলটা কোন প্রকারে, শত চেষ্টাতেও এড়াতে পারে না। মহাক্রোধে অন্ধ বিচারকের দণ্ড দেবার উদ্দাম পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবার পর, অল্পক্ষণ পরে তার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় একথা তখন বালক হলেও বুঝতে পারতাম। প্রতিবারই দেখতাম দণ্ডদানের কিছুক্ষণ পরেই বাবার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্রমেই তাঁর মন এমনই একটা অবস্থায় এসে পৌঁছল যখন তিনি আমায় ডেকে আমার প্রতি কতকটা অনুকম্পা না দেখিয়ে ঠিক স্থির হতে পারতেন না। তাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বেড়েই যেত, যদিও তাঁর তখনকার দয়া অথবা দাক্ষিণ্যে সাড়া না দিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ফলে আমার মনে ঐ সকল ব্যাপারের পর বেদনা, তার ফলে চিন্তাপ্রবৃত্তি বেড়ে যেত, শেষে এই সিদ্ধান্তই বলবৎ হয়ে উঠত যে, এ বাড়ির কারো সঙ্গেই আমার আত্মিক যোগ নেই, এরা কেউ আমার আপন নয়।

তখন যেটা বুঝতাম না পরে সেটা বুঝেছিলাম যে ঐভাবে পীড়নের ফলে আমায় একদিকে যেমন চিন্তাশীল করে তুলেছিল মন আমার তেমনি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল ঐ বাল্য অবস্থা থেকেই, —কিলিয়ে কাঁটাল পাকনো ব'লে একটা কথা আছে, বোধহয় আমাকেও তাই করে দিয়েছিল এরা,—ফলে হয়েছিল কি ? সময় সময় যখন মজলিস বসেছে সেখানে বড়রা কথা কইছেন, হঠাৎ আমার মুখ থেকে এমন সব কথা বেরিয়ে যেত যা বড়দের মুখেই

শোভা পায়। অবশ্য তাইতেই, আমার উপর, তখন থেকে, যে সকল মন্তব্য গুরুজনেরা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছিলেন সেটা সময় সময় আমার মনে গভীর অবসাদ এনে দিত। আমি কখনও আর ভালো হতে পারবো না, মানুষের মতো মানুষ হওয়া বুঝি এ জীবনে আর আমার হবে না। এই ভাবটি ঐ বয়সে অনেক বালকেরই সর্বনাশের কারণ হয়েছে পরে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

যাই হোক, এখন থেকেই সব কিছুই যেন সমস্যা হয়ে দেখা দিত আমার মনে আর আমায় ভাবিয়ে তুলত এর সমাধান নিয়ে। প্রথম ও প্রধান কথা, লেখাপড়া করতে হবে সম্পূর্ণ আমার দায়িত্বে, কারো কাছে সাহায্য পাবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না,—তারপর ভালো ছেলে হতে হবে, সে ভালো এমনি হবে যে সবাই বলবে,—আহা, রাজন্দরের ছেলেটি যেন রত্ন, বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোয় না, সর্বদা বই মুখে নিয়ে আছে। যা পাবে তাই খাবে খিদের সময়, খেতে না পেলেও টুঁ শব্দ পর্যন্ত করবে না। গুরুজনদের শ্রদ্ধা ভক্তি করবে, প্রত্যেকের অনুগত হবে, মাটির দিকে চেয়ে চলবে, মাথা উঁচু করবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্য কথায় মাত্র এটিই ছিল ভালোর নমুনা আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বিশেষত ঠাকুরদাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর থেকে আমি একটু অধিক সাহসী হয়ে উঠেছিলাম, চিন্তাশীলতার ফলে ও বাস্তব ক্ষেত্রে মনোমত কর্ম বা বৃত্তির অভাবে কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিলাম। নির্জনে, ফাঁকা জায়গায় ঐ সকল কল্পনার অবাধ দৌড় দেখা যেত,—সে ফাঁকা জায়গায়, মামার বাড়ির ফাঁকা মাঠে, আর আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি উপরের প্রশস্ত ছাদে, কেউ কোথাও নেই—যেখানে মাথার উপর নীল আকাশে যেন পেঁজা তুলোর রাশি, সাদা সাদা মেঘের দল ভেসে ভেসে যাচ্ছে,—কোথায়? কে জানে। দক্ষিণ দিকে ৺কালী-প্রসন্ন সিংহের বিরাট অট্টালিকার উপর একটা প্রকাণ্ড মাঠের মতো খোলা ছাদ দেখা যাচ্ছে, আর পাশেই সিংদের পিছনের বাগান।

সেই বাগানের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক তালগাছ দাঁড়িয়ে। খোঁচা খোঁচা চুল দাড়িওলা যেন একটা বিরাট শরীর দানবের মুণ্ড, সামনের দিকে চেয়ে আছে,—সে যেন সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে যে যা করছে। তাল আর নারকেল গাছ, ছেলেবেলা থেকেই আমার কাছে জীবন্ত। হাওয়ায় যখন তারা মাথা দোলাত, মাথায় সবুজ কাপড়ের ঘোমটা নতশির ঐ নারকেল গাছকে,—যেন দানবদের কনে বৌ মনে হ'ত।

মামার বাড়িতে থাকলে, বনে জঙ্গলে প্রায়ই সারা দুপুর বেলাটা কাটাতাম যখন সবাই ঘুমোত। কিন্তু এখনও আমার মনে তখন-কার এক অপূর্ব কল্পনার স্মৃতি প্রবল হয়ে আছে, সে বড় অদ্ভুত। একদিন দেখছি কি,—যেন দেশের মধ্যে কোথাও মানুষ জীব-জন্তু কেউ নেই—আছে কেবল ঘাস থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট থেকে ক্রমে মাঝারী আর বড় বড় তারপর প্রকাণ্ড কাণ্ড অশ্বত্থ, বট গাছের মতো গাছ সব,—নীচে জমিতে কোথাও একটু আলো কোথাও অন্ধ-কার ঘাসে-ভরা,—লতাগুল্ম সব চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে, জনপ্রাণী নেই সেখানে,—গাছেরা সব দুলছে, আর গা মাথা হাত পা নেড়ে নেড়ে সবাই নিজেদের মধ্যে কথা কইছে। তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের কথা; মাঝে মাঝে যখন হাওয়া আসছে, আনন্দে মেতে উঠছে তারা। আমি একলা, অবাক হয়ে ওদের কাণ্ড দেখছি। ওদের কথা ত বুঝতে পারছি না,—কিন্তু স্ফূর্তি আর তাদের হাবভাবে মনের আনন্দ দেখে এটুকু বুঝতে পারছি যে ঐ আলো আঁধারে মেশানো রাজ্যে—তারা মহাসুখে নিজের জায়গায় আপনজনের সঙ্গে তারস্বরে আলাপ করছে,—শোঁ, শোঁ, গোঁ, গোঁ, ঝম্, ঝম্ কত রকম শব্দে তারা নিজেদের মনের কথা প্রকাশ করছে। সে এক অপূর্ব আনন্দময় নির্বাক রাজ্য।

এইভাবে ঝোপ-জঙ্গলের ধারে প্রকাণ্ড পাকুড় গাছের তলায় বসে উদ্ভিদ রাজ্যের বৈচিত্র্য দেখতাম, জঙ্গলের বাইরে তখন রৌদ্রে

কাঠ ফাটছে, আগুনের হল্কা, চৈত্র বৈশাখ মাসের দুপুরে,—আর ঘরে ঘরে সবাই ঘুমের কোলে অচেতন।

এ পর্যন্ত কোনখানেই আমার সমবয়সী কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে কখনও যথার্থ একত্ব বা প্রীতির গাঢ়সম্পর্ক ঘটে নি। মিশতে গিয়ে প্রথমেই এক শ্রেণীর মধ্যে, কিছুই ভালো চোখে পড়ত না, কাজেই ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নই ওঠে না। আর এক দল, যারা ভালো ব'লে স্কুলে কিংবা পাড়ায় প্রচলিত তাদেরও এমনই গরিমা-গ্রন্থির* বড়াই যে মিশতে গেলে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ঐটাই। কাজেই ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, এক খেলার সময় ছাড়া, একসঙ্গে মিলবার বা মনোমতো প্রসঙ্গ নিয়ে অবকাশ সময়ে আনন্দে আলোচনার পক্ষে প্রধান অভাব মনোমতো সঙ্গীর। কিন্তু আমার তখন মনের মধ্যে অসংযম উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান হ'য়ে গেছে তৈরী, আমি নিজ সৎভাবকে খর্ব ক'রে অসৎ, দুষ্ট অপরিণামদর্শী এবং অসংযত চরিত্র যাদের, অর্থাৎ যাদের কাছে সহজেই স্থান একটা ক'রে নিতে কোনকালেই বাধা হয় না এমনই সঙ্গ অবলম্বন করেছি। বাড়িতে থাকার সময়ে পাড়ার মধ্যে ঐ স্বভাবের যারা তাদের সঙ্গে, আর স্কুলে শেষ বেঞ্চের ছেলেদের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা কিছুদিন থেকে বেড়েই চলেছিল। তারপর,—

এবার আমার কৈশোরে অধঃপতনের পূর্ণ পরিচয়।

যে কুক্রিয়ার ফলে এদেশের ছাত্রজীবন শক্তিহীন, ক্ষয়িষ্ণু এবং ধ্বংসের পথে চলেছে আমিও অব্যাহতি পাই নি সে কুক্রিয়ার প্রভাব থেকে। বোধহয় এগারো বৎসর বয়স থেকেই তা আরম্ভ হয়েছিল। এর মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করবার এইটুকু,—সাধারণত ঐসব শিক্ষা সহপাঠী অথবা খেলার সাথী বা সমবয়সীদের দিয়েই সঞ্চারিত, কিন্তু আমার পক্ষে তা হয় নি। আমার দীক্ষাগুরু, অতি দরিদ্র প্রৌঢ়

---

* হীরেনবাবু সুপিরিয়ারিটি কমপ্লেকসের ঐ নাম দিয়াছিলেন,—যদিও কোথাও কথাটা ব্যবহারে এখনও সহজ হয়নি।

ব্যক্তি, লোকটা মামাদের সেরেস্তার গোমস্তা একজন। এক অদ্ভুত যোগাযোগ। লোকটা ভয়ানক রোগা, তার মুখখানা, হাত, পা, সর্বস্থান শিরে শিরে ভরা। বিশেষত মুখের দিকে লক্ষ্য করলেই কপালে, আর তার দুদিকে রগে এত শির দেখা যায় জীবনে কারো এমন দেখি নি। দেশে স্ত্রীপুত্রাদি রেখে সে এখানে চাকরি করতে এসেছিল।

সাধারণত ছোট ছেলেরা প্রায়ই দেখেছি, বয়োজ্যেষ্ঠদের এড়িয়ে চলে। আমার প্রকৃতি ঠিক বিপরীত ছিল। স্বভাবত আমার বয়োজ্যেষ্ঠ দলের মধ্যে গতি ছিল বেশী, অবশ্য উপযুক্ত ব্যবধানে থেকে তাদের কথাবার্তা শোনার কৌতূহল ছিল প্রবল। সমবয়সীদের কাছে পাবার উপযুক্ত কিছুই নেই, কেবল খেলার সময় তাদের না হ'লে চলে না। কিন্তু খেলার যোগাযোগটা ত সব সময় নয়? কাজেই আমাকে, বেশীর ভাগ সময়, মামার বাড়ি থাকলে বাইরে মামাদের আড্ডায় আর কলকাতায় থাকলে বাবা, জেঠা, কাকাবাবুদের আড্ডায় চুপ ক'রে ব'সে তাদের কথা বা আলোচনায় মনোযোগী দেখা যেত। যখন এমন কোন কথা চলত যা আমাদের মতো বালকের শোনবার উপযুক্ত নয়,—তখন তাঁরা,—এই তুই ছেলেমানুষ এখানে কেন? পড়াশুনা নেই? ব'লে ভাগিয়ে দিতেন। এই সূত্রেই, হয়ত অনেক সময় দেখা যেত বড়দের কেউ কেউ আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাশূন্য হয়েছেন। আমি আড্ডাবাজ হ'য়ে যাচ্ছি আমার আর কোন আশাই সেই মানুষের মতো হবার, এই মন্তব্য স্পষ্ট ভাষায় সময় প্রকাশ করতেন।

যাই হোক, ঐ বড়দের সঙ্গে মেশবার সুযোগেই বোধহয় ঐভাবে কোন বড়ো একজনের হাতে পড়ে ঐ কুঅভ্যাস প্রশ্রয় পেয়েছিল ঐ তরুণ বয়সে এবং কয়েক বৎসর প্রবল ছিল আমার মধ্যে। তাতে ক্ষতি যা কিছু করেছিল, তার পরিণামটি পরে বুঝেছিলাম। পরে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেও দেখেছি,—অধিকাংশ স্কুলের ছেলেরা

এই জঘন্য ক্রিয়া-প্রবৃত্তি পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর থেকে নানা বিচিত্র সূত্রেই পেয়েছে এবং পরে এই কর্মে দীক্ষা লাভ এমনভাবে অভ্যস্ত হয়েছে যে আর ছাড়তে পারে নি।

উপযুক্ত হয়ে তখন এ সম্বন্ধে অনেকের সঙ্গেই আলোচনা করেছিলাম। তাতে দেখেছি এক শ্রেণীর মত এই যে,—এর প্রতিবিধান হওয়া উচিত, ঘরে এবং স্কুলে এ দু জায়গা থেকেই চেষ্টা হওয়া উচিত ; এর অনিষ্টকারিতার গতি লক্ষ্য করলে স্থির থাকা যায় না। কত শত-সহস্র ছেলে, বিদ্যার্থী অবস্থায় ঐভাবে শরীর নষ্ট করেছে কর্তৃপক্ষের তা অজানা নয়। অতএব এর প্রতিবিধানের আশু প্রয়োজন। এটি হ'ল এক নম্বর অভিমত।

আর এক শ্রেণীর অভিভাবকের মত এই যে, এর কোন প্রতি-বিধান নেই, এ সমাজে থাকলে ঐভাবে তাদের শিখতে হবেই। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটির ফল ভাল নয়, যেহেতু ইন্দ্রিয় সুখের সংস্কার এবং প্রবৃত্তি পুরুষের মধ্যে প্রকৃতির নিয়মেই বিকশিত হয়ে থাকে,—এটা স্বাভাবিক। এটি হ'ল দু নম্বর অভিমত। যারা এই প্রবৃত্তির স্বাভাবিকতার কথা বলেন, তাদের একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে।

পূর্ণ যৌবনে, সুস্থ সবল শরীরে যে প্রবৃত্তি এবং যে উপভোগ স্বাভাবিক, অল্প বয়সে, অপরিণত, অপুষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাম বালশরীরের পক্ষে অকালে ঐ কৃত্রিম উপায়ে ঐ সকল প্রচেষ্টা কি অস্বাভাবিক নয়? যদি তাই হয় তা হ'লে এর প্রতিবিধানের প্রয়োজন আছে, এই সকল দুষ্ট প্রচেষ্টা থেকে বালকদের বাঁচাবার চেষ্টার অবশ্যই সার্থকতা আছে। এইজন্য এর আলোচনারও প্রয়োজন আছে মনে হয়। এখন সবার বড় দুঃখ এই যে পূর্বেই এই কুঅভ্যাসের বিপদ থেকে সাবধান করবার কেউ ছিল না আমাদের এবং তার পরেও ঐ অভ্যাসের হাত থেকে নিবৃত্ত হবার মতো মনোবল ছিল না। এ সত্য প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারবেন যিনি ঐ অবস্থায় পড়েছেন।

এ পাতকের সর্বপ্রধান প্রত্যক্ষ ফল,—মনোবল হারানো। অন্যান্য ফল যা কিছু শরীর ক্ষয় ইত্যাদি সেসব হ'ল পরের কথা।

আমাদের মতো আরও কত কত বিদ্যালয়ের ছাত্র এইভাবে অপরিণত শরীরে এই লোভনীয় দুষ্কর্মের ফলে শরীর নষ্ট করেছে, করছে ও করবে তার হিসাব কে রাখছে? আমাদের দেশে সংসারের কর্তা এবং পুত্রের পিতা যারা, এখনকার দিনে সন্তানদের এই ব্যয়বহুল বিদ্যালাভের যোগাযোগ ঘটাতে কতই না অর্থাভাব কত অসুবিধা ভোগ ক'রে থাকেন। ফলে অন্যদিকে পুষ্টিকর আহারের যোগযোগ থেকে সন্তানদের বঞ্চিত করতে হয়। এই বাংলায় ছাত্র-সমাজের এভাবের স্বাস্থ্যহীন বিদ্যা পরিণামে কোন্ কাজের হয়? শরীর পালনের প্রথম এবং প্রধান নিয়ম যেটি আহার,—পুষ্টিকর খাদ্য, ছেলেদের তা থেকে বঞ্চিত থাকার যে ফল তা কোনদিকে কখনও শুভ হতে পারে কি? শতকরা সত্তর আশিজন ছাত্র দুর্বল, ক্ষয়-প্রাপ্ত শরীর যে দেশে, সে দেশের ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান করতে দূরে বিশেষজ্ঞের কাছে যাবার দরকার কি? ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশের ছেলেরা এভাবে পুষ্টিকর খাদ্যে বঞ্চিত নয়,—যেমন আমাদের বাংলার ছেলেরা বঞ্চিত। তার উপর অকালে অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয়ঘটিত ঐ কুঅভ্যাসের দাস হওয়ার পরিণামে যে সকল ভয়ানক রোগ ও অনিবার্য মানসিক বিকৃতি ঘটে থাকে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি? জাতি বা সমাজের পক্ষে এ ক্ষতির পরিমাণ কতটা বিশেষজ্ঞরা বিচার করবেন।

আমরা একসঙ্গে যারা পড়েছি, দীর্ঘকাল একত্র মিলেমিশে কাটিয়েছি তাদের মধ্যে সবাই চরিত্রের দিক থেকে খারাপ ছিল না। অবশ্য নানা প্রকৃতির ছিল তারা—নিজের অনিষ্ট নানা ভাবেই করেছে। তাদের মধ্যে অনেকে লব্ধপ্রতিষ্ঠও হয়েছে। কিন্তু তাদের কয়েকজনের পরিণাম যা প্রত্যক্ষ করেছি তা যেমন অদ্ভুত তেমনি বিচিত্র আবার তেমনি শোচনীয়। একজন,—বিবাহিত

হয়েও ও অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি, ফলে তার স্ত্রীর আত্মহত্যা। অপর একজন, তার স্বাস্থ্যভঙ্গের লক্ষণ দেখে তার বাবা বিবাহ দিলেন, ফলে অল্পদিনেই ক্ষয় রোগে দাঁড়াল, শেষ কথা বড়ই করুণ। তার বাবা আমাদের কাছে বলেছেন যে,—শত্রু,—সে আমায় ধনেপ্রাণে মেরে গেছে, কি আর বলব তোমাদের কাছে। অপর এক বন্ধু, বিবাহিত, সন্তানের পিতা, এম-এ প্রথম শ্রেণীর প্রফেসর,—বিদ্যার ক্ষেত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা সত্ত্বেও ও অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে নি। সে বলে যে পাতকের প্রধান এবং অনিবার্য ফল মনোবলহীন হওয়া, যার স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয় তার মনের স্বাস্থ্য ভাঙবেই। আর একজন ধনীর দত্তক,—বিবাহিত হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার মিল হ'ল না। ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছে তখনই নির্লজ্জভাবে দম্ভ ক'রে বলে বেড়াত যে, এই অস্বাভাবিক ক্রিয়াই সর্বাপেক্ষা সুখকর। স্ত্রীর সঙ্গ তার ভাল লাগে না। আমার মনে হয় এই বিকৃতি ঐ অকালপক্কতার আর এক অনিবার্য ফল। এত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকৃতি, যা চিকিৎসকেরও বিস্ময়। আরও একজন, অফিসের কাজে দক্ষতার ফলে অল্প বয়সে বড়বাবু হয়েছিল সাহেবের নজরে পড়ে। কিন্তু তার সংসারে এক বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। বিবাহের পর এক বৎসর মাত্র স্ত্রী কাছে ছিল তারপর বাপের বাড়ি গিয়ে আদালতে মোকদ্দমা আনে এবং ঐ লোকের সঙ্গে ঘর করতে পারবে না ব'লে খোরপোষের দাবি করলে। মাসে মাসে খোরাকী বাবদ একটা টাকার ব্যবস্থা ক'রে বড়বাবু তবে রেহাই পান। এদিকে চমৎকার মানুষ, নম্রস্বভাব।

বি-এ,-পড়ছে প্রাইভেট, আমার ভাইকে পড়াত আর আমাদের বাড়িতেই থাকত। কথাবার্তায় ছেলেটি চমৎকার কিন্তু তার শরীর তখন ভয়ানক অবস্থায় এসেছে ; ক্ষয় বোধহয় ধরেছে। এমনই তার ভয়ঙ্কর অভ্যাস, পড়াতে পড়াতে, আমি আসছি ব'লে চলে গেল, পাঁচ-সাত মিনিট পরে এল। শেষে আমার লক্ষ্য পড়ল

যখন, সব কথাই স্বীকার করলে; লজ্জায় দেশে পালাল। আর একটি বিচিত্র পরিণতি, তার কথা ব'লে এ দৃষ্টান্ত শেষ করবো।

পরম রূপবান, মধ্যবিত্ত সচ্ছল সংসারের একমাত্র পুত্র, বাপের চিনির কারবার; আমাদের সহপাঠী ছিল। ক্রমে তার শরীর দুর্বল হ'তে থাকে। ডাক্তার বৈদ্য কোন রোগের হদিস পায় না। চেঞ্জে যাওয়া প্রভৃতি সব কিছুই হয়ে গেছে, তখন বিবাহ দেবার সংকল্প করলেন বাবা। ছেলে বলে বিবাহ দিলে আত্মহত্যা করবে। কাজেই ভাগ্যে বিবাহটা ঘটল না তখন। ক্রমশ, ছেলে একগুঁয়ে হ'য়ে উঠল,—যা তার স্বভাবের বিপরীত। কারো কথা শুনবে না, বাড়ি থেকে কোথাও বার হবে না,—কারো সঙ্গে কথা কইবে না, কেবল নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে থাকবে চুপ ক'রে। বাবা কিংবা মা কাছে গেলে পিছনে ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে থাকবে, বাবা মায়ের মুখের দিকে চাইবার সাহস নেই। মায়ের মনে যা হয় তা তো বুঝতেই পারা যায়। তিনি কান্নাকাটি, মানৎ, ঠাকুরের কাছে মাথা খোঁড়া এইসব করেন। তারপর, তার ভয় করতে আরম্ভ হ'ল, একটা কিছু শব্দ, বা একটা কিছু দেখে চমকে ভয়ে চিৎকার ক'রে ওঠে মাঝে মাঝে। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। শেষে খাওয়া ছেড়ে দিলে। মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ মনে ক'রে বাড়ির মধ্যে কান্নাকাটি। এমনই সময় একদিন তার বাপের সঙ্গে আমার দেখা,—সহপাঠী ব'লে জানতেন। একবার দেখবে এসো, বলে ধরে নিয়ে গেলেন। আমায় দেখে প্রথমে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মুখের দিকে, তারপর যেন স্মরণ হ'ল। অতঃপর তার মুখে একটা প্রফুল্লতা হর্ষ বিস্ময় মিলিতভাবে ফুটে উঠল,— প্রমোদ? আমি তার বিছানায় বসলাম, হাত একখানি হাতে নিলাম। তার বাবা মা সবাই দাঁড়িয়েছিলেন, ছেলের ভাব দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, যেন ছেলের প্রাণের আশা পেলেন। নিজেরাই, চল, চল, আমরা ঘর থেকে যাই, ওরা কথাবার্তা

কইবে। ব'লে চলে গেলেন। দেখলাম, বাপের কি স্নেহ উদ্বেগ ছেলের পেছনে।

ঘন নির্জন হলে, প্রথম কথা সে বললে,—আমি বাঁচব না।

কেন? কি হয়েছে তোর? খুলে বলতো আমায়? সে বললে, ঐ কুশলই আমার সর্বনাশ করেছে। বুঝলাম, অপরাধের বোঝাটা শিক্ষাগুরুর ঘাড়েই চাপাচ্ছে। তাই-ই হয়ে থাকে এ ব্যাপারে। আমার হ'ল কি,— তখন প্রাণের মধ্যে এমনই এক প্রেরণা এল, মহা উৎসাহে দীপ্ত হয়ে উঠল আমার অন্তর,—আমি তাকে এমন সব আশা ও উৎসাহের কথা সব বলতে আরম্ভ করলাম, যা আগে কখনও অনুমানেও আনতে পারি নি। সেই উৎসাহ তার মধ্যে সংক্রামিত হ'ল, ফলে দেখলাম সে অনেকটা সুস্থ হয়েছে।

নৈতিক অবস্থা তখন আমারও ভাল নয়, তবে তার মতো শরীরের অবস্থা আমার হয় নি এইটুকুই যা তফাত। সে আমাকে সাধু প্রকৃতির লোক মনে করেই আমার কাছে সব খুলে বলতে আরম্ভ করলে। যাই হোক আমি তিন চারদিন গিয়েছিলাম তার কাছে, সে যেন ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠছে মনে হ'ল। তারপরেই বাড়ি থেকে আমায় পালিয়ে এলাহাবাদে মাসিমার কাছে যেতে হ'ল। প্রায় চার-পাঁচ মাস কোন খবর পাই নি। ফিরে এসে শুনলাম, সে মারা গিয়েছে। একজন বললে, শেষে নাকি ব্রেন ফিভার হয়েছিল, কিন্তু তার বাবা বললেন,—ম্যালেরিয়া হয়েছিল, তাতে হাই ফিভার ছিল। জ্বর একদিন ১০৮° উঠেছিল,—নামবার মুখে ঘাম হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই ছেলেটির অবস্থা প্রত্যক্ষ ক'রে আমার নিজের একটু উপকার হয়েছিল। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম ঐ কর্মসূত্রেই কত বিচিত্র রোগ এই শরীর আশ্রয় করতে পারে।

আমার এ বিষয়ে যতই অধঃপতন হোক না কেন, মনের মধ্যে এই একভাব সব সময়েই তোলপাড় করত, যখনই ঐ কর্মে প্রবৃত্তি

আসত যে, এ কাজটা অত্যন্ত অন্যায় এবং অস্বাভাবিক। বোধ হয় এ কর্মে প্রবৃত্ত সব ছেলেরই একথা মনে হয়। চোর যেমন,—যখনই সে চুরি করতে যায় তখনই তার মনে হয় যে একাজটা অন্যায় অথবা মন্দ। অতটা বিশ্লেষণ ক'রে নাই দেখুক সে ঠিক অন্তরে অন্তরে অন্তত এটুকু জানে যে, এ কাজটা ভালো হচ্ছে না,—তার কারণ ধরা পড়লেই লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না। নিজেকে তখন হীন মনে হবে। সেইজন্যই এতটা গোপনে কাজ করবার প্রয়াস। নিঃসঙ্গ অবস্থায় দুজনে সুখী হয় এ সংসারে—একজন দুঃখী অপর-জন দুষ্ট। অদ্ভুত ব্যাপার।

আগে এর প্রতিকার সম্বন্ধে দু রকম মতের রকম কথা বলেছি, প্রথম এক দল যা বলেন, এর প্রতিকার হওয়া উচিত,—দ্বিতীয় দল বলেন, এর প্রতিকার অসম্ভব। এখন তৃতীয় দলের মত,—যা প্রথম দুই দলের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু ভিন্ন এবং বিচিত্রও বটে তার কথা ব'লে শেষ করবো।

এখন তিন নম্বর অভিমত।

এ কথাটি যাঁর তিনি সাধারণ মানুষ নন,—তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। দর্শনশাস্ত্রে এম-এ, পণ্ডিত মানুষ, বিবাহ ক'রে সংসারী হয়েছিলেন। তারপর সন্তান-সন্ততি স্ত্রী, মা, ভাই, সব ছেড়ে গৃহ-ত্যাগ ক'রে চলে যান। তাঁর সন্ন্যাস নেবার প্রায় বারো বৎসর পর এই কলকাতায়ই আমার সঙ্গে দেখা হয়; ইনি আর্যমিশনেই আমাদের উপর ক্লাসে পড়তেন।

তিনি বলেন,—এ নিয়ে ফিলানথ্রফি চলে না। এক শ্রেণীর ছেলে আছে যারা ক্ষীণ মনোবল, ঐসব করতেই এসেছে। তারা নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে ঠিক ক্ষেত্রে পড়ে তৈরি হয় ওসব কাজে। প্রকৃতি তাদের ঐসব কাজে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন যেমন যেমন তার মনে ইচ্ছা প্রবল হয়। স্বাভাবিক ত আছেই অস্বাভাবাবিক উপায়ও তারা আবিষ্কার করে বা করতে পারে। একটা কিংবদন্তি

প্রচলিত আছে যে প্রথম ব্রহ্মচারীদের মধ্যেই ঐ অস্বাভাবিক প্রবৃত্তির উদ্ভব হয় এবং বিশ্বামিত্রই নাকি ঐ উপায়টি আবিষ্কার করেন। সেইজন্য এক শ্রেণীর মধ্যে ঐ কর্মটির নাম বিশ্বামিত্র স্মরণ। সত্য মিথ্যা ভগবানই জানেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে এ ভাবে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবার কথা এক আশ্রমের স্বামীর মুখেই শুনেছিলাম, তবে স্কুল কলেজের মতো অতটা নয়,—সেখানে বিরল। যাই হোক, তিনি বলেন যে যারা ঐ প্রকৃতির তাদের সৎশিক্ষা দিলেও বিফল।

তারপর, যারা ভালো হবে তাদের ওদিকে প্রবৃত্তি যাবেই না। একই ক্লাসে আমরা দেখতে পাই প্রায়ই তিন শ্রেণীর ছাত্র থাকে, তারা পাশাপাশি বাড়ছে, নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে যে যার পথে ঠিকই যাচ্ছে। তার মধ্যে যারা শিক্ষকের সামনে বসে, বরাবর তাদের জায়গাই ঐখানে—তাদের ওসব প্রবৃত্তি হয় না। তাদের সৎ সংস্কার প্রবল, তারা ঐসব নানা স্বভাবের সঙ্গে থেকেও নিজ উদ্দিষ্ট পথে চলে যায় মনের জোরে। তারপর যারা মাঝামাঝি বসে থাকে, —তাদের আসলে বিদ্যার ক্ষেত্রে মধ্যম গতিই হয়—যদিবা সঙ্গদোষে ঐসব কুঅভ্যাস তাদের মধ্যে ঢোকে, তাহলে তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আন্তরিক চেষ্টাও থাকে। ফলে, কিছুদিন পরে সামলেও যায়। কিন্তু শেষ দিকে যারা বসে তারা ঐসব করতেই এসেছে। ঐরকম সংস্কার নিয়ে তাদের শিক্ষকের সামনে বসতে সাহসই হবে না,—পিছনটাই চায় তারা। যতদিন স্কুলের ঋণ আছে বাপকে তা শোধ করতেই হয়। তারা অবিদ্যার ঘরের মানুষ, বিদ্যার ক্ষেত্রে শেষদিকেই থাকবে, থাকতেই হবে তাদের। আর ঐসকল বিদ্যা করবেই, কেউ বাধা দিয়ে তাদের রুখতে পারবে না। প্রকৃতিই নিয়ে যাবে ঐ দিকে। তবে তাদের সঙ্গে কোন কোন ভালো ছেলেও যদি খারাপ হয়, এমন যে একেবারেই হয় না তা নয়,—তাদের নিজ নিজ মনোবলেই সংশোধন ক'রে নেয়। আর সে বিষয়ে তারা প্রকৃতির সাহায্যও পায়। তবে

যারা মরে, তাদের মূলে প্রাণশক্তি ক্ষীণ বুঝতে হবে ; ভাইটালিটির অভাব।

তবে পুষ্টিকর আহারের অভাবেই ছেলেরা মূলে দুর্বল হয়, এর উপায় অন্য দিকে, তার জন্য চেষ্টার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

অবশ্য এ সমস্ত মীমাংসা তখনকার নয়, অনেক পরে, ও সকল অপকর্ম সংশোধনের অনেক পরেই ঘটেছিল।

এই কয় বৎসরে আমার মতি এবং গতি ঠিক বলতে গেলে অস্থির, চিত্ত প্রায়ই বিক্ষিপ্ত এবং প্রত্যেক কাজ বিচারশূন্য। কি ক'রে, কোথায় একটি অবলম্বন পাবো এই ভেবেই ঘুরেছি। দাদামশাই-এর মৃত্যুর এবং আমার উপনয়নের পর দুবার পালিয়েছিলাম এক বৎসরের মধ্যে। তাতে বাবাও বুঝতে পেরেছিলেন ওঁর কঠিন শাসন আমি এড়াতেই চাই এবং আমার উন্নতির কোন আশাই নেই। কিন্তু তখনও শাসন বন্ধ হয় নি। অবশ্য সে শাসনের কোন নিয়ম বা পদ্ধতি ছিল না, কোন অপরাধ থাক কিংবা নাই থাক, তাঁর মনোমতো কোন একটা কর্মে আমার ত্রুটি, অথবা অসাবধানতা, কিংবা সে কর্মে আমার মতো একজন বালকের স্বাভাবিক দক্ষতার অভাব, দণ্ড পাবার পক্ষে তাইই যথেষ্ট কারণ হ'ত। তাঁর মেজাজ বাইরের হোক ভিতরের হোক কোন কারণে খারাপ থাকলে তুচ্ছ কারণেই রোষাগ্নি জ্বলে উঠত, যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, ততক্ষণ প্রহার চলত। এ বয়সে প্রাণ কিছুতেই আর এই অবস্থার মধ্যে থাকতে চাইত না। তারপর কয়েকবার পালিয়ে সাহস বেশ অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল।

স্কুলে এবার যখন ক্লাস প্রমোশন হয়,— ঠিক ভেবেছিলাম এবৎসর কিছুতেই ফোর্থ ক্লাস থেকে উঠতে পারবো না, পরীক্ষায় ভালো লিখতে পারি নি, মাত্র দুটি ইংরেজী আর বাংলা ছাড়া। পড়াশুনা ত নিয়মিত হ'তই না, তা ছাড়া তিন-চার মাসের মাইনেও জমেছে। ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্বন্ধ আছে তাই

নামটা কাটা যায় নি। বাবাও সেটা বিলক্ষণ বুঝতেন। অন্য ছেলেদের কখনো এতদিন মাইনে পড়ে থাকে না। যাই হোক প্রমোশনের দিন যখন নাম ডাকা হচ্ছে তখনও নিশ্চিন্ত আছি যে আমাকে ডাকবে না। কিন্তু আশ্চর্য হলাম ঘটনা দেখে। ছিলাম বি সেক্‌সানে, প্রমোশন ত হ'লই তার উপর আবার থার্ডক্লাসের এ সেক্‌সানে ভালো জায়গায় দিলে আমায়। রোল নম্বর আট, অর্থাৎ ভালো দলে টিচারদের সামনে। আমি সেইদিনই অফিসে কেরানী বৃন্দাবনবাবুর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা কি হয়েছে জেনে তবে শান্তি পেলাম। ইংরাজীতে ৬৫, ইতিহাসে ৫২, জিওগ্রাফিতে ৪২, আর সংস্কৃত ও বাংলায় ১৫০-এর মধ্যে ৮৯। ডিক্‌টেশানে দ্বিতীয় হয়েছিলাম। এ ছাড়া অঙ্ক বা জিওমেট্রি কোনটাতেই পাস মার্ক ছিল না, তা সত্ত্বেও প্রমোশন হয়েছিল।

যাই হোক, প্রমোশনের পর বই কেনার ব্যাপারে অনেক দেরি হয়ে গেল, মন আমার তখন উচাটন। স্কুলে যাই, বইগুলির মধ্যে ইংরাজী আর বাংলা,—আগেই নভেল পড়ার মতো গল্পগুলি পড়ে নিতাম, বেশ লাগত। রয়েল রিডারের গল্পগুলি বেশ ভালো। তারপর, শেষের দিকে থাকে পয়েট্রি আর ফেয়ারী টেল্‌স। সেগুলি বিশেষভাবেই মুখরোচক তাই আগেই সেগুলি পড়তাম।

১৮৯৯-এ লর্ড কার্জন ভাইসরয় হয়ে এলেন, আমাদের নূতন হিষ্ট্রিতে তাঁর নাম পর্যন্ত উঠেছিল তখন। ঐ বৎসরেই আমার স্কুল ছাড়বার বছর। থার্ডক্লাসে চার মাস মাত্র ছিলাম। এক বন্ধুর কথা এখানে বলতে হবে, তার নাম কালিদাস ব্যানার্জী, পুরোনো পাপী, থার্ডক্লাসে, এটা তার থার্ড ইয়ার চলছে। আমরা তাকে থার্ড ইয়ার ব'লেই ডাকতাম। সে কিন্তু রাগ করত না। আসত সাড়ে দশটার পর,—ঠিক নিজের জায়গায় শান্ত গম্ভীরভাবে বসত টিচারের দিকে মুখ ক'রে, দৃষ্টিতে এমন ভাব দেখাত যেন তার প্রত্যেক কথাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

পাশে তার বাইশ বছর বয়েসের এক প্রিয় সঙ্গী ছিল, ডাক নাম তার কুলা, ভালো নাম অপ্রকাশ; তারা দুটি মানিকজোড় ছিল। হঠাৎ সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কাল তুই বিহারসালে যাস নি কেন রে? তখন কালিদাসের দুটি হাতের থাবা মুখের উপর উঠে ঠোঁট দুটো ঢাকা দিলে নাকের নীচে থেকে দাড়ি পর্যন্ত। অনুচ্চ স্বরে উত্তর হ'ল, বীণার বাড়ি আটকা পড়েছিলুম। চোখ ঠিক টিচারের দিকে নির্দিষ্ট, কেবল যখন মুখ থেকে কথা বেরোয় তখন দু হাতের থাবাটা মুখে ওঠে,—এইটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। না হলে ঠিক যেন এক মনে পড়া শুনছে। এসব প্রাক্‌টিসে তাদের কৃতিত্ব আছে, সবার হয় না।

টিচার সব জানেন,—এতদিন দেখেছেন, তাঁরা দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদ। একদিন বাড়াবাড়ি দেখে অসহ্য হয়েছিল বোধহয়, হঠাৎ চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই! তোরা স্কুলে আসিস্ কেন?

অম্লানবদনে কালিদাস দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—মাসে পাঁচটি করে টাকা বরাদ্দ আছে স্যার, স্কুলে আসা বন্ধ করলে তা বন্ধ হয়ে যাবে। বলে বসে পড়ল।

তখন ত্রিগুণাবাবুর পিরিয়ড ছিল। তিনি কুলার দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চাইলেন। সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে,—বাবা বলেন বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন স্কুল ছাড়লে। তা ছাড়া এখনও স্কুলে পড়ছি এটা শুনতে ভালো, আউট হয়েছি শুনলেই লোকে মনে করবে বকে গেছি, স্যার!

হঠাৎ ত্রিগুণাবাবু উঠে এলেন এদের বেঞ্চের কাছে,—কি বই ওটা? কুলার সামনে হাত চাপা একটা বই ছিল। দেখি? সরোজ-প্রতিমা, বটতলার নভেল একখানা। কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন তাঁর জায়গায়। কুলা জোড়হাতে বললে,—স্যার। বই-খানা লাইব্রেরীর—আমার নয়, আর কখনও আনবো না, এবার ফিরিয়ে দিন স্যার।

স্যারের গোপন মনে, এইসব ধাড়ি ছেলেদের উপর বিলক্ষণ ভয় আছে, খানিক পরে বইখানা ফিরিয়ে দিলেন।

রামাত্রাহীবাবুর ঘণ্টায় ঐ সব ছেলেরা কি জানি কেন অনেকটাই সংযত থাকত। তার স্নেহ ছিল সবার উপরেই। যদি বড্ড বাড়াবাড়ি দেখতেন তখন বলতেন, ওরে কালি, কুলা, তোরা একটু বাইরে বেড়িয়ে আয়;—যা ঘণ্টা বাজলে আসিস। তখন তোরা জোড়হাতে,—আর কখনও এমন হবে না, স্যার, ব'লে ক্ষমা চেয়ে নিত।

এইসব ছেলেরা কোন টিচারকেই ভয় ক'রত না,—একমাত্র হেডমাষ্টার দেবকিশোরবাবু ছাড়া। তিনি ছিলেন হৃষ্টপুষ্ট এবং সুপুরুষ দেখতে, এমন একটা গাম্ভীর্য ছিল তাঁর মধ্যে সহজে কাছে যেতে আমাদের মনে ভয় হ'ত। অত্যন্ত কম কথা কইতেন,—আর সংযত নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রভাব যেন তাঁর চলা বলা, কাজ করা, সকল ভাবেই প্রকাশ পেত। তখন তিনি স্কুলেই থাকতেন। তিনি কুমার ছিলেন,—ত্রিতলের, ফাস্ট´ক্লাসের প্রাকাণ্ড হলের পাশে সাইড রুমেতেই একখানা লম্বা খালিঘর ছিল সেই ঘরেই তিনি থাকতেন। ভিজে, কলবেরোনো ছোলা খেতেন তিনি। আমাদের সবাইকেই খেতে বলতেন। যখন পড়াতেন, নিস্তব্ধ ক্লাসের মধ্যে মনে হ'ত যেন মানুষ নেই। পাশের ঘরেও ছেলেরা স্থির থাকত যখন তাঁর পিরিয়ড থাকত। তিনি ফাস্ট´ ক্লাসেই পড়াতেন। কখন কখন সেকেণ্ড ক্লাসেও।

আসলে তখনকার আর্য মিশন, তুটি মানুষের চরিত্রবলে বরণীয় ছিল। প্রিন্সিপ্যাল, রামদয়াল মজুমদার আর হেডমাষ্টার দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়—এ যোগাযোগ যেন দৈব। মহাগৌরবের সময় ছিল এটা আর্য মিশনের জীবনেতিহাসে। আমরা সেই সময়ের ছাত্র, কিন্তু আমরা কি করেছি? তখন একই শ্রেণীতে তারকনাথ দাস, পঞ্চানন নিয়োগী প্রভৃতি আরো আরো ভালো ছাত্র যারা, সবার

নাম মনে নেই,—এখনকার দিনে জ্ঞানে ও বিদ্যায় প্রসিদ্ধ হয়েছেন তাঁরা, সব ঐ সময়েরই ফল।

ক্লাস আরম্ভ হ'ত স্তোত্র পাঠের সঙ্গে, তবে নীচের ক্লাসে বাংলা আর উপর দিকে, ফোর্থ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস পর্যন্ত একই সঙ্গে বড় হলে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ হ'ত,—শেষ হলে যে যার ক্লাসে গিয়ে সিটে বসতাম। এখন আমাদের সংস্কৃত স্তোত্রমালার মধ্যে 'কালীকা অপরাধ ভজন' স্তোত্র ব'লে যেটি দেওয়া আছে তাইই পাঠ হ'ত। ভারি মিষ্টি,—আমি ঐ সময়টিতে আনন্দে ভজন করতাম ভালো লাগতো ব'লে, আমার স্বভাবের উপর কিন্তু তার কোন প্রভাবই ছিল না। কিন্তু তারককে দেখেছি ঐ স্তোত্র অবৃত্তির সময়ে চোখের জল গড়িয়ে বুকে পড়ছে। কিছুদিন পর তারক এখান থেকে গিয়ে জেনার্‌ল এসেমব্লীতে ভর্‌তি হ'ল। কারণ কি তা জানি না।

এই ফোর্থ ক্লাস থেকেই শ্রীমৎভগবৎ গীতা পড়ানো আরম্ভ হয়েছিল। যে পণ্ডিতমশাই পড়াতে আসতেন,তাঁর অশান্তির সীমা ছিল না। দণ্ড দিতে পশ্চাৎপদ না হলেও গোলমাল সমানভাবেই সহ্য করতে হ'ত। কালিদাস আবার ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের ভাষ্য, প্যারডির মতো ক'রে শোনাত, তাতে সারা ক্লাসসুদ্ধ ছেলের হাসিতে পাশের ক্লাসে টিচার পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠতেন। একদিন সে জ্যোতিষ ব'লে একটি ছেলের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার এবং শেষে অপমান করেছিল তাকে। জ্যোতিষ শান্তশিষ্ট ভালোমানুষ কিন্তু তার আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তীক্ষ্ণ। গায়ের জোরে সে পারবে না জানত। এখন পণ্ডিতমশাই লাস্ট বেঞ্চের ছেলেদের উপর একটু বেশী রকমই অসন্তুষ্ট,—আমরা সবাই জানতাম, জ্যোতিষও জানত। কালিদাসের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই বোধ হয় সে ব'লে দিলে যে তাঁর সংস্কৃত গীতার শ্লোক নিয়ে কালিদাস পরিহাস করে, তার অদ্ভুত রকমের ব্যাখ্যা করে। শুনেই পণ্ডিতমশাই তাঁর সেই

ঝাঁঝালো গলায় ডাকলেন, কালি কালি এদিকে এস। কালি নিঃসঙ্কোচে সিট থেকে উঠে এল।

পণ্ডিতমশাই তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার গীতার ঐ ব্যাখ্যাটি আমায় শোনা ও ত।

সে অম্লানবদনে বললে, স্যার, আমি পাড়ার এক ছেলের কাছ থেকে যা শুনেছিলাম তাই বলছি স্যার।

কি শুনেছে বলো ত? নিঃসঙ্কোচেই তখন সে আরম্ভ করলে—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ, মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়?

ধৃতরাষ্ট্র বললেন,—সবাই সমান সমান এক একটা বেত নিয়ে জুজুর দল ধর্মদাসের মাঠে মহাউৎসব লাগিয়ে খামোকা এক কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে, আবার ওদিক থেকে, কি করবো কি করবো ক'রে পাণ্ডবেরাও নাকি সেখানে তাদের সঙ্গে জুটেছে?—তারপর কি হ'ল বলত সঞ্জয়? এ পর্যন্ত শুনেই ক্লাসসুদ্ধ ছেলেরা হেসে উঠল। পণ্ডিতমশাই, চুপ কর সব, ব'লে কালির কানটি ধরে হিড়হিড় ক'রে টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে এসে বললেন,—বেশ ব্যাখ্যা ত! তারপর—? নিঃসঙ্কোচে কালি, স্যার কানটা ছেড়ে দিন, হাতে পুঁজ লেগে যাবে, খুব আস্তে আস্তে এমনভাবে বললে যেন সাবধান করে দিল। পণ্ডিতমশাই তখনই ছেড়ে দিয়ে হাতটা উঁচু ক'রে রইলেন, ধুয়ে ফেলবেন ব'লে।

তারপর কালি বললে,—সঞ্জয় বললে,—দৃষ্টাতু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা। অর্থাৎ দেখছ না তুমি, সেখানে পাণ্ডবেরা অনেকেই আছে—আবার তার মধ্যে তোমার বুড়ো দুর্যোধনও রয়েছে যে। ছেলেরা হাসি চাপতে না পেরে অনেকেই কাশতে আরম্ভ করলে। পণ্ডিতমশাই বললেন,—আর কাজ নেই তুমি দূর হও। কালি বললে, স্যার মাত্র একটি লাইন আছে না শুনলে আধকপালে হবে। অগত্যা তিনি বলতে বললেন। কালি বললে, আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা

বচনমব্রবীৎ! অর্থাৎ—শ্রেষ্ঠ আচার ইতি আচার্য কিনা সর্বশ্রেষ্ঠ আচার হ'ল আমের আচার। সেই রাজা দুর্যোধনের দলকে দল আমসি মুখের মধ্যে পুরে চুস্‌তে চুস্‌তে—এই পর্যন্ত শুনেই পণ্ডিত-মশাইয়ের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি বললেন, বাবা, তোমায় পুতলে গাছ বেরোতো, তোমার বাবা কেন যে তা না ক'রে স্কুলে পাঠিয়েছেন, তাই ভাবছি। যাও দূর হও এখান থেকে, মূর্খ।

কালি নির্লজ্জ বেহায়ার চরম। পণ্ডিতমশাইয়ের ও কথাটা সহ্য করলে না,—হাঁ স্যার, বাবার মনে সে আইডিয়াটাও আছে, এইবার স্কুল-কেরিয়ার শেষ ক'রে ঘরে উঠলেই ঘটক লাগাবেন।

বলতে বলতে গিয়ে নিজ স্থানে বসল।

আঠারো

এবারকার পালানোর সঙ্গে একটা আক্ষেপের ব্যাপার জড়ানো আছে। স্কুলের ছুটি ছিল,—সেদিন সকালে বাবা, ঘুম থেকে উঠেই,—বাড়ি থেকে রোজ দুপুর বেলায় বেরিয়ে যাই, একথাটা কি জানি কি ভাবে তাঁর কানে এসেছিল, তাই ভয়ানক প্রহার আরম্ভ করলেন। বাড়ি থেকে কেন বেরিয়েছিলি আর কোথায় যাস্‌? এই দুই প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে তাঁর রাগ ত মাথায় চড়ে গেল,—সেই প্রহারের বহর দেখে বাড়িময় এক বিপ্লব কাণ্ড। যাই হোক ক্লান্ত হয়ে যখন তিনি আমায় পরিত্যাগ করলেন তখন অনেকটাই নির্জীব হয়ে পড়েছি। অবশ্য তখনই আবার পালাবার সংকল্প ঠিক হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেইদিনই ঠিক ঘটল না। ঠাকুরমার স্নেহে ও যত্নে তাঁর ঘরেই সেইদিন ও রাতটা রইলাম, তিনি উঠতে দিলেন না, ভাত, খাবার ইত্যাদি সব ঘরের মধ্যেই আনিয়ে দিলেন। পরদিন বাবা অফিস

বেরিয়ে গেলে আমি খেয়ে নিলাম তারপর সবার অগোচরে বেরিয়ে পড়লাম। এবারে মনের অবস্থা আর এক রকম।

প্রথমে ১নং আড্ডায় গেলাম—সেটা খোঁড়া বিজয়ের আড্ডা, আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে জোড়াপুকুর পার্কের দক্ষিণদিকে খানিকটা গিয়ে পার্বতিচরণ ঘোষ লেনে অন্ধকার একটা কানা গলির ভিতর দিকে জীর্ণ স্যাঁৎসেতে একটা বাড়ির দোতলায়। এখন সে সব চিত্তরঞ্জন এভেনিউর মধ্যে পড়ে গেছে। বাড়িটার নীচের ঘর সব অন্ধকার এঁদোপড়া। দোতলায় তখন খোঁড়া বিজয়ের আখড়ায় গিরিশচন্দ্রের 'কমলে কামিনী'র রিহার্শাল চলছিল,—আমার একটা পার্টও ছিল,—দিনকতক মুখস্থও করেছিলাম, তারপর এখন দেখলাম ও সব আর মনে ভালোই লাগছে না। তখন সেখানে ছিল মতিলাল, মোশান মাস্টার (খোঁড়া) বিজয়বাবুর ভক্ত এবং প্রধান অনুচর। আর গানের রিহার্শাল মাস্টার।

সে আমার মুখের ভাব দেখেই বাড়িতে একটা কিছু হয়েছে অনুমান ক'রে জিজ্ঞাসা করলে,—আজ এত গম্ভীর কেন, কি ব্যাপার।

বললাম, ব্যাপার এমন কিছু নয়, তবে আর এখানে আমি ওসব পার্ট করব না।

কেন বল ত? বেশ ত হচ্ছিল।

ভালো লাগছে না, ওসব না করে যাতে পয়সা আসে এমন কিছু করতে হবে।

সবাই ত হোহো করে হেসে উঠল, যেন আমি কি রহস্যের কথাই বলেছি। মতি বললে, আবার মার খেয়েছ বুঝি? আমি কথা কইলাম না। মনে হ'ল যে এখানে না এলেই ভালো হ'ত।

যে ছেলেটি শ্রীমন্ত সাজবে তার নাম আটু, তাকে দেখতে সুন্দর ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ, বড় বড় চোখ দুটি ঠিক পদ্মের পাপড়ির মতো। সে বলে, তুমি পার্ট করবে না, তা হলে করবে কি? আমি বললাম, —তুমি ত শুনলে, কাজকর্মের চেষ্টা দেখবো বললাম না?

সে বেচারা তখন বলে কি,—ওঃ, তা তোমার অত পয়সার এত দরকার কি ?

কথায় কথা বাড়ে আমি খানিক চুপ ক'রে থেকে উঠে পড়লাম। মতি বললে, চললে কোথা ? এখনই যাচ্ছ যে ? আমি, ভালো লাগছে না ব'লেই নেমে পড়লাম। সিঁড়ির কাছে এসেছি—দেখি পিছনে পিছনে আটু আসছে। আমি দাঁড়ালাম, সে কাছে এসে দাঁড়াল না, সোজা সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল,—আমিও পিছনে আছি। নীচের তলায় এসে যখন দুজনেই পৌঁছে গেলাম তখন সে আস্তে আস্তে বললে,—দেখ ভাই আমারও আর এসব ভালো লাগে না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ? সে বললে,—এরা আমাকে নিয়ে টেপাটেপী করে, কাল টানাটানি করছিল—কি করি বলত ?

আমি বললাম, বাড়িতে তোমার বাবাকে বলে দিলে না কেন? সে বললে,—লজ্জা করে বাবাকে ঐসব বলে দিতে, মাকে বলেছি।

আমি জানতাম, ওর বাপকে এরা একটা থোক টাকা দিয়েই ছেলেটিকে এনেছে, বোধহয় ৫০ কি ৬০ টাকা। বললাম, এখানে ত ঐ সবই হয়, তোমার বাপ কি তা জানতেন না ?

সে কিছু বললে না,—বুঝলাম, টাকার জন্যই বাপ ছেলেকে এ পথে ঠেলে দিয়েছে,—ভগবানই জানেন এর ভবিষ্যৎ। তখনই আমার মনে হ'ল এ কখনও বাপের অবাধ্য হবে না, বাপও টাকা ফেরত দেবে না। একটা লেখাপড়াও যেন হয়েছে,—যতদিন না প্রথম ফাইন্যাল প্লে হয় ততদিন ছাড়িয়ে নেবার যো নেই। এমনই ভাবের লেখা-পড়াটা,—যেন আভাসেই শুনেছিলাম।

আটু আমায় বলে কি, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি বললাম,—তা হয় না, তুমি যে হিসাবে পার্ট নিয়েছ তোমার যাওয়া হবে না। তুমি গেলে এদের বিপদ, এরা সহজে ছাড়বে না, পুলিসকেস পর্যন্ত করবে। তোমার বাবা বিপদে পড়বেন।

তবুও সে বলে, তুমি কোথায় যাবে ভাই ?

যেদিকে দু'চোখ যায়। ব'লে আর না দাঁড়িয়ে পা চালিয়ে দিলাম। তার ছলছল চোখ দুটি আমার মনের মধ্যে গাঁথা রইল। আটুর লেখাপড়া হ'ল না, অথবা হবে না মনে করেই তার বাবা তাকে সখের যাত্রার দলে দিয়েছেন, তারপর তার ভবিষ্যৎ? ভাবা যায় না।

ভাবছিলাম, আমারই বা কি কম দুরদৃষ্ট, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে কোথায় চলেছি?—কে জানে কোথায় উঠবো গিয়ে।

গড়পারে আর একটা আড্ডা,—সেখানে কুশল, কালিদাস, কুলা আমাদের ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চের মুরব্বিরা গুলজার করেন।

গিয়ে দেখি কুলা ও কুশল বসে আছে, আর একজন মেয়েমানুষ, বেশ ভদ্রঘরের মেয়েদের মতো ধব্‌ধবে শান্তিপুরের চওড়া পাড়ের সাড়ি আর ভালো ভালো গহনা পরা, উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, কিন্তু বাঁ দিকে টেরীকাটা—গম্ভীর হয়ে বসে আছে। এর আগে কখনও দেখি নি। আমি অপ্রতিভ হয়ে ফিরে আসছি, কুশল তাড়াতাড়ি উঠে খপ ক'রে হাত ধরে ফেললে,—আরে যাস কোথা, এ যে আমাদের ইন্দু, এখন এই আমাদের রাণীর পার্ট নেবে। বোস না, কালিদা এখুনি আসবে।

ওদের গিরিশবাবুর বিষাদ বইখানা আগে দু বার প্লে হয়ে গেছে জানতাম দুর্গাপদ রাণীর পার্ট করত।

আমার পরনে একটা ছিটের ময়লা শার্ট, গলা থেকে কোনটারই বোতাম নেই, একটা আলপিন দিয়ে খানিক আটকানো, পায়ে ছেঁড়া ধুলোমাখা একটা চটি। চুল উস্ক-খুস্ক কাপড়টাও প্রায় ময়লা; আর কুশল, কুলা এদের আদ্দির পাঞ্জাবি, বাঁদিকে সোনার বোতাম, দিশী ধুতি, চুনোট করা কোঁচা। আমি ত সেখানে মরমে মরে গেলাম। বললাম,—আবার আসবো'খন ভাই, এখন আমায় ছেড়ে দে। কুলা তাই শুনে উঠে এল। তার লম্বা চওড়া শরীর,—দাড়ি গোঁফ অনেকখানি বেরিয়েছে,—গায়ে জোরও কম নয়।

সে আমায় ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে ভিতরে নিয়ে এসে সেই মেয়েটির গা ঘেঁষে বসিয়ে দিলে।

এক নরক থেকে এসে আর এক নরকে এমনভাবে পড়লাম। কেমন ক'রে এর ভিতর থেকে বেরিয়ে যাবো, কে জানে? হাড়ের অশ্রদ্ধা হয়ে গিয়েছিল ঐ মেয়েটির বাঁয়ে টেরী দেখে। কাপড়ে-চোপড়ে এসেন্সের গন্ধ,— আমায় দেখে মুচকি মুচকি হেসে হাতের পাখাখানা নিজের মুখের উপর তুলে ধরলে। সেই পাখার আড়াল থেকে মুখখানা তার যেন এক অদ্ভুত রকমের দেখাতে লাগল। সে মিহিস্বরে, যেন কত স্নেহ এমন ভাবেই বললে,—আহা অনেকটা হেঁটে এসেছে বোধহয়, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, ব'লে বাতাস করতে আরম্ভ করলে। এমন সময় কালিদাস এল,—আরে, একি তুই এবেশে কেন? তাই শুনে ত আমি লজ্জায় মরে গেলাম, মনে হ'ল—হে পৃথিবী দ্বিধা হও। কতক্ষণে বেরিয়ে যাব, সেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। মুখ থেকে আমার কথাই বেরুল না।

তখন ওরা নিজেরাই কথা কইতে রইল, সেই অবসরে একটু সরে কুলার দিকে গিয়ে বসলাম। মেয়েটি মিশ্‌মিশে কালো দাঁতের মাড়ি আর ছোট্ট ছোট্ট দাঁত পান-দোক্তার কশে প্রায় ঝিঙে বিচির মতো, মাড়ির রং ও দাঁতের রং প্রায় মেশানো,—কী বীভৎস মূর্তি। এরা পাগল হয়েছে না কি, এই এদের রাণী সাজবে? এর চেয়ে দুর্গাপদ ঢের ভাল ছিল।

খানিক পর, একটু কথার সুযোগ হ'ল আমার। তখন জিজ্ঞাসা করলাম—দুর্গাপদ কোথা?

আরে ছোঃ, আমার সবাই ক্লাব মেম্বারদের মত করিয়েছি, ফিমেল পার্ট আর মেল দিয়ে করাবোই না। দুগ্‌গাপদ ফুগ্‌গাপদ আর চলছে না।

বুঝলাম, দু'বার প্লে করে এবার একটা গর্ব, অহঙ্কার হয়েছে—আর এমেচার থাকতে চায় না। লেগেই আছে তাদের মুখে অমর

দত্ত, নেপা আর কুশীর কথা, যেন তাদের সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতার অন্ত নেই। জানতাম, কালিদাস ক্লাসিক থিয়েটারের অমর দত্তর ঢঙে হেলে দুলে চলে, কথা কয়, আর একটিং ত হুবহু অমর দত্তর নকল। কিন্তু এত কাঁচা যে অনেকেই হাসে, মনে হয় যেন ক্যারিকেচার। কিন্তু এই বয়সেই ওর লজ্জা সরম কিছুই নেই। সাহসটা খুবই আছে সত্য,—তবে আমার ত মোটেই ভাল লাগে না। একথা অবশ্য আমি কাকেও বলিনি, কি জানি কি মনে করবে। ওর সবচেয়ে বড় গুণ এখন এই দাঁড়িয়েছে যে, সব বড় বড় মেম্বারদের সঙ্গে প্রতি কথায় স্যার স্যার ক'রে বেশ মন যুগিয়ে কথা কইতে পারে।

মনে মনে কি সব মাথামুণ্ডু ভাবছিলাম, দেখি সুরেন মিত্তির, যিনি সেক্রেটারী এই ড্রামাটিক ক্লাবের,—নিজের ঘরের গাড়ি থেকে নামলেন।

কালিদাস তটস্থ হয়ে, দৌড়ে গিয়ে দরজা থেকে, আসুন স্যার, ব'লে ভিতরে নিয়ে এল। ইন্দু সামলে-সুমলে, মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টেনে দিয়ে বসল। এই ত চমৎকার অবসর, আমি দাঁড়িয়ে উঠে,—আসছি, ব'লে, সরে পড়লাম। ওরা সেক্রেটারীকে নিয়ে মেতে রইল, আমার দিকে নজর নেই।

পথে নেমেই সামনে দেখি সুশীল পাল, এই ড্রামাটিক ক্লাবেরই একজন, বয়স ছাব্বিশ আঠাশ হবে—জারমান সিলভারের গয়নার কারবার তাদের। লোকটার প্রতি একটু শ্রদ্ধা ছিল আমার। আমাকে দেখে সুশীলবাবু—কি হে চললে কোথা? ব'লে দাঁড়ালেন।

বললাম,—সুশীলবাবু, আমায় একটা কাজ দিতে পারেন?

হঠাৎ কাজ,—কি কাজ?

যে কোন কাজ করবো,—আপনাদের কারখানায়।

কারখানায় হাতুড়ি পেটার কাজ করবে কি,—ব্রাহ্মণের ছেলে তুমি, লেখা-পড়া কর, লেখাপড়া কর।

আমি বললাম, আর আমার লেখাপড়া হবে না, আপনি আমায় না দিলে অন্য কোথাও চেষ্টা করবো, বাড়িতে আর ফিরে যাবো না।

আচ্ছা, এখন ত আখড়ায় যাচ্ছি,—ওখান থেকে সন্ধ্যের পর যখন বাড়ি যাবো তখন দেখা কোরো—এতক্ষণ কোথা থাকবে? চল না, ঐখানেই বসবে'খন,—ব'লে হাত ধরে ভিতরে নিয়ে এলেন। আবার বসে বসে সব কিছু দেখতে আর শুনতে হ'ল।

আজ মিটিংএ ঠিক হ'ল এবার থেকে এদের ফিমেল নিয়েই প্লে হবে। কালিদাসই এর মধ্যে প্রধান উদ্যোগী একথা আর না বললেও চলে। দেখলাম, মেম্বাররা সবাই দৃষ্টিহীন, নাটক নির্বাচনও খেয়ালের উপর, পার্ট সিলেকশনও ঐরকম। কালিদাস অলর্ক-র পার্ট বেছে নিলে, কেউ কোন আপত্তি করলে না। দুর্গাপদকে দেওয়া হ'ল মন্ত্রীর পার্ট। এইভাবে সব ঠিকঠাক হ'লে, রাত ন'টা নাগাদ সুশীল পাল উঠল, আমিও তার পিছনে পিছনে আছি।

তার বাড়িতে আসতে পথে আমার যা কিছু বলবার ছিল বললাম,—সব শুনে শেষে বললে, আচ্ছা এখন আমাদের বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে আর ঐ কারখানায় রাত্রে শোবে, পারবে? তারপর দিন পনেরো কাজ কর, তখন ভেবে দেখবো। আমি একটা আশ্রয় পেয়ে ত বাঁচলাম। আঃ, বাড়িতে আর আমায় যেতে হবে না।

সেই রাত্রে পালের বাড়িতে, ঠাকুরের রান্না ভাত, তরকারী খেয়ে নীচের ঘরে শুয়ে রইলাম। পরদিন আটটার সময় কারখানায় গেলাম। একজন কারিগর তার নাম শশী, তার হাতেই আমায় ছেড়ে দেওয়া হ'ল কাজ শেখবার জন্য। প্রথম দিনে আমি ছাঁচে দশটি জোড়া চুড়ি করেছিলাম।

তিন ইঞ্চি লোহার গোল গোল চেপ্টা,—নীচের একটি আর উপরে একটি এই দুই ছাঁচের মাঝে, গোল গোল নানা সাইজ ক'রে কাটা জারমান সিলভারের মোটা মোটা তার, কারিগরদের পাশে

পাশে থাক দেওয়া পড়ে আছে এবং একটা নিয়ে ঐ ছাঁচের মধ্যে দিয়ে পিটে পিটে ঢেউ খেলানো সেপের চুড়ি তৈরি হয়। এক একজন পঞ্চাশ-ষাট জোড়া ক'রে তৈরি করতে পারে প্রতিদিন। গায়ের জোর দরকার ; দমাদম হাতুড়ি পেটার কাজ সারাদিন চলে, ঠুকঠাক ঘায়ের কাজ নয়।

সারাদিন পর, কয়েকজন, যারা ঐ কারখানায় থাকে তাদের সঙ্গে প্রথম দিন ঐখানেই রয়ে গেলাম। কাজ শেষ হলে সন্ধ্যার আগে কলে স্নান করে নিলাম, তাতে বেশ স্বচ্ছন্দবোধ হ'ল। কিন্তু ঐ কারখানার চারদিকেই বাড়ি ; মধ্যে নীচু টিনের চালওয়ালা একখানা বড় ঘরই কারখানা। প্রায় পনেরো-ষোলো জন কারিগর সারাদিন কাজ করে সেখানে, কয়েকজন তার মধ্যে, বাইরে হোটেলে খেয়ে এসে রাত্রে ওখানে থাকে।

যাদের সঙ্গে রাত্রে আমি থাকি, তাদের একজনের নাম সুরেশ, সে বেশ গায়। সন্ধ্যার পর তাদের গানের আড্ডা বসল। সিহু ব'লে একজন সে তবলা বাজায়। একটা ছোট সিঙ্গল রীডের বহু পুরোনো হারমোনিয়াম বেরোলো, ময়লা গাব ওঠা বাঁয়া তবলা একজোড়া বেরোলো, মন্দিরা বেরোলো,—আর গানের আসর বসে গেল। দেখেশুনে মনে হ'ল এদের আরও কিছু চলে, আমার মনের ভুল নয় সেটা,—পরে দেখেছিলাম সঙ্কোচ এরা মোটেই করে নি। আমার মতো ছোট এক বাচ্চার কাছে আবার সঙ্কোচ এদের,— আসলে কারখানা ঘরে মদ ভাং চলছে একথা সুশীল পাল জানতে পারলে তাদের তাড়িয়ে দেবে যেহেতু সুশীল পাল সৎচরিত্র লোক, সবাই জানে পান তামাক সিগারেট পর্যন্ত কখনও খান না। আমি তারই লোক, সেইজন্য আমাকে আড়াল করেই ওটা চালাবার চেষ্টা প্রথমে করেছিল। দেখি, গান ভালো জমছে না, কেমন একটা খাপছাড়া ভাবের লাগছিল গানগুলো। আমি বসে শুনেছিলাম,— দেখি প্রথমে, গাইয়ে সুরেশ উঠে গেল কোথায়। একটু পরে ফিরে

এল, এসে গান ধরতে না ধরতে সিহু,—আমি আসছি, ব'লে উঠল, তারপর খানিক বাদে আর একজন উঠে গেল। প্রথমটা ত বুঝতেই পারি নি এরা যায় কোথা? শেষ দিকে খানিকটা গান হ'ল। নিধুবাবুর টপ্পা। সুরেশ বেশ গাইলে,—তান কর্তব দিয়ে বেশ বৈঠকী চালে।

যে যাতনা অযতনে, মনে মনে মন জানে, পাছে লোকে হাসে শুনে, আমি লাজে প্রকাশ করিনে। প্রথম মিলনাবধি, যেন কত অপরাধী, নিরাবধি সাধি প্রাণপণে, তবু সে মিছে রোষে আর দোষে আমায় অকারণে। তারপর,—যতন করিতে তারে বাকি কি রেখেছি আমি, আপন করম দোষে সে হল কুপথগামী। সে যে অতি নিদারুণ, কে জানে তাহারি মন,—জানে মাত্র সেইজন যেজন

এরপর যেসব গান হ'তে লাগল—তার কোন মাথামুণ্ডু নেই—রাত এগারোটার পর এদের গানের পালা শেষ হ'ল। আমি ঐ কারখানার রোয়াকের একদিকে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এখানে তিনটি দিন কাজ করেছিলাম,—একাজে আমার মনই লাগে নি। কেবলই হাতুড়ি পিটে পিটে, ছাঁচে চুড়ি তৈরি করা। দেখলাম,—এখানে যখন থাকতে পারবো না তখন এ কথা আর কাউকে জানিয়ে কি হবে। কেবল সুশীল পালের বাড়িতে একবার গিয়ে তাকে বললাম, আমি একাজ পারবো না। শুনে সে বললে, তাই যাও, বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়া কর গে, সেই ভালো।

আমি অবশ্য বাড়িতে গেলাম না, ওখান থেকে সোজা বেরিয়ে সারকুলার রোড দিয়ে শিয়ালদহে এসে খানিকক্ষণ, বড় রাস্তার ধারে একখানা বাড়ির রকের উপর বসলাম। খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে বরাবর হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর হাওড়ার পোল ছাড়িয়ে বাকলাণ্ড ব্রিজের উপর উঠলাম। তলা দিয়ে রেলওয়ে ট্রেন যাতায়াত করছে, ব্রিজের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে দেখলাম। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির—কিন্তু এই পোলটার উপর থেকে যে দৃশ্য দেখা গেল তাতে ক্ষুধা তৃষ্ণাবোধ কতক্ষণ ছিল না। পশ্চিম থেকে বড় বড় ট্রেন আসছে, ব্রিজের ভিতর দিয়ে স্টেশনে ঢুকছে। কত লোক্যাল ট্রেন হুস্ হুস্ করে চলেছে তলা দিয়ে। অনেকক্ষণ দেখলাম।

তারপর চলতে শুরু করলাম। হাওড়ার মাঠ পেরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম একজনকে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড কোনদিকে। ঐ যে ঐ দিকে।

আবার আর একটা পুল পেরিয়ে চললাম গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। এখন যেন প্রাণে একটা স্বস্তি পেলাম। আঃ বাঁচা গেল, কলকাতার মধ্যে থাকলে সদাই ভয়, বাড়ির কারো সঙ্গে পাছে দেখা হয়ে যায় —এখন আর সে ভয় নেই,—বরাবর যেতে পারবো নিঃসঙ্কোচে দূর, বহুদূর সোজা পশ্চিম দিকে।

মনের মধ্যে এইসব কথা তোলাপাড়া চলছে— পশ্চিমে আমার মেশোমশাই কাজ করেন, মাসিমা, খুদিদা, নরেনদা, এরা সবাই পশ্চিমেই থাকে,—কি সুখ! পশ্চিমে থাকতে! আঃ যদি হেঁটে পশ্চিমে যেতে পারি ত একটা ছোটখাটো কাজ ত নিশ্চয়ই হবে। মাইনে যা হোক—পশ্চিমে থাকতে পাবো, পশ্চিম থেকে মাকে চিঠি লিখবো যে মা! পশ্চিমে এসেছি, এখানে কাজ করছি এর চেয়ে আর সুখ নেই।

পেটে জ্বালা ধরেছে, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর দিয়ে ত পশ্চিমে চলেছি, এখন খাওয়ার কি করা যায়?—বেলা তখন বারোটা, একটা হবে। সকালবেলা বেরিয়েছি, সুশীল পালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। সামনে এক প্রকাণ্ড আমগাছের ছাওয়ায় ঢাকা একখানা ঘর, তার খানিক পিছনে একখানা একতলা বাড়ি। দেয়ালে বালি খসে পড়ছে, ছাদের উপর থেকে কাপড় ঝুলছে। সেই আমগাছটির ছাওয়ায় গিয়ে ত বসলাম। ঘরখানার ভিতরে ঠুক্‌ঠাক্ সেকরার কাজের শব্দ পেলাম, এটা সেকরাদের বাড়ি নাকি? গলার পৈতা

পেটের উপর পড়েছে, পাকা গোঁফ, মাথায় টাক এক উজ্জ্বলশ্যাম ব্রাহ্মণ গামছা কাঁধে, বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে, এসে বরাবর ঢুকলেন ঐ সেকরার দোকানে, আমি আমতলায় বসে বসে দেখছি।

ওরে বলা, তামাক দেতো—আসুন ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা এসে টুলে বসলেন। আমিও উঠলাম। ভয় হ'ল এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেই মুশকিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে আমার মাথা খাবে,—বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি, ধরা পড়বার ভয়ও ত কম নয়।

প্রায় আরও মাইলখানেক চলে দেখি বাঁদিকে গলির মোড়ে কাঠের থামের উপর লেখা,—রোড টু লিলুয়া স্টেশন। ওদিকে যাওয়া হবে না। আরও একটু চলে গেলাম,—একখানা একতলা দরজায় একটি মেয়ে বাইশ-চব্বিশ হবে বয়স,—মাথার কাপড় খোলা,—ঐবাড়ির ঝিউড়ি হবে আমার দিকে দেখছিল। মনে হ'ল, এখানে যদি একটু আশ্রয় পাই তা হলে বেশ হয়। সামনে গিয়ে বললাম,—এ বেলাটা আমায় এখানে থাকতে দেবেন একটু ?

কেন ? তুমি কোথা যাচ্ছ ?

শ্রীরামপুরে,—আমার মামার বাড়ি।

রেলে যাও নি কেন ?—হেঁটে যাবে অতদূর ?

বললাম, পয়সা নেই,—হেঁটেই যেতে হবে আমাকে।

তোমার কে আছে ? বাপ মা ?

সবাই আছে, আমরা গরীব।

মেয়েটিও কম নয়,—স্নানাহার শেষে বলছে—লেখাপড়া কি করেছো।

থার্ডক্লাস পর্যন্ত পড়েছি।

আচ্ছা, আমাদের আশুও ত থার্ডক্লাসে পড়ে। সে আসুক, বিকালে দেখব'খন।

আমি ত বিকালের আগেই সেখান থেকে সরে পড়লাম, আমায় যেতে হবে পশ্চিমে, এখানে বেশী দেরি করলে চলবে কেন ?

ওখান থেকে বরাবর পা চালিয়ে শ্রীরামপুরে যখন এলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারেই দেখি চারজন হিন্দুস্থানী, তাদের মোটঘাট নিয়ে বসে আছে একটি চাতালের উপর, অল্প দূরেই একটা পুকুর,—ভাঙা ঘাট, তার পাশেই একখানা জরাজীর্ণ প্রকাণ্ড বাড়ি। কি জানি কি মনে করে আমি তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। ক্রমে ক্রমে কথা আরম্ভ ক'রে তাদের ব্যাপার জেনে নিলাম।

তারা আরা জেলার লোক, কলকাতায় কাজ করতে এসেছিল, —এখন দেশে ফিরে যাচ্ছে। রেলভাড়া বাঁচিয়ে হেঁটে যাওয়ার উদ্দেশ্য তাদের—পথে কিছু রোজগারেরও সম্ভাবনা আছে। তারা বলে যে তাদের খাওয়ার খরচ কিছুই নেই। এ পথটায় মধ্যে মধ্যে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে দু ক্রোশ চার ক্রোশ অন্তর! সাধু, ফকির, যাত্রীদের—যারা পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ করে তাদের জন্য এ পথে বড় বড় কীর্তিমান লোকেরা একটি ক'রে আশ্রয় ক'রে রেখেছেন। রাত্রিযাপনের স্থান এবং চাল, ডাল ঘি তেল, কাঠ হাঁড়ি-কুড়ি পাতা প্রভৃতি দান, যাতে তারা নিজ হাতে রেঁধে বেড়ে খেয়ে বিশ্রাম ক'রে নিজ গন্তব্য পথে যেতে পারে, তার বেশ ব্যবস্থা বহুকাল থেকেই করা আছে। এখনকার দিনে ওসব উঠে গিয়েছে,—পায়ে হেঁটে তীর্থযাত্রা করবার লোক নেই। পয়সার মূল্য কম আর সময়ের মূল্য বেড়েছে বলেই অতদূর পায়ে হাঁটবার দরকার হয় না।

যাক, আমি কিন্তু বিহারীদের সঙ্গেই ভিড়ে গেলাম যখন শুনলাম তাদের ওদিকে লেখাপড়া জানা বাঙালীলোক বিস্তর আছে, সেথায় গেলেই চাকরি হবে। আনন্দেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে ফেললাম। সে রাত্রে ঐখানেই সদাব্রত নিয়ে একসঙ্গে ভাত ডাল হ'ল, আহারাদির পর ঘাটের চাঁদনীতে ঘুমিয়ে পরদিন আবার যাত্রা।

শ্রীরামপুরের পর মানকুণ্ডর বাবুদের বাড়িতে সদাব্রত নিয়ে দ্বিপ্রহরে স্নানাহার সেরে আবার যাত্রা। এইভাবে তৃতীয় দিনের

দুপুরে শক্তিগড়ের স্টেশন ছাড়িয়ে সদাব্রত নিতে গ্রামে প্রবেশ করলাম। গ্রামের নাম বোরসোল। ঐখানে জমিদার বাড়িতে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ির বাইরের দিকেই ভাণ্ডার। সেখান থেকে চাল ডাল তেল নুন লকড়ি নিয়ে ত রান্নার ব্যবস্থা হ'ল। স্নানাহারের পর খানিকটা আলস্য ঘুচিয়ে নেবার জন্য আমার ছোট্ট পুঁটলীটি মাথায় দিয়ে একটু ঘাসের উপর, গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লাম,—ওরাও বসে বসে ঢুলছিল। বিশ্রামটি একটু অধিক হয়ে থাকবে,—ঘুম ভেঙে দেখি আমার বান্ধব কেউ নেই, জায়গাটা ফাঁকা ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ভাবলাম হয়ত এদিক ওদিকে গেছে কোথাও এখনি আসবে। একজনের নাম ছিল মহাদেব। মহাদেব! মহাদেব ! ক'রে চিৎকার করলাম। হঠাৎ মনে হ'ল আমার পুঁটলীটা ? কই সেটা ত মাথার কাছে নেই, কোথা গেল ? তার মধ্যে একখানি দেশী ধুতি কালা পেড়ে, একটি দামী ফ্লানেলের শার্ট, একখানি পাতলা ধোয়া চাদর মাত্র ছিল। একখানি গামছায় বাঁধা বরাবরই ছিল। যখন স্নান করতাম তখন ওগুলি বার করে একজায়গায় রেখে দিতাম, তখনই ওরা দেখে থাকবে। টাকাকড়ি কিছু ত ছিল না, তবে হয়ত সন্দেহ তাদের হয়েছিল যে কিছু নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে। আমার বুকটা দুড়দুড় ক'রে উঠল,—ওরা কি আমায় ফেলে চলে গেল ? আশ্রয়হীন মনে ক'রে নিজেকে যেন বড়ই অসহায় বোধ হ'ল। দুদিন মাত্র তাদের সঙ্গে ছিলাম।

যে ভাঁড়ারী সিদে দিয়েছিল তাঁকে ওখানে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ওদের দেখেছিলেন ? তিনি বললেন, ওরা ত অনেকক্ষণ চলে গিয়েছে, যখন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের একজন পড়ে রইল যে—তাতে বলেছে, ও আমাদের কেউ নয়, আলাদা লোক।

শুনে আমার চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল পড়তে লাগল এই ভেবে যে আমায় ফেলে ওরা চলে গেল, আমি সঙ্গে গেলে ওদের

কোন ক্ষতিই ছিল না তবে কেন আমায় ফেলে গেল? আমার পুঁটলীটি যাওয়ায় বড় কিছু দুঃখ হয় নি, ভারি ত কাপড় চাদর একখানা, তবে জামাটা দামী ছিল। তা হোক, ঐ তুচ্ছ জিনিসগুলি নিয়ে তাদের লাভ কি?

আমায় কাঁদতে দেখে ভাঁড়ারী ঠাকুর কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ছেলেমানুষ, এদের সঙ্গে কোথা যাচ্ছিলে? আমি তখন বুঝলাম যে এই দুর্বলতাই কাল হ'ল। উত্তরে বললাম, চাকরি করবো বলে পশ্চিমে যাচ্ছিলাম।

পায়ে হেঁটে—এদের সঙ্গে?

আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ক্রমে হয়ত পরিচয় জিজ্ঞাসার পালা আরম্ভ হয়ে যাবে, কাজেই এখন সরে পড়াই ভালো। যদি দ্রুত যেতে পারি হয়ত পথে তাদের ধরতে পারবো;—এই ভেবে সন্‌সন্ করে পা চালিয়ে দিলাম তখন খর রৌদ্রের বদলে মেঘ হয়েছে আকাশে, বেশ ঠাণ্ডা,—গ্রামের পথ দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লাম খুব অল্পক্ষণেই। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে পড়ে দেখি পশ্চিম দিকে বহুদূর দেখা যায়, কিন্তু পথে জনপ্রাণী নেই সেদিকটায়।

সুদর্শন এক ভদ্র যুবা পুরুষ বড় রাস্তায় পায়চারি করছিলেন, পিছনে হাত দুটি। নতুন দাড়ি গোঁফ উঠেছে মুখের সঙ্গে চমৎকার মানানো, বড় বড় চোখ, গৌরবর্ণ তাতে লালের আভা, গায়ে একটি সেক্সপিয়র কলারওলা শার্ট, সোনার বোতাম লাগানো। আমার উপর দেখি তাঁর খর দৃষ্টি। একটু ভয় হ'ল। কোন দিকে না চেয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে সোজা বর্ধমানের দিকে পা চালিয়েছি। হঠাৎ শুনি,—ওহে ছোকরা, শোনো।

ফিরে দেখি—তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাজেই দাঁড়ালাম।

তুমি যাবে কোথা?

বললাম,—পশ্চিমে।

খপ্ করে হাতখানা ধরে বললেন,—বাড়ি কোথা ?

মিথ্যা দিয়ে কোনরকমে বাঁচবার উপায় নেই বুঝলাম যখন তিনি বললেন, সত্য বলতো, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ কিনা ? না হলে পুলিসে দেবো, বুঝেছ ?

সকল সত্যই বেরিয়ে এল। তাঁর নাম ক্ষিতীশবাবু, ঐ জমিদারের বাড়িরই একজন। তৎক্ষণাৎ স্টেশন থেকে বাড়িতে টেলিগ্রাম করা হ'ল। হায় অদৃষ্ট, পশ্চিম যাওয়া হ'ল না,—নজরবন্দী রইলাম জমিদার বাড়িতে সে রাত্রে। পরদিন,—বেলা ছুটো নাগাদ ছোট কাকাবাবু আর তাঁর বন্ধু পাড়ার ভোলা কবিরাজ, পালকি করে শক্তিগড় স্টেশন থেকে একেবারে জমিদার বাড়িতে উপস্থিত।

এবারে বাড়ি ফিরে এসে একদিকে হলাম বন্দী। অপরদিকে খানিকটা ছাড়া পেলাম বাবার কাজকর্ম থেকে। আমার পরে যে ভাই হাবু, তখন সে তৈরী অর্থাৎ তাঁর কাজের উপযুক্ত হয়েছিল। এতদিন সে মামার বাড়ি ছিল, এখন এসেছে কলকাতায় লেখাপড়া করতে। এতদিন সেখানে থেকে তার কোন উপকারই হয় নি, উপরন্তু চাষার ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে সে হয়েছে তাদের একজন। এখন এখানে তাকে স্কুলে দেওয়া হয়েছে।

উপরের বৈঠকখানায় গানবাজনার চর্চা হয়, কাকাবাবুর বন্ধু-বান্ধবেরা আসেন,—আগে আমার সেখানে যাবার অধিকার ছিল না। এখন থেকে সন্ধ্যার পর অবাধ গতি হ'ল, হারমোনিয়াম নিয়ে গান অভ্যাসও চলতে লাগল, আর দিনের বেলায় বন্দী জীবন, তার সঙ্গে বাবার ইংরাজী নভেল আছে,—সুতরাং এইভাবেই দিন কাটতে লাগল।

বন্দী হলাম বলেছি, সে বন্দী দশাটা এমনই যে তার মধ্যেও অনেক ফাঁক ছিল পালাবার। হ'ল কি, এবারে যখন ছোট কাকাবাবু আমায় শক্তিগড় থেকে নিয়ে এলেন ফিরিয়ে। বাবাকে

পিসিরা, ঠাকুমা সবাই পরামর্শ দিলেন যে ওকে একটা ঘরে চাবি দিয়ে রাখা হোক। যখন বাবা অফিসে যাবেন চাবি দিয়ে যাবেন, এলে খুলে দেওয়া হবে। পড়াশুনা লেখা যা কিছু করে ঘরের ভিতরেই করবে ইত্যাদি। বাবা তাইতেই রাজী হলেন। নিয়ম পালন আরম্ভ হ'ল ঠিক পরদিন থেকেই। অফিস যাবার সময়, বার বাড়িতে পায়খানার পাশেই একটি ছোট্ট ছোট্ট ছ' ফুট ঘরে আট ফুট ঘরে একখানা তক্তপোশ পাতা আছে তার উপর মাদুর পেতে আসন হ'ল আমার। আমাকে চাবি দিয়ে বাবা যেতেন, ছ'টার সময় তিনি বাড়ি এলে আমার ঘরের চাবি খোলা হ'ত। তারপর চোখে চোখে রাখা,—সন্ধ্যার পর কাকাবাবুর বৈঠকখানায় কিছু সংগীত চর্চা। এইভাবে কাটতে লাগল আমার দিন।

উনিশ

বাড়ির বার হতে পারি না। সকালবেলাটা বাবা যতক্ষণ ঘুমান, ততক্ষণ হয় বাতাস করতে হয়, না হয় পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে হয়। মনে মনে অনেক কথাই ভাবি। এরা কি বুদ্ধিমান, আমায় ঘরে চাবি দিয়ে আট ঘণ্টা মাত্র বন্ধ ক'রে রেখে আমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাবে। এরা মনে করে কি ? আমার হাসি পায় এদের কাণ্ড দেখে। আর বাবাও কি ক'রে বিশ্বাস করলেন যে এইভাবে আটক করাই আমার পলায়নব্যাধির একমাত্র ঔষধ ? তিনি কি জানেন না, তিনি কি ছিলেন এক সময় ? তাঁর অবশ্য বাড়ি থেকে পালানোর রোগ ছিল না, কিন্তু অন্য দিকে ? এদের আগাগোড়া সবারই ধারণা বাড়ি থেকে পালালেই চরিত্র নষ্ট হয়, আর বাড়িতে আবদ্ধ করলে, বা পালাতে না পারলে স্বভাব চরিত্র

ভালো থাকে। তারপর, খাওয়ার কষ্ট ত ছিলই এবারে পরা অর্থাৎ বস্ত্রকষ্টও আরম্ভ হ'ল। যেহেতু ছেঁড়া নোংরা কাপড় পরা থাকলে বাইরে যেতে পারব না, এইজন্য এমন সব কাপড়ের ব্যবস্থা হ'ল যা প'রে বাইরে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু একথাটা কেউ ভাবলে না যে যদি পালাবার উদ্দেশ্যই থাকে, ফাঁকে ফাঁকে কাপড় সংগ্রহের কোন বাধাই নেই, যেহেতু এতবড় সংসারে চারিদিকেই কাপড় জামার ছড়াছড়ি। যাই হোক এদের বুদ্ধি অনুসারে আমার জীবন এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ল যখন একটা পরিবর্তন না হলে আমার পক্ষে জীবন ধারণই বৃথা যেহেতু, মনের অবস্থা পাগলের মতোই হয়েছে। কিন্তু চুপচাপ থাকি। এমনই সময় একদিন জেঠামশাই, সন্ধ্যার পর আমাকে ডেকে একজোড়া নূতন কাপড় হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—এখন থেকে তুমি আর ছেঁড়া কাপড় পরবে না। আমি অবাক হলাম। তারপর যা হ'ল তা' অবাকের উপরের ব্যাপার।

পরদিন, সকালে যখন বাবাকে বাতাস করছি, বাবা শুয়ে শুয়ে পা নাড়ছেন, মুদিত চোখে নিদ্রার ভাব,—দ্রুতপদে অচলা পিসি এসে,—অ—ছোড়দা, ওঠো না, ওরা যে সব এসেছে। শুনেই বাবা তৎক্ষণাৎ উঠে পড়লেন,—আমায় বললেন, তামাক সাজ।

তিনি বাইরে যাবার পরই ছোট কাকাবাবু এসে, ঠাকুমাকে গোপনে কি বলে গেলেন।

ঠাকুমা দ্রুতপদে এসে আমায় বললেন,—ও ভাই তুমি এবার একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও, তোমার দেখতে এসেছে। আমি তো অবাক হলাম,—মাও আমার যেন তটস্থ হয়ে তোরঙ্গ থেকে কাপড় বার করে দিলেন, কিন্তু জামা নেই। এক পিসতুতো ভায়ের জামা পরে, একদল প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে প্রণাম ক'রে ত বসলাম। সেখানে বাবা, কাকাবাবু, জেঠামশাই সবাই আছেন, মহা উৎসাহে কথা কইছেন। টানা পাখা চলছে। তাঁদের মধ্যে একজন দীর্ঘ স্থূল শরীর—চায়না কোট গায়ে, মোটা চেন

ঝোলানো, প্রধানের মতোই চেহারাটি, একটু বেশী বেশী আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলেন। শেষ হাতের লেখার পরীক্ষায় সব কিছু শেষ,—দেখা হয়ে গেলে প্রণামান্তে উঠে এলাম। এর দিন আট পরেই ধুমধাম করে আশীর্বাদ—এবং আরও একপক্ষ কাল পরে শুভ পরিণয় কর্ম সমাধা—যার নাম আমার বিয়ে হয়ে গেল।

পারিবারিক প্রথা অনুসারে ধুমধাম, আত্মীয় বন্ধু সমাজে সামাজিক বিতরণ, গড়ের বাজনা, সানাই রোশনাই ক'রে বিবাহ হ'ল জোড়াসাঁকো-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাপতি মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র (পালিতা) কন্যার সঙ্গে। দাসুবাবু ছিলেন ছোট ভাই, তাঁরই জ্যেষ্ঠা কন্যাকে উমাপতিবাবু নিজ কন্যাবৎ লালন-পালন করেছিলেন, নিজ মনোমতভাবে শিক্ষাও কিছু দিয়েছিলেন। বয়স যখন তেরো বৎসর থেকে চোদ্দয় পড়েছে, তখনই আমার সঙ্গে তার প্রজাপতি নির্বন্ধ ঘটল, আমার বয়স মাত্র পনেরো। জীবনের আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়ে গেল।

সত্যই আমি অবাক হয়ে গেলাম এই ভেবে যে, আমাকে যিনি কন্যা দান করলেন তিনি কোন বিষয়ে আকৃষ্ট হয়ে একাজটি করেছিলেন। প্রধান কারণগুলি যা পরে আবিষ্কার করেছিলাম তা এই যে, প্রথম,—প্রকাণ্ড বাড়ি, চটকদার বৈঠকখানা যেমন ধনীদের হয়, তারপর খুব কাছেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যখন ইচ্ছা মেয়ে শ্বশুরবাড়ি আসবে। যতদিন না জামাই বড় এবং উপার্জনক্ষম হয় ততদিন কোন কাজে কর্মে এলেও তিন দিনের বেশী থাকবে না। মেয়ের দুবেলা চা খাওয়ার অভ্যাস, কাছেই শ্বশুরবাড়ি, চাকরের দ্বারা সহজেই তা পাঠানো যেতে পারবে। এই কয়টি সুবিধার জন্য পঁয়তাল্লিশ ভরি সোনা, পাঁচশত এক টাকা নগদ, রদারহামসের ইংলিশ সোনার ঘড়ি চেন, একশো পঞ্চাশখানা নমস্কারী কাপড়, কাঁসা পিতল ও রূপার দান-সামগ্রীর সঙ্গে শ্রীমতী মৃণালিনীকে

আমার মতো একজনের হাতে সম্প্রদান ক'রে তখনকার মতো সুখী হয়েছিলেন। যেহেতু আমরা দুজনেই ছোট, পুষ্পশয্যার রাত্রে ঠাকুরমার ঘরে ঠাকুরমার সঙ্গে এক শয্যায় আমাদের বরবধূর পুষ্পশয্যা হ'ল।

আর এক কথা।

এই উপলক্ষ্যে এলাহাবাদে আমার মাসীমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, অবশ্য দূর পথ, ও ছুটি পাওয়া যায় নি তাই মাসীমা-মেসোমশাই আসতে পারলেন না বটে তবে তাঁর মনের কথা লিখলেন বাবাকে,—অত অল্প বয়সে, শরীর যখন এতটা অপরিণত, পুষ্টই হয়নি, মাত্র পনেরো বৎসরের একটি বালকের বিবাহ দেবার আগে কর্তৃপক্ষের দু'বার ভেবে দেখা উচিত নয় কি? এ দায়িত্ব বড় গুরুতর, এর বেশী আমার পক্ষে বলা শোভন হবে না।

অবশ্য মেশোমশাই ছাড়া আর কেউ এতটা প্রতিবাদ করে নি বরং সবাই প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলেন।

এই বিবাহসূত্রে আমাদের সংসারে দুটি স্মরণীয় ব্যাপার ঘটে গেল, তার একটি শুভ আর ঠিক অশুভ না হলেও অবাঞ্ছিত বলা যায়। শুভ যেটি,—তা বাবার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। সেই প্রায় তের বছর আগে, বাবার এক অসম্ভব আবদার দিদিমা মেটাতে পারেন নি, রাগ করে তাই তিনি এতদিন আর ওদিকের মাটি মাড়ান নি। এখন এখন এই শুভ সুযোগে তিনি স্বয়ং গিয়ে দিদিমাকে নিয়ে এলেন। যখন এলেন, আমাদের বাড়ি, বড় বড় মাছ, দই মিষ্টান্ন আনাজ তরকারীতে ভরে গেল। তখন থেকেই যেন যজ্ঞ আরম্ভ হয়ে গেল। সে ধুমধাম প্রায় এক পক্ষ কাল চলেছিল। তারপর দ্বিতীয় অবাঞ্ছিত ব্যাপারটি এই যে বিবাহের পর অল্প দিনের মধ্যে জেঠামশাইরা আলাদা বাড়িতে উঠে গেলেন। অত বড় একটা পরিবার আর একটা প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে আর কতদিন চলতে পারে, সংসার ত বেড়েই চলেছে। অপর কারণ—দাদামশাইয়ের

মৃত্যু, বিশেষ আমার উপনয়নের পর থেকেই মনোমালিন্য শুরু হয়েছিল বড়দের মধ্যে।

আমার প্রথম লাভ এই হ'ল—শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরের সঙ্গে এক শয্যায় প্রথম রাত্রিবাসের পরদিন প্রাতে, যখন নীচে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম দেখি, 'প্রদীপ' রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্র, আর সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকা দু'খানি সযত্নে একটি পেপার ওয়েটে চাপা দেওয়া সামনেই রয়েছে। মনে হ'ল যেন নিধি পেলাম। তখনই আরম্ভ ক'রে দিলাম পড়তে। মাসিক 'ভারতী' কতক সংখ্যা, সাধনা, অনেকগুলি ছিল তাঁর কাছে। সে আকর্ষণের কথা এখনও মনে আছে সেই আমার মাসিক সাহিত্যে প্রথম আকর্ষণ, আর তখন থেকেই যা কিছু কল্পনা তা কেমন ক'রে মাসিক-সাহিত্যে প্রকাশের উপযোগী হবে তাই ছিল চিন্তা। তখন থেকে বোধ হয় তিন বৎসরের মধ্যে কোন মাসেই ফাঁক পড়ে নি। তারপর বইয়ের আলমারিতে উমাপতিবাবুর, 'জন্মভূমি' বাঁধানো ছিল, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সুতরাং এই বিবাহেতে আমার প্রথম ও প্রধান লাভ হ'ল বাংলা সাহিত্য চর্চার সুযোগ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিপাই মিউটিনির কথা, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তখনকার প্রসিদ্ধ লেখকের সারগর্ভ রচনা সকল জন্মভূমিতে বেরিয়েছিল। তা ছাড়া তিনি বঙ্গবাসীর নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন, পূজার সময়ে উপহার পুস্তকও নিতেন, এখন আমার আগ্রহ দেখে বেশী বেশী নেওয়া আরম্ভ করলেন। আমাদের বাড়িতে এসব পাট নেই—তারপর আমার ঐ সকল পাঠে অনুরাগ দেখে কর্তা সুযোগ পেলেই নানা প্রকার পুস্তক সংগ্রহ করতেন। আমি তার ফলভোগ করতাম। ওদিকে মামারা নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের গ্রাহক ছিলেন,—সেখানে থাকলে পড়তে পেতাম। অবশ্য শ্বশুর-বাড়ির পুস্তক সংগ্রহের সব ফলটা ভোগ যে একলা আমিই করতাম

সেটা ঠিক কথা নয়, আমরা দুজনেই করতাম। মৃণালিনীর ডাক নাম ছিল মিনা। তারও বাংলা সাহিত্যে অনুরাগ কম ছিল না। সেটা আবার আমাদের বাড়িতে সবারই চক্ষুশূল ছিল।

মেয়েমানুষের অত বই পড়া কেন? বাবার বিশ্বাস যা, তা' এখনকার দিনে বলাও বোকামী।

যখন এইরকম আমাদের সংসারের সবাইয়ের ধারণা তখন যদিও দুই একদিনের জন্য মিনাকে আনা হ'ত, মনে হয় তার বড় সুখ ছিল না এখানকার আবহাওয়ায়। কিন্তু আশ্চর্য এই নারীপ্রকৃতি— আমার মনে যাই হোক তার বোধহয় মন্দ লাগত না তার ভাব দেখেই বোঝা যেত, আমাদের বাড়িতে এলে। মনে আছে বাবা একবার কয়েক দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন,—মাও মামার বাড়িতে লক্ষ্মীকান্তপুরে প্রসব হতে গিয়েছিলেন এমনই সময় আমাদের দুজনকে একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিলবার সুযোগ দেবার জন্যই ঠাকুমা নাতবৌকে আনিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্য। বাবা, মা, থাকলে ত বধূর সঙ্গে দিনে রাতে দেখা হবার উপায় ছিল না, এবারে তা ঘটে গেল। ঠাকুমা পিসিদের সবাইকে বলে দিলেন ওরা আপনভাবে মেলামেশা করুক যেন কেউ ওদিকে লক্ষ্য না করে। তাতে হ'ল এই, আমরা দুজনে দুজনকে দিনের আলোয় দেখলাম, —কথা কইলাম, তারপর আনন্দের অতিশয্যে সন্ধ্যাবেলা বোনদের সঙ্গে নিয়ে একত্র চাঁদনী রাতে সবাই মিলে চোর চোর খেলাও হ'ল খানিকটা ছাদের উপরে। সে যে কী আনন্দ, জীবনের কী বিচিত্র অভিজ্ঞতা! ভালবাসার স্বাদ পেয়ে জীবন আমার সার্থক হ'ল, মনে হ'ল এই ত জীবন, যদি এই রকম থাকে তা হলে আর কিছুই চাই না।

তা হবার নয়,—বাবা ফিরে এলেন, আর সব হয়ে গেল ঠাণ্ডা, —ভিতরে ভিতরে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলতে থাকল, বাইরে সব যেন নিভে গেল। দেখা-শোনা লুকিয়ে চুরিয়ে, ছাদের সিঁড়িতে

চলত। এইভাবে কয়েকদিন পরে তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিত্রালয়ে যেতে হ'ল।

তারপর থেকেই পত্র লেখা আরম্ভ হয়ে গেল।

তখনকার দিনে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' ব'লে একখানা বই বোধহয় সকল বাড়িতেই থাকত। তাই দেখে নববিবাহিতারা স্বামীকে পত্র লিখতেন। তাতে কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রেমে বিহ্বল নায়কের ও নায়িকার উক্তির ছলে নানাভাবে আত্মনিবেদন করা আছে। প্রাণনাথ, প্রাণেশ্বর, হৃদয়েশ্বর, জীবিতেশ্বর, হৃদয়বল্লভ, প্রাণবল্লভ ইত্যাদি সখের সম্বোধনের ছন্দ, পড়তে পড়তে বিরহের আকুলতা যেন অসহ্য মনে হয়। যাঁরা বঙ্কিমের কবিতার মধ্যে সুন্দর ও সুন্দরীর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণের কথা পড়েছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন তখনকার পত্রের মধ্যে দিয়ে প্রেম-নিবেদন কি রকম ছিল। সে এক স্মরণীয় দিন আমার পক্ষে যেদিন তার সেই প্রথম পদ্যে লেখা পত্রখানি এল তাদের বাড়ির চাকরের হাতে। আমিও তার উত্তর দিলাম পদ্যে। তারপর গান রচনায় মন দিলাম। গানের ভিতর দিয়ে আমার প্রেম-নিবেদন আরম্ভ হয়ে গেল।

মাসে একবার ক'রে নিমন্ত্রণ আসত আমার। কখনও এক রাত্রি কখনও দুই রাত্রি,—তখনও পৃথক শয্যা। শ্বশুরমশাই ছিলেন বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক আদর্শবাদী একাধারে! অল্প বা অপূর্ণ বয়সের স্ত্রীপুরুষ পৃথক থাকবে, এই ছিল তাঁর নীতি। অথচ পনেরো বৎসরের বালকের সঙ্গে প্রায় চতুর্দশী কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া তখন আমার শরীর ছিল রোগা, ছিপছিপে, —তাঁর কন্যার শরীরও রোগা, বেশ পাৎলা, তবে হয়ত দুর্বল নয়। তাই তাঁর আরও ভয়, উভয়ের ঘনিষ্ঠতার ফলে পাছে অকল্যাণ ঘটে। তিনি দু একবার আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে একথাও বললেন, অপরিণত শরীরে যদি কিছু, অর্থাৎ গর্ভসঞ্চার হয় তাহলে ওকে বাঁচানো শক্ত হবে। হায়, হায়! তাঁর এই আশঙ্কাই শেষে সত্য হয়েছিল।

যাই হোক বিবাহের পরেই আমার সঙ্গে অফিসের সম্বন্ধটা যাতে ঘটে যায়, সেই চেষ্টাই বাবা আরম্ভ করেছেন। বাবা হাইকোর্টে কাজ করতেন বলেছি। আমাদের গোষ্ঠীর সবাই,—আজ তিনপুরুষ ঐ হাইকোর্টে কাজ করছে। ঠাকুরদাদামশাই সেরিফের হেডক্লার্ক ছিলেন, কাকাবাবু এখন ঐ পদেই বহাল হয়েছেন।

বাবা অনেক রাত পর্যন্ত লিখতেন। এখন তিনি আমাকে ঐ সকল নথিপত্র নকলের কাজে লাগালেন। যে সকল মূল নথির নকলগুলি ছাপাখানায় যায় সেইসব নথি নকলের কাজে লেগে গেলাম। কাজটা কিছু শক্ত নয়, হাতের লেখাও আমার মন্দ নয়, চলনসই রকমই ছিল। কিন্তু শক্ত লাগত কোন কোন জজের বা সাবজজের হাতের লেখা। সেগুলি পড়া বিষম কঠিন, এমন বিশ্রী লেখা কেউ কখনও দেখে নি। মফঃস্বলের সাবজজ, জেলা জজ,—তাদের নিজ হাতে যে রায় লেখা, তা পড়া এক অধর্ম। যাই হোক ক্রমে ক্রমে আয়ত্ত হতে লাগল, তাতে বাবারও কিছু অর্থাগম হতে থাকে, আর সেই কারণেই আমার উপর পীড়নটাও অনেক কমে গেল। কিন্তু আসলে বন্ধ হ'ল না। তিনি সব সময়ে নিজেকে সংযত রাখতে পারতেন না আর আমি যে বিবাহিত, এখন আর বালক মাত্র নেই সে কথাও মনে রাখতে পারতেন না।

এইভাবে জীবন গতি চলতে চলতে আমার মন ক্রমে একটু বেশী মাত্রায় বহির্মুখী হয়েছিল, ভালো কাপড় জুতো জামা, থিয়েটার দেখার প্রবল তৃষ্ণা,—ভালো পিন-হেড সিগারেট খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। অফিসের যে সব কাজ বাড়িতে করতাম তার মূল্য কতটুকু তা জানতেই পারি নি। কাজ করতে হয় করি,—ভালো করে করবার চেষ্টাই করি, তাতে কখনও একটু ভালো ব্যবহার পাই, উৎসাহবাণী শুনি। কিন্তু তাতে কতটা অর্থানুকূল্য হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না। যখন একটু সাহস করে বলে ফেলি আমার

জুতোটা বড্ড ছিঁড়েছে, তখন,—একটা মুচি ডেকে ভালো ক'রে তালি দিয়ে নে না, ব'লে সরে গেলেন। জামা-কাপড়ের দুর্গতি বিবাহের পর থেকে কতকটা দূর হয়েছে, একটু পোষাক পরিচ্ছদেও ভদ্র হতে চাই। তা ছাড়া আগেই বলেছি—আমাদের সংসারের আদর্শ গাঙ্গুলী বাড়ি, তাদের ছেলেরা যেমন বেশভূষা করে আমাদেরও সেই দিকে রুচি।

বিয়ের ছ' আট মাস পরে দ্বিরাগমন, তারপর থেকে আমাদের রাত্রে এক ঘরে মিলন অনুমোদিত হ'ল—তারপর আমাদের বাড়িতে আমার একখানি ঘর হ'ল। কিন্তু তখনও তাঁরা তিন-চার দিনের বেশী রাখতেন না। অবশ্য আমাদের বাড়িতে তার সঙ্গী ছিল ভালো এবং সংখ্যায় অনেকগুলি সেজন্য এখানে তার সময় মন্দ কাটত না, এইভাবে প্রায় এক বৎসর গেল।

তখন পৌষ মাস, যে ঘরে আমি থাকি কোন একটা জিনিসের সন্ধানে এক সন্ধ্যায় গিয়ে দেখি ঘরের মধ্যে কোলাহল—যেন আনন্দের মেলা চলছে। আমায় দেখে, বোনেরা দুদ্দার শব্দে বেরিয়ে গেল। ভিতরে সে আর তাদের বাড়ির ঝি, তার হাতে ঢাকনা দেয়া একটা রূপার গ্লাস। আমায় দেখে মিনা তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে—তুই যা ব'লে ঝিকে বাইরে পাঠিয়ে দিলে। আমি ঘরে ঢুকলাম, তখন দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে গ্লাসের ঢাকনাটা খুলে রেখে দিলে,—তারপর আমার মুখের কাছে গ্লাসটা ধরে বললে,—খাও। ভাবলাম ওটা চা। আমাদের বাড়িতে চায়ের পাট নেই, সেইজন্য তার বাপের বাড়ি থেকে প্রত্যহ দু'বার ক'রে চা ও মাঝে মাঝে খাবারও আসে, লজ্জায় আমার মনের মধ্যে যা হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এখন এই চা ও আমায় খাওয়াতে চায়! বললাম,—চা ত আমি এখানে খাই না, তুমি তো জানো। সে বললে,—চা নয়, খেয়ে দেখ না। কি সুন্দর সৌরভ,—এক চুমুক দিয়ে বললাম, আর নয়। নূতন নলেন গুড়ের সঙ্গে খাঁটি দুধ ঘন করে পাক করা। অমৃত।

তারই পিত্রালয় থেকে এসব আসছে আমাদের বাড়িতে, তার খাবার জন্য। হায়, আমার বিবাহ, হায়, তার শ্বশুরবাড়ি আসা।

এ সকল যা ঘটেছে, মনের কতক অংশে একটা ক্ষত উৎপন্ন করলেও তার গভীর ভালোবাসার টানে ও-সকল ভেসে যেতে লাগল। যখন তাদের বাড়ি থেকে প্রতি মাসে একবার ক'রে নিমন্ত্রণ আসে, যাওয়া হয়, তখন শাশুড়ি ঠাকুরাণী,— আর এক রকমে আরম্ভ করেন। যথা,—এদিকে পড়াশুনাও কিছু হ'ল না, বেয়াইমশাই অফিসে ঢোকবারও কিছু করছেন না দেখি। এসব ত ভালো কথা নয়, ওমা বেটাছেলে। এ কি রকম পুরুষ মানুষ, কাজ নেই কম্ম নেই, রোজগারের চেষ্টা নেই। দুদিন বাদে ছেলে পুলে হবে, তাদের গায়ে একটু সোনা থাকবে না, ভালো একটু জামা-পোষাক হবে না,—দশের মধ্যে দাঁড়াবার মতো কিছু হবে না। কি জানি বাবা, বেয়াই-বেয়ান কি করে নিশ্চিন্দি হয়ে আছেন। ইত্যাদি।

শ্বশুরমশাইও শুনছেন,—তিনি বললেন, ও ছেলেমানুষ, ওকে বলে কি লাভ? কিন্তু বেয়াইকে ডাকা সাহসে কুলোয় না,—কথাই চলে কেবল। মেয়ের ভবিষ্যৎ সুখ-সম্বন্ধে যা-কিছু সে-সব নিরাশ কথা শাশুড়ির আমাকে শোনানো ছাড়া উপায় ত' নেই, যেহেতু আমাদের বাড়ির আর কারো সঙ্গে তো তাঁর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই।

রাত্রে যখন আমাদের দেখা হয়, তখন সে বলে,—তুমি মার কথায় কিছু মনে কোরো না যেন। ওঁর ঐ রকম স্বভাব, ব্যস্তবাগীশ লোক, আর কেবল সোনাদানা টাকাকড়ি—এই সবই বোঝেন, আর কিছুই জানেন না।

আমার অফিস থেকে আনা কাজ বাড়তে চলছে,—কিন্তু অফিসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে না,—আমার নিজেরও নকলনবিশী করতে ইচ্ছা নেই। তবে ঐসব নকল করার কাজের মধ্যেও একটু সুখ ছিল। যে সব নথিপত্র নকল করতাম, সেগুলি এক

একটা মোকদ্দমার কথা—তার মধ্যে দেওয়ানী আছে, ফৌজদারী আছে, সাক্ষীর কথা, উকিলের জেরা আছে, নানাপ্রকার ব্যাপার আছে। গল্পের দিক থেকেও কম চিত্তাকর্ষক নয়। কত রকমের মোকদ্দমা, অনেক কিছুই জানা যায়, শেখা হয়ে যায়। আবার নানা রস পাওয়া যায়।

একদিনের ব্যাপার। একটা খুনী মোকদ্দমার নথি,—বাবা অফিস থেকে কপি করতে বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেই রাত্রে নিজেই আরম্ভ করে দিলেন, রাত বারোটা পর্যন্ত লিখলেন। পরদিন অফিস যাবার সময় বাকীটা আমায় দিয়ে ব'লে গেলেন যে সারা দিনে অন্ততঃ বারোখানা পাতা লেখা চাই, এসে দেখবেন।

আমি তো সকাল সকাল আরম্ভ ক'রে দিলাম। লিখতে আরম্ভ ক'রে প্রায় একপাতা লিখেই দেখলাম যে কেসটা এমনই ইণ্টারেস্‌টিং, যেন একখানা ডিটেক্‌টিভ নভেল। এক মুসলমান, প্রতিবেশী একজনের স্ত্রীর উপর আসক্ত হয়ে তার স্বামীকে খুন ক'রে এক জায়গায় পুঁতে ফেলে,—উদ্দেশ্য ছিল ঐ স্ত্রী বিধবা হলে তাকে নিকে করবে। নোয়াখালীতে এই ব্যাপার ঘটে, পারজিটার তখন ওখানকার জেলাজজ। তাঁর কাছেই এই মোকদ্দমা, সেখানে বিচার শেষ ক'রে হাইকোর্ট-সেসানে পাঠিয়েছে।

কি দুর্বুদ্ধি ঘটল আমার, আগে এটা তো একবার পড়ে নিই, তারপর ঠিক সব লিখে দেবো; এই ভেবে পড়তে আরম্ভ করলাম। সাক্ষীর জবানবন্দি, উকিলের জেরা, জজের রায়,—আগাগোড়া সব পারজিটার সাহেবের হাতের লেখা। এত বিশ্রী জড়ানো জড়ানো খুদে খুদে লেখা, তার উপর তখনও হাতের লেখা আমার বিশেষ পড়বার অভ্যাস ভাল ছিল না। গল্পটা পড়তে পড়তেই বেলা প্রায় দুটো হয়ে গেল,—তখন ভয় হ'ল—এখন কি এগারো পাতা লেখা সম্ভব? যাই হোক ছখান পাতা যখন শেষ হ'ল তখন বাবা এসেছেন। তারপর যখন লেখা দেখলেন তখনই রাগ গেল মাথায়

চড়ে,—এঁ্যা বলে গেলুম বারো পাতা লিখে রাখতে, সারা তুপুর কি করেছিলি ? তিনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। ধরে নিলেন আমি বাইরে ইয়ার্কি দিতে গিয়ে সারা তুপুর কাটিয়েছি। পিসিরা যদিও একবাক্যে সাক্ষ্য দিলেন, সারাদিন দালানে টেবিলে বসে আমাকে কাজ করতেই দেখেছেন,—কে শোনে ওসব কথা, বিশ্বাসই বা করে কে ? আরম্ভ ক'রে দিলেন মার। একটা মোটা বেতের ছড়ি ভাঙলেন আমার পিঠে, তবে শান্ত হলেন। পিঠে বুকে মাথায় দাগগুলো ফুলে উঠল।

পরদিন তাঁর বুঝি আমার প্রতি, করুণা ঠিক নয়,—হয়তো দয়া হ'ল। একটু অনুগ্রহ দেখাতে তিনি অচলা পিসিকে ডেকে অফিসে যাবার সময় বললেন, অচলা—আজ বৌমাকে আনতে পাঠাও, বিকেলে যেন আনা হয়। পিসি বললেন,—আজ শনিবার বারবেলা যে। বাবা বললেন,—বারবেলার আগেই আসবেন। ব'লে পাঠাও, যেন অফিস থেকে এসে দেখতে পাই। বাস্, বেদবাক্য—ও হুকুম নড়চড় হবার নয়।

কাছের কুটুমবাড়ির সুবিধাই এই ; যদিও শাশুড়ী ঠাকুরাণী সন্তুষ্ট ছিলেন না আমার কোনরকম কাজকর্ম না থাকার জন্য কিন্তু বেয়াইয়ের অনুরোধ মতো মেয়েকে পাঠাতে কখনও আপত্তি করতেন না। সেদিনই বেলা তিনটা নাগাদ প্রায় তিন মাস পরে, বৌ এল শ্বশুরবাড়িতে। এখন আমার ঘর হয়েছে বলেছি, তা ব'লে দিনে-মানে দেখা হবার যো নেই—রাত্রের অপেক্ষায় থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। শনিবার ছিল সেদিনটা, বাবাও সকাল সকাল এসে পড়লেন এবং সঙ্গে আনলেন একশো বড় বড় তপসে মাছ। এই সময়ে ল্যাংড়া আম আর তপসে মাছ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। সুতরাং সেদিন বৌ আসার কল্যাণে আমাদেরও কিছু উত্তম ভোজন জুটেছিল।

রাত্রে, দৈবের খেলা, আমরা তুজনে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে কথা

কইছিলাম, ঘর অন্ধকার ছিল। ইতিমধ্যে দিনের আলোয় সে আমায় কখন দেখেছিল জানি না। তুমি বড্ড রোগা হয়ে গেছ, ব'লে আমার গায়ে হাত বুলতে আরম্ভ করলে। আমার অতটা মনেই ছিল না,—গতকাল বাবার সেই প্রসাদের দাগগুলি এখনও ফুলে আছে। পিঠে পাঁজরার দিকে হাত বুলতে বুলতে সেই লম্বা লম্বা দাগগুলির উপর হাত যখন এল, কোমল আঙুলে সেখানটা অনুভব করতে করতে জিজ্ঞাসা ক'রে বসল—এগুলো কিসের দাগ, এ্যঁা? আমি চুপ ক'রে আছি—তারপর উঠে বসল, আর একটা, আর একটা পর পর চার-পাঁচটা দাগ দেখে বলে উঠল, কোথাও কারো সঙ্গে মারামারি করেছ নাকি?

অবশ্য মারামারির ফলেই হয়েছে বলতে পারলে সুখী হতাম, কিন্তু ও কাজটা আমার নয় তাই এক্ষেত্রে সত্যার্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে অনেক কথাই বলতে হ'ল তাকে শুনতেও হ'ল, যার ফলে অনুভব করলাম তার চোখ থেকে তপ্ত ধারা আমার গা ও হাতের উপর পড়তে লাগল। কাজেই আমার আর শোয়া হ'ল না, উঠলাম তাড়াতাড়ি তাকে সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু সে আমার গলা জড়িয়ে, মাথাটি নীচু করে এমনভাবে অশ্রুপাত করতে আরম্ভ করলে যাতে আমার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ভেসে গেল। আমি কতটা অসহায় এইটুকুই আমার মনে আঘাত করতে লাগল। তারপর—সারা রাত্রি আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আলোচনাতেই কাটল, কিন্তু সিদ্ধান্ত কিছুই হ'ল না।

১৯০২ সালের মাঝামাঝি আমরা সবাই দীর্ঘকালের জন্য মামার বাড়ি গেলাম। বাবা নিজ আর্থিক অবস্থাটা সামলাবার জন্যই এতদিন আমাদের রেখেছিলেন সেখানে, কিন্তু উপলক্ষ্য হ'ল সেজমামার বিবাহ। তাঁদের জমিদারীর অবস্থা তখনও ঠিক শোচনীয় হয় নি, তবে দু'তিন বৎসরের পরেই হয়েছিল। ঐ বিবাহ উপলক্ষ্যে অনেক টাকা খরচ করতে হ'ল ধার-দেনা বেড়ে গেল।

চারটি মামার মধ্যে সেজমামা পাঁচবার বি-এ ফেল ক'রে ল' পড়েছিলেন কিছুদিন। তাঁর কলকাতায় মেসের খরচ যোগাতে যোগাতেই ঋণের ভার বেড়ে গিয়েছিল। বিবাহের পর তাঁর খরচ আরও বাড়ল, কিন্তু তাঁর বি-এ, বা ল' পাস করবার সুবিধা হ'ল না। মেজমামা আমার যথার্থই কর্মী লোক ছিলেন তাঁদের মধ্যে। দক্ষিণে যে বিশাল আবাদি জমি ছিল, তিনিই তার প্রথম এবং প্রধান উদ্যোগী। কোন মামাই দক্ষিণে যেতে রাজী হন নি, কারণ সেটা জঙ্গলময় জায়গা। সুন্দর বন হাসিল ক'রে সরকারের কাছ থেকে সুলভে দেড় হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে মেজমামা তার বিস্তর উন্নতি করেছিলেন। আর বড়মামা আমাদের ছিলেন মামলা মোকদ্দমার তদ্বিরে দক্ষ, আর সৌখিন বন্ধু-সমাজে কলিকাতার আমোদ-প্রমোদে এবং সাহিত্যের আলোচনায় তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি কিছু কিছু প্রবন্ধও লিখতেন—জানি না কোনকালে সে-সব কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিনা। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন। মামার বাড়ির বৈঠকখানায় একটা প্রকাণ্ড কাঁঠাল কাঠের আলমারী ছিল, তার মধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় শত বই ছিল। যখনই মামার বাড়ি গিয়েছি, তখনই ঐ আলমারীর মধ্যে থেকেই পড়বার জিনিস বার করতাম। তখনকার দিনে সত্যচরণ শাস্ত্রী মশাইয়ের একটা প্রতিষ্ঠা ছিল। ছত্রপতি শিবাজী, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, জালিয়াত ক্লাইভ ইত্যাদি তখনকার দিনে তাকে দেশ-হিতৈষী সাহিত্যিক ব'লে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। এই মহাত্মার সঙ্গে ১৯১৮ সালে আমার কৈলাসতীর্থে যাবার যোগাযোগ এবং তখনই তাঁর সঙ্গে আমার গভীর পরিচয় ঘটে। যাই হোক এখন মামার বাড়ি এসে অনেক বিষয়েই আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা পূর্বে হয় নি।

সেজমামার বিবাহ-উপলক্ষ্যে একদিন প্রজা-ভোজন হ'ল, যার নাম বৌভাত। আত্মীয়-কুটুম্ব ভোজনের ব্যাপারে যত সব উৎকৃষ্ট

দ্রব্যসামগ্রী কলকাতা থেকে এসেছিল। সেই সুদূর পল্লীগ্রামে ঐ সব আনানো যে কতটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার তা ছোট হলেও আমার ধারণা হয়েছিল। দেড় হাজার ল্যাংড়া আম, আলু, নানারকম মসলা প্রভৃতি আর ভীমনাগের তৈরি মিষ্টান্ন তিন-চার রকম এতেই প্রায় হাজার টাকা পড়েছিল ; কিন্তু প্রজাদের ভাগ্যে ডালভাত, মাছের তরকারী। পোলাও-কালিয়া আম-মিষ্টান্ন এসব কিছুই নয়। ওখানকার ধরণী পুরাকায়েতের দোকানের একরকম চিনির মুণ্ডি আর জোলো দই ছাড়া উৎকৃষ্ট খাদ্য কিছুই পড়ে নি তাদের পাতে।

আমার অদৃষ্টে এতটা উৎসব ভোগে এল না। কলকাতা থেকে কেশব আর লছমীপ্রসাদের ছেলে ল্যাংড়া হরিদাস মিশ্র দু'জন প্রসিদ্ধ গাইয়ে গিয়েছিল। হরিদাসের সঙ্গে আমাদের বাল্যকাল থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল, আমাদের পাড়াতেই তারা থাকত। আমাদেরই বয়সী কিন্তু তার সঙ্গীত বিদ্যায় দক্ষতা সঙ্গীত-সমাজে সর্বজনবিদিত। যন্ত্রে তার হাত এত সুন্দর ছিল যে সভায় সর্বশেষে সকলকার বাজনা হয়ে গেলে পর তারই বাজনা হ'ত। তার পিতা লছমীপ্রসাদ সর্বজনবরেণ্য গুণী, বহু ধনবানের ঘরে তিনি শিক্ষা দিতেন। এখন ওখানে কেশব, লছমীপ্রসাদের ছোট ভাই আর হরিদাসকে শ্রীশ মামা এনেছিলেন, সেইজন্যই উৎসবটি অত্যন্ত গৌরবের হয়েছিল। ঐ উৎসবের দিনেই সকালে সভায় তাঁদের গান এবং তারপর সুরবাহার পরে সেতার বাজনা শুনে নিয়েছিলাম ভাগ্যে, —তার পরেই প্রবল জ্বরে শয্যাগত হলাম, ঐ গানের আসরেই আমার জ্বর এসেছিল। ম্যালেরিয়া। শ্রাবণ মাস বৃষ্টি বাদলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেই জ্বরটা হ'ল। দিদিমার ঘরে পড়ে রইলাম বেহুঁশ হয়ে। সবাই ব্যস্ত,—কে আমায় দেখবে? দিদিমা ও মা কেবল মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছিলেন। পরদিন জ্বর কমল। কিন্তু মনে মনে প্রবল কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল। সে কল্পনা,—এরকম ভাবে আর থাকবো না আমি—এবারে দূরে কোথাও যাবো, আর কাছে

নয়। বাড়ি থেকে পালাবার পূর্বে আমার মনে যে ভাবের একটা প্রেরণা আসত এটা সেই রকম। আমি যাবো, এখন থেকে, এদের সঙ্গ থেকে চলে যাবো এই তার ভাষা। এখন জ্বরটা ছাড়লে হয়।

জানি না কি কারণে, মনের জোরে কিংবা প্রাকৃতিক নিয়মে তুদিন বাদে তৃতীয় দিনেই জ্বর ছেড়ে গেল। আমি কারো সঙ্গে কোন কথা না কয়ে, মেজমামীর কাছে একটা টাকা নিয়ে, আত্মীয়-কুটুম্বের একদল কলকাতায় আসছিল, তাদেরই এক দলের সঙ্গে ডোঙ্গা করে মগরায় এলাম। মা, দিদিমা, বাবা, মামারা কাকেও জানতে দিই নি। পরে তাঁরা হয়ত জানতে পারলেন যে আমি চলে গিয়েছি, কিন্তু কোথা গিয়েছি কেউ জানে না।

বাড়িতে এসে আমার ভগিনীর ছোট্ট একটা ট্রাঙ্কে খানকতক কাপড়-জামা ইত্যাদি কিছু কিছু নিয়ে নিলাম, তারপর বাবার আলমারীর চাবি খুললাম। তার উপরের থাকের মধ্যে একটা ব্যাগে টাকাকড়ি তার মধ্যে তাঁর সঞ্চিত যা কিছু থাকত। আমার পৈতের সময় দিদিমা যে একটা গিনি দিয়েছিলেন সেটাও তার মধ্যে রাখা ছিল জানতাম। এখন সেইখানি মাত্র নিলাম,—তারপর অবিলম্বে পাঁচটা নাগাদ যাত্রা করলাম সোজা হাওড়া স্টেশনের দিকে, জোড়াসাঁকোর মোড় থেকে একটা গাড়ি নিয়ে। তারপর মুক্তির আনন্দ নিয়ে হাওড়ার পোল পেরিয়ে এখনকার স্টেশনের দক্ষিণে সেই পুরাতন স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তারপর ইণ্টারের একখানি টিকিট কেটে পাঞ্জাব মেলে উঠে চললাম এলাহাবাদ।

তিন দিন আগে, মামার বাড়িতে জ্বরের ধমকে কেবল দূরে পালাবার কথাই ভেবেছি, যেন স্বপ্ন দেখছি রেলে উঠে দূরে চলেছি,—আর পায়ে হাঁটার দূর নয়। কলকাতার জোড়াসাঁকো থেকে অনেক দূর, যেখানে কেউ আর আমার খোঁজ পাবে না। তাহলে স্বপ্নটা সত্য হয়েছে। মুক্তির আনন্দে প্রাণ পূর্ণ, আর কারো কথা মনে নেই, কেবল তার কথা যে একমাত্র দুঃখ পাবে, সে মিনা,

আর কেউ নয়। কিন্তু যতদিন কিছু না করতে পারি ততদিন তাকে কোন পত্র লেখা হবে না।

আমার মায়েরা তিনটি ভগিনী, বড় মাসী মোক্ষদা স্বামীর সঙ্গে কাশীবাসিনী, মেজ সারদা,—তাঁর স্বামী ইউ, পি, সেক্রেটারিয়েটে বাজেট ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট। আগে লক্‌নৌতে ছিলেন তখন সেজমামা তাঁর কাছে এনট্রেন্স পড়তেন, তারপর এফ-এ পাস ক'রে এখন তিনি বি-এর সঙ্গে যুদ্ধ করছেন আগেই বলেছি। মেসো-মশাই বদলী হয়ে এখন এলাহাবাদে রয়েছেন। ছ' মাস নৈনিতাল ও ছ' মাস এলাহাবাদেই থাকতে হয়। ছুটি পান নি তাই সেজমামার বিয়েতে যেতে পারেন নি। এখন তিনি যে নৈনিতালে আছেন তাতো আমি জানতাম না, কেবল জানতাম এলাহাবাদে কর্নেলগঞ্জে তিনি থাকেন, একখানা বাড়ি সারা বৎসরের জন্য ভাড়া করা আছে আবার।

পরদিন, বেলা বারোটা আন্দাজ স্টেশনে নেমে একঝাঁক এক্কা-ওয়ালার সেলামের মধ্যে পড়লাম। কর্নেলগঞ্জ বললেই সবাই বলে, হাম লে জায়েগা। তারপর যখন বললাম, বিনয়বাবু কা কোঠী মালুম হ্যায়?

কৌন্‌ বিনয়বাবু?

মহা মুশকিল,—বললাম—সেক্রেটারিয়েট মে কাম করতা হ্যায়। একজন আমার তোরঙ্গটা ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুতপদে, চলিয়ে হাম জানতা হৈ, ব'লে ঠেলে তুলে দিলে এক্কার ওপর।

এই প্রথম এক্কা দেখলাম। যাই হোক কর্নেলগঞ্জে বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্থান সন্ধান ক'রে নিতে মোটেই কষ্ট পেতে হ'ল না, তিনি ওখানকার প্রসিদ্ধ লোক। সেই ত্রিতল মকানের দরজার কড়ানাড়া দিয়ে ডাকতে এক ষষ্টি বৎসরের শীর্ণা বৃদ্ধা নেমে এসে প্রশ্ন করলেন,—তুমি কেগা?

যতই জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোথায়? ততই তিনি ঐ কথাই

বলেন। শেষে বললাম, তিনি আমার মেসোমশাই। তখন বুড়ী বলে কিনা, তিনি যদি তোমার মেসোমশাই, তিনি কোথায় আছেন তুমি জানো না? আমি ত মহা ফাঁপরে পড়লাম, নানা প্রকারে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম, অনেকদিন, খবরাখবর নেই তাই ঠিক জানতে পারি নি। বুড়ী বলেন,—জানো না, তিনি দু মাস আগেই নৈনিতাল চলে গেছেন সপরিবারে।

এখন উপায়?

এসেছ থাকো, তাঁকে লিখি. তিনি কি বলেন, কি ব্যবস্থা করেন দেখি তারপর কথা হবে। কাজেই আমি জাঁকড়ে রইলাম ঐ বাড়িতে। ব্যাপার এই যে, যখন তাঁরা নৈনিতাল যান তখন ঐ বুড়ী, অঘোর-বাবুর মা, এই বাড়িতে বাস করেন, আর তাঁদের জিনিস-পত্রের তত্ত্বাবধান করেন। বুড়ী আমায় তেতলায় খুদিদার ঘরে থাকতে দিলে। খুদিদা মাসিমার ছোটছেলে, আমার চেয়ে দু' বছরের বড়; ঐ অফিসেই কাজ করে, কাজেই সেও গিয়েছে নৈনিতাল।

সেইদিনই মেসোমশাইকে নৈনিতালে এক পত্র লিখলাম,—তাঁর কাছে আসবার উদ্দেশ্য। আসল কথা সবই লিখলাম, এখন এইখানেই আমার আশ্রয়।

কিন্তু তিনি যে আমার সম্বন্ধে এতটা জানেন স্বপ্নেও ভাবি নি। তিনদিন পর খামে একখানি পত্র পেলাম তাঁর কাছ থেকে : আমায় লিখেছেন,—এসেছ বেশ করেছ, এখন যতদিন ইচ্ছা থাকো, ছোট মাকে (ঐ বৃদ্ধাকে) লিখেছি যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। মধ্যে মধ্যে পত্র দিও, কোন জিনিসের প্রয়োজন হলে জানাতে বিলম্ব কোরো না। পত্রখানি পড়ে তাঁর প্রতি মনে মনে কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম।

আবার অঘোরবাবু, ঐ বৃদ্ধার পুত্রকেও পৃথক পত্র দিয়েছেন, অঘোরবাবু সেই পত্রখানি নিয়েই দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। তাঁকে ইংরাজীতেই লিখেছেন যে, আমার ছোট শালীর বড়

ছেলেটি ওখানে এসেছে। ছেলেটি ইণ্টেলিজেণ্ট কিন্তু তার বাপের পীড়নে বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে পালাতে অভ্যস্ত,—ওখানেও পালিয়েই এসেছে মনে হয়। একটা কোন কাজে লাগতে চায়, তার লেখা ভালো কিন্তু সে এনট্রেন্স পাস নয়, সেইজন্য সরকারী অফিসে কিছু হওয়া সম্ভব নয়, যদি আপনাদের অফিসে এপ্রেণ্টিস হিসাবে নিতে পারেন সেজন্য একটু চেষ্টা করবেন। আমার অনুরোধ, ছেলেটি ওখানে রইল তার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন,—ওখানে ওর গার্জেন না থাকায় কুসঙ্গে পড়বার আশঙ্কা আছে। ওর সঙ্গে ব্যবহার ক'রে আপনার কিরূপ ধারণা তা আমাকে পত্রে জানাবেন।

অঘোরবাবুরই দূর সম্পর্কীয় ভাই একজন আছেন তাঁর নাম অতুলবাবু—তিনি টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। সেখানকার ডিপার্টমেণ্টের হেড্। মেসোমশাই তাঁকেও আমার কথা লিখেছেন। সেদিন তিনিও এসে আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রে গেলেন। দেখলাম, মেসোমশাইয়ের ওখানে একটা এমনই প্রতিষ্ঠা আছে যাতে তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে মানে এবং আলোচনাও ক'রে থাকে। সবাই তাঁর পক্ষে কিছু কাজ করতে পারলে যেন খুশিই হয়। এর কারণ পরে শুনেছিলাম,—আসলে মেসোমশাই ওখানে সাধারণের জন্য সকল কর্মেই অগ্রণী—দুর্গাপূজা প্রভৃতি, নানাস্থানে সাধারণের দুঃস্থ অবস্থায় Relief পাঠানো,—প্রত্যেক জনহিতকর কর্মে তিনি সর্বপ্রধান। নিজেও অনেক টাকা ঐ সকল কাজে দিয়েছেন, তার উপর তাঁর অতি বিনীত সরল এবং অমায়িক ব্যবহার, সকলের উপর তাঁর চরিত্রবলই তাঁকে ওখানে শ্রেষ্ঠ ও সর্বকর্মে প্রধান ক'রে রেখেছে। সোনায় সোহাগা যেমন, তেমনি সবার উপর তিনি একজন উচ্চস্তরের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। বহু বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী গৃহস্থ এবং গরীব লোকে তাঁর কাছে রোগের চিকিৎসা পায়। এটা কম কথা নয়। আগেই কতক শুনেছিলাম; যখন মধ্যে মধ্যে কলকাতায় যেতেন, আমাদের বাড়িতেও আসতেন।

বলেছিলেন যে, বেরিলীর দোকান থেকে তাঁর ছ'মাস অন্তর ওষুধ-পত্র যায়।

যাই হোক, এলাহাবাদে এসে এখন মহা আনন্দে এখানকার বড় বড় রাস্তায় সকাল বিকালে, কোথায় কি আছে দেখে বেড়াই। কর্নেলগঞ্জেও একটা আখড়া ও কন্সার্টপার্টি আছে। খুদিদা সেখানকার মেম্বার এবং ভায়োলিনিস্ট, হাবুলদা হলেন সেক্রেটারী আর মোশান মাস্টার। তারা আমায় সযত্নে তাদের আড্ডায় নিয়ে গেল একদিন। মোটের উপর এক দেড় সপ্তাহের মধ্যেই আমি ওখানে প্রায় সবারই পরিচিত হয়ে পড়লাম মেসোমশাইয়ের আপনজন বলে প্রবীণদের মধ্যে এবং খুদিদার মাসতুত ভাই বলে তরুণদের অন্য দলে।

কর্নেলগঞ্জের ভদ্র-সমাজের সবাই দেখলাম কোন না কোন অফিসের কেরানী, কেবল হাবুলদা'র ছিল টেলারিং শপ্। স্যার প্রমোদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্ট জজ, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি ঘোষ ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিক। এঁরা মেসোমশাইদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার দিক থেকে কেবল মাত্র জানা হ'ল যে, এঁরাই বাঙালীর গৌরব।

দয়ালবাবু বলে এক সুদর্শন, প্রৌঢ় ব্যক্তি, পায়োনিয়ার অফিসে কাজ করেন, আমাদের বাড়ির পিছনেই থাকতেন। তাঁর এক পুত্র তার নাম অনুকূল মুখোপাধ্যায়, তার সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবেই আলাপ হ'ল। তার কথা একটু বলবার আছে। অনুকূল গৌরবর্ণ, একটু বেঁটে ও রোগা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চমৎকার ইংরাজী বলে।

গোড়া থেকেই আমায় সুনজরে না দেখলেও আমি ঐ বুড়ীকে ঠাকুমা বলতাম। কড়া নজর ছিল বুড়ির, প্রত্যহ রাত্রে খাবার সময় সারাদিনের কাজের খবর দিতে হ'ত। এখানে কার সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে, কার সঙ্গে হবে না, এইসব শুনতে হ'ত। আজ

দয়ালবাবু আর তার ছেলে অনুকূলের কথা যেই বলেছি বুড়ী তো একেবারেই খাপ্পা হয়ে উঠল, উ-হু-হু, ওদের সঙ্গে মেশা হবে না। অনুকূল ছেলে ভালো হলে হবে কি, বাপের যা কীর্তি—এমন বেদে নেই পুরাণে নেই। পঁচিশ বছরের বড় ছেলে, তার জন্যে পাত্রী আশীর্বাদ করতে গেল কানপুরে ;—ওমা, একেবারে সেই মেয়েকে নিজে বিয়ে ক'রে ঘরে নিয়ে এল। এল গাড়ি ক'রে, সবাই দেখতে গেছে, তখন গাড়ি থেকে নেমে ঘরের গিন্নিকে বলছে,— দেখছ কি, বিয়ে ক'রে এনেছি, এখন বরণ ক'রে বৌ ঘরে তোল। সেই গিন্নি ছেলেদের নিয়ে আলাদা রয়েছে এখন। দু' বছর আগের কথা। আর মুখ দেখাদেখি নেই তাদের মধ্যে। যেন একটা সাইকলজীক্যাল নভেলের প্লট।

দেখলাম এখানে সবারই জীবন নিয়মিত, আর অফিসগত প্রাণ। অফিস থেকে ঘরে এসেও সেই অফিসের কথা,—তাই-ই তারা ভালবাসে। সবারই বেশ একটা সপ্রতিভ ভাব। শরীর এদের স্বাস্থ্যপূর্ণ, তবে কি যেন একটা বিশেষ বস্তুর অভাব। অথচ তারা বাঙলা বলে কতক উলটো-পালটা ধরনের, কথাগুলি কেমন এক রকমের, যুক্তাক্ষরের উচ্চারণ ভঙ্গিও অদ্ভুত। গান-বাজনায় ছেলেরা দক্ষ, সুর ও তাল কোনদিকেই কম নয় তবে বিচিত্র তাদের তখনকার আধুনিকদের রুচি, পাঁচজনে একসঙ্গে হলে কেউ যদি বলে একটা গান করো না, নগেন। তা হলে নগেন অম্লানবদনে, বিশেষ শ্রদ্ধা-পূর্ণ প্রাণে তখনই আরম্ভ ক'রে দেবে,—কুলগাছে লেগেছে বসন, দাঁড়া দিদি দাঁড়া লো,—মত্ত হোয়ে কোকিল হেথা ডালে বসে ডাকিলো। ইত্যাদি। সেখানে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ত কেউ কেউ আছেন।

বাংলাদেশের কলকাতা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের গান বেশী পৌঁছোয় নি। কলকাতায়ও সর্বত্র নয়, মাত্র এক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথম দিকে তাঁর কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতই সাধারণের প্রিয় হয়েছিল। যেমন,—তোমারে

করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে। এই রকম কয়খানি গান তখন সাধারণের মধ্যে খুব চলত। এটা ঠিক স্বদেশা যুগের পূর্বেই।

এখানে শ্যামবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ গাইয়ে, সকল বড় আসরেই তিনি গান করতেন। প্রথম আরম্ভে খানকয় নিধুবাবুর গান হলে পর ধর্মসঙ্গীত দুই একখানি হয়ে পালা শেষ হ'ত। তার মধ্যে তখন উত্তরপাড়ার রাম দত্তের গান, তনয়ে তার তারিণী, এদিকে এই গানটিই তখন অত্যন্ত বেশী প্রচলিত ছিল, তাছাড়া, হে দুঃখহারী কর নিস্তার, সহে না আর। কে তুমি হে তরুবর, এই রকম কয়েক খানি গান অনেকেই খুব গাইত শুনেছি। কলকাতায় তখন সঙ্গীত-রাজ্যে রেনেসাঁস। পূর্ববঙ্গের কান্ত কবির গান চলছে একদিকে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রচারও সুরু হয়েছে কলকাতা কেন্দ্র থেকে ; ঠিক স্বদেশী যুগের পূর্বাবস্থায়—ব্রাহ্ম সঙ্গীত ছাড়া প্রথম রবিবাবুর হাম্বীর রাগিণীতে, জননীর দ্বারে আজি ঐ, শুনগো শঙ্খ বাজে,—থেক না থেক না ওরে মন, মিথ্যা মগন কাজে ;—এই গান-খানি খুব চলছিল আর অনেকের অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। তখন থেকেই আমরা রবিবাবুর গানের ভক্ত হয়েছিলাম মনে আছে।

যাই হোক এখানে এসে মন কিছু দিন চাকরির দিকে চালিয়ে নিয়ে চলল আমায়। চাকরি থেকে মন গেল এখন এনট্রেন্স পাসের দিকে। যোগাযোগ সূত্র হ'ল শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা।

কর্নেলগঞ্জ থেকে কাট্‌রার দিকে যেতে বড় রাস্তার উপর একখানা বড় বাড়িতে কবি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল এবং ঐ বৎসরেই কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। ঘটনাক্রমে একদিন কাট্‌রায় যাবার সময় স্কুলটির দিকে চাইতে চাইতে যাচ্ছি, দেখি আমাদের আর্যমিশনের ইংলিশ টিচার এস, রায় মশাই দরজা দিয়ে বেরোলেন। প্রথমে বিশ্বাস করি নি,— হয়ত সেই রকমই অন্য কেউ হবেন। চেহারাটি তাঁর প্রভাত

মুখুজ্যে দ্বিতীয়, সেই-মোটা-সোটা শরীর, মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, চোখে পুরু কাঁচের মাইনাস চশমা, সেই পাঞ্জাবির উপর রাবিন্দ্রীক প্যাটার্নের চাদর নেওয়া যে, না ভুল নয়। একেবারে কাছে গিয়ে প্রণাম করতেই দেখি,—সেই গাল দন্তহীন মুখে সেই হাসি। তুমি এখানে যে ?—বল্‌লাম, আমারও ত ঐ প্রশ্ন স্যার, আমি যখন স্কুল ছাড়ি তখনও আপনাকে ঐখানেই দেখে এসেছিলাম আমাদের আর্যমিশনে।

হাঁ, গত জানুয়ারী মাস থেকে এখানে এসে দেবেনবাবুর স্কুলের ভার নিয়েছি। তা তুমি কি করছ ?

তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে চলতে চলতেই অনেক কথা হয়ে গেল। বর্তমান অবস্থায় মনের কথা তাঁকে খুলে বললাম। সব শুনে বললেন,—ঐ দেখ তুমি চঞ্চল বলেই নিজ হিতাহিত এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোন পথ ঠিক করতে পারো নি, বোকার মতো কাজ করেছ স্কুল ছেড়ে দিয়ে। কোন কিছু ধরবার আগে এনট্রেন্স পাসটা দরকার একথা তোমায় কতবার বলেছি, একটা পাস না হলে চাকরিই বল আর বিজনেস্‌ই বল কোন কাজেরই উপযুক্ত হবে না। শেষে বুঝিয়ে দিলেন বিধাতার যোগাযোগে যখন এখানে এসেই পড়েছ তখন এই শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় ভর্তি হয়ে যাও। আমি তোমায় সেকেণ্ড ক্লাসেই নিচ্ছি, অঙ্কে একটু কাঁচা আছ, তা বাড়িতে একটু খাটবে, আর অধরবাবুকে বলে দেবো একটু বিশেষ যত্ন করেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তোমাকে উপযুক্ত ক'রে নেবেন ; ১৯০৪-এ তোমায় নিশ্চয়ই এনট্রেন্স পাস করিয়ে দেবো। তারপর যা হয় কোরো।

তাঁর কথার মধ্যে একটি এমনই শক্তি ছিল, তা ছাড়া তাঁর যুক্তি এতটাই প্রবল, একেবারে যেন চুম্বকে লোহা টানার কাজ হয়ে গেল। আর কাটরায় না গিয়ে ফিরে এলাম বাড়িতে। গত বছরেই খুদিদা এনট্রেন্স পাস করেছেন সুতরাং ঘরে অনেক বই ছিল, তার মধ্যে থেকে ঐ সেকেণ্ড ক্লাসের অনেকগুলি পাঠ্য খুঁজে বার

করলাম। তারপর বুড়ী ঠাকুরমাকে সবিনয় নিবেদন,—কাল দশটার সময় খেয়ে স্কুলে যাব ভর্তি হতে। বুড়ীকে অনুকূল দেখলাম। এখানে এসে অবধি আমায় সে দুচোখে দেখতে পারত না,—অবশ্য তা'বলে খাওয়ানোতে অযত্ন ছিল না কখনো। এখন আমার পড়বার কথা শুনে খুশি হয়ে বললে,—এই ত ভাল, এখন পড়বার বয়স, গোঁফের দেখা দেয় নি, এখন পড়া ছেড়ে দিলে লোকে বলবে বয়াটে ছোঁড়া। কাল থেকে ঠিক সময় ভাত দেবো, যেও তুমি স্কুলে। পত্রে মেসোমসাইকেও খবরটা দিতেই উত্তরে তিনি দশটি টাকা, বই কাগজ কলম খাতাপত্র কেনবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে লিখলেন,—খুব ভালই করেছ দেবেনবাবুর স্কুলে ভর্তি হয়েছ। তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, তাই পত্রযোগে দেবেনবাবুকেও আমার কথা লিখে দিলেন কিন্তু সব জায়গায় একথা লিখতে ভুললেন না যে এলাহাবাদে আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি এবং আমি বিবাহিত। সৃষ্টির মধ্যেই ধ্বংসের বীজ থাকে। এই ব্যাপারে তিনি এক সাংঘাতিক ভুল ক'রে বসলেন, বাবাকে আমার স্কুলে প্রবেশের খবরটা দিয়ে।

এলাহাবাদে আমার এই প্রথম আসা,—তারপর যতদিন ছিলাম প্রায় ছ' মাস, এত সুন্দর, এত স্বাচ্ছন্দ্যময় পাঠ্যজীবনে আমার আর কখনও ঘটে নি। বিকালে নানা স্থানে আমরা দলবদ্ধ হয়ে যেতাম। তখন রামানন্দবাবু কায়স্থ কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ঠিক মনে নেই প্রবাসী আরম্ভ হয়েছিল কিনা কিন্তু তিনি দেবেন্দ্রবাবুর আমন্ত্রণে কয়েকবার আমাদের পাঠশালায় এসেছিলেন। ছাত্র জীবনে ব্রহ্মচর্যই প্রধান, এ সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছুই বলেছিলেন, সেকালের গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের স্বরূপ, এমন সহজ ভাষায় এত মনোগ্রাহী ক'রে বলেছিলেন, যা অনেকদিনই আমাদের মনে ছিল। এত অল্প বয়সে বিবাহ ক'রে যে একটা অন্যায় করেছি, একথা তখন ঘন ঘন আলোড়িত করত মনকে।

একটা প্রাইজ বিতরণোৎসব হয়ে গেল ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলে, চিন্তামণি ঘোষ, রামানন্দবাবু, জজ প্রমোদাচরণ প্রভৃতি সব বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। উৎসবটি 'মিউর সেণ্ট্রাল কলেজে'র প্রাঙ্গণে হ'ল, স্পোর্টস, মিউজিক, কন্সার্ট সবই ছিল। কর্নেলগঞ্জের হাবুলদার দল বাজালে—আনন্দময় হয়েছিল আমাদের ঐ পর্ব-দিনটি। শেষে পুরী তরকারী হালুয়া আর লাড্ডু জলযোগেই স্ফূর্তির চরম হয়ে গেল।

আমার অদৃষ্টে শুভ কর্মের উপর শনির দৃষ্টি আছে। বাবা যখন শুনলেন এখানে আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি, স্বইচ্ছায় পুনরায় বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্বক পাঠে মন দিয়েছি—আশা করেছিলাম তিনি অতিশয় আনন্দিত হয়ে উৎসাহ দিয়েই পত্র লিখবেন। কিন্তু হ'ল বিপরীত, উল্টে তিনি লিখলেন, এখানে যখন তোমায় আমি হাই-কোর্টে বার করবার সব ব্যবস্থা ঠিক করলাম (অথচ আমি তার কিছুই জানি না, ও সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থার কথা শুনিনি) ঠিক তখনই তুমি আবার পলায়ন ক'রে আমাদের দুঃখ দিয়েছ,—এখনই যদি ফিরে আসো তা হলে তোমায় ক্ষমা করতে পারি। আমি যথাসাধ্য যুক্তিপূর্বক, আমার এনট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া, তার সঙ্গে মেসোমশাইয়ের এ সম্বন্ধে গভীর সমর্থন উল্লেখ ক'রে পত্রের উত্তর দিলাম তাঁকে। কিন্তু তাঁর যুক্তি হ'ল এই যে, আমার দ্বারা পাস করা হবে না, মিছামিছি সময় নষ্ট। আমি যখন বিবাহিত তখন আমার চাকুরী করা ভিন্ন কোন পথই নেই, অতএব বাজে পত্র লেখালিখি না ক'রে যেন শীঘ্রই চলে যাই।

আর সেই পত্রের উত্তর দিলাম না, চুপচাপ, যা করছিলাম তাই করতে রইলাম। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম, কেল্লা, যমুনা ব্রিজ, খুসরুবাগ ঘন ঘন ঐসব জায়গায় যাতায়াত, ভ্রমণ আর যথারীতি স্কুলে পড়া,—এই ভাবেই চলতে লাগল আমার ওখানকার অনলস জীবন। মনের মধ্যে একটা গ্লানি মধ্যে মধ্যে উঠে বড়ই পীড়িত

ক'রে তুলত আমায়। ওদিকে বাবার টানাটানি, এখনি চলে এসো, আর এদিকে এই সুন্দর আবহাওয়ায় মনোমতো কর্মে লেগে থাকার প্রবল আকর্ষণ। এই দুই ভাবের মধ্যে মহাদ্বন্দ্বময় একটা অবস্থার উদ্ভব হ'ত। ঐ যে শিশুকাল থেকেই বাবাকে ভয়ঙ্কর দেখা, তাঁর শক্তির প্রভাব আমায় কখনও কখনও মুহ্যমান ক'রে তুলত। মনের জোরটা রাখতে পেরেছিলাম এই দূর দেশ বলে।

শুনলাম, অক্টোবরের শেষে মেসোমশাই নেমে আসবেন নৈনিতাল থেকে,—এবার তাঁদের সঙ্গে দেখা হবে অনেকদিন পর। আমি এখানে ভালই আছি, যথা সময়ে আমার বিষয়ে সব কিছুই তিনি রিপোর্ট পাচ্ছেন সেখানে এখানকার বন্ধুবর্গের পত্রে। ফলে, আমাকে মধ্যে মধ্যে উৎসাহপূর্ণ পত্রও দিচ্ছেন, যাতে আমি মন দিয়ে এইখানেই পড়াশুনা করি আর বাৎসরিক পরীক্ষার পূর্বে যেন কলকাতায় ফিরে না যাই, কারণ তিনি ভালই জানেন কলকাতার হাওয়া কিরূপ প্রতিকূল আমার যথার্থ উন্নতির পথে। তিনি ত সবই জানতেন, আর যেটুকু বাকী ছিল মাসিমা একেবারে আমাদের সংসারের খুঁটিনাটি সব কিছুই আমার এখানে আসা উপলক্ষ্যেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন।

আর দুই সপ্তাহ পরেই তাঁরা আসবেন এই পত্র যেদিন পেলাম ঠিক তার পরদিন একটি দশ টাকার মনি-অর্ডার আর সঙ্গে চিঠি পেলাম বড়মামার,—তোমার মা শয্যাগত, যদি দেখবার ইচ্ছা থাকে ত অবিলম্বেই চলে আসবে, তোমায় দেখবার জন্য তিনি ছট্‌ফট করছেন।

এই পত্র পেয়েই আমার মনে কিছুমাত্র বল রইল না। সেই রাত্রেই যাত্রা করতে হ'ল,—একখানি খামের মধ্যে ঐ পত্রখানি মেসোমশাইকে পাঠিয়ে এবং আজই রাত্রে কলকাতা যাত্রার কথা লিখে তাড়াতাড়ি মিঃ রায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে চলে এলাম। সাড়ে পাঁচ মাস পর আবার আমি কলকাতায় ফিরলাম। বড়

মামার পত্রে অবিশ্বাসের কারণ ছিল না, এসে দেখলাম মায়ের সামান্য জ্বর মাত্র।

কুড়ি

শৈশব, তারপর কৈশোর জীবনে আমার ভয়ের ও নানাবিধ অশান্তির মধ্যে মানুষ হওয়া ; সবচেয়ে বেশী ঐ বদ্ধ আবহাওয়ায়, মনের মধ্যে কেবলই মুক্তির জন্য ছটফটানি সব সময়েই অনুভব, মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে পালানো গেলেও এতাবৎ তা সার্থক হয় নি কারণ ঘটনাচক্রে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। তাই গোড়া থেকেই মনের মধ্যে এই ধারণাটিই বদ্ধমূল হয়েছিল যে ঐ বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ না কাটাতে পারলে জীবনে আমার কখনই কল্যাণ আসবে না। এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থাই আমার মনুষ্যত্ব এবং কর্মজীবন নির্ধারণের পথে প্রবল বাধা। তখন পর্যন্ত আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কোনও আভাস অর্থাৎ আমি যথার্থই কোন পথ ধরে চলবো তার কোনও নির্দেশ পাই নি।

লেখা-পড়া ত ঐ সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্তই হয়ে রইল। তবে পড়াশুনাটা ঘরে চললেও পাস ক'রে য়ুনিভারসিটির চাপরাশ ধারণ করবার প্রবৃত্তিরও অভাব ছিল, কাজেই সে সম্ভাবনাও রইল না। দু-একটা পাস করেই বা কি হবে, সেই ত হাইকোর্টের কেরানীগিরিই করতে হবে যা বাবা ঠাকুরদা ক'রে গিয়েছেন! দারুণ বিতৃষ্ণা ছিল ঐ অফিস যাওয়া, আর মাসে মাসে পঁচিশ তিরিশ টাকা মাইনে পেয়ে জীবন সার্থক মনে করা। আমাদের এই বাড়ির মেয়েদের মাথায় এই ধারণাই বদ্ধমূল যে, পুরুষ-জীবনে আর কোন সার্থকতাই নেই বা হ'তে পারে না চাকরি করা ব্যতীত। এটা

আরও অসহ্য হয়েছিল আমার তখনকার জীবনে, বোধ হয় প্রতি দিনই সকাল সন্ধ্যায় খাওয়ার সময়ে ভিতরে গেলে, তাদের মুখ থেকে আমাকে শুনতে হ'ত চাকরি লক্ষ্মী, মহাভাগ্য না হলে কেউ সাহেবের অনুগ্রহ বা চাকরি পায় না। বিশেষত হাইকোর্টের চাকরি।

এখন দেশের কথা কিছু আছে। দৈনিক কাগজ মারফত, নানারকম খবরের কথা শুনতে পেতাম। শুধু দৈনিক কাগজ নয়, সেইসব সংবাদ যা গুরুজন প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠদের আলোচনার বিষয়, —তাদের সিদ্ধান্তগুলি আমার মনে দাগ রাখতে আরম্ভ করেছিল। কলকাতার সমাজে থিয়েটার বা নাটকাভিনয়ের কথাই প্রধান। কোন্ থিয়েটারে গিরিশ কিংবা ক্ষীরোদবাবুর কোন্ বই হচ্ছে—সেই নাটক দেখা হলে তার সমালোচনা। গিরিশ ঘোষ, অমৃত বসু, অমর দত্ত, কুসী, নেপা বসু, অমৃত মিত্র, কাশীবাবু, মুস্তাফী সাহেব ইত্যাদি এদের জীবন ও অভিনয় কৃতিত্ব,—এ সকলের আলোচনা প্রতি রবিবার প্রাতে স্নানাহারের পূর্ব পর্যন্ত স্থির ও নিশ্চিতভাবেই আমাদের বাড়িতে চলত। শীতকালে সার্কাস, আর নতুন ইংরাজী বায়স্কোপের কথা। মধ্যে মধ্যে অফিস-প্রসঙ্গও চলত। হাইকোর্টে কোন্ জজ কোন মোকদ্দমায় কি রায় দিয়েছেন। বিশেষত সেসানের খুন ও ডাকাতির মোকদ্দমার কথাও হ'ত। সিভিল্ মোকদ্দমায় কোন বড়লোক দেনার দায়ে কারাবরণ করেছেন এ সকল খবরও অনেক শুনতাম। শনিবারের রেসের খবর, রবিবার সকালের আসরে সর্বপ্রথম প্রস্তাব ও আলোচনার বিষয় ছিল।

মামার বাড়ি থাকলে অন্য রকমের আলোচনা শুনতাম মামাদের আড্ডায়। তাদের বৈঠকে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনা; কংগ্রেসের কথা, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা, গুরুদাসবাবু, আশুবাবু, রাসবিহারী ঘোষের কথা, হাইকোর্টের বিচার-বিভাগের কথা, এমন কি ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যের গ্ল্যাডস্টোন, ডিসরেলী,

পামারস্টোন প্রভৃতি প্রধান মন্ত্রীর কথা এমনভাবে চলত তা শুনে মনে হ'ত যেন এঁরা সবাই তাঁদের সবার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রে সম্প্রতি ফিরেছেন।

তখনকার সংবাদপত্র ছাড়া আরও এক সূত্রে কোন বিশেষ বা অসাধারণ খবর পদ্যপ্রিয় বাঙালী গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের মহলেও পৌঁছে যেত,—সেটি বটতলার সুলভ পদ্য পুস্তকের মারফতে। আমার আজও মনে আছে। বিপিন দত্ত নামে কোন ভদ্রলোক স্বর্ণ বাঈজীর ঘরে নিহত হন, সেই অপরাধে ধরা পড়েন ঐ প্রসিদ্ধ বাঈজী। তার বিবরণ বার হ'ল,—

বিপিন দত্ত গেল মারা—স্বর্ণ বাঈজী পড়ল ধরা, মূল্য এক পয়সা। কৈশোরে বটতলার পদ্য পুস্তকের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। এইভাবে তখন থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম যে এ-শহরে যে-কোন বিশেষ ঘটনা, বটতলার সুলভ পদ্য সংস্করণ কলকাতার ছোক্‌রা ও মেয়েমহল গুল্‌জার ক'রে রাখত। এখনও সেদিন পর্যন্ত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমার কথা বটতলার পদ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও সেই সুরে 'ভগ্নদূত' আর 'অবতার' সাপ্তাহিক দু'খানি স্থায়ী সাহিত্য হিসাবে রসিক-সমাজের মনোরঞ্জন ক'রে আসছে অনেক দিন থেকে।

ঐ সময়ে একবার কলকাতায় মড়ক লাগল, বিউবনিক প্লেগ, বোম্বাই থেকেই নাকি সেই প্লেগের আবির্ভাব। তার প্রকোপে কলকাতা ছেড়ে অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা পালাতে লাগল। খবরের কাগজে লেখার কি ধুম। হিতবাদী বঙ্গবাসী, বসুমতী, এই তিনখানি প্রসিদ্ধ কাগজ, প্রত্যেকখানির সাইজ এক একখানা বেশ বড় একটি বিছানার চাদরের মতো। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পদ্যের রসিকতা তখনকার রসিক সাধারণের প্রিয় ছিল। যারা পশ্চিমের দিকে পালাচ্ছিলেন, তাদের জন্য চৌসা স্টেশনে সিগ্রিগেশন ক্যাম্প হয়েছিল, সেখানে ট্রেন থেকে সবাইকে নামিয়ে পরীক্ষা ক'রে তবে ছাড়া

হ'ত। তাতে রটে গেল এই কথা যে, সেখানে ক্যাম্পে নিয়ে গেলে কেউ আর নাকি ফিরে আসে না। একে শহরবাসী পলাতক গৃহস্থদের ভয়টা প্রবল, তার উপর এই খবরটা আর এক আতঙ্কের সৃষ্টি করলে। তখন হিতবাদীতে ঐ সম্পর্কে এক পদ্য প্রকাশিত হ'ল—তার দু'লাইন আমার এখনও মনে আছে।

তোমরা পালাও কেন আর ; শুনিতে ভীষণ, সিগরিগেশান, সবই কেবল ফক্কিকার। তোমরা পালাও কেন আর।

ঐসব দৈনিকে মধ্যে মধ্যে ছবিও থাকত। তবে সে ছবি, এখনকার মতো লাইন বা প্রোসেস ব্লক নয়, সেগুলি তখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী প্রিয়গোপালের উডকাট্। তার ধাচই আলাদা। এখনকার দিনে প্রিয়গোপালের কদর নেই কিন্তু সেই প্রিয়গোপালের একদল শিষ্য মডার্ন প্রোসেস ব্লক তৈরিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তখনকার কলকাতার দৈনিক খবরের আকার-প্রকার ঐ রকম হলেও মাসিক সচিত্র পত্রিকার পত্তন হয়েছিল রামানন্দবাবুর 'প্রদীপে'। তবে এ সবকিছুই ম্লান হয়ে যেত যে কোন একখানি বিলাতী পত্রিকার আবির্ভাবে।

আমাদের বাড়ির একখানা বাড়ির পাশেই গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ি। বোধহয় এতটা উন্নত ও শিক্ষিত পরিবার আমাদের পাড়ায় বৈদ্যরাই ছিল। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে চাষা-ধোবা পাড়ার যথার্থ পরিচয় বলতে গুপ্তবংশ তিন-চার ঘর ও চাটুজ্জেরা তিন-চার ঘর। শেষোক্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে গোবিন্দ ডাক্তারেরাই শ্রেষ্ঠ পাড়ার সকল বাড়িতে, শৈশব থেকেই আমার গতিবিধি ছিল অবাধ, সকল সংসারেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে যাতায়াতের ফলে কিছুটা স্নেহের অধিকারী ছিলাম। এইভাবে আমি কখনও কখনও গোবিন্দ ডাক্তার-দের বাড়িতে যেতাম। সেইখানেই প্রথমে বিলাতি 'রিভিউ অফ্ রিভিউস্' দেখলাম। ঐ জগদ্বিখ্যাত মাসিকে একমাত্র ওঁরাই গ্রাহক ছিলেন আমাদের পাড়ার মধ্যে। কি চমৎকার কাগজ, ছাপা ও ছবি

তার গন্ধটাই প্রাণে আনন্দ যোগায়, তখন এমন একটা ধারণা হয়েছিল আমাদের ঠিক এই ধরনের সচিত্র মাসিক পত্রিকার প্রকাশ তখন স্বপ্নেরও অগোচর। অবশ্য তখন বাঙলা সমাজে ইংরাজী যা কিছু সবেরই জয় জয়কার,—সেই ব্রিটিশের সাম্রাজ্য, সারা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত, ভিক্‌টোরিয়া তার সাম্রাজ্ঞী, যার রাজ্যে চন্দ্র-সূর্য অস্ত যায় না।

মনে আছে ১৮৯৯ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন যিনি, তাঁর অমেল থেকেই বলতে গেলে বাঙলার মারফতে সারা ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা সক্রিয় হ'য়ে উঠল। তিনি লর্ড কার্জন। উপাধিতে লর্ড হলেও তখনও 'হাউস অফ কমন্সেই' তাঁর আসন ছিল। এই প্রতিভাশালী নবীন সাম্রাজ্যবাদী ভাইসরয়টি ভারতের, বিশেষত বাঙলার ইতিহাসে তাঁর কর্মপদ্ধতির স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন। কারণ বাঙলাদেশেই তাঁর কর্মের বৈশিষ্ট্য, বাঙালীকেই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিশেষভাবে—তাই আমাদের বাঙলাকেই তিনি আগা-পাশতলা এমনই একটি বিশেষ মনোভাব নিয়ে শাসন ক'রে গিয়েছেন যার জন্য বাঙালী তাঁকে কখনও ভুলতে পারবে না। পরাধীনতার গ্লানি আমাদের মধ্যে, তাঁর আমলেই তীব্রতর অনুভবের বিষয় হয়েছিল।

সেটা কংগ্রেসের ষোড়শ বৎসর। আমার জন্ম বৎসরে কংগ্রেসের জন্ম সুতরাং কংগ্রেসের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমারও আয়ুবৃদ্ধি বৎসরের হিসাবে একই। এর মধ্যে যখনই কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছে ততবারই এক চমৎকার মেলাও তার সঙ্গে ছিল, যার জন্যই তখন রাজনৈতিক বুদ্ধি বিকাশের অভাব থাকলেও আমরা কংগ্রেসকে মনে রাখতে পেরেছি।

স্পষ্টই মনে আছে, এই সময় থেকেই দেশে, বিশেষ কলকাতার সমাজে, সরকারের কাজগুলির বিচার বা সমালোচনা বড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল, পুরানো ধারা যেন উঠে গিয়েছিল। পূর্বে—জ্ঞানের উন্মেষ

থেকে বালক অবস্থায় ইংরাজ গভর্নমেণ্টের উপর অহেতুক ভক্তির পরিচয় ঠাকুরদাদামশাইয়ের সকল কথাতেই পেয়ে এসেছি। তা'তে এই ধারণাই বদ্ধমুল হয়েছিল, এই যে ইংরাজ, লালমুখ জাতটি, এ দেশের রাজা এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এদের তুল্য সদাশয়ও কেউ নয় আর এদের চেয়ে শক্তিশালী পৃথিবীতে কোন জাতিই নয়। বিশেষত এই কুইনের আমলে আমরা রামরাজ্যে বাস করেছি। আবার প্রাচীনদলের মতো এই যে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া, ইনি রাবণের মা নিকষা, রামচন্দ্রের বরে কলিযুগে জন্ম নিয়েছেন শ্বেতদ্বীপের রাণী হয়ে। আমার কিন্তু কুইনের ছবি দেখে তাকে নিকষাই মনে হ'ত। বুড়োদের বলতে শুনেছি,—দেখো এটা কুইনের রাজত্ব, এখানে মেয়েদের উপর অত্যাচার চলবে না! মেয়েদের দাম বেড়ে গিয়েছিল, একথা বোধহয় মিথ্যা নয়। সেইজন্য এদের যা কিছু, সবই সুখ ও সৌভাগ্যের চরম ও আদর্শ, এদের অনুগ্রহ আমাদের মহাসৌভাগ্যের ফলেই লাভ হয়েছে। এমন কি, অফিসের বাবুদের মুখে ইংরাজের সদাশয়তার কথা অলোচনা করতে মুখে আনন্দের পুলক লক্ষ্য করতাম। মোট কথা তখনকার বাঙালী সমাজে নিরাপত্তাজনিত ইংরাজদের প্রতি এক অপূর্ব আনুগত্যের ভাব সর্বত্রই দেখা যেত, বিশেষত প্রবীণদের মধ্যে।

ইংরাজের কথার সঙ্গে সঙ্গে বাবা-জেঠার মুখে সেইদিন এমনই একটি মন্তব্য শুনলাম, তাতে পূর্ব ধারণার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত এদের সর্বশক্তিমত্তার উপর সন্দেহ জাগাল। তখন বুয়র-ওয়ার চলছিল। বাড়ি থেকে আমরা কালীঘাট যাচ্ছি এক নিমন্ত্রণে। তখন ঘোড়ায় টানা ট্রাম। একখানি, তাঁর পাঁচটি ক'রে দু'দিকে দশটি খোলা দরজা ঢুকেই বেঞ্চিতে সামনাসামনি বসবার জায়গা—দুদিক দিয়েই নামা ওঠা যায়। দুটি কান বার করা, ঘাড়ে সোলার টুপি, একজোড়া অস্‌ট্রেলিয়ান ঘোড়া টানে ঐ ট্রাম গাড়ি। বড় রাস্তায় একমাইল অন্তর আস্তাবল, যেখানে ঘোড়া বদল হয়। আমাদের

জোড়াসাঁকোয় একটা, হ্যারিসন রোডের মোড়ে একটা, তারপর লালবাজারের মোড়ে একটা,—শেষে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটা ঘোড়া বদলের আড্ডা। কালীঘাটে যেতে এস্‌প্লানেডের মোড়ের আড্ডাই শেষ এই চিৎপুর লাইনে। তারপর কালীঘাটের ট্রাম লাইন আরম্ভ। কালীঘাট লাইনে ট্রামগুলি আরও একটু ছোট, চারটি ক'রে দরজা আর একটি ক'রে ঘোড়ায় টানে। সেদিন কথা হ'ল আমরা পাঁচ পয়সা দিয়ে জোড়াসাঁকো থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ট্রামে গিয়ে ওদিকে হেঁটেই যাব। বেশ ফাঁকা এই বিকালবেলা, গড়ে মাঠের উপর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কালীঘাট যাওয়া যাবে।

চৌরঙ্গীতে এসে আমাদের কি আনন্দ সাহেব-কোয়ার্টার দেখে। ট্রাম থেকে নেমে আমরা যে কি এক বিশাল ফাঁকারাজ্যে, মুক্ত বাতাসের মধ্যে এসে পড়লাম তা মুখে বলবার নয়। দেখি চৌরঙ্গীর উপর প্রত্যেক সাহেবদের দোকানে, প্রত্যেক বাড়িতে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা উড়ছে, চারিদিকেই আনন্দ-চিহ্ন। বাবাই প্রথমে আমাদের উদ্দেশ ক'রে কথাটা পাড়লেন। বললেন,—জানিস, আজ এত ধুমধাম ক'রে ওরা বাড়িতে বাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে কেন? জেঠা-মশাই ছিলেন আগে; তিনি বললেন, বুয়র-ওয়ার শেষ হ'ল বোধহয়, তাই ত? বাবা বললেন, শেষ হ'ল বটে, কিন্তু আসলে প্রিটোরিয়া দখল হয়েছে বলেই আজ এত আনন্দ। তারপর তাঁরা দু'জনে আগে কথা কইতে কইতে চললেন, আমরা চারটি ছেলের দল পিছনে পিছনে তাঁদের কথা শুনতে শুনতে চলেছি মাঠের ধারে ফুটপাথ দিয়ে।

বাবা-বললেন,—কম সোনা ঢালতে হয়েছে ঐ সোনার খনি দখল করতে? কর্তাদের টাকার জোরেই জয়জয়কার। জেঠামশাই এদিক ওদিক দেখলেন, কোন মন্তব্য করলেন না। বাবা কিন্তু নিঃসঙ্কোচেই বলে চলেছেন,—জানো, দাদা! জেনারেল ক্রোঞ্জি কি রকম ঘোল খাইয়েছিল এদের, কত যে ব্রিটিশ সৈন্য মারা গেছে তার হিসাব

নেই। শেষে লর্ড রবার্টস গিয়ে বিস্তর চেষ্টায় তবে কর্তাদের মান বাঁচায়। আর শুনেছ? জেনারেল জুবার্ট এদের এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল, বাইরে থেকে সাপ্লাইএর অভাবে ঘোড়াগুলো কেটে কেটে খেয়ে দিনের পর দিন প্রাণ বাঁচাতে হয়েছিল বাছাদের। ঘোড়া কেটে খাওয়াটা আমাদের কানে কেমন অদ্ভুত শোনায়।

এ কি কথা? ঠাকুরদাদামশাইয়ের ইংরাজ, আর পৃথিবীতে চন্দ্র সূর্য অস্ত যায় না যাদের রাজ্যে,—সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ রাজ্যের অতুলনীয় গৌরবের উপর একি মন্তব্য বাবার মুখে শুনলাম। যাই হোক এখন এই সূত্রে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে,—এখন ধারণা হ'ল এরাই একমাত্র সর্বশক্তিমান নয়। তখন থেকে কিছুদিন ঐ বুয়র-যুদ্ধের কথাই শুনতাম বাড়িতে। ১৮৯৯ থেকে তিনটি বছর যুদ্ধের পর তবে তা শেষ হ'ল। ক্রমে ক্রমে জেনারেল বোথার রণ-নৈপুণ্যের কথা, তারপর জেনারেল ক্রোঞ্জিকে বন্দী ক'রে চালান দেওয়া সেণ্ট হেলেনায়, যেখানে নেপোলিয়ানকে রাখা হয়েছিল এসকল খবরও বেরিয়ে গেল। তখনকার ব্রিটিশ জেনারেলদের ছবিও ক্যালেণ্ডারে বেরিয়েছিল, মাঝখানে লর্ড রবার্টসের মূর্তি। তার কিছুদিন পরেই কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু সংবাদ কলকাতায় সকল সমাজ গরম ক'রে দিলে।

এই বুয়র-ওয়ার অবসানের সঙ্গে কুইনের মৃত্যু,—এ সম্বন্ধে যে বিবরণ খবরের কাগজে বেরিয়েছিল তা সত্যই মর্মন্তুদ। ঐ যুদ্ধে ইংলণ্ডের যে সৈন্য ক্ষয় হয়েছিল এত লোকক্ষয় নাকি আগে কখনও হয় নি। বিশেষত, মধ্যবিত্ত এবং সম্ভ্রান্ত বংশের বহু সংখ্যক যুবক রণক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেছিল। সেই মৃত্যুতালিকা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতেই মহারাণী প্রথম হৃদয়ে আঘাত পান, সে আঘাত তিনি সামলাতে পারেন নি। এতটা লোকক্ষয়ের সংবাদে সেই যে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন আর তিনি সুস্থ হন নি। প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে নিস্তেজ হতে থাকে, এইভাবে দুই একদিনেই তাঁর শেষাবস্থার লক্ষণ

প্রকাশ পায়। শরীরে কোন রোগের লক্ষণই ছিল না। তাঁর দেহত্যাগ ভারতের নরনারী নির্বিশেষে সবারই বেদনাদায়ক হয়েছিল। টাউন-হলে বিরাট শোক-সভা হ'ল। ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'অশ্রুধারা' নামে একখানি রূপক, নাটকাকারে বেরিয়েছিল। তাতে একখানি গান ছিল তার প্রথম লাইনটা আজও মনে আছে :

নীরব মানব, তমাচ্ছন্ন সব, ভিক্‌টোবিয়া নাই, ভিক্‌টোরিয়া নাই,—সসাগরা ধরা শোকাচ্ছন্ন তাই।

সাহেব কোয়ার্টারে, বড় রাস্তায়, অফিস-অঞ্চলে সাহেবদের হাতে চওড়া কালো পাতলা কাপড়ের পট্টি, শোকচিহ্ন দেখা যেত, কিছুদিন ধরে এটা চলেছিল। তারপর সপ্তম এডোয়ার্ডের করোনেশন উৎসবের ধুম পড়ে গেল। দিল্লীতে দরবার হ'ল লর্ড কার্জনের প্রস্তাবে। তাঁরই প্ল্যান মতো ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের সূচনা। কলকাতার হাওয়া কিছুদিন ধরে বেশ গরম রইল।

১৯০১ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সময় থেকে প্রায় সব কথাই মনে আছে। আমাদের দৌড় কিন্তু ঐ বিরাট মণ্ডপ আর মেলা দেখা পর্যন্ত, ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।

আমার মধ্যে ধীরে ধীরে এক পরিবর্তন এই সময় থেকেই সুরু হ'ল, যার প্রধান লক্ষণ এই গতানুগতিকতার প্রতি একটা অনাস্থা, —সেটা আমায় এক বিচিত্রভাবে ভাবিত ক'রে তুললে। সে ভাবনার মূল এই যে, যেমন করেই হোক এই বাড়ির প্রথামত গতানুগতিক জীবন-এর হাত থেকে আমায় বাঁচতেই হবে। মন এতটা অশান্ত হয়ে উঠল, কোথাও আর শান্তি পাই না। এই পরিবর্তনই আমার জীবনে সব কিছুই ওলট-পালট ক'রে দিলে।

একুশ

একবার মিনার কথা বলি। আমি এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে দেখি শ্বশুর-বাড়িতে তিন ব্যক্তি তিন রকমের মনোভাব নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। শ্বশুরমশাই ইতিমধ্যে বাবার সঙ্গে বেশ একটা যুক্তিমূলক ঝগড়া ক'রে এসেছেন, আমার সঙ্গে দেখা হওয়া-মাত্রই সেটা শুনিয়ে দিলেন। তিনি বাবাকে বলেছেন যে, ইয়ংম্যান, কোনও অকুপেশান নেই, এরকম বেকার কাজকর্মহীন অবস্থায় তাকে ফেলে রেখে দিলেন, তাতে সে এদিক-ওদিকে যাবেই ত। না তাকে ভাল ক'রে পড়াশুনা করালেন, না দিলেন তাকে কোন কাজে বা চাকরি-বাকরিতে। তাঁরই উপেক্ষায় এই রকমটা হয়েছে, এখন তাঁরই উচিত তাকে কলকাতায় এনে অফিসে ঢোকানো।

শাশুড়ী বললেন,—এমন ছেলে ত দেখি নি, যদি বাড়ি ছেড়ে এ দেশ সে দেশ ক'রে বেড়াবে তা হলে বিয়ে করেছিলে কেন? এক-জনের মেয়ে গলায় ক'রে, এইভাবে বিদেশে পালানো। চাকরি নেই, বাকরি নেই, হোহো টোটো ক'রে হেথা-সেথা ক'রে বেড়ানো। আমার কপালখানা ইত্যাদি।

সবশেষে এবার শয়নকক্ষে যখন হাজির হলাম, সেখানে মিনার যে মূর্তি দেখলাম তাতে মনের মধ্যে আমার ক্ষোভ, দুঃখ বা অভিযান কিছুমাত্র অবশিষ্ট রইল না। তাকে কত দুঃখ দিয়েছি—অন্তঃকরণে অনুশোচনার তীব্র কশাঘাত অনুভব করতে করতে তার হাত দুটি আপন হাতে নিয়ে মুখ নীচু ক'রে নীরবে কাটালাম দীর্ঘকাল। টপ টপ ক'রে তার অশ্রুবিন্দু পড়ছে আমার হাতে কতই না অনুযোগের কথা শুনতে হবে এই আশাই করছি। কিন্তু তার মুখে যে কথা প্রথমেই আজ শুনলাম তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত।

মা তোমায় যা বলেছেন সে কথা মনে রেখ না,—বলো, তাঁর কোন কথা মনে রাখবে না? যখন আমি স্বীকার করলাম তখন সে আরও বললে। মা এই জগতে চিনেছেন কেবল তিনটি,—ধন, মান, সৌভাগ্য। উনি বলেন, মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় সোনা দানা, দামী দামী গহনা আর দেরাজ ও পেটরাভরা বারাণসী কাপড়। হাত বাক্সে যার টাকা ভরা থাকে না তাকে উনি দরিদ্র মনে করেন, ব্যবহারের অযোগ্য তারা।

এইভাবে সে আমার মনের যত গ্লানি সবকিছু নিঃশেষে দূর ক'রে দিলে।

আমি ভালই জানতাম যে আমাদের বড় বাড়ি আর বৈঠকখানা দেখে ওঁরা আমাদের ধনবান, সুখ-সৌভাগ্যশালী বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তারপর যখন ক্রমে ক্রমে আমাদের সংসারের গলদ প্রকাশিত হতে লাগল আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী দুজনেই বুঝেছিলেন যে তাঁদের আদরের পালিত কন্যাটিকে, এত খরচপত্র ক'রে জলে ফেলেই দিয়েছেন। তাতে আমার শ্বশুর যতটা দুঃখ পেয়েছিলেন আমার শাশুড়ীর নৈরাশ্যের জ্বালা তাঁর তুলনায় অনেক বেশীই ছিল, —আর সেইজন্যই আমায় পেলেই তিনি নিঃসঙ্কোচে মনের সব কিছু কথা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত ক'রে অনেকটা হাল্‌কা হতেন। মিনু তা লক্ষ্য ক'রে অন্তরে যে বেদনা বোধ করত, তা বুঝলেও ভাষায় সংযত হওয়াটা তিনি দুর্বলতার নামান্তর মনে করতেন। মাঝখান থেকে মিনার দুঃখটাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রকট হয়ে উঠত একথা না বললেও চলে। কিন্তু গিন্নী সে সকল বড় গ্রাহ্য করতেন না, এই ভেবে যে আমার প্রতি যা কিছু অনুযোগ তাঁর, সে ত তারই ভালর জন্য। আবার মাঝে মাঝে মিনাকে প্রবোধ দিতেন এই ব'লে যে, ঐ রকম কড়া ক'রে না বললে ওসব ছেলের চৈতন্য হয় না। উমাপতিবাবু কিন্তু এ ব্যাপারে আমার চেয়ে বাবাকেই বিশেষ দোষী মনে করতেন, তা আগেই বলেছি।

এলাহাবাদ থেকে ফিরে আসবার পর আবার বাবাকে এই সম্বন্ধে আমার অগোচরে একদা তিনি এমনই তীব্র অনুযোগ করে ছিলেন যার ফলে ব্যাপারটি আর বাবার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। তাই দেখলাম, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমায় হাইকোর্টে বার করবার ব্যবস্থাই করেছেন। ব্যবস্থার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল।

হাইকোর্টের এপেলেট সাইডে প্রিভিকাউনসিল আপিল-বিভাগে কাজ করতেন বাবা, তিনি এসিস্ট্যাণ্ট পেস্কার ছিলেন। আবার, পেস্কার যোগেন বসুর অনুপস্থিতিতে বা ছুটিতে গেলে তিনিই পেস্কারের কাজ করতেন। যোগেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি ডেপুটি রেজিস্টারকে ব'লে যতদিন কোন সুযোগ না আসে ততদিন শিক্ষানবিশির কাজে আমায় বাহাল করলেন। এইজন্য, দুশো টাকা চাই ব'লে বাবা গোপনে শ্বশুরমশাইকে এক পত্র লিখেছিলেন। পরদিন তিনি স্বয়ং এসে উপস্থিত। বোধহয় বাবা চুপি-চুপি কাজটা দুই বেয়াইয়ের মধ্যেই সারতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমার শ্বশুর সেই দিন বিকালে, একেবারে অন্দর মহলে, যেখানে কাকাবাবু, জেঠা-মশাই, ঠাকুমা, পিসিরা সবাই উপস্থিত, এক দালান লোক সেইখানে এসে একেবারে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙলেন। তিনি বললেন,—দুশো টাকা হলে যদি বাবাজীর কাজ হয় সে টাকা আনন্দেই দেবো, কিন্তু কি ব্যাপারটা খুলে ত কিছুই লেখেন নি? বলতে বলতে একশো টাকার দুখানি নোট পার্সের মধ্যে থেকে বার করলেন।

বাবার মুখটি চুপ হয়ে গেল। মেয়ের বাপ, শাঁসাল যদি হয়, তাহলে ছেলের বাপ নানা প্রয়োজনে তার ঘাড় ভাঙবে, এতে কোন সংকোচ করার কথা নয় আমাদের এই নির্লজ্জ কলকাতার দরিদ্র কুটুম্ব সমাজে, তবে বাবার এমন অপ্রতিভের মতো মুখ কেন হ'ল? বাবা উত্তরে বললেন,—কি জানেন বেয়াই মশাই, ডিপার্টমেণ্টের

সাহেবরা ত ঘুষ বলে নেয় না, ওরা টাকাটা হ্যাণ্ডনোটে ধার নিচ্ছি বলে নেয়। তাই এই টাকাটা সাহেবকে দিতে হবে ধার বলে, ফেরত পাবার আশাটা ছেড়ে দিয়েই।

যাই হোক এইভাবেই আমায় হাইকোর্টে বার করা হ'ল।

তখন বারো চৌদ্দ আনায় টুইলের শার্ট পাওয়া যেত চাঁদনীতে, আর এক টাকা পাঁচ সিকায় ক্যাম্বিশের জুতোর খুব চলন ছিল। এইভাবেই আমার ভদ্র পোষাক দিলেন বাবা, আমি হাইকোর্টে বেরোতে আরম্ভ করলাম।

এপ্রেন্টিস বলতে একেবারে উপবাসী নয়, বিলক্ষণ উপার্জন ছিল। উপার্জনের পথটা বাবাই আগে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলেন, যাবামাত্রই কাজে লেগে গেলাম। ওখানে সেকসান রাইটারী কাজটা আসলে নকল-নবিশের কাজ। মফঃস্বল থেকে আপিল-বিভাগে বিচারের জন্য যে সব নথি-পত্র আসে সেসব ছাপা হয়ে পেপার বুক তৈরি হয়,—তাই দেখেই জজেরা এখানে বিচার করেন। মূল নথিপত্র নিয়ে উকিলেরাই আগে দেখাশুনা করেন। নিয়মমতো সেসব অরিজিন্যাল নথি তো আর হাইকোর্টে রেকর্ডস থেকে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হয় না, তবে উকিলেরা সেগুলি দেখতে পান এবং প্রয়োজনমতো কপি অথবা নকল ক'রে নিতে পারেন, নিজের লোক দিয়েই হোক অথবা আদালতের সেকসান রাইটারদের দিয়েই হোক। সরকারী নকলনবিশদের চার্জ বড় বেশী আর ছাপার সকল খরচই পার্টিকে দিতে হয়। তা ছাড়া সরকারী লোকদের ফুরসত কম তাই উকিলেরা নিজের লোক দিয়েই ও কাজটা ঐ দপ্তরের মধ্যেই অল্প খরচে সেরে নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে প্রথম প্রথম ঐসব উকিলদের কাছ থেকেই নকলের কাজ নিতে হ'ত। তাতেও কিছু কম কাজ হ'ত না। প্রথম মাসে পঁয়ত্রিশ থেকে শুরু হ'ল। সারা মাস কাজ থাকলে ষাট পঁয়ষটি এমন কি বাহাত্তর টাকাও উপার্জন হয়েছে কোন কোন মাসে। তবে

আমার সঙ্গে কাজেরই সম্বন্ধ, আর কোন দিন এক আনা, কোনদিন বা দু আনা পয়সা জলখাবার বাবদে পাওয়া যেত। কাজের দরুন সব টাকাই বাবা আদায় করতেন। টাকায় আমার অধিকার ছিল না বটে কিন্তু আসলে আমার লাভ ছিল অন্যদিকে, হাতে যখন কাজ থাকত না।

সেই সময় করতাম কি? তখন স্বনামধন্য গুরুদাসবাবু, চন্দ্রমাধব ঘোষ এরা ছিলেন জজ, মাত্র দুজন বাঙালী, বাকী সব লালমুখ,—স্যার ফ্রানসিস উইলিয়াম ম্যাকলিন চিফ্ জাস্টিস। গুরুদাসবাবু রিটায়ার করতে সারদা মিত্র জজ হলেন। ব্যারিস্টারদের দেখেছি, জ্যেষ্ঠ উডরোফের ছেলে তখনও ব্যারিস্টার ছিলেন, অল্পদিন পরেই জজ হয়ে বসলেন। হোমউডও তখন জজ ছিলেন। পরবর্তীকালে এরা দুজনেই ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিএন্টাল আর্টের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক এবং গণনীয় মেম্বার হয়েছিলেন। সেইজন্য এদের খুব বেশী মনে আছে। যখন হাতে আমার কাজ থাকত না তখন জজেদের ঘরে ঘুরে ঘুরে সব দেখতাম, বিচার শুনতাম। রাসবিহারী ঘোষ, আশুবাবু, দ্বারিক চক্রবর্তী, সামসুল হুদা, লালমোহন দাস প্রভৃতি তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। জ্যাকসান গার্থ, এ পি সিংহ, বি সি মিত্র, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, সি আর দাস, এরাই তখনকার বড় ব্যারিস্টার। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডব্লিউ সি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শেলী ব্যানার্জি স্ট্যাণ্ডিং কাউনসিল। এক মোকদ্দমায় তখন একদিন—একদিকে রাসবিহারী ঘোষ, অপর পক্ষে আশুতোষকে দেখেছি চিফ জাস্টিসের ঘরে। সামসুল হুদা সাহেবকে জজ হবার আগে একদিন চন্দ্রমাধব ঘোষের ঘরে একটি মোকদ্দমায় আরগুমেণ্টের সময় বলতে শুনেছিলাম। এমন চমৎকার বক্তৃতা কখনও শুনি নি। কি সুন্দর সহজ ভঙ্গিতে অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল।

এইভাবে প্রত্যেক আদালত ঘরেতে ঘুরে ঘুরে আরও জিনিস

দেখতাম যার প্রভাব আমার ভবিষ্যৎ জীবনে বড় কম ছিল না। সে আকর্ষণটা অয়েল পেন্টিংএর, চিফের ঘরে তিনখানি, সেসন ঘরে দু'খানি, মাঝে এক ঘরে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের লাইফ-সাইজ অয়েল পোর্ট্রেট ছিল, খুব চওড়া চওড়া ঝকঝকে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। ঐ বিশাল আদালত ঘরের সঙ্গে সেগুলি এমনই মানানসই যে দেখলে ভোলা যায় না। চিফের ঘরে স্যার ইলিজা ইম্‌পের আলেখ্যখানি তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ পেণ্টার জন কলিয়ারের আঁকা। কি চমৎকার লাল সাটিনের গাউন-পরা, মেজেতে পাতা ঘর জোড়া মাদুরের উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ যে বিস্তৃত মাদুর আর সেই মাদুরের বুনন পর্যন্ত এমনই কৌশলে আঁকা, এমনই স্বাভাবিক তার রং যে দেখবার জিনিস। আসল পোর্ট্রেটের কথাই নেই, পক্ককেশ বৃদ্ধের বিচক্ষণ মূর্তি। যেন জীবন্ত। সাধারণতঃ জজেরা কালো গাউন পরেন। যখন ফৌজদারী আসামীর অপরাধের বিচারে দায়রা আদালতে বসেন তখন লাল গাউন; সে এক বড়ই গম্ভীর ত্রাসোদ্দীপক বিচারকের মূর্তি। আদালত ঘর গম্‌গম্‌ করে। মধ্যে মধ্যে যখন ক্রিমিন্যাল সেসন আদালতের কাজ আরম্ভ হ'ত, আমি দেখেছি। সেই বিশাল জনপূর্ণ নিস্তব্ধ ঘরে যেন যমালয়ের গাম্ভীর্য বিরাজিত।

আমার কাজের সঙ্গে বর্তমান সম্বন্ধ মোটেই প্রিয় অথবা আশাপ্রদ নয়। কারণ ওখানকার উকিল, যাঁরা পেপার বুকের কাজ করেন তাঁরা প্রায়ই দরিদ্র জাতীয়। মামলা মোকদ্দমায় যাঁরা অকৃতী তাঁরাই, লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলদের কাছ থেকে পেপার বুক ছেপে বা ছাপিয়ে সব কিছু তৈরি ক'রে দেবার ভার নেন। কাজেই তাঁদের কাছ থেকে আবার যারা নথিপত্র কপি করে, অথবা ছাপা কাজ সম্পন্ন ক'রে দেবার ভার নেয়, তাদের সঙ্গে অত্যন্ত দর কষা-কষি এবং সময়ে সময়ে পয়সা মেটাতে যে ব্যবহার করেন তাকে সৎ ব্যবহার বলা যায় না। তবে ওর মধ্যে ভাল লোকও অনেক

আছেন তাই ওকাজ অনেক কালই চলে আসছে। ভাগ্যক্রমে আমার অদৃষ্টে কাজের বেলা ভাল লোকও যেমন, আবার সঙ্কীর্ণমনা অসৎ প্রকৃতির উকিলও তেমন জুটেছিল। এই দুই রকম ব্যবহারে একজনের অনেকটা চতুর হবার কথা, কিন্তু আমি তা হয়েছিলাম কিনা সন্দেহ, তবে ও কাজটায় আমার একটা ঘৃণা ধরে আসছিল। বলতে কি, তখন থেকেই একটু ভদ্র রকমের কাজের সন্ধানে ছিলাম।

ওখানে আর একরকম কাজ আছে,—সেটা তরজমার কাজ। সেও ঐ সকল ব্রিফলেস উকিলদেরই হাতে। তাঁরা নিজেরাই সেগুলি অনুবাদ ক'রে মোটা টাকা উপার্জন করেন। আমার মতো বাইরের একজনের পক্ষে তখন কিছুদিন একজন উকিলের তাঁবেদার হওয়া ছাড়া তা শেখবার, তারপর কর্ম দায়িত্ব হাতে নিয়ে সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করবার উপায় নেই। মফঃস্বলের জেলা ও মহকুমা আদালতের দলিলপত্র বাঙলা ভাষায় যা কিছু সে সব তর্জমা ক'রে ঐ পেপার বুকের মধ্যে ইংরাজীতেই ছাপা হয়, উকিল এবং জজেরা তাই দেখে বিচার করেন। সেই সব নথি বাঙলা থেকে ইংরাজী অনুবাদের একটা বিভাগ হাইকোর্টেও আছে। সেখানে সরকারী মাইনে করা অনুবাদক যাদের ট্রানশ্লেটার বলে, তাঁরা আছেন। কিন্তু সরকারী অনুবাদকদের কাজের চার্জ অনেক বেশী, আর সংখ্যায়ও তারা কম, সেইজন্য প্রতিষ্ঠাহীন উকিলেরা সেই সকল কাজ ক'রে সরকারী একজামিনারদের দিয়ে পাস করিয়ে কাজ চালিয়ে দেন। মোটের উপর কপি করা বৃত্তির চেয়ে সেটা একটু পদমর্যাদায় উঁচু। আমার পক্ষে সহজ মনে হ'ল দুই একটা কাজ দেখে। এখন ঐদিকে ঝোঁক দেখে বাবাও শেষে রাজী হলেন।

হাইকোর্টে কাজে বার হবার পর থেকে পূর্ণ একটি বৎসর কপিস্টের কাজই করেছিলাম, পর বৎসর ট্রানশ্লেসনের কাজে লাগলাম

ওখানকারই এক উকিলের দপ্তরে। এ পর্যন্ত বাইরের লোক হিসাবেই কাজ চলেছে। আদালতের মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ এসেছিল কিনা জানি না, ইতিমধ্যে বাবাও আমায় সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। তবে দ্বিতীয় বৎসরের মাঝে একদিন হঠাৎ দেখি বাবা আমার উপর অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে উঠলেন। বড়ই বিচিত্র ব্যাপার।

ইতিমধ্যে আমার কাপড়, জামা-জুতো এসব বেশ জীর্ণ হয়েই এসেছিল। তিনি চোখের সামনে নিত্যই দেখছেন সব, বুঝতেও পারছেন কিন্তু কিছুতেই কিছু করবেন না। তখন একদিন মুখ ফুটে বললাম। শুনে বললেন, এরই মধ্যে সব কিনতে হবে? এই তো সেদিন সব কিনে দিয়েছি। সুতরাং আর এ সম্বন্ধে তাঁকে কিছুই জানাবার দরকার নেই। মনে মনে ঠিক করলাম আর বলবো না। তারপর, প্রায় একসপ্তাহ পরে সদয় হয়ে অফিসে একদিন ডেকে বললেন,—শোন, একটা কথা!

আমি ভাবলাম এ আবার কি রকম, একটু ভয়ও হ'ল যাই হোক কাছেই বসলাম। তিনি উদাসভাবে খানিক সামনে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলেন, তাই দেখে সন্দেহ আর ভয় যুগপৎ বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল। এ আবার কি? খানিক পরে বললেন,—আমি তোমার ওপর বড় একটা অন্যায় করেছি, তোমার একটা বিশেষ ক্ষতিই করেছি।

সে বড়ই করুণ সুর, এমন কখনও আগে শুনি নি। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়েই রইলাম, আমার জীবনে এই প্রথম তাঁর মুখ থেকে, এমন অনুশোচনার সুরে এমনই একটি ভাষায় কথা শোনা। চিরকালটাই ভয়ের সম্পর্ক, হঠাৎ এমন বিপরীত ভাবটা আমায় এমনই মুগ্ধ ক'রে দিলে, পাছে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আরও বেদনাদায়ক হয় সেইজন্য আমি আর কোন প্রশ্নই করলাম না। আমার মুখ থেকে কোন কথাই বার হ'ল না,

চুপটি ক'রে বসেই রইলাম। তিনি যখন দেখলেন আমার অবস্থাটা নেহাত অনবস্থারই মতো তখন একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ ক'রে চুরুট ধরিয়ে বললেন, আচ্ছা এখন যাও—আজ ছুটির পর এক সঙ্গে গিয়ে যা যা দরকার কিনে দেবো। ব্যস এই পর্যন্তই কথা। আজও পর্যন্ত জানতে পারি নি তিনি আমার কি ক্ষতি করেছিলেন। তবে পরে, মনে মনে এটা নির্ঘাত বুঝেছিলাম যে আমার পারমানেণ্ট হবার একটি নিশ্চিত সুযোগ উপেক্ষা করেছেন বর্তমান মাসিক সত্তর আশি টাকার খাতিরে। সে ক্ষতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমার কোন সম্বন্ধই নেই, যদিও অন্যায় কিছু থাকে তবে সেটা সম্পূর্ণ তাঁর মনের উপর দিয়েই হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে বিবাহিত জীবনের মুখ্য পরিণতি, পিতৃত্বের সম্ভাবনার খবর শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে গেল বাড়িতে। একদিন অফিস থেকে এসে শুনলাম। প্রথমে একটা আঘাত, তারপরও কিন্তু সেই বেদনা স্থায়ী হয়েই রইল আমার মধ্যে। অথচ বাড়িতে আর কেউ এই খবরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনেই করে নি। অবশ্য সম্বন্ধ তো আমারই সঙ্গে যেহেতু আমিই সন্তানের পিতা হব, কিন্তু যে অবস্থায় এই সম্ভাবনা অন্তরে আনন্দ জাগায় অধমের সে অবস্থা তো নয়। যথার্থ কারণ বলতে তখন অনেক কথা, তখনও কৈশোর অবস্থা কাটে নি, আর জীবনে তখনও কোনও পথ পাই নি, দ্বিতীয়ত আমি যে কত বড় অসহায় তা আমার চেয়ে বেশী যিনি জানেন তিনি সবার অন্তর্যামী। তৃতীয়, পিতা হবার দায়িত্ব স্মরণ ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে যেভাবে নিজের শিশু ভাইবোনগুলিকে লালিত ও পালিত হতে দেখেছি, সেইসব স্মরণে এলো।

শিশুর ভাত খাওয়া শুরু হবার পূর্ব অবস্থা পর্যন্ত যে শোচনীয় দুর্গতি,—ক্ষুধাতুর হয়ে চীৎকারের ফলে শিশুকে জোলো দুধ, ঠাণ্ডা, কিংবা কাগজ জেলে একটু গরম হ'ল কি না হ'ল, তাই-ই ঝিনুক দিয়ে গেলানো, একটু মিশ্রী বা চিনির বালাই নেই। তারপর সবচেয়ে দুর্গতি

অসুখ-বিসুখ হলে অথবা শীতের সময়। একটা ময়লা সুতোর ফ্রক পরা, পা হাত ঠাণ্ডায় নীলবর্ণ হিম, কান-ঢাকা মাথায় এক টুপি, সে যে কি কাপড়ে তৈরি, কোন হদিশ পাওয়া যাবে না এত ময়লা। রৌদ্র ওঠবার পূর্ব পর্যন্ত এইভাবে এখানে-সেখানে, অথবা রৌদ্রের আশায় ছাতের ওপর শীতে কাঁপা, হুপিং কাফে ভোগা, তাদের সর্দি-কাশিতে দেখেছি কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার অবস্থা। পিতা লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, ন'টায় উঠবেন। মায়ের মাথা ফাটা-ফাটির পর তখন একদিন হয়তো একটু হোমিওপ্যাথি ওষুধ এলো বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে। এসব কি বেশী অতীতের কথা? এখনও তো আমার শিশু ভাইটির বয়স দু বৎসরও হয়নি, দেখছি এইভাবেই মানুষ হচ্ছে। গোপনে, শয়নকালে এই সকল ভাবতে থাকি আর কান্না পায়,—হে ভগবান, আমার পিতা হবার অধিকার তো হয় নি, অথচ আমি বাপ হতে চলেছি, এই মারাত্মক সত্য আমার জীবনে প্রায় এই সতেরো বৎসর বয়সে সম্ভব হতে চলেছে। কি হবে আমার? রাগ কারো উপরে নয়, নিজ অক্ষমতার উপর প্রবল বিদ্বেষ আর নৈরাশ্যমূলক অবসাদ।

যেমন প্রতি মাসে হয়ে থাকে এই মাসেও একবার আগামী শনিবারের সকালে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ পত্র এলো শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে, আমি না যাবার ইচ্ছায় টোড়িরামকে বলে ফেললাম,—আমার একটা বিশেষ কাজ আছে, আমি তো যেতে পারবো না।

এই টোড়িরাম, বিহারী কুর্মি। আগেই বলেছি—বাল্যকাল থেকেই ঐ সংসারে কাজ করছে, মিনাকে সে মানুষ করেছে, সুতরাং সে একজন গণ্য ব্যক্তি ওদের সংসারে। এই টোড়িরামের মারফতেই এতাবৎ কাল আমাদের প্রেম-পত্রাদি, এমন কি অনেক কিছুই কর্তাগিন্নির অগোচরে নানা ক্ষেত্রে তখন সম্ভব হয়েছে। তখনকার অবস্থা তো মিনার ভালরকমই জানা ছিল, তাই কখনও কখনও

এরই হাত দিয়ে অনেক কিছুই গোপনে পাঠিয়ে দিত, সুতরাং সে আমাদের একজন হিতৈষী বন্ধুর মধ্যেই গণ্য।

এখন গোড়াতে যখনই আমি এবার যেতে পারবো না বললাম, কোন কথা না বলে নিতান্তই ভাল মানুষের মতো সে, তার জেবের ভিতর থেকে একখানা পত্র বার ক'রে আমার হাতে দিলে। মিনা যে কি ক'রে বুঝেছিল যে আমি এবার যেতে চাইবো না তাদের বাড়িতে, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! কারণ, শেষে টোড়িরাম তার সেই মোচা গোঁফের ফাঁকে একটুখানি বিজ্ঞ হাসি হেসে বললে,—দিদিমণি বোলে দিয়েছিলেন যদি আমি এবার যেতে পারবো না এমন কথা বলি তা হোলেই চিঠিখানা দিতে হোবে, না হোলে চিঠি ফিরিয়ে আনতে হোবে। চিঠিতে লেখা ছিল—তুমি নিশ্চয়ই এসো, যেন এড়াবার চেষ্টা কোরো না, আমার বিশেষ কথা আছে।

শনিবারে মানসিক অবসাদকে অসাধারণ গাম্ভীর্যের মধ্যে ঢাকা দিয়ে সন্ধ্যায় গেলাম শ্বশুরবাড়ি যেমন সময়ে গিয়ে থাকি। শ্বশুর তাঁর স্বভাবসুলভ উদারভাবেই গ্রহণ করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কাজে পারমানেণ্টের কোন সুযোগ এলো কি? শেষে মন্তব্য করলেন,—বেয়াইমশাই কি করছেন, এতদিনে একটা পাকা ব্যবস্থা করতে পারলেন না? তারপর খাবার সময় শাশুড়ী আরম্ভ করলেন,—এমনই বরাত, আজ বাদে কাল ছেলেমেয়ে হবে, এখনও একটা আয় নেই, ছেলে হলে তার গায়ে একটু সোনা দিতে পারবে না, দুটো গয়না দিতে পারবে না, দুটো জামাও দিতে পারবে না,—ওমা এ কি রকম বাপ হওয়া? শ্বশুরমশাই ঐ বক্তৃতার বহর শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। বললেন,—সব হবে, সময়ে সব হবে, তুমি একটু কথাটা কম কও দিকি নি? সাধ-আহ্লাদের সময় যায় নি। গিন্নি কিন্তু কথাটা কম করবার আগেই বলে ফেললেন,—সময় আর কবে হবে? তারপর যথা-সময়ে যখন মিনার সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন যেন সকল দুঃখের শান্তি।

সে যে কি অদ্ভুত উপায়ে আমার যত কিছু দুর্ভাবনা, সব কিছু সমস্যার মীমাংসা ক'রে বসে আছে সেইটে ভেবেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। নারী প্রকৃতি কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত বাস্তব জ্ঞান। প্রথমেই বলে যে,—তোমার এত দুর্ভাবনায় কাহিল হওয়া কেন? যিনি জীবন দেবেন তিনিই তার জীবনের সব কিছু ব্যবস্থা, উচিত-মতো বাঁচবার যোগাড়ও ক'রে দেবেন। একথায় আমার হিন্দু-সংস্কার প্রভাবিত মনের মধ্যে একটু সাড়া পেলেও আমার দিক থেকে যেখানে আঘাতটা দিনরাত বেদনাদায়ক হয়েছে সেটাও না বলে থাকতে পারলাম না। তার উত্তরে সে বলে কি—ওটা তোমার অহঙ্কারের কথা। তুমি জন্মদাতা বলেই তার (সন্তানের) পালন-কর্তা হবে এমন কিছু কথা নেই, সব জায়গায় তা হয়ও না। সন্তান সুখে থাকা, ভালভাবে মানুষ হওয়া নিয়ে কথা, তা, যে আসছে সে তার ভাগ্য নিয়েই তো আসছে।

অতি চমৎকার, মিনা যে একথা ভাবতে পারে আর আমাকে তার ভাবনায় প্রভাবিত করবার চেষ্টাও করতে পারে তা আমি কখনও মনে করতে পারি নি কারণ আগে তার মুখে এমন ভাবের কথা শুনি নি। যখন বললাম, তুমি যে এইভাবে গুরুতর ব্যাপারটা ভেবে এত সহজ মীমাংসা ক'রে নিশ্চিন্ত আছ এটাও আমার পক্ষে এক সান্ত্বনা। উত্তরে সে বললে,—কেন নিশ্চিন্ত থাকবো না, তুমি জানলে তুমিও এতটা উদ্বেগ আগে থেকে ভোগ ক'রে কাহিল হতে না। আমি বললাম,—বার বার ঐকথাই বলছো যে, তুমি আমায় এত কাহিল দেখছো কোথা বলতো? ভেবে কি কাহিল হয়? সে বলে,—হাঁ, হাঁ তোমাকে জানি, কোথাও কিছু নেই, আগে থাকতে ভাবনায় দমে যাওয়া তোমার স্বভাব। সেই জন্যই বলেছিলাম, নিশ্চয় এসো। তুমি রোগা হয়ে যাও নি? দেখ দিকি আরশিতে? তারপর, কি জন্য এ ব্যাপারে সে এত নিশ্চিন্ত—বেশ শুনলাম তার মুখে। সেটি এই যে শ্বশুরমশাই, মিনাকে নয়, তার গর্ভজ

সন্তানদের তাঁর স্থাবর অস্থাবর যা কিছু উইল ক'রে দিয়েছেন। সুতরাং তার সন্তান কখনও আমার উপার্জনের বা অর্থের অভাবে দুঃখ যে পাবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। আমাকেও নিশ্চিন্ত করতে চায়। আমার পুরুষবুদ্ধি, তাতে জন্মদাতার অহংকার, তাই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না—এই কথাই সে আমায় সতেজে বুঝিয়ে দিলে।

আমি অবাক! সেই লাজুক, স্বল্পভাষিণী মিনা, আজ এতটা বাক্‌পটু ও সাহসী হ'ল কি করে? তার মাতৃত্বের সংস্কার, সম্ভাবনা থেকেই সে প্রস্তুত। তার জীবনে সার্থকতার আভাস, তারপর জাতকের জীবনের নিরাপত্তা, যাতে তার সন্তান লালন-পালনে দুঃখ বা অভাব ভোগ করতে হবে না—এই আশ্বাসই তাকে বুদ্ধিমতী ক'রে তুলেছে।

তখন বললাম,—তাহলে তোমার মা এমন ক'রে বার বার আমাকে এত কঠিন কথা বললেন কেন? উত্তরে সে বললে,—তোমার মধ্যে পৌরুষ জাগাবার জন্যে, এটা বুঝলে না, তা ছাড়া তিনি অল্পে সন্তুষ্ট হবার পাত্রী নন। তিনি চান সন্তানের বাপেরও সাচ্ছল্য আর মায়েরও সাচ্ছল্য, দুদিক থেকেই সন্তানকে সৌভাগ্যবান না দেখলে তাঁর শান্তি নেই। একদিকের ভাল অবস্থায় তাঁর বিশ্বাস নেই, তৃপ্তিও নেই।

মিনার সঙ্গে যেটুকু আলোচনা হ'ল—সে বুঝেছিল, আমি তার কথায় অনেকটাই শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন হয়েছি। অবশ্য তখনকার মতো সে এটা আমায় স্বীকার করিয়ে নিলে যে, বর্তমান অবস্থায় অক্ষমতার জন্যে যেন বেশী ভাবনা চিন্তায় আমি মন খারাপ না করি। কারণ জীবনে উন্নতির কাল বয়ে যায় নি আমার, ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হবে, তার এটা অন্তরের বিশ্বাস।

যাই হোক তার কাছে এসে সত্য সত্যই তখনকার মতো অনেকটাই স্থির হয়েছিলাম। তারপর কিন্তু এক ঘটনায় আমায়

অন্যদিকে চালিয়ে দিলে। তাতেই আমার মধ্যে আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্বটি বেড়ে গেল। আর তারই প্রতিক্রিয়ায় অধ্যাত্ম শাস্ত্র এবং সাহিত্য অধ্যয়নের প্রবৃত্তি এলো।

আমাদের মনোধর্মে যখনই কোন কাজে প্রবৃত্তি হয় তা সংস্কার অনুসারেই হয়—তাইতে আমাদের অন্তরের প্রবৃত্তির পরিচয়টাই পাওয়া যায়। একটি শিশুর জন্ম আর একটি শিশুর মৃত্যুর দৃশ্য, নানাজনের মধ্যে নানাভাবের তরঙ্গ উৎপন্ন করে। আমার একটি শিশু ভগিনীর মৃত্যু দেখলাম, আবার বিবাহিতা একটি সন্তানের মা, আমার পরেই যে ভগিনী—রাণী, যার সিমলার গণেশ উকিলের বড় ছেলে পুলিনবাবু'র সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল, তার মৃত্যুও দেখলাম। তার মৃত্যুর পূর্বে তার শ্বশুরবাড়িতেই দেখতে গেলাম তার রুগ্ন স্বামীকে। সে এক নাটকীয় ব্যাপার। দোতলায় তাদের তিনখানি ঘর। একধারের ঘরে রাণীর স্বামী রোগ-শয্যায়। সে আজ প্রায় তিন মাস ভুগছে পেটের একটা এবসেস্ অপারেশনের ফলে, সুরেশ সর্বাধিকারীর হাতেই অস্ত্রোপচার। তখন রাণী সম্পূর্ণ সুস্থ, স্বামীর সেবায় দিনরাত ব্যস্ত। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি,—তার ব্যবহারে, সহজ কর্ম তৎপরতার মধ্যে নৈরাশ্যের কোন আভাসই ছিল না। যদিও তখন ডাক্তারে বলেছিল অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে আসছে। তিন মাস ভোগের পর যখন রোগীর অবস্থা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আবার তখন একদিন আমি দেখতে গেলাম। শুনলাম রাণীর জ্বর হয়েছে কাল রাত থেকে। কি রকম জ্বর? সামান্যই জ্বর, বললে তার দেওর। দেখা হ'ল, বিছানায় শুয়ে আছে রাণী, আমায় দেখে উঠে বসল। তার শাশুড়ী দাঁড়িয়ে ছিলেন মাথার শিয়রে, বললেন,—ও কি বৌমা, ডাক্তারে উঠতে বারণ করেছে যে।

তখন আমি বললাম, সামান্য জ্বর যখন উঠতে বারণ কেন? তার পিছন থেকে শাশুড়ী তাঁর নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন

তার হার্টের অবস্থা খারাপ। রাণী শুনলে না কোন কথা, বললে, দাদার সঙ্গে একটু কথা কইব মা; অর্থাৎ এখানে আর কেউ না থাকে। শাশুড়ী চলে যেতে যেতে বললেন, বেশী কথা কওয়া বারণ। সে বললে, আচ্ছা মা! দেখলাম যেন তার হাঁপের মতো লাগছে। হঠাৎ এতটা পরিবর্তন সন্দেহ হ'ল একটু, কিছু বললাম না।

বিছানায় তার কাছেই বসে জিজ্ঞাসা করলাম,—হাঁরে হঠাৎ জ্বর হল কেন? বড্ড বেশী পরিশ্রম কিছু—

না না দাদা, কিছু বেশী করি নি,—শোনো, আমি আর বাঁচবো না, তুমি মাকে একবার কাল সকালেই নিয়ে আসতে পারবে? একবার দেখবো, প্রণাম করবো। তার দৃঢ় নিশ্চয়তা দেখে ভয় পাবার কথা, কিন্তু আমার ভয় এলো না। সে মৃত্যুকে কি অদ্ভুত সহজভাবে নিয়েছে আর ঠিক ঠিক এমনভাবে জেনেছে যে, কথায় বা তার প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে চিত্তের মধ্যে তিলমাত্র ভয়কে স্পর্শ করতে দিলে না। জীবনের মতোই সহজ এই মৃত্যু—এমন দেখি নি জীবনে। তারপর তার স্বামীর ঘরের দিকে দেখিয়ে ইশারায় বললে, ওঁর আগেই ঠিক যাবো। তার বয়স তখন ষোলও নয়, আমার চেয়ে দু বছরের ছোট ছিল সে। যাই হোক, মাকে আজ যদি না হয় তো কাল সকালেই আনবার কথাটা সে আমায় তিনবার বললে।

বাড়িতে এসে সব কথা বলতে বাবা প্রথমে মায়ের যাওয়া মঞ্জুর করলেন না, শেষে পিসিদের নির্বন্ধাতিশয়ে বললেন,—বিকালের দিকে যাবে। মাকে আর যেতে হ'ল না; পরদিন দুপুর নাগাদ তাদের ঝি এসে খবর দিলে সে আজ বারোটার সময় মারা গিয়েছে আর মৃত্যুর আগে সারা সকালটা, কেবল মা এসেছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে অনেকবার। তার মৃত্যুর কথা পুলিনকে জানানো হয় নি। কিন্তু সে ঘন ঘন খোঁজ করছে। তাকে বলা হয়েছে রাণীর অসুখ দেখে তার বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে। তার দুবছরের শিশু সন্তানটি চারদিকে মা, মা, বলে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তৃতীয় দিনে

খবর এলো পুলিনও পূর্বদিন বেলা বারোটা নাগাদ মারা গিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার আড়াআড়ি।

-এখন এই মৃত্যুরহস্য—কিছুদিন দিবারাত্র আমার চিন্তার বিষয় হয়ে রইল। জন্ম-মৃত্যুর রহস্য ভেদ সংসারী কোন ব্যক্তিই ঠিকমতো করতে পারে না কিন্তু সবাই পূর্বাপর সাধুসন্তদের কথা অথবা পুরাণ দর্শনের কথা শুনে, তারপর নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে অথবা সংস্কার বশে এক রকম মনগড়া মীমাংসা একটা ক'রে নেয়, আবার তাই অপরকে বুঝিয়েও দিতে চায়। মানুষের তো জ্ঞান কম নয়। যত কিছু দার্শনিকজ্ঞানের উন্মেষ, সিদ্ধান্ত এমন কি তত্ত্ব অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিও এই মৃত্যুকে নিয়ে,—কারণ জন্মের চেয়ে মৃত্যুই বেশী রকম ভাবিয়ে তোলে মানুষের মন।

রাণীর মৃত্যুই আমায় ভাবিয়ে তুলেছিল, আর দুইভাবেই ভাবিয়েছিল। প্রথমতঃ সে যতদিন বেঁচেছিল বাপের বাড়িতেও দুঃখ পেয়েছে, শ্বশুরবাড়িতেও সুখী হতে পারে নি। তার জীবন হয়তো ওরই মধ্যে অল্প কিছুদিন স্বামীর ভালবাসায় সুখী হয়ে থাকবে, শাশুড়ী ননদ ভাল ছিল না, তার মুখেই শুনেছিলাম। নিরবচ্ছিন্ন দুঃখটাও আবার সম্ভব নয় একজনের জীবনে। তবে শেষ পর্যন্ত দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে মৃত্যুর মধ্যে সে একটা জীবনব্যাপী দুঃখ এড়াবার সুখ পেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু কি তার কাম্য ছিল? তার মৃত্যুটা নাটকীয় ভাবের বলেই একথা আমার বিশ্বাস হয় না যে স্বামীর মৃত্যু অবধারিত জানলেও দু বছরের সন্তানের প্রতি সকল মমতা ত্যাগ ক'রে, মৃত্যুর কোলে ঝাঁপ দিতে তার নিজের মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। স্বামী না থাকলেও এক সন্তানমমতাই এ ধরণীর ভালবাসায় বাঁধা থাকবার পক্ষে যথেষ্ট, সবার উপর নিজ জীবনের কত সম্ভাবনার টান তো আছেই মহৎ ঐ যৌবনকালে।

কাজেই এই নাটকীয় মৃত্যু এবং এর অনিবার্য ক্রমপরিণতিও একটা রহস্য।

দ্বিতীয় ভাবনাটি, অপর দিকে। সে নিজেই বলেছিল, ওঁর (অর্থাৎ স্বামীর) আগেই যাবো। মনে হয় তাহলে আগেই সে জানতে পেরেছিল যে, আসন্ন মৃত্যুর কোলে স্বামী, তার আগেই সে দেহত্যাগ করতে পারবে। তাহলে তার মৃত্যু—স্বামীর আগে যাবার প্রবল ইচ্ছাতেই কি সে ঘটাতে পারলে? তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে মৃত্যুর সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার প্রবল সম্বন্ধ আছে। আর যদি এমন হয় যে ঐ সময়ে নির্ধারিত মৃত্যুর কথা আগেই সে জানতে পেরেছিল মাত্র, আর তাইতেই সে আত্মসমর্পণ করেছিল। এর কোন্‌টা ঠিক? একজন কি প্রবল ইচ্ছার জোরে তার মৃত্যু সহজভাবে ঘটাতে পারে?

আমরা তো কেবল বাঁচবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করি যখনই মৃত্যুর সম্ভাবনা কল্পনায় দেখতে পাই। আর বেঁচেও যাই, যদিও সে বাঁচাতে জীবনে সুখী হয়তো হই না। আমরা মৃত্যুকে ভয় করি, বাঁচতেই ভালবাসি। সুখী হই না হই, জীবনে আমাদের আশা ও সম্ভাবনা থাকে সুখী হবার। দুঃখ কতটা গভীর হলে তবে সেই জীবনে বিতৃষ্ণা আসে আর মৃত্যুই হয় কাম্যবস্তু, এখন তা ভাবছিলাম। আমার একবার মনে হয়, নির্মম মৃত্যু, সে তার নিয়মেই আসে আমাদের জীবন থেকে পৃথক করতে, আমরা হয়তো কিছু আগে জানতে পারি মাত্র, তাতে আত্মসমর্পণ ছাড়া উপায় নেই কারণ সেটা অবশ্যম্ভাবী। আবার ভাবি তাই বা কেন, প্রবল ইচ্ছায় মৃত্যু মানুষেই ঘটাতে পারে, দেশকালের মধ্যে আমি ক্রিয়াশীল হয়ে আছি এই বোধটিই তো আমাদের জীবন? আর এখানে থাকতে চাই না, এর বাইরে যাবো দেশ আর কালের গণ্ডী ছাড়িয়ে, এর নামই তো মৃত্যু বা দেহত্যাগ? এর মধ্যে অকাল বা কাল বলে কোন কথাই তো নেই। এই রকম কত কথাই না মনের মধ্যে ভাবতে থাকি। মানুষের মৃত্যু দুর্জ্ঞেয়, প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে যখন আসে তখন আগে থাকতে জানতে পেরেই হোক বা না জেনেই হোক তাইতেই আত্মসমর্পণ

ছাড়া তাকে এড়াবার কোন পথই নেই। যদিও ইচ্ছা-মৃত্যুর রহস্য ভেদ হয় না,—তবুও মনের মধ্যে এটা অসম্ভব মনে ক'রে ছেড়ে দিতে পারি না, অবিশ্বাসও করতে পারিনা।

এই রকম যখন মনের অবস্থা—তখন একদিন পাড়ায় এক বাল্য সহপাঠীর বাড়িতে, তার বাবার পড়বার ঘরের টেবিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উপদেশ,—একখানি চটি বই দেখতে পাই। সেইখানে বসে বসেই পড়ে ফেললাম। তাঁর প্রথম কথাই হ'ল—সংসারী লোকের মন যেন পানাপুকুর, হাত দিয়ে এই পানা সরিয়ে দিলে, পরিষ্কার জল, তাতে চমৎকার সূর্য দেখা যাচ্ছে, আবার দেখতে দেখতে পানায় ঢেকে গেল ইত্যাদি। এই প্রথম আমার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয়। আগেই বলেছি, আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল,—সন্তানের পিতা হবার সম্ভাবনার কথা জানার সময় থেকে আরম্ভ। তারপর আমার প্রথম কন্যার জন্ম সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই যে ধাক্কা পেলাম, তাইতেই জীবন একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে গেল। আর প্রায় ঐ সময়েই—বিলাতি নভেলের উপর বিতৃষ্ণা আর দর্শনশাস্ত্র আলোচনার উপর প্রবল ঝোঁক এলো। প্রথমে, বাড়িতেই গোপনে—পাতঞ্জল, অনুবাদ ও টীকার সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করি। তখন অফিসের কাজও চলছে। ঐ সময়েই রাণীর মৃত্যুব্যাপার ঘটে গেল। তার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ বইখানি প্রথম পেলাম। তখন থেকেই তাঁর আরও কথা জানবার প্রবল তৃষ্ণা জেগে উঠল যার ফলে শ্রীম কথিত কথামৃত পেলাম। দীর্ঘকাল অন্নাভাবগ্রস্ত কেউ যখন পুনরায় অন্নের আস্বাদ পায় তখন যে লোলুপতা তাকে অধিকার করে, ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা আমার প্রাণে সেই লোলুপতাই জাগিয়েছিল।

এই গ্রন্থের এক জায়গায় দেখি মৃত্যু সম্বন্ধে অপূর্ব সমাধান আছে। তাইতেই রাণীর নাটকীয় মৃত্যুর সমাধান হয়ে গেল। ভূকৈলাসে এক সমাধিস্থ যোগীর কথা, মাটির তলায় তাঁকে পাওয়া

যায়। তাঁকে চেতন করতে নানাভাবে পীড়ন করা হয়, তাঁর সমাধি ভঙ্গ হ'ল বটে কিন্তু তার ফলে দেহত্যাগ হ'ল। তাইতেই ঠাকুর বলেছেন যে ছাঁচ তৈরি হয়ে গেলে আর খোলের দরকার কি, তাই খোলটা ভেঙে ফেলে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে জন্ম, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গেলে আর দেহ থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি? ঐ যোগীর সমাধিতে ইষ্টলাভ তো হয়েই গিয়েছিল তাই তিনি দেহত্যাগ করলেন,—সাধারণতঃ সমাধির পর দেহ থাকে না তবে তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছায় তাঁরই কর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে কারো কারো দেহ থাকে। সে কথা আলাদা।

তা হলে জন্ম ও মৃত্যু সম্বন্ধে আসলে এইটিই তো মনে হয় যে, জীব জন্মায় সেই ঈশ্বর বা প্রকৃতির ইচ্ছায়, তাঁরই কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, আর সেই উদ্দেশ্য বা কর্মটুকু শেষ হলেই তার শরীর বা জীবনে আর প্রয়োজন নেই। কাজেই সবার আয়ুকাল বা জীবনের ভোগকাল সমান নয়,—তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সফল করতে, মাত্র যেটুকু দরকার কেবল সেইটুকুই দেহের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। মৃত্যুর পক্ষে অকাল বা কাল আমাদের তুলনামূলক মনোধর্মের কথা। এইভাবেই তখন রাণীর অকালমৃত্যু রহস্যের সমাধান হ'ল সত্য কিন্তু এই মৃত্যুর মধ্যে মানুষের ইচ্ছারও একটা প্রবল হাত আছে—এটাও মন থেকে গেল না আমার। এ সম্বন্ধে যা ধারণা জন্মেছিল—আমার যৌবনের এক অভিজ্ঞতার ফলে হয়েছিল তা পরে বলবো, এখন একথা এই পর্যন্ত।

যতদিন একটা পাকা কাজের যোগাড় না হয় ততদিন যেমন শান্তি ছিল না আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর, অন্যদিকে যতদিন এই ধরনের নথিপত্র নকলের ঠিকে কাজে মাসে পঞ্চাশ ষাট আসছে ততদিন কোন পাকা কাজের জন্য বাবারও দুশ্চিন্তা নেই। ইতিমধ্যে দেখলাম দু'তিনটি পাকা কাজের জন্য বাইরের লোক বাহাল হ'ল, বাবাও দেখলেন কোন উচ্চবাচ্যই করলেন না। পারমানেন্ট পোস্টে প্রথম

পঁচিশ টাকায় ঢুকতে হয়, কাজেই ঠিকে কাজ ক'রে যারা বেশী উপার্জন করে তাদের এই লোভ ছাড়া শক্ত। আমি লিখি বটে কিন্তু উপার্জনটা বাবার, কাজেই আমার পাকা কাজের চেষ্টা অসম্ভব। নানা কারণেই আমার মধ্যে এই সব কাজে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব পুঞ্জীভূত হ'য়ে আসছিল, তাই আমার তরফ থেকে সাহস ক'রে এই নথি নকলের কাজ কমিয়ে তরজমার কাজে বেশী সময় দিতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। কাজ শেখা তো চলছিল আগে থেকেই, এখন থেকে রবিবার পর্যন্ত কাজ করতে যেতাম উকিলের বাড়ি।

জ্ঞানরঞ্জন চাটুয্যে নামে এক উকিলবাবুর কাছেই আমার তরজমার কাজ শেখা চলছিল। চাঁপাতলায় এক বাসায় সপরিবারে তিনি থাকতেন, প্রতি রবিবারেই আমায় সেখানে যেতে হ'ত। ঐ ওকালতির কাজ, তিনি মাঝে মাঝে গর্বের সঙ্গেই বলতেন,—বড় গোলমেলে ওসব আমার ভাল লাগে না, আমার এই কাজই ভাল লাগে, এতে যা হয়। আসলে ব্রিফলেস উকিল যারা, পেপার বুকের কাজ তারাই ক'রে থাকেন এ সত্য আদালতের পেয়াদারাও জানে। এক বিচিত্র প্রকৃতির লোকটি,—বাড়িতে এক রকম, আপিসে আর এক রকম। তাঁর কাজে লাগবার পর—কিছুদিন আমার শিক্ষানবিশি চলল। তারপর রীতিমতো কাজ আরম্ভ হ'ল। প্রথম দলিল তরজমা হয়ে গেলে—তিনি এপ্রুভ ক'রে মুরুব্বির মতো বললেন,—এর জন্য আর পয়সা পাবেন না, এখন তো আপনার প্রোবেশনারি পিরিয়ড। শুনে আমি বললাম, এর পর থেকে পাবো তো? তিনি বললেন,—হ্যাঁ, তা তো পেতেই পারেন। টাকার যে বড় খাকতি দেখছি।

মানুষটি দুর্মুখ, হাসতে হাসতেই আঘাত করেন। আমি কথা কইলাম না আর।

বাবা কিন্তু শুনে চটে গেলেন, বললেন, তরজমার প্রথম টাকাটা কেন তুমি ছেড়ে দিলে,—ছ'পাতা দলিল তরজমার অন্ততঃ পনেরো

টাকা পাওয়া যেত। যাই হোক, পরে ঐ ছ'আট পাতা দলিল তরজমা হয়ে গেলে দশ বারো টাকা পাওয়া যেতে লাগল; কিন্তু টাকা আদায় করা মুশকিল। তাছাড়া ক্রমে ক্রমে তাঁর ভব্যতালেশহীন অদ্ভুত আচরণ আমায় বিরক্ত ক'রে তুললে। বাড়িতে কাজ করতে গেলে তাঁর তখনকার ব্যবহারটা আত্মসম্মানে আঘাত করে। ওদিকে আবার ধর্মজ্ঞানও তাঁর উৎকট, আচার হিন্দু শাস্ত্রের উপর স্তরের। সন্ধ্যাপূজার সময়-অসময় বলে কিছুই নেই, 'যখনই প্রাণ চাইবে তখনই পূজা না ক'রে আমি খাই না',—গরিমাপূর্ণ বচন শুনতে হয়।

বেলা তখন দুটো কি আড়াইটে, এক টেবিলে বসে দুজনে কাজ করছি। হঠাৎ চীৎকার, ওই, এই, কে আছিস বটে, আমার আসন পেড়ে, পূজার জায়গা ক'রে দেগে উপর ঘরে। তারপর হাতের কাজ রেখে, তামাকের নল পাশে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে উপরে চলে গেলেন। পাঁচ-সাত মিনিট পরেই খুব ঘন ঘন ঘণ্টা নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সেটা থামলে আবার উচ্চস্বর শোনা গেল, ওই, ওরে, রঞ্জন, ঠাঁই ক'রে খাবার দিতে বল,—খিদে লেগেছে, খেয়েই বসবো গা। প্রতি রবিবার এই সব আমার দেখা ও শোনা, উপসংপদা ধর্মের অন্তর্গত।

গুড়গুড়ির নল মুখে কাজে বসলেন। আমার দলিলটার মধ্যে একটা গোলমেলে জায়গা বুঝে নেবার জন্য কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি সেটা হাতে ক'রে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই ওঁর। মিনিটখানেক দাঁড়াবার পর, এ জায়গাটা দেখুন না, বলে আমি দলিলটা রাখলাম। সেদিকে না চেয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে, আপনারা তোপসে মাছ-টাছ পান ওদিকে? বলেই একগাল হেসে নল টানতে লাগলেন। আমার উত্তর না পেয়ে নিজেই বলছেন, ওর যা মূল্য,—কেমন ক'রেই বা পাবেন এমন সময় একটা চ্যাঙাড়ীতে গোটাকতক ল্যাংড়া আম নিয়ে একজন ঢুকল। দেখেই মহা প্রফুল্ল হয়ে, ওরে, ওই, রঞ্জন, কে আছিস, মধ্যমবাবুর ওখান থেকে আম এসেছে, দেখচিস না,—

বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে একটা আম তুলে ঘ্রাণ নিয়ে, যেন বিজয়-গর্বে স্ফীত হয়ে উঠলেন,—বড় আম বটে, সেরা মাল বটে রে, নিয়ে যা ভিতরে, ওখানে দেখাগে। বলে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে মধ্যমবাবুর ভৃত্যের সঙ্গে মহা উৎসাহেই কুশল সংবাদ আদানপ্রদানে নিযুক্ত হলেন। আমি দাঁড়িয়েই আছি, লক্ষ্যই নেই। যে সকল পারিবারিক ব্যবহারের কথা তাঁদের প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল আমার মতো একজন বাইরের লোকের সামনে, তা শুনে অপ্রতিভ হয়ে আমি ঘর থেকে বাইরে গিয়ে বাঁচি। প্রায় আধঘণ্টা ঘরোয়া কথার পর—আমার ডাক পড়ল।

ভৃত্যকে বিদায় দেবার পর, আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি এইবার দলিলের জায়গাটা বুঝে নেবো বলে—তা প্রথমে মহা উল্লাসে আমায় তার সম্ভাষণই হ'ল, কেমন, এঁ্যা, আমগুলো দামী বটে? আচ্ছা আম, এঁ্যা? অনেকগুলো—অনেকগুলো—আমার উৎকট গম্ভীর মুখের ভাবটি নিরীক্ষণ ক'রে বোধ হয় সামলে বললেন,—কৈ আসুন তো দেখি।

বাড়িতে এই রকম, অফিসে আর এক রকম। ওঁর মুহুরী যে ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত গোবেচারা প্রকৃতির লোক, অফিসে যখনই তাঁকে দেখেছি ওঁর সঙ্গে কথায় ও ব্যবহারে ঠিক যেন সে কৃতদাস। না ধমকে কথাই নেই। লেখাপড়া-জানা মানুষ যে এ ভাবে আর একজন অনুগত লোকের উপর এমন ব্যবহার করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এক দিন জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি, এ রকম ব্যবহার সহ্য ক'রে আছেন কি ক'রে? তার উত্তর পেলাম এইরূপ,—ওঁরা হলেন জমিদার আমাদের, (বীরভূমেরই লোক) তাছাড়া মধ্যমবাবু, যিনি জজ, আমার ছেলের পড়াশুনার খরচপত্র দিচ্ছেন উনি অর্থাৎ বড়-বাবু, যাই হোক, জজ সাহেব আমাদের প্রতি সদয়। তিনি বলেন, উয়ার কথায় কিছু মনে করিস না। উনি পাগল।

আমার দুটি বৎসর কাজ চলেছিল। তখনকার ভাল ভাল কয়েকজনের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। তার মধ্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ মুখার্জি, শেষে গুরুদাসবাবুর জামাই শ্রীযুত মন্মথ মুখোপাধ্যায়, এদের সৎ ব্যবহার আমার চিরদিন মনে থাকবে। এদের কাছে অনেক কিছুই শিখেছি। বিপরীত ব্যবহারের জন্য দুজন, ঐ জ্ঞানবাবু একজন, অপর ভদ্রজনের নাম যদুনাথ মণ্ডল। তাঁর মূর্তিটির জন্য সবাই তাঁকে, আড়ালেই অবশ্য যদু মোড়ল বলে নির্দেশ করত। এমন কৃপণ জীবনে দেখি নি। বদমেজাজ আর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী স্বভাব ছিল তার। একটু সামান্য ভুল হ'লে বলত —বামনের ছেলে ঘণ্টা নাড়া শিখতে পার নি, সহজ হ'ত, এ কাজ ক'রে হবে কি ?

এইভাবেই কাজ আমার চলতে থাকে। যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠি তখন ওখান থেকে মিউজিয়ামে চলে যাই। মাঠ পেরিয়ে গেলেই মিউজিয়াম, একটি চমৎকার পিকচার গ্যালারী আছে পাশেই। এখন সে অংশটি মিউজিয়ামের সামিল হয়ে গেছে। তখন ওখানে দুটি বড় বড় হল-ভরা চমৎকার যে সকল বিলাতী ছবি ছিল সেগুলি অয়েল কলার ও ওয়াটার কলার আর্টের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও বর্তমান বা আধুনিক শিল্পী মুরিলো, গয়া, রেমব্রাঁ, র‍্যাফেল, দাভিঞ্চি, করেজিও প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের উৎকৃষ্ট নকল অনেকগুলি ছিল। তা ছাড়া ভালো ভালো ল্যাণ্ডস্কেপ এত ছিল যে, দিনের পর দিন মুগ্ধ হয়ে এইখানেই কাটিয়ে দিতাম। ওখান থেকে ফিরে আর অফিসে আসতে ইচ্ছা হ'ত না। চারটে বাজলে বন্ধ করাই নিয়ম শীতকালে, পাশেই আর্ট স্কুলেরও ছুটি হ'ত—ছেলেরা সব স্কুল থেকে বেরিয়ে আসত দেখতাম।

বাল্যাবস্থায় নানা কথায় আগেই বলেছি আমার মধ্যেও এক শিল্পীর মন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সেই ভাবের প্রবণতাও মধ্যে মধ্যে অনুভব করেছি। এখন থেকে অতি নিভৃত মনের কোণে আমার

মধ্যে এই কথারই তোলাপাড়া চলতে লাগল। শিল্পী বা চিত্রকর জীবনই সর্বোত্তম এবং মহৎ জীবন আর একথা মনে বিলক্ষণ আঘাত করত যে, আমি কখনও এই রকম কেরানী হয়ে জীবন-যাপন করতে জন্মগ্রহণ করি নি। ক্রমে ক্রমে অন্তর-ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্যই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'ত, তারপর একটা প্রবল ঝড়ঝাপটার পর এটা প্রত্যয়ের পর্যায়ে এসে পড়ল। এইভাবে কর্ম—এখনই আরম্ভ করবার সুবিধা দেখা গেল না বটে, কারণ এটা কার্যকরী করতে গেলে এখনই একটা অনর্থ উপস্থিত হবে,—বাবা কঠিন হয়ে উঠবেন, একটা সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই বিধাতার বিধানে আর একটি অঘটন উপলক্ষ্যে তা ঘটে গেল।

একে তো একটি মেয়ে হয়েছে, তারপর এক বৎসর উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই আবার সন্তান-সম্ভাবনার কথাও শুনেছি, তখন থেকে আমার জীবন-ভবিষ্যৎ এক কঠিন দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনায় এবং বর্তমান এই অনিশ্চিত কর্মক্ষেত্র আগাগোড়া অশান্তিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে যখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, মনের শান্তি এমনভাবে ব্যাহত হতে আরম্ভ হ'ল যে বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছা হ'ত না, যেন পাগলের মতো অবস্থা, ছটফট করতে থাকি। ঐ সময়েই একদিন শ্বশুর মহাশয়ের বইএর আলমারীতে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের বিখ্যাত মহাভারত আঠারো পর্ব সম্পূর্ণ, প্রথম প্রথম সংস্করণে যেমনটি বেরিয়েছিল—সংগ্রহ করা আছে দেখলাম। তারপর সেগুলি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করি। এই মহাভারত প্রথমবার,—অফিসের ঐ কাজের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে পড়তে প্রায় তিনমাস লাগে, এই তিন মাস আমার যে কোথা দিয়ে কেটেছিল মনে নেই। রামায়ণ মহাভারতের কথা আমরা শিশুকাল থেকেই শুনে থাকি। আমার মনে কল্পনায় একটি অতীতের মহান স্মৃতি ভেসে উঠত যেন আমি ঐ সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। তারপর যখন সত্য সত্যই ঐ আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস অধ্যয়নের সুযোগ ঘটল, তখনই যথার্থ পরিচয় ঘটল আমাদের জাতীয়

জীবনের আদর্শের সঙ্গে। সে পরিচয় যেন আমার ব্যক্তিত্বকে বহুগুণে পুষ্ট ক'রে আমাদের সংস্কৃতির মূলতত্ত্বটি স্মৃতির সঙ্গে এক হয়ে আবার আমায় শক্তিতে বলবান ক'রে তুললে। আমার এই জীবন জাতীয় পুণ্যের ফলেই হয়েছে এ ধারণা আমার বদ্ধমূল হয়ে গেল, আমার জীবন সার্থক হবে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল—তাই থেকে এলো সাহিত্যের প্রেরণা, আকর্ষণ, ভাষার সঙ্গে মনোবল, জীবনের উপর ভাষার প্রভাববোধ। এই মহাভারত পড়ার ফলেই আমার বিচ্ছিন্ন, উৎপীড়িত জীবন আত্মবিকাশে বলবান হয়ে উঠল। মহাভারত একটি প্রবল শক্তি। তারপর পূজার ছুটি পড়ল। আমার জীবনের পরিবর্তন সম্পূর্ণ হ'ল ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে।

এবার দুর্গাপূজা মামাদের পালা। কথা হ'ল মায়ের শরীর খারাপ বলে তিনি যাবেন না, আমিই কেবল যাবো। মিনাকে তো তাঁরা পল্লীগ্রামে পাঠাবেন না, তাই আমার যাবার আগে তাকে আনা হ'ল আমাদের বাড়িতে। যখন দেখা হ'ল আমার সঙ্গে, মেয়েটিকে কোলে ক'রে বসল সে মা হয়ে। বসে, তখন আমার সঙ্গে যে ভাবে কথা আরম্ভ করলে, দেখলাম, তার শরীরও যেমন, মনটিও তেমনি অসুস্থ, নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে পড়েছে। আমায় লক্ষ্য ক'রে প্রথমেই সে বললে, তোমার যেন মনটা আগেকার মতো নেই, তুমি অনেকটাই বদলে গেছ। মনে মনে স্বীকার করলাম তার কথা, কিন্তু কিছু না বলে চুপ ক'রে আছি। তখন সে বললে, আচ্ছা, সত্যি কিনা বলত, আমার উপর আর তোমার কিছুমাত্র টান আছে? কথাটা আমায় অবাক করলে এই ভেবে যে আমার একটা পরিবর্তন এসেছে সত্য, তাতে ভালবাসা কমে নি, কেবল শরীর নিয়ে যে একটা প্রবল আকর্ষণ সেইটাই কমেছে এই কথাটা তাকে কি ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারি—সেই কথাটাই ভাবছি, সে তা বুঝলে না, তার ধৈর্যও রইল না,—দেখলাম আমার কোন কথাই খাটবে না, কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাসের কথাই সে আজ বলবে। এমনই তার ভাবটা এবং উত্তর

উত্তর সে বড়ই কঠিন কথা বলতে লাগল। দেখলাম, আমার কাজকর্মের অবস্থা, বর্তমানে যে দ্বন্দ্বময় অনিশ্চিত জীবন, তার মধ্যে একটা নৈরাশ্য এনেছে। তার উপর তার নিজের শরীর ভাল নয়। আমি তাকে বললাম,—তুমি এতটা দমে গেছ কেন বলত? আমাদের এই তো জীবন শুরু হয়েছে এর মধ্যে—। বাধা দিয়ে সে বলে উঠল,—তুমি যাইই বলো না কেন, আমিই তোমার পথের কাঁটা তোমার উন্নতির পথে প্রধান বাধা। এ পর্যন্ত বলে একটু থেমে নির্ঘাত বজ্র হানলে এই কথায়,—আমি মলেই তুমি বাঁচো।

আমার মেয়েটির বয়স যখন পূর্ণ এক বৎসর হয় নি তখন আবার সন্তান সম্ভাবনার খবর যখন থেকে পিসিরা পেয়েছেন তখন থেকে আমার উপরেই আক্রোশটা বেড়ে গেল, কিন্তু আমি তাদের হাতের বাইরে, তাদের সেই প্রচণ্ড আক্রোশের আঘাতটা গিয়ে পড়ল মিনার উপর, কারণ সে ছিল অন্দর মহলে তাদেরই হাতের মধ্যে। সে আঘাত বড়ই বিষম তার পক্ষে। আমার নাম দিয়ে, যেন আমিই পিসিদের কাছে বলেছি যে, এবার যদি মেয়ে হয় তাহলে আমি তার না কি মুখ দেখবো না। পিসিদের সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা কোন কালেই ছিল না, তাদের সঙ্গে কথাই নেই। আমার পক্ষে একথাটা বলা কতটা অস্বাভাবিক তা মিনা ভাল জানত কিন্তু তার মনের সঙ্গে শরীরের অবস্থাও ভাল ছিল না। সে পিসিদের ঐ কথাটা যেন সত্যিই আমার মুখের কথা বলেই বিশ্বাস ক'রে যে অশান্তি ভোগ করছে তা ভগবানই জানেন। এই সব কথা তারই ফল। পিসিদের বাক্যবাণের বিরুদ্ধে কখনও আমায় বলে নি, ঘটনাচক্রে আমার ভগিনী উমাশশীর মুখে শুনেছিলাম অনেকদিন পর। যাই হোক এখন ভাবছিলাম কত কি।

এমন ভয়ানক কথাটা তার মুখ থেকে কি ক'রে যে বেরিয়ে আসতে পারে এবং মনের কোন অবস্থায় এটা সম্ভব তাই ভাবছি। সে ছিল চির আশাবাদী। প্রথম সন্তান মেয়ে হওয়া তাকে কতকটা

মনঃপীড়া দিয়েছিল। আমার শাশুড়ী পুনঃপুনঃ তাকে শুনিয়েছিলেন, ও মা, কোথায় প্রথমে একটি ছেলে হবে, সবাই কত আশা ক'রে আছি তা নয়, পোড়া বিধাতার কি বিচার, প্রথমেই একটি মেয়ে দিতে হয় কি? ইত্যাদি। অবশ্য নাতনীর প্রতি তাঁর স্নেহমমতা মনে হয় কম ছিল না, কিন্তু তাঁর মনে যেটা সাধ, মনের আশা তা জোর গলায় প্রকাশ না ক'রে থাকাটা তাঁর পক্ষে অসম্ভব—তার ফলে মিনার মনে যাই হোক না কেন। তার পর—এক বৎসর যেতে না যেতেই পুনরায় সন্তান-সম্ভাবনার কথাটা কর্তা-গিন্নি উভয়কেই চিন্তিত ক'রে তুলেছিল মেয়ের দুর্বল শরীরের জন্য। কাজেই যত কিছু অপরাধ সবই আমার। আশ্চর্য আমাদের সামাজিক এবং পারিবারিক গার্হস্থ্য জীবনের মহিমা, ঠাকুর্দার বাড়িতে পোষা মেয়ে, আমার পিসিগুলির বিচারে যত অপরাধ মিনার, আর শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ীর কাছে যত অপরাধ আমার। সুতরাং মাঝখান থেকে শ্বশুরমশাইকে মেয়ের দুর্বল স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবেই ভাবিয়ে তুললে। কাজেই আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা তাকে তার মায়ের মুখ থেকে শুনতে হ'ত তা নিশ্চয়ই তার আশা-ভরসার অনুকূল নয়। বুঝলাম, সব কিছু মিলিয়েই তার এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে যা থেকে উদ্ধারের কোন উপায় নেই।

আমার এখন বয়স উনিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নি। ১৯০৪ সালের সেপ্টেম্বর, বিচিত্র ব্যাপার এই যে আমার অবস্থাও তার চেয়ে কম শোচনীয় নয়। উপার্জন আমি করি না তা নয়, তবে তার এক পয়সাও আমার হাতে পড়ে না, প্রয়োজন মতো মোটা কাপড়, জামা, জুতো নিতান্তই না হলে নয় যেটি, সেইটুকু মাত্র প্রাপ্য। আজ প্রায় চার বৎসর আমি বিবাহিত, এখন আমি সন্তানের পিতা, আমার যে পয়সায় দরকার থাকতে পারে এ কথা যেন বাবা লক্ষ্যই করেন না। পয়সা হাতে পড়লে স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে, এই অজুহাত একদিন শুনেছিলাম তাঁর মুখে, যখন পিসিরা তাঁকে

ধরেছিল, ওকে এখন কিছু কিছু পয়সা দাও না কেন ছোড়দা. ওরও তো খরচ করতে ইচ্ছে হয়? তার উত্তরে ঐ কথা।

যাই হোক এখন মিনার মুখে আজ যে কথা শুনলাম তাতে এই বুঝলাম যেন আমাদের দাম্পত্য জীবনে আর সুখের আশা নেই এই ধারণাই তার হয়েছে,—আর আমার অক্ষমতাই তার জন্য দায়ী। যে কয়দিন ছিল প্রত্যেক দিনই তার সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিচয় পেয়েছি—যেন সে মানুষই নয়।

আমাদের বাড়িতে তার আসবার দ্বিতীয় দিনের কথা। দুপুর বেলা যখন সবাই শান্ত তখন ঘরে এসেছি তার কাছে। সে আশা করেছিল আমাকে। আমাদের এই যে প্রথম সন্তানটি, বেশ ফুটফুটে সুন্দর হয়েছে দেখতে, তার কোলে রয়েছে, ব'সে ব'সে আমি বার বার দেখছি। আবার তার ঐ শিশুটিকে আদর করবার বিচিত্র ধরণটিও দেখছি। সে এমনভাবে আদর করছে দেখলে মনে হয় যেন, ওদের ঐ মাতৃত্ব স্বভাবসিদ্ধ অধিকারের জোরে স্বয়ংক্রিয়। ঘনিষ্ঠতা তাদের মধ্যে এমনই নিবিড়, একজন ষোড়শী মা, অপর জন সাত-আট মাসের কোমল শিশু, মধ্যে আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। আমার সামনেই সে আদর করছে, নানা রকমে তাকে নাড়াচাড়া ক'রে। কতকগুলি শব্দ, তার কোন অর্থ নেই কিন্তু ভাব আছে প্রচুর তার স্বপক্ষে, তাই হ'ল আদরের ভাষা। আমি উপভোগ করছিলাম প্রচুর—এমনই অবস্থায়, খুকীকে সে তুলে নাচাতে নাচাতে এনে ঝপ্ ক'রে আমার কোলে ফেলে দিয়ে হেসে উঠল যেন আমায় খুব জব্দ করেছে এবার। আমি সসঙ্কোচে বললাম, কর কি ঐ কচি শরীর, ওর লাগবে যে। আস্তে আস্তে তাকে তুলে, যাতে না লাগে এমনভাবে কোলে নিলাম, তাতেও অস্বস্তি বোধ হতে লাগল, বোধ হয় ওর কোথাও লাগল, বোধ হয় ওর কোথাও লাগছে। এইভাবে, ঠিক যে ভাবে,বাগিয়ে নিলে সে আরাম পায় কিছুতেই আর সেটা পারছি না

দেখে,—নাঃ তোমার কর্ম নয়, তুমি একটু ভাল ক'রে নিতেই জান না, বলে আমাকে বেশ এক চোট বকে নিলে।

আচ্ছা, তোমরা কি বল দিকি ; এমন পুতুলের মতো আমাদের এই খুকী, একে কোলে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছা হয় না ? বলে সে তারপর অতি সহজেই তাকে তুলে নিয়েই নিজের গালে তার গালটি রেখে, তার সঙ্গে কথা আরম্ভ ক'রে দিলে। তারপর তাকে নাচাতে নাচাতে,—দেখ খুকী, সে যেন কতই বোঝে এমনভাবে কথা বলে চলল,—তোর বাবা ঐ যে বাবা, বেটা ছেলে, কঠোর প্রকৃতি কিনা, তাই তোকে আদর করতে জানে না, শিশু বলে ছুঁতেই চায় না। তোর সঙ্গে কথা কয় না, মনে করে তুই কিচ্ছুই বুঝিস না। আচ্ছা খুকী তুই যে সব বুঝিস এটা বুঝিয়ে দিতে পারিস ? হাঁ, তুই পারিস, নিশ্চয়ই পারিস। বললাম, ঐ ছ'মাসের মেয়ে ও কি কথা বুঝতে পারে ? তৎক্ষণাৎ উত্তর হ'ল, হাঁ ঠিক পারে, নিশ্চয়ই পারে দেখবে ও আদর-অনাদর বোঝে কি না ? বলেই তাকে কোল থেকে নামিয়ে মাদুরের উপর দিলে শুইয়ে। খুকি প্রথমে যেন অবাক, তারপর মাথাটি একবার এদিক ওদিক, তারপর স্পষ্টই কান্না লাগিয়ে দিল—হাত পা নেড়ে। দেখলে, ও আবার বোঝে না, ও সব বোঝে, এই বলে তাকে কোলে নিয়ে চুম্বনে স্থির ক'রে দিল। তারপর—তোকে নামিয়ে দেওয়ার জরিমানা এটা, না খুকি ?—বলে আবার খুকির গালে চুম্বন দিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, খুকি সব কিছু বোঝে।

আসলে খুকীকে পেয়ে সে খুব খুসী হয়েছিল,—নিজেই তার নাম দিয়েছিল নলিনী। আমার দেওয়া ভবানী নাম সে পছন্দ করে নি। মেয়েকে শিক্ষিত করতে হবে, বেথুন কলেজে পড়াবে—তাকে পাশ করিয়ে একেবারে আধুনিক মেয়ে তৈরি ক'রে তার মাকে অর্থাৎ আমার শাশুড়ী অর্থাৎ খুকির দিদিমাকে অবাক ক'রে দেবে। যেহেতু তিনি সেকেলে মানুষ, কলিকালের মেয়েদের পছন্দ করেন না।

ইতিমধ্যে একরাত্রে আমার কাছে খুকিকে রেখে, বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেল। মধ্যে গভীর রাতে একবার শিশুও কান্না আরম্ভ করলে। অবশ্য তাকে শান্ত করা গেল। থিয়েটার থেকে ফিরলে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটি ফেলে কি বলে তুমি থিয়েটার দেখতে গেলে? সে বললে, সঙ্গে নিয়ে গেলে যে অবস্থা হয় তাতো দেখেছি, তার চেয়ে রেখে যাওয়াই ভাল। তোমার ঘুমের একটু ব্যঘাত হ'ল বটে কিন্তু দর্শকদের শান্তিভঙ্গ হয় নি মেয়ের কান্নায়—তাতে তুমি তাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী হয়েছ। তার কথা এই ভাবেরই ছিল। কোন কথার উত্তর দিতে তার ভেবে নেবার দরকার হ'ত না। এমন পরিষ্কার উত্তর দেবার রীতি ছিল তার।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়ে যেদিন পিত্রালয়ে গেল, সেদিন আবার এমন কতকগুলি কথা বলে গেল, যাতে এই কয়দিনের আনন্দ নিরানন্দেই শেষ হ'ল। সে বলে কি—সেদিন এসে এখানে তোমায় অনেক কিছু বলেছি,—তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, কিছু মনে করো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—মনে মনে তুমি ঐ সব ভাবো নি আগে? সে বলে যে, ভাবি তো আকাশ-পাতাল কত কি, তোমার কাছে যখন না থাকি,—কিন্তু তোমার কাছে এলে একেবারে সব কোথায় যে চলে যায়, কিছুই ভেবে পাই নি। এই যে যাচ্ছি, আবার হয়তো ঐ সবই আবার ভাবতে থাকব। মা এক একটি ফেকড়া বার করবেন, আমি তাই নিয়েই তোলাপাড়া করব। তাতে তোমার দোষ কি? বলতে বলতে তার চোখে জল ঝরঝর করতে লাগল, আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে সে আবার বলতে লাগল,—হয়তো তোমার এরকম অবস্থা কখনই থাকবে না, তোমার ভাল হবে, তুমি সেই রকমই হবে যেমন আমার মা চাইছেন কিন্তু আমি হয়তো তা দেখতে পাব না।

এমন ভালয় আমার সুখ কি তা যদি তোমার ভোগে না লাগে?

তুমি আজ যাবার সময় কেন এমন কথা বললে? আমাকে আবার আঘাত দিতেই কি ঐ কথা বলছ?

না না—না—বলে, আমার হাতটা নিয়ে তার গলায় জড়িয়ে দুহাত দিয়ে ধরে রইল, তারপর বললে, আমায় মাপ করো।

আমি বললাম, আমার দ্বারা তুমি জীবনে সুখী হবে, অন্তত আমি কখনও তোমার সুখী করতে পারব এ আশা কি তোমার সত্যই নেই। আমার কিন্তু সেটা পুরোপুরিই আছে। উত্তরে, সে আমার বুকের উপর মুখখানি রেখে বললে, বিশ্বাস করবে আমার কথা? তোমকে কাছে পাওয়া ছাড়া অন্য কোন সুখের আশা আমি করি নি, অন্য কোন সুখের কল্পনাও করি নি। সাংসারিক জীবনে বিলাসিতা বাহুল্য, গয়না-গাঁটি, সোনা-দানা হবে তবে সুখ হবে ও সব মা বোঝেন, আমার ভিতরে ও সব ঢোকে না। আলোচনা করতেও ভাল লাগে না। বরাতই মন্দ তোমার সঙ্গে কখনও পূর্ণ একমাস একত্র থাকতে পাই নি, এর চেয়ে বড় দুঃখ আমার আর নেই।

এই দেখাশুনার পর যখন লক্ষ্মীকান্তপুরে গেলাম তখন কল্পারম্ভের চারদিন মাত্র আছে। মামাদের প্রতিপদে কল্পারম্ভ। বোধন থেকেই একটা আবির্ভাব হয়, যতবার গিয়েছি এ আমি অনুভব করেছি। দেখতে দেখতে সপ্তমী এসে পড়ল। আমি মহাপূজার কর্মীগণের অন্যতম। পুষ্প সংগ্রহ আর শ্বেত ও রক্ত চন্দন প্রস্তুত আমার কাজ ছিল। তারপর ভোগ নিয়ে আসা ও যথাস্থানে রাখা ইত্যাদি। বেশ প্রফুল্ল মনেই ছিলাম। মহাষ্টমীর দিন বৈকালে শ্বশুর মহাশয়ের লেখা একখানি পোস্টকার্ডে সমাচার পেলাম যে আমার একটি কন্যা হয়েছে, মিনার শরীর অত্যন্ত দুর্বল। শিশু ভাল আছে এবারেও মেয়ে হয়েছে এটা ভগবৎ ইচ্ছা জেনে আমি যেন মনে কোন উদ্বেগ ভোগ না করি তাই তিনি আমায় আশ্বাস দিয়েছেন।

কি জানি, মনে কেমন একটা আঘাত পেলাম। সেটা দ্বিতীয়-বারেও মেয়ে হয়েছে বলে কিংবা মিনার শরীরের কথা ভেবে অথবা দুটি কারণেই তা বুঝতে পারি নি। যাই হোক দুর্গাপূজা হয়ে গেল, কয়েকদিন পরে কোজাগরী পূর্ণিমাতে লক্ষ্মীপূজাও হয়ে গেল। তারও প্রায় এক সপ্তাহ পরে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে এক খবর এল যে মা ভয়ঙ্কর পীড়িত, সেই সঙ্গে আমার তৃতীয় সহোদরাও টাইফয়েড রোগে শয্যাশায়ী। মায়ের ক্রমশ জ্ঞান লোপ হয়ে আসছে কেবল দিদিমাকে দেখতে চাইছেন। তাই আমাকে ও দিদিমাকে নিয়ে মামারা কেউ যেন পত্রপাঠ মাত্র চলে আসেন, বাবা এই কথা লিখেছেন। এ সংবাদের পর তাড়াহুড়ো পড়ে গেল দিদিমাকে নিয়ে যাবার জন্য। যাই হোক পরদিন আমরা যখন বাড়িতে পৌঁছে গেলাম তখন বেলা ন'টা। গিয়ে শুনলাম আজ একজন বড় ডাক্তার আসবে বেলা বারোটার সময়। দেখলাম মা একেবারে বিছানার সঙ্গে মিশে রয়েছেন। দিদিমাকে দেখে তাঁর মুখখানি উজ্জল হয়ে উঠল। আমায় দেখেই আমার ঠাণ্ডা ডান হাতখানি নিয়ে কপালে, চোখে অনেকক্ষণ চেপে রাখলেন। এখন মায়ের সেবায় লেগে গেলাম।

রাত্রে যখন খাওয়া শেষ হ'ল বাবার বিছানায় গিয়ে বসেছি তখন আমার মেজ ভাই, ডাকনাম ছিল হাবু, সে আমার কাছে বসেই কথা কইছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—হাবু, আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে কোন খবর পেয়েছ, তোমার বৌদি কেমন আছে জানো? সে বললে,—কোজগরী পূর্ণিমার রাত্রে বৌদি মারা গেছেন।

বাইশ

মিনার মৃত্যু। সূতিকাগারে বারো দিনের একটি মেয়ে রেখে, কোজগরী পূর্ণিমার স্মরণীয় রাত্রে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে এই সংসারের সঙ্গে তার চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলে। তারপর হাবুর মুখেই তার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কথাও শুনলাম। সেই রাত্রে জোড়াসাঁকো থেকে শ্বশুর মশাই,—আমাদের বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিলেন তাতে জেঠামশাই আমাদের বাড়ির ছেলেদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই রাত্রে শ্মশানের কাজ শেষ ক'রে পরদিন প্রভাতে তাঁরা ফিরে আসেন।

স্তব্ধ বিস্ময়ে এক অদ্ভুত মনোভাবে আবিষ্ট হয়ে খবর শুনলাম। চোখের জল এক কোঁটাও পড়ে নি,—কেবল এইটুকুই বুঝলাম যে বুকের মধ্যে একটা প্রবল ওলট-পালট চলতে লাগল, চোখে জল এল না, তাতে আমি আশ্চর্য হই নি, কারণ আমি জানতাম ঠাকুর্দা-মশাইয়ের গভীর শোক আমাকে প্রথমে কাঁদায় নি, অমন তিন চারদিন ছিলাম। এখন এই কথাই কেবল মনে আঘাত করতে লাগল আমার—এ কি হয়ে গেল? এমনভাবে হঠাৎ মৃত্যু, আমার আগোচরে, এ কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? মনে আবার এ ভাবনাও হতে থাকল যে, ঠিক যে সময় সে কলকাতায় মারা গিয়েছে আমি তখন কোথায়, কি ভাবে, কি কাজে ছিলাম, মনটা আমার কি করছিল?

এই তো সেইদিন, লক্ষ্মীকান্তপুরে, মামাদের পূজার পালায়,—প্রতিপদী কল্পারম্ভ—অর্থাৎ প্রতিপদের সেই বোধনের দিন থেকেই পুরোহিতের সঙ্গে, তাঁর সকল কাজের সহায়তায় লেগেছিলাম।

একটি অনির্বচনীয় তন্ময়তা, আমায় যেন এক নির্বাক শক্তির সাহায্যে সকল কাজ করিয়ে নিয়ে প্রতিক্ষণের অস্তিত্ব সার্থক করেছিল। নিত্যই চণ্ডীপাঠের ধ্বনি, পুরোহিত মহাশয়ের মুখে, তার সুর ও ছন্দ, আমার মধ্যে যে আনন্দময় আলোড়ন, নির্মল শান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তা জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা। এইভাবে পূজার মধ্যেই আমার দ্বিতীয় কন্যার আবির্ভাবের সংবাদ শ্বশুরমহাশয়ের পত্রে জানলাম। তাতে অতি সামান্যকাল বিক্ষেপ, দুটি মেয়ে হ'ল, আমার এই আঠারো উনিশ বৎসর বয়সে,—এই রকমের কত কিছু ঢেউ তুলেছিল, কিন্তু তা অল্পক্ষণেরই জন্য, তারপর আবার ডুবে গেলাম পূজার কাজে। তারপর মহাপূজা হ'ল শেষ —এল লক্ষ্মীপূজা, ঐ কোজগরী পূর্ণিমার রাত্রে। ওখানে রাত্রি জাগরণের ব্যাপার ছিল, একদল তাস-পাশা নিয়ে কাটালে, আমি কোন দলের মধ্যে গেলাম না,—মনে কোন প্রকার উদ্বেগ, অশান্তি কিছুই ছিল না। কি ভাবে ছিলাম ঠিক মনে নেই—যখন জোড়সাঁকোর পিত্রালয়ে তার দেহত্যাগ ঘটল, হয়তো তখন আমি ঘুমিয়ে। স্বপ্নশূন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূতই ছিলাম, কিছুই জানি না, বিধাতা আমার জীবন-কাণ্ডে এক গভীর সমস্যার সমাধান ক'রে রেখেছেন প্রিয়তমার অকালমৃত্যু উপলক্ষ্য ক'রে। দুর্ঘটনার এই নিদারুণ সংবাদ কেউ আমায় দেয় নি। তার কিছুদিন বাদে টাইফয়েড আক্রমণে মায়ের জীবন সংশয়ের কথা এবং দিদিমাকে নিয়ে শীঘ্র কলকাতা যাবার তাগিদ এল পত্রে, সেই সঙ্গে আমার ফিরে আসবার কথাও ছিল, এ যোগাযোগও অদ্ভুত। তারপর এই আঘাত।

জীবনের এই গুরুতর আঘাত,—ঠাকুরদাদামশাইয়ের মৃত্যুর আঘাত যদি গুরু হয়ে থাকে তাহলে এটি নিশ্চয়ই গুরুতর। এ আঘাতের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রচুর, যার ফলে এই বয়সে আমার জীবন ওলট-পালট হয়ে গেল। এই বিয়োগের যে প্রভাব আমার জীবনে দীর্ঘকাল চলেছিল সেই প্রভাবটি আগাগোড়া সৎভাবেরই, আর

তাকে কেন্দ্র ক'রেই একটা ক্রিয়াও আরম্ভ হয়ে গেল্। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় ছিল যে এই মৃত্যুতে তাকে যেন আমি জীবন্তভাবেই আমার মধ্যে পেলাম—এমন গভীরভাবে তাকে আমি আগে কখনও পাই নি। অবাধ এ পাওয়া। হৃদয়ের মধ্যে যেন বল হয়েই সে রইল।

জানতাম, আমাদের বাড়িতে এসে রীতিমতো শ্বশুর-ঘর করতে পায় নি সে, যে কয়বার অল্পদিনের জন্য এসেছে হয়তো তাতে ও সুখী হয় নি, কিন্তু সে তা গ্রাহ্যও করে নি। এখন আমার মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে,—সে আমাকে যেমনটি দেখতে চেয়েছিল, আমার যে অবস্থা হলে সে সুখী হ'ত, ঠিক তেমনটি যতদিন না হতে পারি ততদিন আমার নিষ্কৃতি নেই তার জীবন্ত স্মৃতিময় পরশ থেকে। আর, সেই পথের সহায়, সাহস ও বিশ্বাস হয়েই সে রইল আমার মধ্যে। কিন্তু এই যে এতটা অনুভূতি, তার মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবে যে সম্বন্ধটা ঘনীভূত এবং অন্তরে উন্নত ক'রে তুলেছিল তা, সত্য বলতে কি, বুঝতে এবং ধারণা করতে কিছুদিন গেল,—এত দ্রুত ঘটে নি এখন যেভাবে দ্রুত লিখতে পেরেছি। এখন মায়ের কথা একটু আছে।

এদিকে মায়ের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, বিশেষত সম্প্রতি ডাক্তার উদ্বেগ প্রকাশ করতে যখন আরম্ভ করলেন,—বাবা তো একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়লেন। শুনলাম, তিনি কান্না আরম্ভ করেছিলেন পিসিদের কাছে। তারপর দিদিমা যখন এসে উপস্থিত হলেন, বাড়ির সবাই যেন একটা ভরসা পেয়ে গেল। দিদিমা একেবারে সোজা গিয়ে মায়ের মাথার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন, তারপর তপ্ত কপালে হাত দিয়ে বললেন,—ভয় কি মা! তুমি এবার সেরে যাবে, মা কালী রক্ষা করবেন।

আশ্চর্য ব্যাপার, পরদিন প্রভাত থেকে মায়ের অবস্থা বদলে গেল। ন'টার সময় ডাক্তার এলেন, পরীক্ষা ক'রে বললেন, আশ্চর্য

পরিবর্তন দেখছি যে। সেইদিন থেকেই মায়ের পীড়া আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলল। দিদিমা আসার পর থেকে তিনি সেই যে মায়ের বিছানার পাশে বসলেন, এক ডাক্তার ছাড়া আর কাকেও রোগীর অঙ্গ স্পর্শ করতে দেন নি। এইভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই মায়ের জ্বর সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি এত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল তা স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে ঠিক দু'মাস লাগল। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি পথ্য পেয়েছিলেন, তার পরেই মৃণালিনীর মৃত্যু সংবাদ মাকে জানানো হ'ল। শুনে তিনি নীরবে কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জন করলেন। আমার ডান হাতখানি ধরে কেবল মাত্র এই কথা বললেন, তুই যেন এখন কোথাও যাস নি। আমি স্বীকার করলাম এখন কোথাও যাবো না। এইভাবে প্রায় একপক্ষ কেটে গেল। মা যখন ওঠা-বসা করতে পারেন, বল পেয়েছেন দিদিমা তাঁকে লক্ষ্মীকান্তপুরে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলেন। —বললেন, সেখানে গেলে খুব শীঘ্রই সেরে উঠবে। ঠিক হয়ে গেল সব, বাবাও বিনা প্রতিবাদেই রাজী হয়ে গেলেন। দিদিমার উপর তাঁর শ্রদ্ধা শত গুণ বেড়েছে মায়ের এই রোগমুক্তির সূত্রে। আগামী সপ্তাহে দিন ঠিক হয়ে গেল, বড় মামা সবাইকে নিয়ে যাবেন। মা আমায় ধরে বসলেন,—তুই চ, আমার সঙ্গে, অফিস থাক এখন, পরে হবে। রাজী হলাম।

কয়েকদিন আগের কথা বলছি, কিভাবে সেদিন হঠাৎ বিকাল বেলার একটা চিন্তা আমাকে অশান্ত ক'রে তুললে। সেটা এই যে, —আমার সম্বন্ধে মিনার শেষ কথা কিছু আছে কিনা, এবং যদি থাকে সেটা কেমন ক'রে জানা যায়। আমাকে কি তার কিছুই বলবার ছিল না? আমি রইলাম কোথায়, সে রইল কোথায়। সত্য সত্যই আমার অনুপস্থিতিতে তার স্মৃতি থেকে আমার কথা লুপ্ত হয়েছিল একি সম্ভব? এই সব ভাবতে ভাবতে এমন একটা ছট্‌ফটানি আরম্ভ হ'ল বাড়িতে আর থাকতে পারলাম না। জোড়াসাঁকোর

দিকে ছুটলাম। তাদের সেই পুরোনো চাকর টোড়িরামের সঙ্গে যদি দেখা হয়। সে বেচারা আমাদের প্রেমপত্র আদান-প্রদানে সহায় ছিল। তার মুখে সব শুনবো বলে ঐ অঞ্চলে ঘুরে ফিরে ফুটপাথে বেড়াতে সুরু করলাম—কখন সে বাইরে আসবে সেই সুযোগের প্রতীক্ষায়। সন্ধ্যার কিছু আগে পর্যন্ত তাদের গলিটার সামনেই, বড় রাস্তার ফুটপাতে ঘুরে ফিরে কাটালাম। বড় রাস্তা থেকেই তাদের এগার নম্বর বাড়ী সহজেই দেখা যায়,—যেহেতু সেটা সরু ঐ গলির মধ্যে, দ্বিতীয় বাড়ীটি। প্রায় এক ঘণ্টার পরে দেখি টোড়িরাম বেরিয়ে আসছে ঘরের কোন কাজে, বড় রাস্তায় পা দিতেই আমি তার হাতখানা ধরে ফেরলাম। তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলেছে।

আমায় দেখতে পেয়েই সে বলে উঠলো,—জামাইবাবু ?

হ্যাঁ তুমি একটু এদিকে এসো, একটু কথা আছে।

কাছেই দাঁয়েদের গলির মধ্যে তাকে নিয়ে গেলাম—নিরালয় একটি বাড়ির র'কে বসে কথা সুরু করলাম। সে সব কথাই বললে।

আমি মামার বাড়ীতে যাওয়ার পর থেকেই তার শরীর ভাল ছিল না। প্রায় ন' মাস ছিল সে গর্ভবতী, তারপর দুর্গা পূজার পূর্বেই তার সন্তানটি জন্মালো। তারপর থেকেই তার মাথার ঠিক ছিল না। অতিরিক্ত রক্ত স্রাবের ফলেই নাকি ঐসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, ডাক্তার বলেছিল ব্যাপার কঠিন। আগেই বলেছি টোড়িরাম বিহারী লোক, প্রায় পঁচিশ বৎসর ঐ বাড়িতে কাজ করছে, মিনাকে জন্মাতে দেখেছে, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে। সে তাদেরই পরিবারের একজন এমনই তার সম্বন্ধ। আজ এখন আমার অবস্থা দেখে আগাগোড়া সব কিছুই এমনভাবে বলে গেল, যাতে আমার অন্ধকার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠলো। এতটা ঘনিষ্ঠ ভাবে সে যে আমায় তাদের সব কথা গোপন না ক'রে প্রকাশ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। যাই হোক এখন আমি তার মুখ

থেকে যা কিছু শুনলাম তাতে সহজে এই ধারণাই হ'ল, দ্বিতীয় বারেও মেয়ে হওয়াটা তাকে আঘাত করেছিল, বিশেষতঃ তার মা যখন ঘৃণাভরে তার মুখের উপরই বললেন,—আ পোড়াকপাল, আবার মেয়ে? মনে মনে সে নিরাশ হয়েছিল এই ভেবে যে এবারেও মেয়ে হওয়াটা তার মা নিজেই যখন সুদৃষ্টিতে দেখলেন না, তখন শ্বশুর-বাড়ির কেউ ভাল চোখে দেখবেনা। এসব ব্যাপারে নারী-পক্ষ যে সম্পূর্ণ নিরীহ নয়, আমাদের সমাজের মেয়েদের সে ধারণাই নেই, কারণ নারী-সমাজ তখনকার দিনে এসকল ব্যাপারে কুসংস্কার পূর্ণই ছিল। আমার শ্বশুর, যথার্থই একজন মহৎ ব্যক্তি, এমন ধৈর্য্যশীল, স্থিরবুদ্ধি, মনোবলসম্পন্ন গৃহস্থ আমার জীবনে কমই দেখেছি। তিনি যেন বুঝেছিলেন এবার তাকে বাঁচানো শক্ত হবে, —তাই প্রথম থেকেই তিনি যতটা সম্ভব সাবধান হয়েছিলেন; শিশুকে পৃথক রাখা হয়েছিল নার্সের কাছে, আর মিনাকে নিয়ে তিনি দিনরাত কাটিয়েছেন। মিনার শেষদিন, অত্যন্ত দুর্ব্বল অবস্থায়,—সন্ধ্যার দীপ জ্বালা হলে পর, মেয়ের মাথাটী কোলে নিয়ে শ্বশুরমশাই বসে তার মাথায় হাওয়া করছিলেন। মিনা বড় ছটফট করতে লাগলো, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, অমন করছ কেন, কিছু কষ্ট হচ্ছে কি?

মিনা জিজ্ঞাসা করলে, মামার বাড়ীতে কি খবর গেছে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রমোদকে পরদিনই তো-লিখে দিয়েছি, মা!

তাতে সে আবার বললেন,—এবারেও মেয়ে হয়েছে লিখেছ? শ্বশুর মশাই বললেন, তাতে কি হয়েছে, মেয়ে কি ফেলনা? এ যে ঈশ্বরের দান, তার জন্য তুমি এত উতলা হচ্চ কেন? এর পরেই সে হঠাৎ উঠে বসতে গেল। একটা ফিটের মতো হ'ল। কেন উঠতে চাইছ মা, বলে বাবা তাকে ধরে আবার স্থিত করবার চেষ্টা করলেন, শেষে হঠাৎ বলে উঠল, ঘরে আলো নেই কেন?—অন্ধকার যে!

এই কথাই শেষ, তারপর হৃৎপিণ্ডের কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে প্রথম প্রহরের মধ্যেই।

এরপর থেকে শ্বশুরমশাই, ঐ মাতৃহারা বারো দিনের শিশুটিকে নিয়ে পড়লেন,—কেমন ক'রে তাকে বাঁচানো যায়। সেই রাত্রি থেকেই তিনি দ্বন্দ্বে নামলেন। ঐ মেয়েকে বাঁচাতে তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছেন, এখন বোধহয় একটু ভরসা হয়েছে। ডাক্তারও বলেছে এইভাবে নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে পারলে ভয় নেই, খুকি বেঁচে যাবে।

সব কিছু শোনা হয়ে গেলে তাকে এই অনুরোধ ক'রে বিদায় নিলাম, সে যেন আজ আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কাকেও না বলে।

এখন ঐ ছোটটি কেমন হয়েছে কে জানে? মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়েই জন্মাল সে। তবে স্বচ্ছন্দ প্রতিপালনে বঞ্চিত নিশ্চয়ই হবে না। তাদের দাদু ও দিদিমার যত্নে মায়ের অভাব তারা বোধ করবে না। আমার মনে হয়, মাতৃহীনা যারা তারা যদি বাল্যে দুঃখ না পায়, মায়ের জন্য বিশেষ অভাব তাহলে বোধ করে না।

এখন একবার তাদের দেখবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল অথচ যেতেও পা ওঠে না।

বাবার হুকুম না পেলে শ্বশুরবাড়ি যাবার অধিকার ছিল না তখন। না হলে একথা মনে মনে আমার কতবার হয়েছে যে এখনও পর্যন্ত আমার মিনাদের বাড়ি যাওয়া হয় নি, অন্তত মেয়েদের দেখতে অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। আমার ছটফটানি দেখে—এখন পিসিদের প্রস্তাবমতো বাবা আমায় সঙ্গে নিয়ে আজই সন্ধ্যায় সেখানে গিয়ে উঠলেন। শাশুড়ী তো প্রথমটা কান্নাকাটি করলেন, আমার ধন কার হ'ল গো, এই কথা বলে। আমার কানে এটা বড়ই অদ্ভুত শোনাল, মনে হ'ল, শাশুড়ী ঠাকুরাণী এখন থেকেই আমার সঙ্গে অদূর বা সুদূর দ্বিতীয় সংসার সম্ভাবনাটাকে নিশ্চিতের পর্যায়ে

ফেলেই বর্তমান সম্বন্ধ আরম্ভ করলেন। বিশেষত মিনার মৃত্যুর পর মেয়েদের দিক থেকেই,—আমার পর হয়ে যাওয়াটা, যেন আমার সঙ্গে আজকার দিনে প্রথম সাক্ষাতের সম্ভাষণে, অসঙ্কোচে প্রকাশ না-ক'রে শান্তি ছিল না। মনের মধ্যে আমার এ আঘাতটা সামলাতে না সামলাতে বাবা আবার যে কথা শ্বশুরমশাইকে বলে বসলেন সে কথায় ধরণী বুঝি দ্বিধা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে প্রবেশ করাই তখন একমাত্র কাম্য হয়ে পড়ল আমার। পিসিরা যে এই মতলব ক'রেই বাবাকে পাঠিয়েছিলেন তা বুঝে ঘৃণায় আমার মন বিষিয়ে উঠল। তিনি বললেন, যা হবার তাতো হয়ে গিয়েছে,— বৌমা তো স্বর্গে গিয়েছেন, এখন যে দুটিকে রেখে গিয়েছেন, তাদের প্রতিপালনের ভার তো আমাদেরই, তাই এখন আমরা তাদের নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করতে চাই ; এতে আপনাদের আপত্তির কথা নয়, কি বলেন ?

শ্বশুরমশাই তাকিয়া অবলম্বনে মাথাটি হেঁট ক'রে নল হাতে তামাক টানছিলেন, চুপটি ক'রেই শুনছিলেন বাবার কথা সব। ঘরের বাইরে শাশুড়ীও সব শুনছিলেন আড়াল থেকে। এখন বাবার সব কথা বলা হলে পর তখন আস্তে আস্তে তিনি বললেন,— তারপর ?

তাঁর এই কথাটা যে গভীর তাৎপর্য পূর্ণ তা আমি প্রথমটা বুঝতেই পারি নি, তখনই বুঝলাম, যখন বাবা বললেন, অবশ্য বলতে দুঃখ হয়, কিন্তু না বললেও তো নয়, তাই এই সঙ্গে বৌমার গয়নাগুলি নিয়ে যাবার কথাও আছে, যদিও—

শোনবামাত্রই শাশুড়ী কেঁদে উঠলেন, এখনও যে একমাস হয় নি গো,—বেয়াই কি ক'রে এই নিদারুণ কথা বললেন ইত্যাদি। কিন্তু শ্বশুরমশাই নল ছেড়ে উঠে ভাল হয়ে বসলেন, চেঁচিয়ে অন্তরালবর্তী সহধর্মিণীকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,—একটু চুপ কর তো ? তারপর বাবার দিকে ফিরে বললেন, নাতনীদের প্রতিপালন

করতে চাইছেন ভাল কথা, কিন্তু পারবেন কি? বিশেষত বারো চৌদ্দ দিনের যে শিশুটিকে সে রেখে গেছে তাকে বাঁচানো সহজ কথা নয়। তাকে কেমন ক'রে বাঁচাতে হচ্ছে, কতটা খরচ, তার পথ্য তার সেবার ব্যবস্থায় তা জানেন না বোধহয়, শুনলে আপনার আর উৎসাহ থাকবে না। তা ছাড়া আপনাদের ঐ সংসারের মধ্যে আমরাই বা কোন সাহসে ঐ অসহায় মাতৃহীন শিশুদের ছেড়ে দেবো? ওসব কথা তুলে আর কাজ নেই নিশ্চিত জেনে রাখুন তাদের প্রতিপালনের কাজ আপনাদের নয়, সে দায়িত্ব আমাদেরই। কারণ বুঝতেই তো পাচ্ছেন আমাদের আর কেউ নেই ভগবানের দান বলেই ওদের পেয়েছি, আমাদের সঙ্গেই ওদের জীবন বিধাতার বিধানে বাঁধা! তারপর গহনার কথা, পঞ্চান্ন ভরি সোনা দিয়ে বিয়ে দিয়েছিলাম,—আপনারা তার ওপর এক ভরি দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। মেয়েরা বেঁচে থাক, ওদের মায়ের জিনিস ওরাই পরবে, ওদেরই থাকবে। ওসব হাত ছাড়ার কথা ভাবতেই পারি না। এই সেদিন এতবড় গুরুতর আঘাতটা পেয়েছি, এখনও আমাদের ঘা শুকোয় নি। ঐসব কথা নিয়ে আর আমাদের আঘাত করবেন না।

বাবা আমাদের কাছেই যম, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে ভয়, তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না আমাদের কিন্তু এখানে শ্বশুরমশাইয়ের এইসব কথার পর একেবারে নির্বাক হয়ে বসে রইলেন; বাদ-প্রতিবাদ তো দূরের কথা, আর ও সম্বন্ধে কোন কথাই তুললেন না। তারপর ধীরে ধীরে শ্বশুরমশাই তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন প্রতি সপ্তাহে শুধু ঐ শিশুটিকে পালন করতে প্রায় পনেরো ষোল টাকা পথ্য ও ডাক্তার, অন্যান্য নার্সিং-এর খরচ আলাদা। দিন রাত তার দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতে হয়, কোন রকমে কোনপ্রকার অনিয়ম যাতে না হয়। শিশু অত্যন্ত দুর্বল, ওকে বাঁচানোটাই একটা সমস্যা হয়ে আছে।

যাই হোক সেই রাত্রের ব্যাপারে আমাদের সংসারের প্রত্যেক মানুষটির উপর যে অশ্রদ্ধা আমার এল পরিবর্তন হ'ল না আমার জীবনে। এখন থেকেই মেয়েদের দেখবার জন্য বিনা অনুমতিতেই মাঝে মাঝে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলাম শ্বশুরবাড়িতে।

আমার স্ত্রী!—কথাটা আমার ঐ বয়সে বলতে গেলেও বাধে। আঠারো, উনিশ বৎসরের বালক আমি তখন,—কারো কাছে আমার স্ত্রী বলে নিজমুখে কথাটা বলতেও যেমন—আর একজনের পক্ষে তা শুনতেও যেন কেমন অস্বাভাবিক লাগে না কি? তখনকার দিনে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকলেও এ যেন একটা সঙ্কোচের ব্যাপার ছিল। তা থাক, কিন্তু ঐ বয়সে কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে আমার পক্ষে সেই স্ত্রী বিয়োগও ঘটে গেল,—দুটি মাতৃহারা কন্যার পিতা হয়েই রইলাম যদিও তাদের প্রতিপালনের আঁচও আমার গায়ে লাগতে দেবে না এঁরা। ইন্দ্রিয়গ্রাম তো বটেই, স্থূল শরীর পর্যন্ত পূর্ণ পরিণত হবার আগেই আমার পক্ষে একটা চমৎকার সংসার ভোগ ঘটেও গেল। বিধাতার এ এক বিচিত্র খেলা, যেন আমার ভিতর দিয়ে সংসারের আর একটা দিক মুক্ত ক'রে দিলে চিত্ত ক্ষেত্রে। আমার জীবনের দ্বিতীয় অঙ্ক এইখান থেকেই আরম্ভ হ'ল।

বিচিত্র এই অঙ্কের যে আমি, সে আমি আর হালকা বালক নয়; চিন্তাশীল পরিণত যুবা একজন, জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে সে—অতঃপর এই বিবর্তন। এখন হাইকোর্টে গিয়ে উকিলের সঙ্গে ঐ কপি করা না হয় তরজমার কাজ আর নয়। বাবা মধ্যস্থ হয়ে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে গম্ভীর হয়ে থাকবেন আর আমার অভাব হলে চার আনা পয়সা চেয়ে নিতে ভরসা হবে না। ক্ষুধায় খেতে পাব না। ও পথে আর নয়। তবে মায়ের টাইফয়েডের একচল্লিশ দিন ভোগে, বাবার বেশ কিছু খরচ হয়ে গিয়েছিল। শুনেছিলাম পিসিদের কাছে তখন তিনি বলেছিলেন যে, গোড়া থেকে আমারই

উপার্জনের টাকাটা, যেটা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, এই অসুখে সেই টাকাটা বেরিয়ে গেছে। তবু ভাল,—একথা শুনে মনে একটু স্বচ্ছন্দ বোধ করলাম, জয় ভগবান! আমার শ্রমোৎপন্ন টাকাটা মায়ের চিকিৎসায়, ঔষধপথ্যে ব্যয় হয়েছে। এটা আমার কতবড় সান্ত্বনা! তা হলে দু'বৎসর কাজ আমার অসার্থক হয় নি মোটেই।

বোধ হয় চার মাসও হয় নি মিনা মারা গিয়েছে, ইতিমধ্যে বাড়িতে পিসি ও ঠাকুমা এদের মধ্যে আমার বিয়ের কথাও উঠেছে। এতটা ঘৃণা এদের উপর তখন আমার ছিল, এদের মুখ দেখতে হবে বলে বাড়ির ভিতর যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। দুবেলা খাবার সময় মাথা নীচু ক'রে সোজা গিয়ে রান্না ঘরেই উঠতাম। খাওয়া শেষ হলে সোজা বাইরে চলে আসতাম।

এখন থেকে ব্রহ্মচর্যের উপর প্রগাঢ় আস্থা এল। ত্রি-সন্ধ্যা চলছিল আর প্রত্যুষেই গঙ্গাস্নান এই ছিল নিয়ম। রাত্রে ছাদের উপর,—দিনমানে অন্য সময়, তখন হাঁটা পথে সেই মিউজিয়ামের পাশে পিকচার গ্যালারীই ছিল আমার তীর্থ। কখনও কখনও নিরালয়, আমাদের বাড়ির কাছে জোড়াপুকুরের বাগানে বসে বহুক্ষণ কাটাতাম। অল্পদিনেই স্থির ক'রে ফেললাম এ জীবনে আমি কি করতে পারি,—যাতে কাজের মতো কাজ হবে। বাপ-ঠাকুর্দারা যা ক'রে গেছেন তার নিন্দা আমি করবো না, কিন্তু আমি ও কাজ কখনই করব না। ওতে মনুষ্যত্বহীন করে,—সামান্য ধন নিয়েই মনে মনে কত রকমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী রচনা ক'রে তারই মধ্যে জীবনের সকল সাধ মেটাতে হয়। মনের মধ্যে কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার স্থানই থাকে না। পঁচিশ টাকায় আরম্ভ,—দেড় শো দুশো টাকায় শেষ। তাইতেই জীবনের সবকিছু মিটিয়ে ফেলতে হবে! কি কষ্ট! ছেলেমেয়েদের পুষ্টিকর, প্রয়োজনীয় আহার্য, আমাদের মতো এই সংসারে যারা জন্মাবে তাদের জন্য নয়। চুলোয় যাক, আমাদের দরকার কি এমন সংসারে?

মনে মনে, কি ভাবে ঠিক জানি না, আমার মধ্যে এই সঙ্কল্প প্রবল, যেন একেবারে দৃঢ় হয়ে বসল—আমি আমাদেরও এই গতানুগতিক সংসারের কারো দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব না। ঠাকুর্দা-মশাই বলেছিলেন, যখন তোমার মধ্যে কোন কাজই ভাল লাগবে না, তখনই তুমি জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে আর তখনই তোমায় কি কাজ করতে হবে ভিতর থেকেই তার নির্দেশ পাবে। এখন ঠিক তাইই হয়েছিল। চার-পাঁচদিন ছটফটানির পর অতি সহজেই প্রাণে প্রাণে এই সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়েছিলাম যে, আমি হব চিত্রশিল্পী। যে যে বিখ্যাত ইটালীয়ান চিত্রকরদের ছবির প্রতিকৃতি এতদিন ধরে দেখে এসেছিলাম তার মধ্যে র‍্যাফেলের উপরেই আমার শ্রদ্ধা জন্মেছিল সবার উপর, তাই—র‍্যাফেলই হলেন আমার আদর্শ এবং গুরু।

যেই মাত্র এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে স্থির হয়ে গেল অমনি একটি ভবিষ্যৎ সিদ্ধির প্রসাদ, সে এক মহান আনন্দময় তরঙ্গের বেগ অন্তর-ক্ষেত্র তোলপাড় করতে আরম্ভ করলে। সেই আনন্দের মাঝেই জন্মাল প্রথম অমৃত, আমার ভবিষ্যৎ জীবন পথের কর্মপ্রেরণা যা সারাজীবনই আমার অবলম্বন হয়ে রইল। আমার শিল্পী-জীবনের মূলে এইভাবে প্রথমেই মিনার প্রীতি মনঃশক্তি হয়ে কাজ করেছে।

তারপর দ্বিতীয় কথা এই যে, এখন এত সাহস, বাবার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে নিজ নির্বাচিত পথে সোজা যাবার চেষ্টা যে কতটা জটিল, এমন কি যেটা অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে তা জেনেও কোথা থেকে এল আমার মধ্যে? শিল্পী হতে গেলে কত কত যোগাযোগ দরকার—প্রত্যেকটাই অর্থসাপেক্ষ। বাবা তো একটি পয়সাও সাহায্য করবেন না বরং প্রতিবাদ করবেন এতো জানা কথা, তবুও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তাই আমার সম্বল; এতটা মনের জোর আমার পক্ষে এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি করলে।

এরপর আমি মামার বাড়ি থেকে দিদিমাকে সঙ্গে নিয়ে মাঘ

মেলা দেখতে প্রয়াগে গিয়ে পড়লাম মেশোমশাইয়ের কাছে। মাসিমা সব কথাই শুনেছিলেন। তিনি এবং মেশোমশাই দুজনেই আমায় বললেন,—তুই এইখানেই থাক, আমার গুরুদেব এই কুম্ভ মেলায় আসছেন, দেখা হবে; আমি তাঁর কাছে নিয়ে যাবো, তাঁর উপদেশ মতো চললে মন স্থির হবে। আমার প্রাণটা ঐ রকমই একটা চাইছিল, ঠিক যেন আমার সর্বার্থসিদ্ধির পথ খুলে গেল এখানে এসে।

১৯০৫ সালের জানুয়ারী, ঐ সময়েই প্রয়াগের কুম্ভমেলার ঘটা। কেল্লার ধার থেকে দারাগঞ্জের ঘাট পর্যন্ত, বাঁধের দু'দিকেই কেবল তাঁবু। প্রত্যেক তাঁবুর মাথায় ঝাণ্ডা বা পতাকা, পাণ্ডাদের বৃত্তি বা বংশগত নিদর্শন। মেশোমশাইদের পাণ্ডাদের নাম গোবিন্দ দেও আর কদম ঝাণ্ডা, পতাকায় একটা কদম গাছ আর ফুল আঁকা। এই নিদর্শন মনে রেখে তাঁবু থেকে বার হতে হয়, না হলে পথ-ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। স্নানের প্রায় তিনদিন পূর্বে মাসিমা প্রভৃতি মেয়েরা সবাই গিয়ে তাঁবুতে উঠলেন। আমরা পুরুষেরা রাত্রে এক্কাযোগে বাড়িতে ফিরে যেতাম, আবার সকলে এসে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতাম, বড় বড় হালুয়ারীর দোকানে দিবারাত্র যজ্ঞ চলছে, ঘিয়ে ভাজা পুরির গন্ধে তীর্থস্থান ভরপুর।

অবশ্য স্নানের এক সপ্তাহ পূর্বেই মেশোমশাইয়ের গুরুদেব স্বামী কেশবানন্দজী বড় মহারাজ, এসেছেন খবর এল। তাঁর দু'জন, তিনি আর কেশবানন্দজীর প্রধান শিষ্য, স্বামী জ্ঞানানন্দজী, সেই জন্য ছোট মহারাজ। দু'জনেই দ্বারভাঙ্গা-ক্যাসেলে আসন করেছেন খবর পেয়ে মেশোমশাই আমায় বললেন, চল্ যাবি, আমার সঙ্গে? সেদো ভাত খাবি? না, হাত ধুয়ে বসে আছি—আমার ঐ অবস্থা। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বিকাল চারটা নাগাদ গিয়ে পৌঁছলাম দ্বারভাঙ্গা-ক্যাসেলের ফটকে। শুনলাম, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিংহ জ্ঞানানন্দজীর শিষ্য।

এ বারান্দা সে বারান্দা পার হয়ে সেখানে তাঁরা ছিলেন, সেই বিরাট হলঘরে পৌঁছানো এবং এক সঙ্গে দুই স্বামীরই দর্শন পাওয়া গেল। বিস্তৃত হলজোড়া ফরাস, হলের দুই প্রান্তে দুটি পুরু শয্যার উপর তাঁদের গদি পাতা নিজ নিজ দু'খানি প্রকাণ্ড বাঘছাল পাতা। দুই স্বামীর আসনের মধ্যে প্রায় সাত আট হাত ব্যবধান। আমরা কেশবানন্দ স্বামীজীর আসনের ধারে বসলাম প্রণাম ক'রে। মেশোমশাইকে স্বামীজী বিশেষ স্নেহভরে কুশল প্রশ্ন করলেন তারপর আমার দিকে লক্ষ্য ক'রে প্রশ্ন করলেন—এটি কে? তাতে মেশোমশাই আর কিছুই বাকী রাখলেন না, আগাপাশলতা সকল পরিচয় দিয়ে শেষে বললেন, আপনার কাছেই এসেছে, ও ছেলে-মানুষ, যাতে ওর মন স্থির হয় তাই ক'রে দিন। আমি কিন্তু তাঁকে আমার মনের কোন কথাই বলি নি, তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আমার বৈরাগ্য প্রবল হয়ে সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প এসেছে।

জ্ঞানানন্দজীর দিকে, আসনের ধারেও লোকের অভাব ছিল না। একটা গুরুতর বিষয়ের কি যেন আলোচনা চলছিল। পরে জানা গেল এ আলোচনার মুখ্য কথাটা দ্বারভাঙ্গা মহারাজকে সহায় ক'রে এরা দু'জনে এবং এখানকার গণ্যমান্য এঁদের শিষ্যসেবক অনেকে সহযোগিতায় 'ভারতধর্ম মহামণ্ডল' নাম দিয়ে একটি ধর্মসমাজ এই কুম্ভযোগের সুযোগে স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে প্রথমে ওখানকার প্রসিদ্ধ উকিল ও লেজিসলেটিভ কৌন্‌সিলের মেম্বর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সহযোগী ছিলেন, তারপর কোন কারণে এঁদের সঙ্গে পণ্ডিতজীর মতদ্বৈধের কারণেই তিনি পৃথক হয়ে যান এবং 'সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়' নামে অপর একটি ধর্মসভা স্থাপনের উদ্যোগ করেন। এখন এই দুই দলের প্রতিযোগিতামূলক যা কিছু বচসা বাদানুবাদের ব্যাপার চারিদিকে ধূমায়মান।

ওদের দলগত মন্তব্য যা কিছু তার মধ্যে কোন ধর্ম নেই, আমাদের এই মহামণ্ডলই যথার্থ হিন্দুধর্মসম্মত প্রতিষ্ঠান; এরা

এইসব বলছে। এই দুই ধর্মসভার বিরাট প্যাণ্ডেল দুটিও কাছাকাছি তৈরি হয়ে গেছে। ডেকরেশনের কাজ চলছে দুই জায়গাতেই। কুম্ভযোগের প্রথম দিনেই সভার উদ্বোধন হবে ; সেদিকে লক্ষ্য রেখে পুরোদমেই উদ্যোগ আয়োজন চলছে, দুই পক্ষেরই অর্থের অভাব নেই। বসে বসে আমরা কত কথাই শুনলাম। পণ্ডিতজী কেন এদের কাছ থেকে পৃথক হলেন তার মূল কারণ নাকি পণ্ডিতজীর বাঙালীবিদ্বেষ। কেশবানন্দ ও জ্ঞানানন্দ সন্ন্যাসী হলেও দুইজনেই বাঙালী। দু'জন বাঙালী এসে প্রয়াগে একটা বিরাট ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়বে আর তার সকল ক্ষমতা তাঁদের হাতেই থাকবে এই হিন্দুস্থানী রাজ্যে এটা তাঁরা পছন্দ করেন নি। ধর্ম প্রচারেও বাঙালী এসে এদেশে প্রাধান্য লাভ করবে এটা এদেশের প্রধান এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলী চান না। তাই পণ্ডিতজী এদের নিয়ে আর একটি দল, অবশ্য হিন্দু ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যেই গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। মালব্য প্রথম অবস্থায় যে একটু বাঙালীবিমুখ ছিলেন, একথা নাকি তখনকার অনেকেই জানেন।

আর একজন,—মেশোমশাইয়ের গুরুভাই, অল্প ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি আছে ; সেক্রেটারিয়েটের একজন অফিসার—মালব্যজীর সম্বন্ধে আলোচনায় অদ্ভুত রকমের এক রং দিয়ে দিলেন। দেখছেন! ঐ বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষটি, মাথাটা এইটুকু, তার মধ্যে কি কূটবুদ্ধি! এই পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যে একেবারে নূতন একটা প্যাণ্ডেল খাড়া ক'রে ফেললেন? এলাহাবাদ বারের মধ্যে সব চেয়ে ধড়িবাজ উকিল, যখন প্রথমে আমাদের মণ্ডলের মধ্যে এসে মিশেছিলেন, স্বামীজীর উপর কি চমৎকার শ্রদ্ধা নিবেদন,—এঁ্যা? কি রকম উদ্যোগ, আর সিনসিয়ারিটি,—স্বামীজী, বড় মহারাজ একেবারে গলে গেলেন। আমি কিন্তু তখনই জানি ভিতরে ভিতরে একটা কিছু রহস্য আছে।

সন্ধ্যার পরই আমরা উঠলাম, বড়, ছোট, দুই মহারাজকে প্রণাম

ক'রে। আমার কিন্তু ছোট মহারাজকেই বেশী ভাল লাগল। কারণ জানি না, তবে এইটুকু জানি তাঁর মূর্তি, কথাবার্তার বৈশিষ্ট্য সত্য সত্যই যেন প্রাচীন ঋষির মতোই, তাতেই আমায় আকৃষ্ট করেছিল। কি সুন্দর সদা প্রফুল্ল সহাস্য মুখ ; কাঁচাপাকা দাড়িটা পাক দেওয়া, তলায় একটা গাঁট। জটা দু'জনেরই মাথার উপরে কটাহ আকারে বেড় দিয়ে বাঁধা। কেশবানন্দজীর চুল খুব কমই পাকা, মনে হয় যেন, একটিও পাকা নয়, চক্ষু দুটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ঝানু বিষয়ী লোকের মতো। কিন্তু কণ্ঠস্বর অতীব মিষ্ট ও কোমল। যে সময়ে আমরা, তখনকার মতো বিদায় নিয়ে উঠলাম, —বড় মহারাজের হুকুমে, ঠিক সেই ক্ষণেই দু'জন ব্রহ্মচারী এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালেন। মেশোমশাই বললেন, তা হলে আজ রাত্রিটা এঁরা আমাদের ঐখানেই থাকবেন তো ?

স্বামীজী বললেন,—হাঁ, এখানে ওদের আজ আর রাখবো না, কাল সকালে ওখান থেকে প্রাতঃকৃত্য শেষ ক'রে স্নানের সময় এখানে আসবে।

যে আজ্ঞা বলে, ঐ দুটি কুমার ব্রহ্মচারীর সঙ্গে মেশোমশাই বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন। আমার প্রাণটা,—এদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ছটফট্ করতে লাগল। ভাগ্যক্রমে বাড়িতে এসে একত্র আহার ও আমরা তিনজনে একত্র অবশ্য পৃথক শয্যায় শয়ন করলাম, একখানি ঘরে—সুতরাং আলাপ পরিচয় কিছু কম হ'ল না। একজনের নাম দুর্গানন্দ, অপরটি নিত্যানন্দ। বয়সে দু'জনেই এক, প্রায় বারো হবে। চমৎকার জটাগুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে ; গৈরিকের উত্তরীয় যেভাবে ব্রহ্মচারীদের বাঁধা থাকে পিঠে বেড় দেওয়া-এবং বুকে বাঁধা। দুর্গানন্দকে দেখতে অবিকল কেশবানন্দের মতো। আমার মনে এই যে একটা ভাব উঠল, যতই ভাল ক'রে দেখছিলাম ততই বদ্ধমূল হয়ে গেল এ ধারণাটা। যাই হোক নিত্যানন্দের তুলনায় সে ছিল একটু মাথায় ছোট।

পরদিন মেশোমশাইকেও জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর কি মনে হয়? তিনি বললেন, গুরুদেব দুর্গানন্দকে পেয়েছেন কনৌজ থেকে, তাঁরই এক শিষ্যের ছেলে,—ওর লক্ষণ দেখে ওকে চেয়ে নিয়েছেন। তাঁরা ওকে একেবারে গুরুদেবের হাতেই সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন। আর নিত্যানন্দকে পেয়েছেন উড়িষ্যার এক শিষ্যের কাছ থেকে, ও পিতৃমাতৃহীন। নিত্যানন্দের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, দুর্গানন্দের কণ্ঠস্বর অনেকটা কেশবানন্দ স্বামীজীর মতো, বেশ কোমল।

পরদিন আবার আমরা দ্বারভাঙ্গা ক্যাসেলে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে। তারপর আজ বিকালে মেলায় গেলাম। কি ভয়ঙ্কর ভিড়। পথে কেবল নরনারী, সাধু-সন্ন্যাসীর ঘন চলাচল, আর তাঁবু, তাঁবু, তাঁবু, চারিদিকেই কেবল তাঁবু। বাঁধ থেকে নেমে কতকটা গেলেই কল্পবাসের অসংখ্য ঝুপড়ির ঘন সমাবেশ গঙ্গার চরের সবটা জুড়ে একেবারে জলের কোল পর্যন্ত। মধ্যে গলি পথ, দুদিকেই ঝুপড়ি। চারদিকে চার হাত উঁচু চারটি দেওয়াল, সরু সরু লম্বা লম্বা শক্ত এক রকম ঘাসের চাপ, সরু সরু লম্বা লম্বা কঞ্চির সঙ্গে বাঁধা। হাওয়া প্রবলভাবেই ঢুকছে সব দিক দিয়ে, হাড়ের ভিতরে ঢুকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটি কুশঘাসের শয্যা—কল্পবাসিনী বিধবারা তার ওপর একখানি কম্বল পেতে আর একখানি কম্বল গায়ে দিয়ে দিনরাত কাটান, সারা মাঘ মাসের ঐ শীতে। এইভাবেই কল্পবাসের প্রথা কতকাল থেকেই চলে আসছে।

এবারে অনেকের কাছেই শুনেছিলাম,—কুম্ভযোগের জন্য কল্পবাসীদের সংখ্যা নাকি অনেক বেশী। কল্পবাসের কাল পৌষের মকর সংক্রান্তি থেকে মাঘের সংক্রান্তি পর্যন্ত। প্রদীপ ঘরে থাকবে না, একটি ক'রে লণ্ঠন, রাত্রে জ্বলে। দেখলাম, বাঙালী বিধবারা ধর্ম উপার্জনের জন্য প্রয়াগে এসে ঐ কল্পবাসের নামে কি অসাধারণ তিতিক্ষাই না সহ্য করেন। ধর্ম উদ্দেশ্যে এই সকল

ব্যাপার চিত্তশুদ্ধির কতকটা সহায়তা করে তা হয়তো সাধারণের ধারণা নেই। ঐ দিন দেখলাম, 'ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের' বিশাল মণ্ডপ, তিন থেকে প্রায় চার হাজার লোকের বসবার ব্যবস্থা হয়েছে। খুব উঁচু,—উপরে প্রকাণ্ড পতাকা উড়ছে, লাল গৈরিক পতাকা— ভিতরের দিকে চন্দ্রাতপ, সভাপতির স্থান বেশ সুন্দর হয়েছে। বড় বড় শালের রলা তাতে লাল ও সাদা কাপড় পাকিয়ে আগাগোড়া ঢাকা। প্রবেশ দ্বার চারদিকে চারটি, মুরুব্বিরা সব দ্বারেই আছেন। কর্নেলগঞ্জের একটা এ: ‍ ার কনসার্ট পার্টি মধ্যে মধ্যে বাজাবে, সে ব্যবস্থাও হয়েছে। ফেরবার পথে সনাতন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্যাণ্ডেলও দেখলাম। পণ্ডিতজীকেও দেখলাম বহু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাজকর্ম দেখে বেড়াচ্ছেন। মনে হ'ল এদের মণ্ডপটি যেন একটু ছোট। আর সবদিকে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই।

দেখতে দেখতে স্নানের দিন এসে পড়ল। সেই বিরাট স্নানের দৃশ্য উপরের কোথাও থেকে দেখা ঠিক সম্ভব নয়; তাই মেশোমশাই ত্রিবেণী সঙ্গমের কাছেই একখানা প্রকাণ্ড নৌকা ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন। আমরা সবই পূর্ব রাত্রে বাড়ি থেকে খাওয়া শেষ ক'রে রাত্রি এগারোটা নাগাদ সেই নৌকায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মেশোমশাইয়ের সংসারের সবাই তো বটেই তারপর মাসিমার যত সব আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সবাইকে সঙ্গে নিয়েছিলেন—যাদের পক্ষে ঐ দৃশ্য অন্য কোথাও ভাল জায়গা থেকে দেখা সম্ভব ছিল না। কুম্ভযোগের ঐ শুভ মুহূর্তে সাধু সন্ন্যাসী, সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ের স্নান দেখা যায় এমন স্থান পাওয়া সত্যই দুর্ঘট। ভোর সাড়ে ছটা থেকে স্নান আরম্ভ। ত্রিবেণী সঙ্গম থেকে সোজা পথ চরের উপর, তার দুদিকেই পুলিস ছাড়া আর কেউ নেই;—মোটা কাছির রেলিং-এর মধ্যে পুলিস প্রভৃতি যা কিছু,—পথ পরিষ্কার,—সেখানে কারো স্থান নেই। পুলিসের উচ্চতম অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি, সবাই শশব্যস্ত। আমি ভাবছিলাম, সাধু সন্ন্যাসী স্নান করবে তা

এত পুলিস কেন? এক্ষেত্রে প্রয়োজনের অনেক কমই পুলিস রাখা আছে শেষে বুঝলাম, যখন আসল ব্যাপার দেখলাম।

তখন বোধ হয় পাঁচটা হবে মেশোমশাই আমাদের ডেকে দিলেন—বললেন,—সবাই তৈরী হয়ে ঠিক হয়ে বসো। আর বেশী দেরি নেই এইবার স্নান আরম্ভ হবে।

চারদিকেই দেখি জনসমুদ্র। প্রথমেই নিরঞ্জনী আখড়ার স্নান। ক্রমে বেশ ফরসা হয়ে এল। সামনে দেখা গেল, বোধহয় ত্রিশ চল্লিশ হাত দূরে—প্রথমে হাতির উপর সোনার হাওদা, তারপর হাতি, আবার হাতি,—তারপর পালকির মতো তাঞ্জাম, রূপা সোনায় মোড়া আসাসোটা-ধারীর দল দুইপাশে, মোহান্ত মহারাজ এসে পড়লেন; তাঞ্জাম থেকে নামলেন, সঙ্গমের জল সর্বাঙ্গে মার্জনা করলেন, অবগাহন করলেন না। তিনি চলে যেতে না যেতেই আখড়ার উলঙ্গ সন্ন্যাসী দল চিমটা হাতে, চারজন ক'রে সারি সারি, এ রকম দলে দলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সঙ্গমের মধ্যে। এ ওর গায়ে ও এর গায়ে এইভাবে পরস্পর কতক্ষণ জল ছোড়াছুড়ি চলল। কেউ মাথা ডুবোলেন না, গা ভিজানো পর্যন্তই হ'ল, মাথায় শুধু জল মার্জন। এইভাবে, নিরঞ্জনী আখড়ার স্নান শেষ হলেই, আবার লাইন ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল। এবার নির্বাণী আখড়ার স্নান। ঐভাবেই সব হ'ল বটে তবে ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর দল চিমটা দিয়ে পুলিসদের মারপিট ক'রে বেশ কয়েকজনকে জখম ক'রে হোই হাই করতে করতে চলে গেল। মুখে তাদের অকথ্য গালাগালি, সামনে যাকে দেখছে তাকেই গালাগাল আর চিমটা নিয়ে তাড়া। এরা যে কি ভাবের সন্ন্যাসী বুঝলাম না। ঐ মোহান্ত ছাড়া দলের মধ্যে আর কারো একটু শান্তভাব নেই। এইভাবে চলল স্নানের পালা অনেক বেলা পর্যন্ত। আমরাও নৌকা থেকে নেমে সঙ্গমে স্নান ক'রে নিলাম। শেষে বেলা বারোটা যখন আমরা কয়েকখানা এক্কা ক'রে বাসায় এলাম। সারাদিন কেবল ঐ কথা।

রামানন্দবাবু তখন কায়স্থ কলেজের প্রিন্‌সিপ্যাল। তিনি কর্নেলগঞ্জে আমাদের বাসার কাছেই একখানা বাড়িতে থাকেন, মেশোমশাইয়ে সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা শুনেছি। কল্পবাসের ক্ষেত্রে তাঁদেরও আপন একজন ছিলেন। এর মধ্যে আমার দিদিমাকে কল্পবাসে আনা হয়েছিল, তাঁর ছাপ্পরের কাছেই একখানিতে রামানন্দবাবুর আত্মীয়টি ছিলেন। দেখতাম রামানন্দবাবুর সঙ্গে তাঁর ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রত্যহই আসতেন বিকালের দিকে। ব্রাহ্ম হলেও দেখলাম তিনি এই কল্পবাসীদের তত্ত্বাবধায়ক; সাধু সন্তদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে ফিরে দেখা যেমন আমরা করতাম, দেখি তিনিও সপরিবারবর্গে ঐ ধর্মোৎসবটি পূর্ণরকমেই উপভোগ করছেন। মেশোমশাই বললেন,—ধর্ম ভিতরে জাগ্রত হলে তখন সম্প্রদায়ের গণ্ডী থাকে না। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দল ঐ কুম্ভক্ষেত্রে সংকীর্তনে মাতিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমরা দু'জনে তাঁর তাঁবুতে যেতাম, সংকীর্তন শোনা আর কিছু প্রসাদ পাওয়া কয়েকদিন চলেছিল।

তেইশ

এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা সূত্রে 'ভাবতধর্ম মহামণ্ডল' নামে যে ধর্ম প্রতিষ্ঠানের জন্ম হ'ল স্বামী জ্ঞানানন্দজী তার সর্বাধ্যক্ষ বা পুরোধা আর কাশীতেই তার প্রধানকেন্দ্র স্থাপিত হ'ল। আর 'সনাতন ধর্ম' সম্প্রদায় বলে যে প্রতিষ্ঠানটি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হ'ল তার কর্মস্থল এখন কিছুদিন এলাহাবাদেই রইল পরে অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্তভাবেই ধর্ম বা সংস্কৃতি প্রচারের কাজে তাকেও কাশীতে দেখতে পাই। দু'টি

প্রতিষ্ঠানের মূল কথাটা ছিল একই,—সেটা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বর্ণাশ্রমকে অবলম্বন ক'রে সম্প্রদায়স্থ জনগণের মধ্যে ধর্ম-জীবনেরই মহিমা প্রচার।

যাই হোক, এবার স্বামীজীর কথা বলতে হবে। কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী, তখনও তিনি ব্রহ্মচারী শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে প্রবজ্যা গ্রহণ করেন নি যদিও সাধারণ লোকে তাঁকে স্বামীজী বলেই সম্বোধন করতো আর তিনিও তার প্রতিবাদ কোনদিনই করেন নি। আমার বোধ হয় জীবিতকালের মধ্যে তিনি সন্ন্যাস বা প্রবজ্যা গ্রহণ করেন নি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই তিনি ছিলেন। তাঁকে স্বামীজী বলে সম্বোধনটার ব্যবহার রেখেছিলেন তাঁর শিষ্য সেবকেরা। আমি এ কথাটা এত ক'রে বলছি এই কারণে যে আমাদের বাঙালী শিক্ষিত সাধারণও জানেন না যে শঙ্করের দশনামী ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ থেকে উচ্চস্তরে শ্রেণী বিভেদ আছে এবং বিশেষ বিশেষ সাধনার দ্বারাই যোগ্যতা অর্জন ক'রে তবে উচ্চস্তরে গতি হয়। ধর্মরাজ্যে সর্বশেষ অবস্থা হ'ল ব্রহ্মজ্ঞ বা পরমহংস অবস্থা। তাঁরা প্রথমে থাকেন ব্রহ্মচারী, তারপর শিখাসূত্র ত্যাগ ক'রে হন সন্ন্যাসী বা স্বামীজী। মাথায় জটাভারের একটা প্রবল আকর্ষণ আছে এবং সাধারণে মনে করেন যে জটাজুট থাকলেই সে হয় যথার্থ সন্ন্যাসী। তাঁরা জানেন না যে কেশ শ্মশ্রু রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি অলঙ্কার যা কিছু সে সবই উপাধি। উপাধিটা ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্যন্তই চলে; সন্ন্যাসীর উপাধি নেই কারণ সকল কিছু ত্যাগ হলেই তবে সন্ন্যাস! যাই হোক, তিনি ব্রহ্মচারী থেকেও ক্রিয়াকর্ম অনেক কিছুই ক'রে গিয়েছেন। আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তিনি ভাগ্যের যোগাযোগে তিনটি আশ্রমের স্বামী হয়েছিলেন। হরিদ্বারে কটলী কেনালের ধারে তাঁর গুরুর ছোট একটি আশ্রম ছিল। অনেক দিন মামলা মোকদ্দমা ক'রে সেই আশ্রমটি অধিকার করেন। গঙ্গানন্দ নামে একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী ছিলেন তার রক্ষক। আর

ভুবনেশ্বরে গৌরীকুণ্ডের কাছেই কিছু জমি নিয়ে তিনি আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ক্রমে আশপাশের অনেকটা জমি সংগ্রহ ক'রে ঐ আশ্রমটি বাড়িয়েছিলেন।

কেশবানন্দের প্রথম ও প্রধান আশ্রমের কথা—সেটি হ'ল বৃন্দাবনে, রাধাবাগ আশ্রম। যমুনা তীর থেকে কতকটা দূর হলেও এইখানেই তাঁর কীর্তি ছিল বেশী। সেকথা পরে বলবার অবকাশ হবে কারণ আমার জীবনে ঐ এক সময় এই আশ্রমের সঙ্গেই বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং ঐ সময় উনি যে ভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং ঐ সূত্রে সাধক জীবনে যে বস্তু লাভ ঘটেছিল, একথা নিশ্চিত জানি যে জীবনে এর চেয়ে মহৎ লাভ আর কখনও কোথাও কোন সূত্রেই আমার ঘটে নি। তখন তিনি ঐ আশ্রমে শ্রীশ্রীকাত্যায়নী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছিলেন। নানা কারণেই আমার ধারণা উনি আসলে তন্ত্রমার্গের সাধক ছিলেন, আর সেই কারণেই শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত জ্ঞানমার্গের সন্ন্যাসের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। যাই হোক, এখন কিন্তু আমার সঙ্গে প্রয়াগের কুম্ভমেলার সময়ে এই যে প্রথম দেখা, তাতে আমি বিশেষ আকৃষ্ট হলাম না। মেশোমশায়ের নির্বন্ধাতিশয়েই যেন তখন তিনি আমাকে গ্রহণ করেছিলেন বা আমার সম্বন্ধে কথা কয়েছিলেন। এই কথাই তখন বলেছিলেন যে, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীই ব্রাহ্মণ সন্তানের আধ্যাত্মিক সাধন ও সিদ্ধির সবচেয়ে বড় পথ। আর এখন ঐ রকমই ক'রে যাও, পরে যখন আবার দেখা হবে, তখন দেখে শুনে বুঝিয়ে বলে দেবো তোমায় কি করতে হবে। ও কাজ তো আমি প্রথম থেকেই স্বতঃ-প্রণোদিত হয়েই করছিলাম। এখন উনি কিছু না বললেও আমি ঐ কাজই করতাম। বেশীর ভাগ আর একটি কথা বলে দিলেন, গীতা পাঠ চলবে এক অধ্যায় করে, তাহলেই সব হবে। উনি গীতাখানি ভাল অধ্যয়ন করেছিলেন ফলে সকল শ্লোক সঠিক ব্যাখ্যার অধিকার ছিল তাঁর। কারণ দেখেছি, দ্বারভাঙ্গা-ক্যাসেলে

সময় সময় অনেকেই ধরে বসতো, গুরুদেব এ জায়গাটির তাৎপর্য বুঝতে পারছি না। তখন উনি সহজ সরল ভাষায় সেই শ্লোক ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন—তাতে সবাই সন্তুষ্ট হ'ত। চণ্ডীবাবু বলে একজন ওঁর শিষ্য ছিলেন। যতদিন উনি প্রয়াগে ছিলেন, চণ্ডীবাবু দিবারাত্রই তাঁর কাছে তাঁরই কাজে থাকতেন। তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ছিলেন। কেশবানন্দজীও কম চিকিৎসক ছিলেন না। কিন্তু কাশীতে ওঁর গুরু, স্বর্গত শ্যামাচরণ লাহিড়ী মশাইয়ের অবধৌতিক চিকিৎসা-প্রণালী এবং তাঁর যাবতীয় মহামূল্য এবং দুর্লভ ঔষধের খাতাখানি ওঁর গুরুভাই পঞ্চানন ভট্টাচার্য-মশাই লাভ করেন ও পরে বিস্তৃতভাবে প্রচার করেন। কেশবা-নন্দজী তাঁর খাতা না পেলেও অনেক কঠিন রোগের ঔষধ জানতেন। শুনেছি অনেকে তাঁর ঐ প্রণালীর চিকিৎসার ফলে আরোগ্যলাভ করেছে। অবধৌতিক প্রণালীতে চিকিৎসা তো ছিলই, আর তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাও কোথাও কোথাও করতেন নিজেও হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেতেন দেখেছি। কেশবানন্দজী নেহাত সেকেলে সন্ন্যাসী ছিলেন না, এখনকার সভ্যজগতের সুখ-সুবিধা পূর্ণ রকমেই গ্রহণ করতেন। রেলেতে তিনি, সেকেণ্ড ক্লাস কখনও কখনও ফার্স্ট ক্লাসেও ভ্রমণ করতেন। জ্ঞানানন্দজীও তাই। বিশেষত জ্ঞানানন্দজীও পূর্বাশ্রমে গ্রাজুয়েট, স্বামী বিবেকানন্দের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে তাঁর মধ্যে ছিল, এটা আমার নিজের ধারণা। কাশীতে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বেশ প্রীতিময় যোগ ছিল জ্ঞানানন্দ-জীর এবং বৃন্দাবনের রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে কেশবানন্দজীর যোগা-যোগ ছিল। উৎসবাদিতে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ চলতো—গানবাজনা কীর্তনাদি, মিশনের কর্মীরা মাঝে মাঝে রাধাবাগের আশ্রমে এসে কেশবানন্দজীকে শুনিয়ে যেতেন। গান ভালবাসতেন বটে কিন্তু গানের মানুষ ছিলেন না, এমন কি ভক্তিবর্গের লোক তিনি নন, তিনি যথার্থই শক্তিমার্গের মানুষ। এই এক কথায় তাঁর পরিচয়।

যতদিন ওঁরা ছিলেন আমি প্রত্যহই বিকালে মেশোমশাইয়ের সঙ্গে যেতাম, বাসা থেকে কাছেই কমপক্ষে সন্ধ্যায় দু'তিন ঘণ্টা কাটাতাম ঐ কেশবানন্দের আসনের পাশে। বেশীর ভাগ কথা নানা বিষয়ক, কদাচ ধর্ম বা জ্ঞান সম্বন্ধে আলাপ বা আলাচনা হ'ত। আমি সব কিছুই শুনতাম, কখনও কোন প্রশ্ন করি নি। সব মিলিয়ে লাগত ভাল। মনের একটা কাজ হয়ে গিয়েছিল, ঐ সঙ্গলাভ। এদিকে প্রয়াগের কুম্ভযোগের শেষেই দু'জনেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করলে পর আমার মনটা যেন কতকটা অবলম্বনহারা হয়ে পড়ল।

কারো স্ত্রীবিয়োগের কথা শুনলেই পরিচিত বন্ধু সমাজের চেয়ে আত্মীয়কুটুম্ব সমাজে হতভাগ্য বিপত্নীকের পুনরায় বিবাহ দেওয়াটাই যেন তাদের প্রবল একটা দায়। মাসিমা, অনেকটা আমায় বাঁচিয়ে চলতেন, না হলে ওখানে আমার দীর্ঘকাল থাকা অসম্ভব হয়ে উঠত। তিনি আর মেশোমশাই দু'জনে মিলে কি পরামর্শ করতেন জানি না তবে মেশোমশাই আমায় প্রায়ই বলতেন, মনের একটা অকুপেশন না হলে চলবে না। অবলম্বনশূন্য অবস্থায় কোন যুবার থাকতে নেই—নানাপ্রকার অকর্ম কুকর্মের প্রবৃত্তি এসে জোটে। তুই কি করবি বল্ দিকি, এখানে আমাদের অফিসে চেষ্টা ক'রে দেখবো? টেম্পোরারী একটা কিছু হতে পারে।

এতদিন মনে মনে রেখে শেষে একদিন বলেই ফেললাম, আমি পেন্টিং শিখবো। শুনেই তিনি বললেন,—তাই নাকি? আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, তাঁর ঐ একটি কথায় তা বোঝা গেল। সেদিন আর কোন কথাই বললেন না।

পরদিন মাসিমার মুখে আসল কথাটা শুনলাম। মেশোমশাই বলেছেন,—ওর বয়স হয়ে গেছে, এখন আর অতবড় একটা বিদ্যা শেখবার সুবিধা হবে কি?

আঠারো উনিশ বৎসর বয়স কি পেন্টিং শেখবার পক্ষে বড় বেশী? —শেষে যখন একথা বললাম;—যদি ঐ কাজ শিখতে পারি তবেই

আমার জীবন সার্থক হবে, না হলে আমার বাঁচবার কোন দরকার নেই। আমি এবিষয়ে কৃতসংকল্প। এখন তিনি সরল বিশ্বাসেই আমার সংকল্পটি গ্রহণ করলেন। বললেন,—টাকা, শেখবার খরচ, সে কথা ভেবেছিস ?

বললাম,—সে কথা এখন ভাবি নি। এইটুকু জানি যে আসছে জুলাই থেকেই শিক্ষা আরম্ভ। ইতিমধ্যে দেখবো যদি কোন উপায় করতে পারি।

এরপর থেকে মেশোমশাইয়ের উৎসাহ আমার সঙ্গে মিলে গেল। কিছুদিন আমায় তাঁরা ছাড়লেন না, এলাহাবাদেই রেখে দিলেন। একটা টেম্পোরারী কাজে আমায় ঢুকিয়ে দিলেন ত্রিশ টাকা মাইনে। বললেন, যতটা পারিস টাকা কিছু সংগ্রহ ক'রে ফেল,—আমার কাছে জমিয়ে রাখবি, জুন মাসের শেষে যখন যাবি সঙ্গে নিয়ে যাবি। বোধহয় তোর কয়েক মাসের মাইনে, এডমিশন ফি বাবদ কতক টাকা তোর জমে যেতে পারে। শেষে আমি আছি।

আমার মনে মনে যেটার উপর বেশী নির্ভর ক'রে আছি সেটাও তাঁকে বললাম। সেটা প্রাইভেট টুইসানি। ফিফ্‌থ ক্লাস সিক্স্থ ক্লাসের ছেলে পর্যন্ত পড়াতে পারবো, মাসে দশ টাকা উপার্জন করতে পারবো না ? নিশ্চয়ই পারবো।

মিনার মৃত্যুর পরে এইবার এলাহাবাদে এসে জানতে পারলাম যে, মেশোমশাই আমার কতবড় কল্যাণকামী বন্ধু। আমার উৎসাহ প্রবল হয়ে উঠেছিল তাঁর সমর্থন পেয়ে। কিন্তু এরপর আর ওখানে থাকতেই পারলাম না, মে মাসের প্রথমেই কলকাতায় চলে এলাম, একটা এমনই উৎসাহ আমায় যেন ওখান থেকে টেনে নিয়ে এল। অনেক কিছুই খবর সংগ্রহ করতে হবে, আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া সহজ নয়। এডমিশনের কতকগুলি সর্ত আছে—শিল্পীর বংশ হওয়া চাই, —না হলে কোন প্রতিষ্ঠান বা বড়লোকের সুপারিশ চাই। আগেই এসব শুনেছিলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, কলকাতায় ফিরে এসে আরও একবার বাবার খপ্পরে পড়ে গেলাম, যার ফলে সে বৎসর আর আমার আর্ট স্কুলে ভর্তি হওয়া তো হ'লই না, উপরন্তু আবার হাইকোর্টেই যাতায়াত আরম্ভ হয়ে গেল। আমি আর্ট স্কুলে ভর্তি হব শুনেই বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে কখনও আর্ট স্কুলে যায়? ওটা উৎসন্ন যাবার পথ। তারপর তিনি অকাট্য যুক্তি সহযোগে পিসিদের বুঝিয়ে দিলেন যে আমার ভাগ্যে এবার হাইকোর্টের একটা পাকা কাজের যোগাড় হয়েছে, এমন সুযোগ এর আগে কখনও হয় নি। বাবার বন্ধু কুপার সাহেব বিলাত যাচ্ছেন তিনি নাকি আমায় পাকা একটা কাজে বাহাল ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হবেন। এইসব লোভ দেখিয়ে শেষে এই বলে উলটো চাপ দিলেন, যদি আমি তাঁর কথা না শুনি তাহলে এ বাড়িতে আর আমার স্থান নেই। আমি বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুতও হয়েছিলাম, কিন্তু মা আমার হাত ধরে কান্না আরম্ভ করলেন। বললেন,—কোথায় আবার পথে পথে ঘুরে বেড়াবি, এবার আমার কথা রাখ, দেখ না এবার কি হয়? এরপর আর কথা নয়, ঠিক পরদিন থেকেই আবার হাইকোর্টে যাতায়াত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই উকিলদের উপাসনা, নথিপত্র নকল এবং কোন কোন নথি তরজমার কাজ। তবে এবার অফুরন্ত কাজ আর উপার্জনের ভলিউমটা একটু বেশী। পাকা কাজের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কুপার সাহেব তিন-চার মাস আগেই বিলাতে চলে গিয়েছেন। যাই হোক এইভাবে দশটি মাস, আমার জীবনের মর্মান্তিক যন্ত্রণার চরম হয়ে গেল, যখন অতিষ্ঠ অবস্থায় এসে পড়লাম তখনই যাথার্থ আমার শিল্প সাধনার পথ খুলল। এবার সেই কথাই বলব।

আমাদের বাড়ির কাছেই পশ্চিম দিকে, ঢাকাই কামারদের বাড়ি। কৃষ্ণধন বলে তাদের একটি ছেলে, একসঙ্গে শৈশবে আমরা উলঙ্গ খেলা করেছি। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল থেকে পাশ ক'রে বেরিয়ে এখন সারভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে ম্যাপ বিভাগে কাজ

করছে। সে ছিল ফার্স্ট ক্লাস লিথোগ্রাফার। তাছাড়া সকাল সন্ধ্যায় প্রাইভেট কাজ করত তাতে তার বিলক্ষণ উপার্জন ছিল। সে ছিল শিল্পী ও শিল্পের ভক্ত। বিশেষত ইটালিয়ান আর্টের পরম ভক্ত। আমার সঙ্গে তার প্রণয় ছিল গভীর, আর প্রত্যহ সকালে যেমন সে কাজে বসত নিত্য নিয়মিত, প্রত্যহ সকালে আমার ঘণ্টা-দু'ঘণ্টা তার কাজের কাছে বসে কাটত। আমার শিল্পপ্রেরণা তার কাছ থেকেই আর তার কাছ থেকেই প্রথমে আমি প্রাচীন ইটালিয়ান আর্টিস্টদের কথা, তাদের জীবনকাহিনী শুনি। শুধু গল্প নয়, তার কাছে প্রাচীন শিল্পীদের কাজের ভাল ভাল ছাপা আর্ট জর্নাল, কত কত এনগ্রেভিং কপির অনেক সংগ্রহ ছিল। সে সব আমায় দেখতে ছেড়ে দিত। এটি র‍্যাফেল, এটি টিশিয়ান, এটি দাভিঞ্চি, এটি করেজিও, এটি মুরিলো, রুবেন রেমব্রাঁ কোন কাজটি কার, তাদের তাদের বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। আসলে তখন থেকে র‍্যাফেলই আমার মন সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। এখনও পর্যন্ত তার চেয়ে বড় আর কাকেও আমি দেখি নি। ঐ অল্পায়ু মহাশিল্পীর জীবন-কথা সে আমায় কত যে শুনিয়েছিল, তার ঠিক নেই এবং পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী থেকে, ভ্যাসারিজ লাইফ অফ ইটালিয়ান পেণ্টারস্, বিরাট গ্রন্থখানি অধ্যয়নে প্রলুব্ধ করেছিল। সেটা অবশ্য কিছুদিন পরের কথা। কৃষ্ণধন জানত আমি হাইকোর্টেই কাজ করি আর তার কাছে বসে বসে এই যে ইটালিয়ান বড় বড় পেণ্টারদের কথা শুনি সেটা যেন তারই নির্বন্ধাতিশয়ে, আমার উপর ঐসব শিল্প ও শিল্পীর কোনও প্রভাব যে থাকতে পারে তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। আমি যে মনে মনে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার সংকল্প করেছি আর চিত্রশিল্প আমার জীবনে প্রধান অবলম্বন হবে একথা তখনও তাকে বলি নি। বাধা পেয়েই আমি আবার ঐ হাইকোর্টে ঢুকতে বাধ্য হয়েছি, একথাও সে জানত না। তাই, এবার যখন মনে মনে আগামী

জুলাই মাসে আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার দৃঢ় সংকল্প করেছি একথা তাকে জানালাম, সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারলে না, সে বলে তোমাদের যে চার পুরুষ হাইকোর্টের কাজ, তুমি ছেড়ে দেবে ?

হাইকোর্টে জাঁকালো নামটা সে জানে, কি রকম কাজ যে করি তাতো সে জানে না কাজেই প্রথমে বিশ্বাস করে নি, তারপর যখন তার বিশ্বাস হ'ল, তখন সে বলে কি,—এখনই তুমি বাগচী মশাইয়ের কাছে যাও ; তাঁকে ধরো, তিনি সব ঠিক ক'রে দেবেন। অন্নদাপ্রসাদ বাগচীমশাইয়ের উপর তার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। শুধু ঠিকানা বলে দেওয়া নয়, কোন্ সময়ে যেতে হবে, কিভাবে নমস্কার ক'রে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে হবে সব কথাই খুঁটিয়ে বলে দিলে। আমি তদ্দণ্ডেই যাত্রা করলাম।

কৃষ্ণধন ঠিক যেভাবে বলে দিয়েছিল সেইভাবেই সিকদার বাগানে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ঠাকুরদালানে তিনি ছিলেন, —আরও অনেকেই ছিলেন, তার মধ্যে একজন, পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম আশু মিত্তির, কালিকলমে তাঁর ছবি আঁকছেন, আর বাগচীমশাই চুপ ক'রে বসে আছেন কোন দিকেই চেয়ে দেখছেন না। আমি চুপ ক'রে একদিকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। বোধহয় আধ ঘণ্টাটাক কাজ হ'ল—প্রায় চার ইঞ্চি মুখখানা। তাঁর মানানসই গোঁফ, ছোট্ট দাড়ি ও খুব লম্বা পাকানো চুল মাথার ছুদিক থেকে নেমে বুকের উপর পড়েছে। আতুড় গা। বারেন্দ্র শ্রেণীর, তাই খাটো পৈতে। যাই হোক বাগচীমশাই আমায় উপেক্ষা করেন নি। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে এসেছি ? তাঁর পুরাতন ছাত্র কৃষ্ণধনের কথা বললাম।

আমার সকল কথা শুনে বললেন,—ওখানে কি করতে ঢুকবে, —ওরা আর পেন্টিং অর্থাৎ য়ুরোপীয়ান আর্ট শেখাবে না, এখন পোটোদারী শেখাচ্ছে। ইণ্ডিয়ান আর্ট যাকে বলে তাইই এখন

শিখতে হবে ওয়ানে ভর্তি হয়ে। পারবে? তারপর বললেন যে, —তিনিও আবার রিটায়ার করছেন, হরিনারায়ণবাবু হেডমাস্টার হচ্ছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক, তাঁর মুখ থেকে যা শোনা গেল তাতে দমে গেলাম। যদি অওেল পেন্টিং না শেখায় তবে কি শিখবো? বাগচীমশাইয়ের কাছ থেকে সটান কৃষ্ণধনের কাছে এসে সব কথা বললাম। কৃষ্ণধন মোটেই দমে গেল না, সে বললে, —চলে যাবার আগে হ্যাভেল সায়েব ওখানে ইণ্ডিয়ান আর্ট ইন্‌ট্রো-ডিউস্ করেছেন তাই কর্তাদের রাগ হয়েছে। অয়েল পেন্টিং ক্লাস ঠিকই আছে, যতদিন না নূতন প্রিন্‌সিপ্যাল আসেন ততদিন একটু অসুবিধা হবে, এই যা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন অস্থায়ী প্রিন্‌সিপ্যাল রইলেন। স্থায়ী প্রিন্‌সিপ্যাল এলে তখন আবার পুরোদমেই চলবে য়ুরোপীয়ান আর্ট। তার কথায় প্রাণে উৎসাহ এল। ফল কথা থার্ড জুলাই ১৯০৬, আমি আর্ট স্কুলে প্রবেশ করলাম। মেশোমশাই পূর্বেই উৎসাহ দিয়েছিলেন, এখন তিনি আরও দশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমার হাতে যে টাকা ছিল তাইতে কাপড় জামা জুতো আর কিছু কিছু মালমসলা কিনতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

স্কুল ভর্তি হবার পর মহা উৎসাহেই কাজ আরম্ভ ক'রে দিলাম। যেন আমার নূতন একটা জন্ম হ'ল। সে যে কি উৎসাহ ভাষায় প্রকাশ করা সত্যই অসম্ভব। যথার্থ এইবার মন বুদ্ধিতে আমার দ্বিজত্ব লাভই হ'ল।

প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে মাসে তিন টাকা করেই মাইনে, তারপর পাঁচ টাকা। ফার্স্ট ইয়ারে ব্ল্যাকবোর্ডে ক্লাসেই ঢুকেছিলাম। তামিল দেশীয় শ্রীযুক্ত টি.এ. আচারী তখন ছিলেন আমাদের মাস্টার। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, রোগা, তীব্র বাজখাঁই কণ্ঠস্বর, মাথার পিছন দিকে গ্রন্থি দেওয়া টিকিটি তাঁর সর্বদাই ঝুলত। বাংলা ভাষা কতকটা আয়ত্ত করেছিলেন। আরে, তুমি কিসি করতে পারো না অর্থাৎ তুমি

কিছুই করতে পার না। আরও একটা কথা—কি কশিলো এ্যাঃ অর্থাৎ কি করছিলে তুমি। এই কথা কয়টি বোধহয় প্রত্যেক ছাত্রই তাঁর কাছ থেকে প্রত্যহ শুনেছে।

চব্বিশ

সকালবেলা প্রায় নটার সময় তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে ২২নং চাষা-ধোপা পাড়া থেকে জোড়াসাঁকোর মোড় ধরেই হাঁটতে আরম্ভ করতাম। প্রায় ছয় মাইল পথ, সাড়ে দশটায় স্কুলে পৌঁছে যেতাম। তখন ঘোড়ার ট্রাম আর ছিল না, শহরে সবে ইলেকট্রিক্ ট্রাম চলতে শুরু হয়েছিল। কিন্তু আমার পক্ষে ট্রামে যাওয়া সম্ভব ছিল না, রোজ তিন আনা খরচ কোথা পাবো? এতে যে ক্ষতিটা হয়ে গিয়েছে তা কোনো রকমেই পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল না। ক্লাসে গিয়ে যখন খাতা পেন্সিল নিয়ে কাজ আরম্ভ করতাম তখন যা কিছু খেয়ে এসেছিলাম সবটাই অম্বল হয়ে গেছে। অবশ্য সে-সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতাম না। কাজে বসে কখনও উঠে কোথাও যেতাম না, এমন কি বাইরে যাওয়াও আমার অভ্যাস ছিল না। কি প্রবল আকর্ষণ ছিল ক্লাসের দৈনন্দিন কাজে, আমাদের মাস্টার যিনি তিনিও এটা লক্ষ্য করতেন। এইভাবে প্রথম মাসেই ফার্স্ট ইয়ারের কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ ক'রে ফেললাম। একটি কপিও বাদ দিই নি, কোন কাজ খানিক ক'রে কাল করবো বলে ফেলে রেখেও দিই নি। কাজ দেখে আচারী মাস্টার মহাখুশী, তিনি রেকমেণ্ড করলেন আর হেডমাস্টারমশাই আমাকে কপি ক্লাসে প্রমোশন দিয়ে দিলেন।

এই কপি ক্লাসে উঠেই আমার কাজের উন্নতি হয়েছিল। স্কুলে

আমরা যেসব কাজ ক'রে আসতাম, বাড়িতে এসে সেগুলি মেমারী থেকে আবার ড্রইং করতাম। তারপর ক্রমে ক্রমে কাজের গণ্ডি বাড়াতে আরম্ভ করলাম। বাড়িতে, ভাই বোনদের কাকেও বসিয়ে প্রথমে হাত পা, তারপর সারা শরীরটা, ক্রমে মুখাকৃতি অর্থাৎ পোর্‌ট্রেটেও ধ্যান দিতে আরম্ভ করলাম। আমার মূল উদ্দেশ্য ফিগার ডিজাইন, মূর্তি রচনা বা সৃষ্টি। প্রাচীন সভ্যতার যা কিছু আমাদের পৌরাণিক বিষয় তাই ছিল আমার প্রাণের জিনিস। ক্রমে ক্রমে অতিগোপনে ঐসব শুরু করছিলাম। ক্লাসের কাকেও তো নয়ই বাড়ির কাকেও দেখাতাম না।

এখানে এই সময়েই ভারতের একজন নীরব কর্মী উচ্চস্তরের ভাস্করের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এই কপি ক্লাসে প্রথমে হিরণ্ময়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ। তার গুণগ্রাহিতাই আমায় আকৃষ্ট করেছিল তার পানে। শিল্পবোধ তার অতি তীক্ষ্ণ। য়ুরোপীয় শিল্পের ভক্ত হলেও তার ইণ্ডিয়ান আর্টের উপর, বিশেষত অবনীবাবুর ছবি ও নন্দলালের ছবির উপর তার প্রাণের দরদ ছিল। পরে অবশ্য ভাস্কর্য-কলাই প্রধান অবলম্বন করেছিল এবং বিলাতি শিক্ষার যোগাযোগ হয়েছিল। কিন্তু যতদিন তার পথ ঠিক নির্বাচিত হয় নি—ততদিন এক সঙ্গেই এক শ্রেণীতে কাজ ক'রে চলেছিলাম। এই কপিক্লাসেই প্রমোশন পাবার কয়েক মাস পরেই অসিত হালদার ভর্তি হ'ল। শুনলাম, আসলে ইণ্ডিয়ান আর্টের কোর্স নিয়েই ঢুকেছে; ড্রইং-এ হাতটা ঠিক দুরস্ত করবার জন্যই অবনীবাবু তাকে কপি ক্লাসে কিছুদিন কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

হিরণ্ময় ও অসিতের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের ছাত্রজীবনের এক সন্ধিক্ষণেই ঘটেছিল আর সেটা ঐ সময়ে সুখের হয়েছিল। প্রায় আমরা এক সঙ্গেই বাড়ি ফিরতাম স্কুলের ছুটির পরে। রবিবার প্রভৃতি ছুটির বারে আমরা একজনের বাসায় মিলিত হয়ে য়ুরোপীয় শিল্পচর্চাই করতাম। হিরণ্ময়ের বাসায় আমি অনেকবারই

গিয়েছি। তার ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরী থেকে নানা ভাষার আর্ট জার্নাল, শিল্প-সম্বন্ধীয় অনেক দামী বই নিয়ে আসত, আমরা সবাই নানাভাবে তার ফলভোগ করতাম। এইভাবে য়ুরোপীয় শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

স্কুলে, তখন ব্ল্যাকবোর্ড ক্লাসের সেই প্রকাণ্ড হলভরা উৎকৃষ্ট অয়েলকলার আর্ট যাকে য়ুরোপীয় ক্লাসিক বলে তা ছিল। ল্যাণ্ডস্কেপ ও ফিগার বা অরিজীন্যাল ছিল আর ফিগার ডিজাইন বেশীর ভাগ পুরাতন স্কুলের উৎকৃষ্ট কপি ছিল অনেক। ছোট মাঝারী আবার দুই একখানা বড় ল্যাণ্ডস্কেপও ছিল, সে যে কি চমৎকার ছবি তা বর্ণনার ভাষা নেই। একখানা ছবি—সানসেট্ তার নাম নীল-নদের উপর সূর্যাস্ত। আর একখানি ছিল, মধ্যে বিশাল একটি নীলহ্রদ, তার চারদিকেই বিশাল পর্বতমালা। এই দু'খানা আমায় এমনই মুগ্ধ করেছিল যে আমি জীবনে আজও তাদের ভুলতে পারি নি। বিশেষত চারিদিকে পর্বতমালা মধ্যে নীল সরোবর ঐ ছবিখানি আমায় সম্মোহিত করেছিল। ইটালী বা সুইটজারল্যাণ্ডের কোন হ্রদের চিত্র হবে। ভবিষ্যতে নীলরাজ্য নামে একটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল আমাকে। মুরিলোর একখানা বেশ বড়, অর্ধ-গোলাকার ছবি ছিল, ছবিখানা বাইবেলের ছবি। সেখানা চট্ ক'রে প্রথম দৃষ্টিতে ভাল ধরা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সারা ক্যানভাসটা একটা গাঢ় ব্রাউন রঙের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছে মাত্র আর কিছুই নেই তাতে। কাছে গিয়ে স্থির হয়ে দেখলে ধীরে ধীরে তার ভিতরে দেখা যাবে এক বিচারালয়ের দৃশ্য। উঁচু আসনে বিচারক আর নীচে বন্দিনী গর্ভবতী এক সুন্দরী। কি ব্যাকুল কাতর দৃষ্টি তার,—বিচারকের পানে চেয়ে আছে, প্রহরী তখনও তাকে ধরে আছে। এই ভাবের ছবি—নীচের হলে ভরা ছিল। পিকচার গ্যালারী ভাঙবার পর ছবিগুলি এইভাবে নানাস্থানে

রাখা হয়। অনেকটা বেওয়ারিশ মালের মতোই ঐ সম্পদ নানা স্থানে ঘুরে বেড়াল কিছুদিন—তারপর ক্রমে ক্রমে সেসব অদৃশ্য হতে লাগল, তারপর নিশ্চিহ্ন। ১৯১১ সালে যখন বেরিয়ে আসি তখন আর একখানিও ছিল না। অত বড় আর্ট গ্যালারীর অতগুলি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কেমন ক'রে কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেল একথা আর্ট স্কুলের ছেলেরা কেউ জানে না। তবে আমাদের মতো তখনকার য়ুরোপীয় শিল্প ভক্তদের এই কথাই মনে হয়, হ্যাভেল সাহেব যে উদ্দেশ্যে যাই-ই কেন করুন না তিনি ঐসব উৎকৃষ্ট শিল্প নিদর্শন থেকে তখনকার বহু ছাত্র এবং রসপিপাসু শিল্পিদের বঞ্চিত করেছেন, এবং তাঁর ঐ চিত্রশালা সম্পৃক্ত কর্ম অনেকেই সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। এই সময়ে আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ থেকে ১৯০৬ এই চারটি বছর বাংলার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এ সময়টা নানাবিধ ঘটনা পরম্পরায় দেশকে গরম ক'রে রেখেছিল। এই সময়েই প্রথম টাউন হলে বিরাট সভা দেখেছিলাম, তার উপলক্ষ্য ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মৃত্যু। টাউনহলে এক বিরাট সভা হ'ল, উদ্বোধন করলেন কলিকাতার সেরিফ ব্যক্ষিয়ার সাহেব। তাইতে স্যার গুরুদাস ছিলেন, সুরেন্দ্রবাবু ছিলেন, র‍্যাটক্লিফ সাহেব স্টেটসম্যানের সম্পাদক,—আর যত প্রসিদ্ধ বক্তা,—হাইকোর্টের ব্যারিস্টার উকিল, তার উপর ঠাকুরবাড়ির বিশিষ্ট পোষাকে যত ছেলে, যুবা, বৃদ্ধ সব। সবার উপর প্রদ্যোত-কুমারের পাগড়িবাঁধা মুণ্ড আর বিলাতি সুটপরা মূর্তি, লাঠি হাতে প্রায় সর্বত্রই ঘুরে ঘুরে সকলকার সঙ্গে বিলাতি এটিকেট মতে মুচকে হেসে, ঘাড় নেড়ে আলাপ, কখনও লাঠিটা নাকে ঠেকিয়ে কৃতার্থ করা। ভগবান জানেন তার মধ্যে যথার্থ প্রীতি ছিল কিনা. আমার কিন্তু ওটি সম্পূর্ণ মৌখিক বলেই মনে হ'ল। স্যার গুরুদাস যখন মহর্ষির অশেষ গুণের প্রশংসা ক'রে তাঁর ধর্ম-জীবনের নিষ্ঠার

কথা বললেন তখন, ঠাকুর শব্দটি বলতে গিয়ে টাগুর বলেছিলেন। মনে হ'ল তিনি ইংরাজী বক্তৃতায় ঠাকুর বলতে চান না, আবার ইংরাজীতে টেগোর শব্দটাও এড়াতে চান—তাই মাঝামাঝি টাগুর বলেই যেন একটা রফা ক'রে নিয়েছেন। তারপর বললেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনি প্রথমেই বললেন এই যে মহর্ষি শব্দটি, এটা গভর্নমেণ্টের দেওয়া কোন টাইটেল্ নয়। এই মহর্ষি পদ তিনি নিজ ধর্মসাধনের দ্বারা অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর গুণগ্রাহী দেশবাসী তাঁকে মহর্ষি বলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এইভাবে তিনি এমন সুন্দর বললেন, আমরা সবাই একটা উত্তেজনা অনুভব করলাম। তারপর মতিলাল ঘোষ,—কি চমৎকার তাঁর ইংরাজী বক্তৃতা। কিন্তু সব চেয়ে মিষ্টি বললেন, স্টেটস্‌ম্যানের র‍্যাটক্লিফ সায়েব। তিনি বললেন, মানুষ ধর্মজীবনে কত বড় হতে পারেন, বিশেষত ভারতের এই প্রগতির যুগে যখন রাজনীতি প্রভৃতি অন্যান্য দিকের মতো ধর্মরাজ্যেও গভীর অন্তরদৃষ্টি অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধার্মিকদেরও মুগ্ধ করেছে। তাঁর ধর্মজীবনে প্রথম বিকাশ, তাঁর পিতৃঋণের বন্দোবস্ত,—এ রকমটা যে কোন জাতির ধর্মাত্মাদের জীবনেতিহাসে মহা গৌরবের জিনিস। তারপর গোখেল বলতে উঠলেন। এত সুন্দর তার ভাষা, এমন কোমল তার প্রকাশভঙ্গি জীবনে এমন শুনি নি। বহু লোক বলেছিলেন, সবার কথা আমি জানি না—রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমি চলে আসি। জীবনে এই প্রথম টাউনহল মিটিং দেখলাম আর সুরেনবাবুর বক্তৃতাও এই প্রথম শুনলাম। অবশ্য এটা আরম্ভ মাত্র। এর পরে বহুবার বাংলার তথা ভারতের তখনকার উৎকৃষ্ট বক্তাদের বক্তৃতা শোনবার সুযোগ ঘটেছিল। কারণ প্রায় তখন থেকেই বাংলাকে কেন্দ্র বা উপলক্ষ্য ক'রে সারা ভারত যে স্বাধীনতার উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—আজও থামে নি।

এর পরেই বোধহয়, টাউন হলে প্রোটেস্ট মিটিং এগেনস্ট পার্টিশন

অফ বেঙ্গল হ'ল,—ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি। সে যে কি বিশাল সভা, কথায় বলা যায় না। উপর হলে, নীচের হলে আর সামনের, তিনটিই বিরাট সভা এক সঙ্গে। সুরেনবাবু, অম্বিকা মজুমদার, রাসবিহারী ঘোষ, বিপিন পাল প্রভৃতি বোধহয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কেউ আর বাকী ছিল না। এটা গেল রাজনীতির দিক। ধর্মের দিকেও তখন কলকাতাবাসীর উত্তেজনার সীমা ছিল না। থিওসফি-ক্যাল হলে হীরেনবাবুর সভাপতিত্বে কত ভাল ভাল বক্তার বক্তৃতা যে হ'ত বোধহয় তার খুব কমই আমরা মিস্ করতাম। কুলদা-প্রসাদের ভাগবৎ-কথা ঐখানে প্রথম শুনি, বোধহয় প্রত্যেক রবিবারেই শুনেছি। তারপর এলেন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কি অপূর্ব তাঁর শক্তি উপাসনার ব্যাখ্যা। ধীর শান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষটি,—শেষের দিকে তিনি শ্রীমান রেবতীমোহন তাঁর উপযুক্ত ছাত্র বা শিষ্যের উপর ব্যাখ্যার ভার দিয়ে নেমে যেতেন প্লাটফর্ম থেকে। তাঁর শক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যার মূল কথা, তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গে প্রকাশ করেছি। খুব বেশী বোধহয় প্রতি সপ্তাহে একদিন আমরা কুলদা ভাগবৎ রত্নের কথা শুনতে যেতাম। বাংলা তখন জেগে উঠেছে, পথে পথে যেন শক্তির স্রোত। সরকারের দণ্ড অগ্রাহ্য ক'রে চলাই তখনকার ছেলেদের বৈশিষ্ট্য। ছাত্রদের মধ্যে এমন নির্ভীকভাব এর আগে কেউ দেখে নি।

আমার জীবনের বৈশিষ্ট্য যখন চিত্র-শিল্প শিক্ষার রূপ নিয়ে দেখা দিলে তখন শুধু চিত্র নয়, সাহিত্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব প্রেরণা তার সঙ্গে ছিল। সঙ্গীতে আমার জন্মগত অধিকার ছিল, কিন্তু গোড়াতে শিক্ষার জন্য ব্যকুলতা ছিল না। শুনে শুনে গান শিখতাম ও গাইতাম। এখন সেই উদ্যম ধ্রুপদ গান শিক্ষার জন্য প্রবল হয়ে উঠেছিল—সেকথা পরে। এখন সাহিত্য পরিষদের সভার কথা বলছি কারণ ঐ রকম সাহিত্য সভা, বোধহয় খুব কমই হয়েছে এই কলকাতায়। যদিও বড় বড় সাহিত্য-সভা এরপর

অনেকবারই এই কলকাতায় হয়েছিল এবং বহুজন সমাগমও নিশ্চয়ই তাতে হয়ে থাকবে কিন্তু এমন গুণী-জন সমাবেশ বোধ হয় আর হয় নি। এ সভাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন, ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোধহয় আচার্য জগদীশ সভাপতি হয়েছিলেন। আর পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি, প্রমথ চৌধুরী, অমৃত বোস, হেমেন্দ্রপ্রসাদ, শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী বোমকেশ মুস্তফী, পি. সি. রায়, মতিলাল ঘোষ প্রমুখ কত যে মহাত্মা সমবেত হয়েছিলেন তার কথা আর কি বলবো।

পাঁচটায় আরম্ভ। আমরা ভাল একটু জায়গা পাব বলে দুপুর বেলা থেকে তপস্যারম্ভ করেছিলাম। প্রথমেই সভাপতি নির্বাচনের পর রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠ হ'ল। সে প্রবন্ধ দীর্ঘ এবং মাতৃভাষার প্রতি প্রত্যেক বঙ্গ-সন্তানের যে কর্তব্য আছে তারই আহ্বান, মাতৃ-ভাষার অর্চনার অভাবেই আমরা আজও হীনবল ইত্যাদি, শেষে বলেছিলেন যে জননী আজ সন্তানদের মুখচেয়ে বসে আছেন কখন তাঁর সন্তানেরা মায়ের মন্দিরে সমবেত হয়ে এই মাতৃভাষাকে মুখ্য অবলম্বন করবে। তারপর রামেন্দ্রসুন্দর বললেন পরিষ্কার আবেগ-শূন্য ভাষায়, প্রথমে, যে দুঃখ ও দুর্দিনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার এই প্রতিষ্ঠানটি অর্থাৎ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তার সঙ্গে বললেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এতদিনের কাজের কথা। এখন ভাষার মধ্যে দিয়ে সে কাজ বিস্তৃত হয়ে বাঙালী জনসাধারণের প্রাণের মধ্যে তার আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাই তিনি প্রস্তাব করলেন এখন সাহিত্য পরিষদের ছাত্র সভ্য বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, যেখানে স্কুল কলেজের ছেলেরা নিঃসঙ্কোচে সাহিত্য আলোচনা এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করতে উৎসাহ পাবে। ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্যচর্চা এখন যেভাবে প্রসার লাভ করতে চাইছে তাতে আমরা আশা করতে পারি এই

সাহিত্য তাদের মধ্যে একটি নূতন শক্তির রূপ নেবে। বিশেষত এতে ছাত্রদের সাহিত্য সৃষ্টির উৎসাহ বেড়ে যাবে আর ছাত্রদের মধ্যে দিয়ে যে শক্তি প্রসারিত হবে তাতে আমাদের মাতৃভাষার ভিতর দিয়েই আমরা জাতীয় মুক্তির ধারে পৌঁছে যাব। চরম উন্নতির পথ এই মাতৃভাষার মধ্যেই আছে।

ঐ সভায় এই পরিষদের ছাত্র সভ্য নিয়ে একটি বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় আর সেটা কার্যকরী করতে যা যা করতে হবে তা ঐ সভাতেই স্থির হয়ে যায়। সঙ্কল্প আমার স্থির হয়ে গেল, সভ্য হতেই হবে, পরে তা হয়েও ছিলাম। এটা তো হ'ল কাজের কথা, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল বক্তা বাংলায় বক্তৃতা করলেন তা শোনাও একজনের মহাভাগ্য। সুরেশ সমাজপতির বাংলা ভাষায় বক্তৃতা যিনি শোনেন নি তিনি ধারণা করতে পারবেন না যে বাংলার ভাষা-সাহিত্যে কতবড় অধিকারী তিনি ছিলেন। একদিকে বিদ্যাসাগর অপরদিকে বঙ্কিম, এই দুই ভাষার কি অপূর্ব মিলন সমাজপতির ভাষায়। আর বাংলার লেখ্যভাষায় কি উচ্চস্তরের বক্তৃতা করা যায়। আমি আজ পঁয়ষট্টি বছর পূর্ণ করেছি, কিশোর কাল থেকে বাংলা বক্তৃতা কতই না শুনেছি, কিন্তু, ধর্ম বিষয়ক বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, আর সাহিত্য-প্রসঙ্গে সুরেশ সমাজপতির তুলনায় উচ্চ অধিকারী দেখি নি, আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের কথাই বলছি অন্য কথা বলি নি। বক্তৃতায় ক্লাসিক্যাল বাংলা সাহিত্যকে টেকনিক হিসাবে ব্যবহার, এমন নির্ভুল সহজ, সরল শুদ্ধ,—এবং গূঢ় অর্থপূর্ণ শব্দ প্রয়োগ বোধহয় সমাজপতি ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। সমাজপতির বক্তৃতা শুনলে একজনের সহজেই ধারণা হবে যে বাংলা ভাষা শুধুই মধুর নয় তেজস্বীও বটে। ঐ সাহিত্য পরিষদের সঙ্গেই সুরেশ চন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা সকলেই জানেন—আর তাঁর কয়েকটি বক্তৃতা ঐ সাহিত্য পরিষদের সভাতেই শুনেছিলাম। পরিষৎ সভায়

তিনি কখনই অনুপস্থিত থাকতেন না। তারপর আজ এই সভায় আরও অনেকের বক্তৃতা হয়েছিল—রসরাজ অমৃত বোসের বক্তৃতায় আমাদের অনেকেই হাসির দমকে অশ্রুপাত করিয়েছে। সকল রসই রসরাজের বক্তৃতায় ছিল, তাঁর প্রাণ ছিল 'উইট এণ্ড হিউমারে' পূর্ণ। এখন আর আমরা ঐ ধরনের বক্তৃতা শুনতে পাই না, রসরাজের কণ্ঠ অনেক দিনই নীরব হয়ে গেছে। এখনকার দিনে অর্থাৎ দেশের বর্তমান অবস্থায় মনে হয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতার দিন যেন চলে গিয়েছে। এখন, শেষের দিকে হীরেনবাবুর বক্তৃতা হ'ল। সবাই জানেন পরিষদের উচ্চ শিক্ষিত ভক্ত-সংখ্যা কম নয়; কিন্তু আমার মনে হয় হীরেনবাবুর সঙ্গে পরিষদের সম্বন্ধ যতটা দীর্ঘকাল-স্থায়ী, বাগাড়ম্বরহীন নীরব এবং গভীর ছিল এমন প্রতিষ্ঠাবান অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ছিল না। এতগুলি গুণের একত্র সমাবেশ খুব কম মানুষের মধ্যেই ঘটেছে। হীরেনবাবুর যে দিকটায় আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি সেটা ঠিক সাহিত্য-পরিষদের লাভালাভের দিক নয়, আসলে সেটা হীরেনবাবুরই অন্তর-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। না হলে রামেন্দ্রসুন্দরবাবুর সম্বন্ধ কম গভীর নয়।

শেষে সবার অনুরোধে বিশেষত রামেন্দ্রসুন্দর এবং আচার্য জগদীশের বিশেষ অনুরোধে রবিবাবু একখানি গান গাইলেন। সঙ্গে কোন যন্ত্র সাহায্য ছিল না, চলনসই একটা হারমোনিয়াম প্রথমে তাঁকে দেওয়া হ'ল বটে তা তিনি এক একটা পরদা টিপে-টাপে, গলার সঙ্গে অমিল দেখে সরিয়ে রাখলেন, শেষে—নিজের কোমল কণ্ঠেই গাইলেন,—'আমায় বলো না গাহিতে বলো না; একি হাসিখেলা প্রমোদের মেলা, কথা শুধু মিছে ছলনা। এসেছি কি হেথা যশের কাঙালী কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি, মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে মিছে কাজে নিশি যাপনা।'

সাহিত্যের সঙ্গে যেমন প্রথম জীবনে—সঙ্গীতের সঙ্গে কিন্তু তার চেয়ে তখন আমার সম্বন্ধ কিছু বেশী ঘনিষ্ঠই ছিল। তখনও

আমার প্রথম বিবাহ হয় নি, আমি সেতার শিখতে আরম্ভ করি। বিষ্ণুপুরের ত্রিলোচন ভট্টাচার্যমশাই আমাদের কাছাকাছিই থাকতেন, তাঁর কাছেই আমার হাতে খড়ি হ'ল। তিনি চমৎকার সেতার বাজাতেন, যদুভট্টের শিষ্য সম্প্রদায়ের একজন ছিলেন বলে তাঁর খাতির ছিল। যার গানের গলা আছে, একটি যন্ত্র শিখে তার তৃপ্তি নেই। আমার ধ্রুপদ শেখবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছিল। আমাদের পাড়ায় সুবোধচন্দ্র দে—তাঁদের বৈঠকখানায় প্রতি শনিবার রবিবার বড় বড় গাইয়ে আসত, বিখ্যাত মুরারী গুপ্ত মশাইয়ের শিষ্য মৃদঙ্গী সঙ্গত করতেন পাখোয়াজে। তখনকার কলকাতার যত উৎকৃষ্ট ধ্রুপদী খেয়ালী সবাই আসতেন মাঝে মাঝে। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী দুর্লভ ভট্টাচার্যমশাই যখন আসতেন তখন তাঁদের ঘরে লোক ধরত না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকে শুনত। তখনকার দিনে সে এক বিচিত্র ব্যাপার!

আমরা একদল পড়ার ছেলে রীতিমতো শ্রোতা ছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞ প্রবীণ গুণীদের কাছে তো শেখবার কথা বলা যায় না, তাঁরা তো হেসেই উড়িয়ে দেবেন, তোরা আবার ধ্রুপদ শিখবি কি? কাজেই আমরা উঁকিঝুঁকি মেরে দরজা জানালার আশপাশ থেকেই শুনে সুখী হতাম, আসরে আমাদের স্থান ছিল না। সবার মনের দুঃখ যিনি শোনেন এবং বোঝেন, তিনি কিন্তু শুনেছিলেন, বিধাতার অপূর্ব যোগাযোগে আমার যে ঐ ধ্রুপদ শেখবার সুযোগ হয়েছিল —সে এক নভেল ব্যাপার। সেই কথাই বলছি। শিক্ষার গুরু হলেন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চৌধুরী, চন্দননগরের অধিবাসী, তিনি কলকাতায় থাকতেন।

আমাদের বাড়ির পিছনে যে এখন গিরিশ পার্ক, সেটা আগে জোড়াপুকুর স্কোয়ার ছিল, আগেই বলেছি। সেই বাগানের দক্ষিণ দিকে একখানা জীর্ণ দ্বিতল বাড়িতে থাকতেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল দীঘলমশাই। পাটের দালালী করতেন, বড়

বেহ্লার ছিলেন এবং তখন তাঁর পসারও যথেষ্ট ছিল, চলনসই একটা ঘোড়াগাড়িও ছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী-সমাজে তাঁর সম্ভ্রম কিছু কম ছিল না। কিন্তু আমার কাছে দীঘলমশাইয়ের পেশাদারী সম্ভ্রমের চেয়ে অন্য একদিকে তিনি মহৎ বলে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি তখনকার বাংলায়, প্রসিদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ বীণকারদের একজন ছিলেন। ও ক্ষেত্রে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন কারণ তাঁর স্টাইল ছিল—আর তা অননুকরণীয়ই ছিল একথা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি। আমাদের এই চন্দ্রবাবু দীঘলমশাইয়ের সহকর্মী বা সহকারী ছিলেন। দীঘলমশাই বীণাকার আর চন্দ্রবাবু ধ্রুপদ ও খেয়ালে দক্ষ গায়ক।

একদিন মনের উদ্বেগে ছটফট করতে করতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঐ স্কোয়ারে বসে ভাবছি, কি ক'রে ঘরের অশান্তি থেকে বাঁচা যায়। দীঘলমশাইয়ের বৈঠকখানা থেকে বীণার ঝঙ্কার আসছে না? আর কথাবার্তা নেই, সেই ময়লা গেঞ্জি গায়ে, সোজা গিয়ে দেখি সম্ভ্রান্ত বাঙালী একদল স্থির সমাহিতচিত্তে শুনছেন তাঁর বীণা। জানালার ধাপের উপর বসতে যাচ্ছিলাম, প্রিয়দর্শন মধ্যবয়সী শ্রোতাদের মধ্যে একজন, ইনিই চন্দ্রকুমার চৌধুরী—এই খানে বোসো, বলে তক্তাপোশের উপরে তাঁর পাশেই আমায় বসালেন। আমি কখনও এটা আশা করি নি, বিশেষত ঐ সমাজে। যাই হোক যে রাগিণীর খেলা তখন চলছিল, অল্পক্ষণেই তা শেষ হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতা সকলেই তখন যেন ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। একজন তার মধ্যে বলে উঠলেন, এই হ'ল যথার্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, কত তপস্যার ফল— এসব নিয়ে কালচারের সৌভাগ্য কয়জনের হয়? অপর একজন বলে ফেললেন, দীঘল-মশাই, আপনার তিলক কামোদ শুনবো। কামানো দাড়ি ছাঁটা গোঁফ, প্রশস্ত ললাট, তাতে চন্দনের উর্ধ্বপুণ্ড্র, চন্দনলিপ্ত সোনার কবচে সোনার চেনে বাঁধা নাতিদীর্ঘ খর্ব দীঘলমশাই গৌরবর্ণ,

প্রৌঢ় ব্যক্তি। বেশ মোটাসোটা, মাথায় টাকের আভাস, গম্ভীর স্বর তাঁর। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কটা বেজেছে? ঘড়ি ছিল না সেখানে, একজন বললেন,—সাড়ে তিনটে চারটে হবে। শুনে তিনি বললেন,—তিলক কামোদের সময় নেই, গৌড় সারঙ্গ বাজাচ্ছি, শুনুন। তারপর আলাপ আরম্ভ হ'ল। গৌড় সারঙ্গের যে রূপ বীণায় তুললেন, এ অনির্বচনীয়, জীবনে এমন শুনি নি। সেই দিন যেন আমার সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নূতন জন্ম হ'ল।

যখন এই আসর ভেঙে গেল, তখন যিনি আমায় বসিয়েছিলেন, তিনি আমার পরিচয় কথা আরম্ভ করলেন। সব কথা শুনে বলেন কি, চলো তোমাদের বাড়ি দেখে আসি। এমন অযাচিত অনুগ্রহ বোধহয় এমন ক'রে কেউ পায় না। সেই যে বাড়ি দেখে গেলেন, বলে গেলেন, মনে থাকে যেন প্রতি শনিবার বেলা আড়াইটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত গানের, বিশেষত রাগ-রাগিণীর রূপ, তার কসরত দেখিয়ে দেবো। তুমি কী শিখতে চাও? বললাম,—ধ্রুপদ। শুনে বললেন,—তাইই হবে। এই সেতারটি তোমার তানপুরার কাজ করবে। লজ্জায় আমি সেতারটি বার করি নি, তিনি নিজেই পেড়ে সুর বেঁধে নিয়ে একখানি এমন সুন্দর বেহাগের গৎ বাজালেন। তৈরী হাতের কি মিষ্টি কাজ। যাই হোক চন্দ্রবাবুর কাছেই আমার হাতে খড়ি হ'ল। তিনি এখন থেকেই আমায় স্নেহের পাশে এমনই বেঁধে ফেললেন, কেমন করে তাঁর গানের বৈশিষ্ট্য, সুরের খোঁচ-খাঁচ, যেখানে যেটি ঠিক সেইখানেই সেটি আদায় না করিয়ে তিনি ছাড়তেন না। এইভাবে সেতার ও গান এই দুই শিক্ষাই চলতে লাগল ; এই নিয়ে আমার অনেকদিন কেটেছিল। তারপর ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে চিত্রশিল্প আমার জীবনের প্রধান হয়ে গেল। কিন্তু গান-বাজনা কিছুদিনের জন্য ঢিলে পড়লেও কারণ চিত্রশিল্পে তখন নবানুরাগ, সঙ্গীতের সঙ্গে আমার জন্মগত প্রাণের সম্বন্ধ, তা চিরকালের—যখনই চিত্র ঢিলে পড়ে তখনই গান

মাথা তুলে দাঁড়ায়। এইভাবেই দেখেছি সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রশিল্প নিয়েই আমার জীবন পূর্ণ,—তিনটির একটিকেও বাদ দেওয়া যাবে না। যদিও এখন আমার শিল্প-জীবনের কথাই বলতে হবে। মিনার মৃত্যুর পর আমার সাহিত্য কেবল পাঠের মধ্যেই প্রবল ছিল, রচনা বন্ধ হয়ে গেল।

দীঘলমশাইয়ের কথা আরও একটু আছে, এখানে এতটা শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন তিনি আমাদের কাছে, শেষে অর্থাৎ উপরের ঘটনার বোধ হয় মাস খানেক পরে এক বিকালে এমন একটি ব্যাপার চোখে পড়ল যার ফলে আমাদের মধ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বিপরীত দিকে টলে পড়ল। আমরা তাঁর বাড়ির সামনে, পার্কের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় এক বিকালে চু-কপাটি খেলা দেখছিলাম। দেখি একখানা পালকি হুম হাম ক'রে এসে নামলো সেইখানে যেখানে ছেলেরা খেলায় মশগুল। আমরা সরে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল একটি মহিলা চওড়া কালাপেড়ে ধোপদোস্ত কাপড় গহনা-গাঁটি পরা। উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গিনী, বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে দীঘলমশাইয়ের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখন একটা চাকর বেরিয়ে আসছিল তাঁর বাড়ি থেকে, সে দেখেই খবর দিতে গেল ভিতরে। অল্পক্ষণেই দীঘলমশাই এলেন বেরিয়ে, বজ্র গম্ভীর স্বরে বললেন,—নিকাল যাও ইহাঁসে। মহিলাটি বললেন,—কেন? আমি কি করেছি—আমায় এমন করে পায়ে ঠেলে চলে এসেছ? কোন কথা শুনতে চাই না,—খবরদার বলছি, চলে যাও, এখান থেকে, না হলে চাবুক মেরে তাড়াবো, বলে দীঘলমশাই হাতে সঙ্কেত করলেন চলে যেতে। উত্তরে সেই মহিলা বললেন, মারো না মারো, —তোমার হাতে চাবুক খেয়েই যাবো। আশ্চর্য, দীঘলমশাই মিথ্যা ভয় দেখাতেই যে ঐ কথাটা বলেন নি,—সবাই, আমরা অবাক বিস্ময়ে কতকটা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম। আমাদের তিনি মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। চাবুক লাও, হুকুম করতেই

কোচমান চাবুক নিয়ে এসে হাজির করলে, আর তিনি সপাসপ্ চালাতে আরম্ভ করলেন ঐ মহিলার গায়ে, পিঠে, সর্বাঙ্গে—বেরোও বেরোও, এখান থেকে, এই বলতে বলতে। মেয়েটি, সেই চাবুকের প্রত্যেক আঘাত পেয়ে চমকে চমকে উঠতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, মারো, মারো, আরও মারো। ভয়ে, বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমরা দেখলাম শেষ পর্যন্ত দীঘলমশাই ক্লান্ত হয়ে চাবুকটা ছুঁড়ে ফেলে নিজের বাড়িতে গিয়ে বসলেন আর সেই মহিলাও উঠলেন। এ দৃশ্য আজও ভুলতে পারিনি। এতগুলি চাবুকের আঘাত মেয়েটি সহ্য ক'রে শেষে চোখের জলে,—আচ্ছা চললাম, তুমি ভাল থাক, এই বলে চলে গেল।

এই সময়টা দেখেছি হয় গোলদিঘিতে না হয় হেদোর ধারে, না হয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির হলে, না হয় ওভারটুন হলে, না হলে কোথাও না কোথাও একটা মিটিং থাকতই, বোধহয় একটা দিনও বাদ যেত না। একদিন জেনারেল এসেমব্লি হলে 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক পাঁচকড়িবাবুর বক্তৃতা ছিল। কি ভেবে আমি ঐখানেই ঢুকলাম, যদিও মানুষটার উপর আমাদের তিলমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। পণ্ডিতের মতোই চেহারাটা, আকর্ণবিস্তৃত অধরোষ্ঠ। পাঁচকরিবাবু প্রবীণ লোক, নিজ জ্ঞান বিদ্যাবুদ্ধির একটু দম্ভ ছিল ; স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু, তা ছাড়া তখনকার বড় বড় শিক্ষিত যাঁরা তাঁদের সঙ্গে বিশেষত আশুবাবুর মতো একজন দিক্পাল ব্যক্তির অনুগ্রহভাজন বলে বেশ একটা তমো ছিল তাঁর। বেঙ্গল পার্টিসানের ব্যাপারে সুরেনবাবুর 'বয়কট অফ ব্রিটিশ গুডস' তখন চার দিকের নব্য-সমাজে মহা উত্তেজনা জাগিয়েছে—বিশেষত কলেজের ছেলেরা আগুন হয়ে আছে সেই সময় ঐখানে তিনি বক্তৃতা করতে উঠলেন। সামনের কটি দাঁত ছিল না, মুখব্যাদান তাঁর এক অদ্ভুত রকমের। এখন তিনি উঠে তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গিতে, বেশ ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে শ্লেষ, বিদ্রূপের সঙ্গে এখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় ছাত্রদের নামা

অন্যায়, ছেলেদের এতটা উত্তেজনার নিন্দা আরম্ভ করলেন ; স্কুল কলেজের ছেলেদের শক্তি কতটুকু, পুলিস দেখলে যারা ভয়ে পালায়, মুখের কথা ছাড়া তাদের সাহসের পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না, দেশের এসব ছেলেদের দ্বারা কি কাজ হবে ? ইত্যাদি।

আর বলতে হ'ল না, ঐ কলেজের ছেলেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। তাদের একজন সোজা দাঁড়িয়ে উঠল, তার বীরত্বব্যঞ্জক মূর্তি গৌরবর্ণ পাতলা শরীর, চোখে চশমা ; উঠেই ইংরাজীতে বলতে আরম্ভ করলে—এখনকার দিনে পাঁচকড়িবাবু কি চান যে স্কুল কলেজের ছেলেরা চোখকান বুজিয়ে কেবল স্কুলের পড়া মুখস্থ করবে ? আর তাদের গার্জনদের শাসনে গভর্নমেণ্টের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে তাদের সকল রকম অত্যাচার তাদের বাপ পিতামহদের মতো স্বীকার ক'রে জীবন ধন্য বোধ করবে ? বৃদ্ধত্বের চাপে এবং কালের প্রভাবে পাঁচুবাবুর মাথার ঠিক নেই, না হলে আজ তিনি যেভাবে মাতৃভাষায় দেশের ছাত্র-সমাজকে আক্রমণ করলেন তাতে লজ্জিত হওয়া উচিত। আজ আমাদের জাতীয় শক্তি বিকাশের মুখে ছাত্রদের তিনি দাবিয়ে রাখতে চান ? ছেলেটি মহা উত্তেজিত হয়েই বলছিল, আবেগে মাঝে মাঝে কথা তার আটকে যাচ্ছিল। ন্যাশন্যাল ডিমন্‌স্ট্রেশান, কথাটা অনেকবারই বলতে শোনা গেল তাকে।

যাই হোক এমন সময়ে দেখি মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধা, গায়ে মোটা চাদর জড়ানো, হাতে একটা লাঠি,—ব্রহ্মচারী বেশে আমাদের আর্য মিশনের তারকনাথ দাস উঠে,—বাংলায় বলতে আরম্ভ করলে, পাঁচকড়ি নামটা ভুলে, সে পঞ্চাননবাবু, আজ ছাত্র সমাজকে যে লজ্জা দিয়েছেন, বলে আরম্ভ করলে,—দেশের একজন অতি বড় কাপুরুষও আজকের দিনে নিজ দেশের ছাত্রদের প্রতি এমন অবান্তর, ন্যায়-নীতি-বিগর্হিত বাক্য কখনও প্রযোগ করতে পারত না। ব্যাপারটা অন্য দেশে, য়ুরোপ কি আমেরিকার কোথাও হ'লে আজ

তাঁর মতো একজনকে চরম দণ্ড মাথা পেতে নিতে হ'ত এই ছাত্রদের হাত থেকে। যে লোক নিজে পুলিসের ব্যাটনের ভয়ে সভা থেকে সবার আগে পালায়, ধরা পড়ে দণ্ড পাবার আগেই পুলিসের কাছে নাকে কানে খৎ দিয়ে এমন কাজ কখনও করবো না, প্রতিজ্ঞা করে—তার মুখে ছাত্রদের নিন্দা, যে ছাত্রদের কাজে প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষীরা গৌরব বোধ করেন। তাদের কাজের এভাবের কদালোচনা শোভা পায় না।

পাঁচকড়িবাবুর বিচিত্র ভাবের মুখখানির ছবি তখন একটা দেখবার মতো হয়েছিল। অতি কষ্টে একটা যেন উপেক্ষার হাসি। যেন বলতে চাইছেন ছেলেদের কাণ্ড দেখ—আর তাঁর বড় বড় ট্যারা চোখ দুটিতে, বুঝি মেরেই বা দেয়, এইরকম একটা ভয়ের ভাব, আর মুখে,—আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে, আমার ভুল হয়েছে, আমি ছাত্রদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে এমন ভেবে কিছু বলি নি বলে কতকটা ঠাণ্ডা করতে চেষ্টাও করলেন। কেই-বা শোনে তাঁর ঐ আমতা-আমতা ক'রে কথা; চারদিকেই একটা গণ্ডগোলের সূচনা হয়ে গেল। আমি তারকের কাছে গিয়ে তাকে যতই কেননা বসাবার চেষ্টা করি,—সে কোন দিকে না দেখে, ঐ পঞ্চাননবাবুর অত্যন্ত স্বার্থপর হীন বুদ্ধি, দেশের কাজে, তাঁর তুলনায় ছাত্রদের দরদ কতটা যে গভীর হতে পারে সেটা তলিয়ে না দেখে তাদের উপর এভাবে আক্রমণ; এটা কি অত্যন্ত অন্যায় নয়? বলে আক্ষেপে ওখানকার বায়ুমণ্ডল গরম ক'রে তুললে।

ঐ সভায় হীরেনবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনিই বোধহয় ঠিক সময় বুঝে উঠে ছাত্রদের সম্বোধন ক'রে বললেন,—বড়ই দুঃখের কথা যে আজ দেশের একজন প্রবীণের মুখ থেকে এমন একটা কথা বেরুল সেটা ছাত্রগণ আত্মমর্যাদায় আঘাত বলেই গণনা করেছে। তারপর, তিনি ছাত্রদের ধৈর্যচ্যুতি লক্ষ্য ক'রে বললেন,—বর্তমানে আমাদের দেশের ছাত্রেরা কোন প্রকারে অসংযত হবে এটা দেখতে

তিনি চান না, তার বদলে তিনি মৃত্যু কামনা করেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ তারা অবশ্যই করবে ; কিন্তু তারা অসংযত হয়ে, কালাকাল বিবেচনা না ক'রে উত্তেজিত হয়ে উঠে কেনই বা ধৈর্য হারাবে ? বলে অনেকটাই ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন, আমরাও চলে এলাম। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তারক জাপানে গেল আর রাসবিহারী বসু ও আমাদের পাড়ার ধীরেন লাহিড়ী আমাদের সহাধ্যায়ী গোবিন ক্ষেত্রী প্রভৃতির সঙ্গে গিয়েছিল। তারক সেখান থেকে আমেরিকায় চলে যায়, আজও সে প্রবাসী। ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের একজন আসামী বলে ভারত প্রবেশ তার নিষিদ্ধ ছিল। তবে আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে তার পত্রালাপ আছে।

পঁচিশ

আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীতে প্রমোশন পাবার পর কাজের প্রসার এতটা বেড়ে গেল, মনে হ'ত স্কুলের কাজগুলি যেন কিছুই নয়। প্রথম বৎসরের দ্বিতীয় মাস থেকে মডেল ড্রইংয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সকল কিছু আঁকার একটা সহজ পন্থা পাওয়া গিয়েছিল ফলে কাজের জোর বেড়ে গিয়েছিল অনেক। এখন আর আমার পক্ষে কোন কিছু আঁকা আর কঠিন বলে বোধ হয় না।

কৃষ্ণধন আমার দ্রুত উন্নতি দেখে খুশি হয়ে অফিস থেকে তিনটি তুলি, কয়েকটা ওয়াটার কলার কেক্ উৎকৃষ্ট সেব্ল হেয়ার ব্রাশ উপহার দিলে ; একটা তিন, একটা ছয় আর একটা দশ নম্বর। অত উৎকৃষ্ট মাল বাজারে পাওয়া দুষ্কর, পাওয়া যদি বা যায়, দাম ভয়ানক। শুধু তা নয়, কৃষ্ণধন আমায় ওয়াটার কলারে আঁকার পদ্ধতি, ওয়াশের কাজে দীক্ষাও দিলে। স্কুলে সে কাজ ধরতে

আরও ছ'মাস দেরি। অতদিন অপেক্ষা ক'রে লাভ কি। পাঁচ ছ'টা প্রাইমারী রং এনে দিয়ে সে আমার উৎসাহ বহুগুণে বাড়িয়ে দিলে। লাইট সেডের কাজ আরম্ভ করলাম চীনে কালি, ও তুলি দিয়ে। এইটি বেশ শক্ত কাজ, এইটিতেই হ'ল লাইট সেডের কাজে, আমার পেন্টিং শিক্ষার হাতে খড়ি।

পেন্সিলে মানুষ মূর্তি আঁকা লাইফ মডেল থেকে আগেই আরম্ভ করেছিলাম বাড়িতে। আমাদের আচারী মাস্টার এবং সন্তোষবাবু উভয়েই আমায় বিশেষ ক'রেই বলেছিলেন যদি সত্য সত্যই কাজের মানুষ হতে চাও কখনও আঁকা ছবি কপি করো না, যা কিছু করবে একেবারে ডাইরেক্ট অবজেক্ট থেকে করবে। এ জীবনে আমি কখনও একথাটা ভুলি নি। এটা আমার ছাত্রদেরও পরবর্তী কালে অনেক বলেছি। এখনকার ভাল ভাল লোভনীয় বিলাতী ছবি, ফিগার রচনা,—ল্যাণ্ডস্কেপ প্রভৃতি স্কুলের চারদিকেই ছড়াছড়ি, আর উপরের ক্লাসের ছেলেরা নির্বিবাদে তাকে কপি করেছে, সে কপি মাস্টারমশাইরাও দেখেছেন কিন্তু কেউ কোন কথাই বলেন নি। যাই হোক, এই কয় মাসে স্কুলের কাজ দেখে এই ধারণাই প্রবল হয়ে গেল যে এখানে শেখানো বলতে কিছুই হয় না, যে ছেলে নিজে চেষ্টা করে, নিজের বুদ্ধিতে কিছু করতে পারে তারই কিছু হয়, না হলে টিচারের সাহায্যে এখানে কারো কিছুই হবার নয়। এ হিসাবে বাগচীমশায়ের কথা ঠিক—যথার্থ শিক্ষার অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিল্প শিক্ষার বিষয় নৈরাশ্যজনক, বর্তমানে একথা যথার্থই ·

পূজোর ছুটির মধ্যেই কপি ক্লাসের কাজ শেষ হয়ে গেল। এর পরেই ফোলিয়েজ ক্লাসে প্রমোশন নিয়ে পূজোর ছুটিতে মামার বাড়ি যাই।

এবার পূজোর ছুটির দিন, সেদিন শনিবার ছিল, স্কুলে এক বিশেষ ব্যাপারে অনুষ্ঠান। হয়েছিল কি, নীচের হলে সকল শ্রেণীর ছাত্র ও শিক্ষকগণ নিয়ে একটি সভা। তখনও আমাদের স্থায়ী

প্রিন্‌সিপ্যাল আসেন নি, অবনীবাবুই অফিসিয়েট করছিলেন ; এখন তিনিই সভাপতি হয়ে একটি লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তাঁর ভাবের সঙ্গে এবং তাঁর ভাষার সঙ্গেও এই প্রথম পরিচিত হলাম। যে প্রবন্ধটি তিনি পাঠ করলেন তাকে ভারতীয় শিল্পের উপর ব্যবসায়ী ও অব্যবসায়ীদের অযথা আক্রমণের প্রতিবাদ বলা যেতে পারে। এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, ব্যবসায়ী বলতে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষিত স্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রবৃন্দ তা ছাড়া অন্নদা বাগচী, বামাপদ বন্দ্যো, রাজেন মুখো, যামিনী গাঙ্গুলী প্রমুখ লব্ধপ্রতিষ্ঠ তখনকার অয়েল-কলার আর্টিস্টবৃন্দ একধার থেকে সবাই যাঁরা বর্তমান ইণ্ডিয়ান আর্টের বিরুদ্ধে ছিলেন। আর অব্যবসায়ী বলতে সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ একদল সাহিত্যিক যাঁরা পাশ্চাত্য শিল্পকলার পরম ভক্ত, তাঁরা এখনকার ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনগুলি বিশেষত অবনীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র যা প্রবাসী মারফত দেশ-সমাজে প্রচারিত হচ্ছিল, সাহিত্য পত্রিকায় তার তীব্র সমালোচনার নামে কদালোচনা করতেন, তাঁদেরই আমি অব্যবসায়ী বলেছি। সেকালে কালী কাব্যবিশারদ যেমন 'হিতবাদী'তে রবীন্দ্রনাথের কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কবিতার উপর যে ভাবে রুচিবিগর্হিত আক্রমণ ক'রে নিজের এবং এক শ্রেণীর পাঠকের চিত্ত বিনোদন করতেন অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে সমাজপতি প্রায় সেই ভাবের আক্রমণ করতেন। একথা তখনকার শিক্ষিত ভদ্র সবাই লক্ষ্য করেছিল। আমরা শিল্পী বিদ্যার্থী যারা, তারাও ঐ ভাবের কদালোচনায় ব্যথা পেতাম—যদিও আমরাও আমাদের মন্তব্য দিয়ে ঐ সকল ছবির সমালোচনা করতে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরত ছিলাম না আমরা যে সমালোচনা করতাম তার মুখ্য উদ্দেশ্য তখনকার ইণ্ডিয়ান আর্টে এনাটমির দোষ, বিকৃত অবয়ব, মূর্তিগুলিই আমাদের কাছে ছিল অস্বাভাবিক ; এই অসঙ্গতির জন্য ক্ষোভ। ইণ্ডিয়ান আর্ট হ'লেই যে স্বাভাবিক শরীর সংস্থানের ব্যতিক্রম করতে হবে এমন কি কথা?

বিধাতার সৃষ্টি, যা সহজ, যা আমরা দিবারাত্র চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছি, কেন তা সেইভাবের স্বাভাবিক সৌন্দর্য লাবণ্যমণ্ডিত মূর্তি হবে না।

সমাজপতিদের এক থিওরী ছিল, তাঁরা বলতে চান রূপই আসল, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কি য়ুরোপীয় আর্ট বা কি ইণ্ডিয়ান আর্ট সকল আর্টই সমান। আর্টের জাতিধর্ম পৃথক নয়। এরা ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে এক কিম্ভূতকিমাকার শিল্প সৃষ্টি করছেন যা ছেলেখেলার সামিল, যে কোন দেশেরই হোক সৌন্দর্য প্রাকৃতনিয়মানুগই হবে। অন্যথা সেটা আর্ট বলেই গণনীয় নয়।

আচার্য বলেন, ইণ্ডিয়ান আর্টের মূল কথা ঠিক বাস্তব জগতের ব্যাপার বৈচিত্র্য নিয়ে নয়, তা হ'ল য়ুরোপীয় আর্টের মর্মকথা। প্রাচ্য শিল্পের যা কিছু এটা ভাব-রাজ্যের ব্যাপার। মানব মূর্তির রূপ বা সৌন্দর্য চিত্রে প্রকাশ করতে এনাটমির প্রয়োজনটা মুখ্য নয়, গৌণ; ঠিক ঠিক শরীর সংস্থানের উপর লক্ষ্য থাকলে ঠিক ঠিক মানুষ মূর্তিই চিত্রিত হয় কিন্তু তা ভাবানুমোদিত হয় না, সেইজন্য ভারতীয় শিল্পকলার তা আদর্শ হতে পারে না। ভাব জগৎ থেকেই ভারতীয় শিল্পের বিচার করতে হবে। রবি বর্মার ছবি যে এতটা চিত্তাকর্ষক তা পাশ্চাত্যকলার এবং বাস্তবের অনুকরণ বলে তাই, তার মধ্যে ভারতীয় শিল্প সম্পদ নেই। যে রূপ নয়নের সুখকর, সে রূপ যতই সুন্দর হোক না কেন তার মধ্যে হৃদয়রাজ্যের সম্পদ নেই বলে তা ভারতীয় শিল্প বলে গণ্য হবে না। তারপর বর্তমান ভারতীয় শিল্পে বা চিত্রে ঐ ক্ষীণ শরীর, লম্বা লম্বা আঙুল এইসব দেখা যায়, যা নিয়ে বাজারে নানাপ্রকার কদালোচনা হয়ে থাকে। তিনি বলেন,—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পদৃষ্টির অভাব থেকেই এসব হচ্ছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল আলাদা, মানুষের অতীন্দ্রিয় সত্তা নিয়েই বিচার সেখানে, সে দিক থেকে না দেখে পাশ্চাত্য ইহসর্বস্ব স্থূল সৌন্দর্য উপাসকের দৃষ্টিতে দেখলে ঐরকমই দেখাবে

তাতে চিত্রের আসল ভাব থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সুতরাং ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতিতে আঁকা ছবিতে যেখানে নর-নারীর শীর্ণ শরীর দেখা যাবে (যেমন তাঁর আঁকা বিরহী যক্ষ প্রভৃতি) সেখানে বুঝতে হবে এটা সাধারণ ভোগবিলাসে গঠিত জাগতিক স্থূল শরীর নয়, এ শরীর তপস্যায় ক্ষীণ, (তপক্লিষ্ট শরীর) অন্তরের শক্তিতে উজ্জ্বল,—এ সকল শরীরের রেখায়তন ভঙ্গী যা কিছু তা ভাব জগতেরই বিষয়। কাজেই বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীটা না বদলালে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে না, বা তা থেকে রস পাওয়া যাবে না। এতদিন আমরা ঐ পাশ্চাত্য শিল্পকলার স্থূল বাহ্য সৌন্দর্য দেখতেই অভ্যস্ত হয়েছি, প্রাচ্য ভাববিমুখতাই এখন আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়েছে, আমাদের নিজ ঘরের শিল্পের মধ্যে যে বিচিত্র, সৌন্দর্যের আকার রয়েছে তা দেখতে দিচ্ছে না। ইণ্ডিয়ান আর্টিস্টিক এনাটমি, ব'লে তার একখানি বই আছে তাতে দক্ষিণ ভারতীয় এবং উড়িষ্যার ভাস্কর্যকলান্তর্গত মূর্তির তাল অর্থাৎ মাপযোগের কথা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আদর্শ ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

এখন এই যুক্তির সঙ্গে এদেশের সাহিত্যিকদের যুক্তির যে বিরোধ, যা নিয়ে তখনকার শিক্ষিতদের সঙ্গে শিল্পী, অর্থাৎ ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির প্রবর্তকদের যে মতবিরোধ তা নিয়ে আলোচনারও সার্থকতা আছে। সেইটিই এখন বুঝতে হবে।

তখনকার দিনে দেখেছি শিক্ষতদের মধ্যে দুটি বিভাগ হয়েছিল ; তার মধ্যে একদল, তাঁরা ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির ভাবের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা পূর্ণভাবেই বর্তমান, যেমন ডাঃ সুনীতি চাটুয্যে, ডাঃ কালিদাস নাগ, অমিয় চক্রবর্তী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি —তাঁদের কথা বলবো না, কারণ এই নব্য ভারতীয় শিল্পাদর্শের সঙ্গে তাঁদের প্রীতি তো ছিলই এবং গভীর শ্রদ্ধাও ছিল।

শিক্ষিত সম্প্রাদায়ের অপর যে দল তাদের কথাই আলাদা। শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি, তাঁরা স্বীকার করেন না যে শিল্পরাজ্যে সৌন্দর্যবোধের অথবা নরনারীর সৌন্দর্য অনুভূতির দেশ বা জাতি হিসাবে চিত্রশিল্পর রাজ্যে কোন পার্থক্য আছে। যে রূপটা য়ুরোপীয় শিল্পীর তুলিতে সুন্দরের দৃষ্টান্ত বলে গণ্য হয়, বা হতে পারে, ভারতীয় শিল্পীর চোখে এবং তুলিতে, তা সুন্দর বলে স্বীকৃত হবে না কেন? সৌন্দর্যের আবার জাতিভেদ আছে নাকি? এখন দ্বন্দ্বটা এই শিল্পের জাতিভেদ নিয়ে। প্রাচ্যবিদ্ যাঁরা,—শিল্পীই হোন বা সাহিত্যিকই হোন, তাঁরা বলেন,—শিল্পে জাতিভেদ আছে বৈ কি? জাতিভেদের মূলে আছে সংস্কার। য়ুরোপীয় শিল্পীরা যে ছবি আঁকে, তাদের এই প্রবৃত্তির পিছনে নিজ দেশীয়, বা সামাজিক সংস্কার আছে যা তাদের অঙ্কন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে, আর সেই সংস্কারকে ধরেই একটা বিশিষ্ট ধারায় তাদের সৃষ্টি প্রসারিত হয়। ওরিয়েণ্ট্যাল বা প্রাচ্য ভূমিতেই একটা সংস্কার আছে সেই সংস্কার থেকেই তাদের সাহিত্য শিল্প নৃত্য ও সঙ্গীত কলার সৃষ্টি প্রবাহ মান্ধাতার আমল থেকে গতিশীল। এর ইংরেজী নাম ট্রাডিসান।

একটা বিশিষ্ট পদ্ধতির ধারা ধরেই সকল দেশের সকল শিল্পই চলে থাকে। তারপর সৌন্দর্য বোধেরও তারতম্য আছে। রূপ বা নর-নারীর সৌন্দর্যের মূল যে অনুভূতি, এরও তারতম্য আমরা কি দেখতে পাই না ভিন্ন দেশের সংস্কারগত বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে? মিলো দ্বীপ থেকে হাত ভাঙা যে ভিনাসের মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল,—য়ুরোপীয় শিল্পী এমন কি ঐ ভূমির আপামর সাধারণের চোখে সেই মূর্তির নারী সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু প্রাচ্যের কোন শিল্পী তাকে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা বলে স্বীকার করতে পারেন কি? এইখানেই সংস্কারগত পার্থক্য। তারপর ভারতীয় পদ্ধতি, বা প্রাচীন শিল্পপ্রবাহ, অজন্তা, বাঘ প্রভৃতি গুহায় যেসব নিদর্শন

এখনও কিছু কিছু আছে, কালের প্রভাবে অথবা যে কোন কারণেই হোক এক সময়ে ঐ ধারা বন্ধ হয়ে যায়। তার কতদিন পড় কাংড়া, তারপর রাজপুত, তারপর মোগল যুগে আবার শিল্পপ্রবাহ চলেছিল। এখন একদল প্রাচ্যশিল্পী বলেন, অজন্তা গুহার চিত্রই হ'ল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির পরাকাষ্ঠা বা সর্বোচ্চ পরিণতি। তাঁরা সেইভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই ঐ অজন্তার পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বহু চিত্রকলা সৃষ্টি করেছেন। আবার একদল শিল্পী আছেন যাঁরা অজন্তা গুহাচিত্রকে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির, —অথবা আলঙ্কারিক শিল্পের পরাকাষ্ঠা বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন। কারণ এই গুহা-চিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায় যার জন্য তাকে ভারতীয় চিত্রকলার চরম পরিণতি বলে মেনে নেওয়া চলে না। আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, পূর্ণাঙ্গ পুষ্ট হবার পূর্বেই যে কোন কারণেই হোক অজন্তা গুহা চিত্রাবলী সৃষ্টির পর ভারতীয় শিল্পকলা প্রবাহ রুদ্ধ হয়েছিল এবং বহুকাল পরে যখন আবার ভারতীয় হিন্দু জাতীয় জীবনে শিল্প-প্রবাহ সচল হয়েছিল কাংড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে, তখন তা আর পূর্ব প্রবাহ ধরে চলে নি, ভিন্ন খাতেই চলেছিল। তার প্রমাণ চিত্রশিল্প সৃষ্টি আকারে ক্ষুদ্র এবং পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। মোগল যুগেব আলেখ্য, আকারে ক্ষুদ্র হলেও পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য এবং রেখায়তনভঙ্গীর দিক দিয়ে অতীব উচ্চ স্তরের পরিণতি। ও এক বিচিত্র পদ্ধতি, নিজ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যাই হোক এখনকার এই নব অভ্যুত্থানের সময় ভারতীয় শিল্পের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য এসে মিলেছিল যে জন্য জগতের শিল্পকলা সমাজে তার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। পরবর্তীকালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ যে শিল্পীরা নব্য ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁদের জীবন ও শক্তি উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের পথ নির্বাচন ভুল করেন নি এবং তাঁদের কাজে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের জন্য এক বিশাল রাজপথ

উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের তখনকার যে মনোভাব তা পাশ্চাত্য শিল্পকলার ঐশ্বর্য নিয়েই মশগুল,—ইণ্ডিয়ান ট্রাডিসানের কথা ভাববার অবসর কোথা? এ সত্য আমরা কেন অস্বীকার করতে যাব? তখন, যখন আমরা য়ুরোপীয় ট্রাডিসান নিয়ে তাকে নিজস্ব ক'রে নেবার কসরতে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি তখন অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ শিল্পীগণ ভারতীয় শিল্পকলার ট্রাডিসান নিয়ে দিব্য সহজ অভ্যুদয়ের পথে এগিয়ে চলেছেন। আমরা তাঁদের ছবির যে সমালোচনা করেছি তাও ঐ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই। ভারতীয় কলা বা চিত্রশিল্পের সংস্কারগত যে বৈশিষ্ট্য আছে তা তখনকার আমরা স্বীকার করা দূরে থাক, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনভিজ্ঞ; অবশ্য একথাও সত্য যে পরবর্তীকালে যখন সে দৃষ্টি খুলেছিল, ভারতের কলা-বৈচিত্র্যের স্বরূপ যখন ধ্যানে ধরা দিয়েছিল তখনই য়ুরোপীয় শিল্পের মোহ খসে গেল, যেমন যথা সময়ে গাছের পুরনো বাকল খসে যায় সেই রকম; আর তখনই এই ভারতীয় শিল্পকে মন-প্রাণ দিয়েই আপন ক'রে নিতে পেরেছিলাম, যেমন আমাদের পূর্ববর্তী শিল্পীরা পেরেছিলেন। আর তখন থেকেই ভারতীয় পদ্ধতিতেই আমার কর্ম সাধনার স্তরে পৌঁছেছিল। শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবনের এই যে গতি এতে অনুশোচনার কোনই কারণ নেই। অবনীন্দ্রনাথও প্রথমে পাশ্চাত্য শিল্পেই মশগুল ছিলেন তারপর যখন ভাবের প্রভাবে ভারতীয় চিত্রকলা রসের আস্বাদন পেলেন তখন কি আর পরদেশীয় অনুরক্ত থাকতে পারলেন? এতে তাঁর গৌরবের কোন হানি তো হয় নি বরং গৌরব বেড়েছিল সবাই তা জানে।

তখনকার মাসিক তিনখানি—সাহিত্য, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন নবপর্যায়ের কাজ পূর্ণ উদ্যমেই চলছিল। রবীন্দ্রনাথের অন্য কোন নভেলই মর্মস্পর্শ করে নি। এক 'গোরা'ই আমাদের প্রাণকে পূর্ণ

করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আর অবনীন্দ্রনাথের ছবি, প্রবাসীতেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হ'ত। সেই সকল ছবির অরিজিন্যাল দেখবার সুযোগ ছবির সমালোচকদের ছিল না; তা আমাদেরই ছিল, কারণ আমরা ছিলাম ছাত্র, আমাদের অবাধগতি স্কুলের সকল ক্লাসে। তা ছাড়া অবনীবাবু তখন স্কুলে তাঁর ঘরে বসেই আঁকতেন। কখনও কখনও তাঁর ক্লাসেও নিয়ে আসতেন, তাঁর কাজ তখনই আমরা দেখতাম। তা ছাড়া নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী প্রমুখ তখনকার ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা অবাধ ছিল।

ছাব্বিশ

আর্ট স্কুলে প্রবেশ,—প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পর তৃতীয় ধাপে, পুজোর ছুটির দু-চার দিন পূর্বেই ফোলিয়েজ ক্লাসে প্রমোশনের কথা বলেছি। ছুটির দিনগুলিও আমার বৃথা যায় নি, অনেকগুলি লাইফ স্টাডি করেছিলাম, মামার বাড়িতে। আরও,—আরম্ভ করেছিলাম গাছপালার নানা রূপ, প্রাকৃতিক দৃশ্য, যদিও এখনও আকাশকে ধরতে পারি নি। কারণ, ল্যাণ্ডস্কেপের ক্ষেত্রে, বড়ই শক্ত ঐটি,—সবাই জানেন। ল্যাণ্ডস্কেপের রচনায় আকাশ ও পোর্ট্রেটে চুল ও ড্রাপারী, অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়।

নানা ভাবের শিল্প রচনায় ছুটি কাটিয়ে ফিরে এলাম। ফোলিয়েজ ক্লাসের কাজটা ছিল সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ছাত্রদের এই লতা-পাতা-ডাল-পাল প্রভৃতি স্টাডির ভিতর দিয়েই উদ্ভিদ প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়,—এই পরিচয় শেষ পর্যন্ত সর্বোচ্চস্তরে মানুষ মূর্তির অনুশীলনেই চরম স্ফূর্তি পায়। আমাদের এত

উপকার হয়েছিল এই ক্লাসের কাজে যাতে ড্রইংয়ের সব কিছু জটিল বিষয় সহজ হয়ে গিয়েছিল। উপেনবাবু ছিলেন শিক্ষক। তিনি বলতেন একটা গাছের পাতা আর তার সঙ্গে ডালের সম্পর্ক, যে ঠিক দেখাতে পারবে তার পক্ষে মানুষের অথবা পশু-পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীবমূর্তি আঁকা অত্যন্ত সহজ হবে। একথা বর্ণে বর্ণে সত্য। কিন্তু বেশীরভাগ ছেলে দেখেছি এদিকে মনই দিত না। দিনের মধ্যে মাত্র দুঘণ্টা ফোলিয়েজ স্টাডি; তারপর মডেল ড্রইং আছে, অর্নামেণ্ট্যাল ডিজাইন প্রভৃতি নানা বিষয় ছিল; তাও অনেকেই ফাঁকি দিত।

সুখের বিষয় এখন থেকে আবার মডেলিং ক্লাস খুলল। আগে কৃষ্ণনগরের একজন শিল্পী মহেশ কিংবা উমেশ পাল ছিলেন মাস্টার। তিনি চলে যাবার পর এতদিন বন্ধ ছিল, এখন আচারী মাস্টারের অধীনে অথবা খবরদারীতে আবার ক্লাসটা খোলা হ'ল। আচারী মাস্টার ছিলেন যেন দ্বিতীয় বিশ্বকর্মা। কেউ যদি বলে তিনি এ কাজটা জানেন না—তাহলেই তার আর রক্ষা নেই। হিরণ্ময়, অসিত, আমি এবং আরও কয়েকজন ভর্তি হয়ে মাটি ঘাঁটতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। আচারী আমাদের বুঝিয়ে দিলেন তিনি ছাড়া এই কাজ শেখানো আর কারো পক্ষে সম্ভব নয় এই স্কুলে। হীরু তো মডেলিং ভালই করত, পরে সে এই বিষয় নিয়েই বিলাতে গিয়েছিল শিখতে। তাতে আচারী দুঃখ ক'রে যা বললেন, তার তাৎপর্য হ'ল,—আমার কাছ থেকে চলে অন্য জায়গায় গেলে কি হবে, আমার চেয়ে ভাল কেউ শেখাতেই পারবে না।

বছর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার রং নিয়ে কাজ করবার প্রবৃত্তি উদ্দাম হয়ে উঠল, এক বিচিত্র উপায়ে সব কিছুই যোগা-যোগও ঘটে গেল। আর একদিকে আমার একটু ভালও হয়ে গেল। প্রথম বৎসর পূর্ণ হবার আগেই একটা কাজ এমন বেরিয়ে গেল যাতে আমাদের বাড়িতে কর্তাদের এই রকমের একটা বিশ্বাস

জন্মাল যে আমি শেষ পর্যন্ত শিখতে এবং উপজীবিকা বলে এই বৃত্তিতেই সফল হতে পারব। ঠাকুর্দামশাইয়ের একখানি ফটো থেকে তাঁর একটা লাইফ সাইজ বাস্ট পোর্ট্রেট করেছিলাম। সেটা ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট হলেও তার এফেক্ট চমৎকার হয়েছিল। কাজখানিতে সিদ্ধিলাভ ক'রে আমি যেন সবারই একটু অনুকম্পার পাত্র হয়ে গেলাম। কাকাবাবু, সেই প্রথম থেকেই মাসে একটাকা ক'রে সাহায্য করতেন, এখন রং তুলি কিনতে কিছু দিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমার এ উদ্যমে সিদ্ধিলাভ হবেই। তাঁর বিশ্বাস এখন তাঁরই প্রবল বক্তৃতার প্রভাবে বাবার মধ্যে সংক্রামিত হ'ল, ঐ ঠাকুর্দামশাইয়ের ছবিখানি দেখে। কিন্তু তার ফল হ'ল বিপরীত। তিনি মেয়েমহলে প্রস্তাব করলেন যে এও চলুক সকাল বিকালে, আর আপিসও চলুক সারা দিনটা, তাতে দুদিকেই রোজগার হবে। অবশ্য আমায় তা প্রত্যাখ্যান করতেই হ'ল কারণ এখন শেখার কাজ বন্ধ দিয়ে কলম পিশতে হাইকোর্ট যেতে প্রবৃত্তির অভাব। তাইতে আবার তিনি বিমুখও হলেন। একথা আমরা জানি যে তাঁর মেজাজ প্রসন্ন বা অনুকূল হতেও যতক্ষণ, অপ্রসন্ন বা প্রতিকূল হতেও বেশী সময় লাগে না। ফলে দিন কতক অশান্তি ভোগ চলল আমার অদৃষ্টে। তবে এখন আর প্রহার ছিল না।

ছোট, মাঝারি, বড় সব রকম বোর্ড দু'তিনখানি সংগ্রহ করেছিলাম। একখানা ইজেল এখন বড়ই দরকার—বাড়িতে কাজ করতে। একদিন স্কুলের পথে, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে এক নিলাম-ঘরে দেখি একখানা ছোট ইজেল রয়েছে, সাড়ে চার থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যে। দাম জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, বেশী নয় মাত্র চার টাকা। কোটপ্যাণ্ট পরা, ইংরাজী ধরনের ট্যাঁস ফিরিঙ্গি লোকটি ছিল গায়ের রংটা আমাদেরই মতো। সাহস ক'রে বললাম, স্যার আমি স্টুডেণ্ট, গরীব—অনুগ্রহ ক'রে যদি আর একটু কম করেন তা হলে আমি নিতে পারি এটা। তিনি বাংলায় জিজ্ঞাসা

করলেন, কত হলে তোমার সুবিধা হয়? বললাম, তিন টাকা হলে আমার পক্ষে সহজ হয়, যদিও বলতে লজ্জা হয়। কি ভাগ্য আমার, তিনি প্রসন্ন হয়ে বললেন, তাই দিও। স্কুল থেকে ফেরবার সময় সেটা হাতে নিয়ে মহা আনন্দেই বাড়ি ফিরছি; বিধাতার বিধানে আজ এতদিন পর অভয়ের সঙ্গে দেখা। আমরা ফিফথ ক্লাসে এক সঙ্গেই পড়েছি। দীর্ঘকাল পরে এই দেখা, শান্ত স্থির স্বভাব। ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে আমারই বেশী ছিল, পড়াশুনায় সে তেমন ভাল ছিল না। তবে আমার কাছে তার অন্য আকর্ষণ ছিল। বটতলার আরব্য পারস্য ও তুরস্ক উপন্যাসের বোধহয় সব গল্পই তার মুখস্থ ছিল। তার মতো এমন মিষ্টি গল্প করতে কাকেও শুনি নি। তার গল্পের মোহ আমায় ঐ সময় কঠিন দণ্ডভোগ করিয়েছে। যাই হোক এখন সবার বড় সুখের কথা এই যে সেও পেন্টিং শিখছে, বউবাজারে, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের কাছেই অধ্যক্ষ রণদাবাবুর প্রতিষ্ঠিত জুবিলি আর্ট একাডেমিতে। আগেই তাঁর ইতিহাস আমাদের শোনা ছিল, আর্ট স্কুলের রিভোল্টিং স্টুডেন্ট, বিখ্যাত, পূর্ববঙ্গের রণদাপ্রসাদ গুপ্তের কথা,—তিনি মারামারি ক'রে স্কুল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের চেষ্টায় এবং দেশের বিত্তমান বন্ধুবর্গের সাহায্যে নূতন আর্ট স্কুল স্থাপন করেন। জুবিলি আর্ট একাডেমি নাম দিয়েছিলেন স্কুলের, কুইনের ডায়মণ্ড জুবিলির সময় স্থাপিত হয়েছিল বলে। অভয়ের সঙ্গে আমার এই যে পুনর্মিলন, যথার্থই আমার জীবনে এই সময়ে এতবড় একটি সৎসঙ্গের অভাব পূর্ণ করেছিল, সে কথা বলবার নয়।

তখন দুজনে মিলে যত সুখ-দুঃখের কথা। আর্য মিশন ছাড়বার পর তার শরীরের উপর দিয়ে অনেক দুঃখ গিয়েছে। ছাত্রাবস্থায় স্বাস্থ্য ভঙ্গ বড়ই দুঃখের, এখন তার শরীর সম্পূর্ণ নয়। চোর-বাগানে তাদের বাড়ি, একদিন গিয়ে দেখে এলাম, সেও আমাদের বাড়িতে এল পরদিন। এইভাবে চলল আমাদের কাজকর্মের

মধ্যে বন্ধুত্বের সহযোগ ; স্কুলে যতটা হোক বাড়িতে আমার রংঙের কাজ কিছু বেশী রকমই চলছিল। তখনও অয়েল কলার ধরি নি, জলের রং দিয়েই সব কাজ করতাম। অভয় আগাগোড়াই অয়েল কলারের কাজ করত। কাগজের দামও কম নয়, রঙের দাম তো নয়ই ; পয়সার বড় দরকার, অভয় আমার জন্য দু' জায়গায় কাজ যোগাড় করলে। একটা প্রাইভেট টুইসানি, তাদের পাশের বাড়িতে একজন পশ্চিমা ব্যবসায়ীর দু'টি ছেলেকে ইংরাজী পড়ানো, তাতে ছ'টাকা মাইনে, আর ডাঃ এস. সি. পালের 'হরিতৈলে'র দোকানে বিদেশ থেকে যে সব ইংরাজী চিঠিপত্র আসে, যথারীতি তার উত্তর দেওয়া। মাদ্রাজ প্রদেশের অনেক গ্রাহক ইংরাজীতে পত্র দেয়, তাদের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়াই আমার কাজ, অথচ মাইনেটি শুধু দশ টাকা। এই কাজ দুটি একটি বিকালে বা সন্ধ্যার দিকেই করতে হ'ত, ছেলেদের পড়ানোটা সন্ধ্যার পর।

শিক্ষার কাজ তো চলছিলই তা ছাড়া এখন থেকে এক সঙ্গেই আমরা দুজনে স্বদেশী মিটিংএ যেতাম। প্রতি বুধবারে আদি ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনায়ও যোগ দিতাম, রবিবারে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে। আগে শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পর্কিত স্থানগুলিতে যেতাম এখন এই ভাবে মনের গণ্ডী প্রসারিত হতে চলেছিল, অভয়ের সঙ্গে যোগা-যোগের ফলে। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে এবং বেলুড় মঠে যাতায়াত ছিল বিবেকানন্দের—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব সময়ে। কাঁকুড়-গাছিতেও ভক্ত রামচন্দ্রের আশ্রমে যোগবিনোদ ছিলেন কর্মকর্তা, সেখানে বেলুড় থেকেও সন্ন্যাসীরা নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দিতেন। অনেককেই দেখতাম, তার মধ্যে বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ, তুলসী মহারাজ, বুড়ো মহারাজকে ও মহিনদাকে দেখতাম—মনে আছে। এইভাবে আমার শিল্পবিদ্যা অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে একটি অধ্যাত্ম প্রেরণাও কাজ করছিল, যা তখন সম্পূর্ণরূপে আমার বাহ্য প্রকৃতিতে ধরা দেয় নি।

অভয়ের তখন বিবাহ হয়েছিল, তবে কোন সন্তান হয় নি। স্কুলের শিক্ষাতেও তার জোর ছিল না। যদিও রণদাবাবুর উপর তার শ্রদ্ধা ছিল কিন্তু রণদাবাবুর শক্তি, কর্মদক্ষতা, অভয়ের দুর্বল শরীর মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। স্কুলের কাজটা ছেলেদের মধ্যে যারা সিনিয়র, তারাই ঠিক মতো চালাত—ছেলেদের উপর তাঁর প্রভাব এতটাই ছিল। অভয় একদিন আমায় রণদাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে। এমনই একটি সরল, শক্তিশালী মানুষ, জীবনে এই প্রথম দেখলাম। তিনি বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ, সকল দিকেই বলিষ্ঠ, কোথাও দুর্বলতার লেশমাত্র নেই। যেমন সুন্দর শরীর তেমনি বলিষ্ঠ ও সুন্দর ছিল তাঁর মন। কথা কইতেন ইন্‌স্‌পায়ার্ড হয়ে, কেউ যেন পর নয় সবাই আপন। তাঁর কথার মধ্যে বেশ একটা উন্মাদনা আছে, একজনকে শীঘ্রই আকর্ষণ করে নিজভাবে ভাবিত করতে পারেন। তারপর তাঁর স্বদেশনিষ্ঠা অনন্যসাধারণ—এমনটি তখনকার দিনে আর্টিস্টদের মধ্যে সত্য সত্যই বিরল। অয়েল কলার তো কোন রকমেই ভারতে তৈরি করবার উপায় ছিল না, বিলাতি ব্যবহার না ক'রে উপায় ছিল না। কিন্তু ক্যানভাস্‌টাও বিলাতি! বিলাতি বর্জনের দিনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রণদাপ্রসাদ বিলাতি ক্যানভাস কেমন ক'রে ব্যবহার করবেন? তিনি করলেন কি, একটু ঘন বুননওয়ালা কাজের উপযোগী পাটের থান অর্থাৎ চট এনে ব্যাকফ্রেমে যথারীতি স্ট্রেচ ক'রে নিয়ে তার উপর অয়েল কলার চাপাতে আরম্ভ করলেন—ছেলেরা দেখে অবাক! কাজ একরকম সফল হয়েছিল বলতে হবে। তিনি নিয়ম ক'রে দিলেন, তাঁর স্কুলে বিলাতি ক্যানভাস্ ব্যবহার চলবে না, সবাইকে ঐ চট ব্যবহার করতে হবে আর তা স্কুল থেকেই পাওয়া যাবে, দাম লাগবে না। প্রিন্‌সিপ্যালের খেয়াল দেখে ছেলেরা মনে মনে হাসে। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন অতীব গুণবতী, কর্তব্যনিষ্ঠ, শান্ত প্রকৃতি মহিলা, সগৌরবে স্বামীর ঐ স্বদেশীয় ক্যাম্বিসের ছবিতে, প্রদীপ

হাতে নদীকূলে ধরা দিয়েছিলেন। ছবিখানি রণদাবাবুর ঘরের বাইরে ক্লাসরুমের মধ্যে দরজার উপরে, উঁচু দেয়ালে টাঙানো ছিল।

নরেন সরকার তখনকার প্রসিদ্ধ জুবিলি আর্ট একাডেমির সর্ব-প্রধান ও প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র। তখনকার দিনে তার কাজ একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। তখনকার বাজারে তার চিত্রের একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল তার প্রতিষ্ঠাও অসাধারণ। 'চিত্রে চন্দ্রশেখর' ও 'দুর্গেশ-নন্দিনী' তখনকার কীর্তি। এখনকার দিনে রণদাবাবুর কয়েকজন ছাত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন অয়েল কলার পোর্‌ট্রেট পেন্টিংএর কাজে। ছেলেরা রণদবাবুকে কত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ভাবে পেয়েছিল—গুরুকে এমনভাবে পাওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও দুরদৃষ্টবশতঃ তা আমাদের ভাগ্যে জোটে নি বটে কিন্তু এই জুবিলি আর্ট একাডেমিতে ভাগ্যবান্ ছাত্রদের তা জুটেছিল। এ সৌভাগ্য আমাদের সরকারী আর্ট স্কুলের ছাত্রদের ভাগ্যে তখন থাকবার কথাও নয়। কারণ সরকারী বিদ্যা প্রতিষ্ঠানের চালই আলাদা। প্রত্যেক শিক্ষকের পদমর্যাদা, ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও ব্যবহার-বৈশিষ্ট্য এমন কি ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কই পৃথক। বিচিত্র পার্থক্য, পৃথক চলাটাই যেন প্রত্যেক ব্রিটিশ সরকারী কর্ম বিভাগেরই বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক ও ছাত্রে এতটা পার্থক্য, শিক্ষকদের উপেক্ষাপ্রবণতা, কর্তব্যের মাপকাটিতে সব সম্পর্কই স্নেহহীন বাঁধা,—এ যেমন গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে দেখেছি, এমন আর কোথাও দেখি নি। ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আর্ট স্কুলের টিচারদের যেন অপমানের বিষয়। তখনকার দিনে আর একটা ব্যাপার দেখেছি যে চাপকান-পরা মাস্টারদের উপর ছাত্রদের একটা অশ্রদ্ধার সম্পর্ক যেন দেখা যেত। সন্তোষবাবু যেদিন কাপড়-জামা পরে আসতেন সেদিন একরকম, আর যেদিন হেডমাস্টারের মত চাপকান পরে এলেন ছেলেদের কি সেইদিনই বিগড়াতে হয় ? চাপকানটা যেন চাপরাশীদেরই পোষাক, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের

মোটেই মানায় না। রণদাবাবু স্মার্ট ড্রেসই পছন্দ করতেন। তিনি স্যুট পরতেন, দোহারা শরীর, মানাতও এত চমৎকার!

রণদাপ্রসাদ ছিলেন যেন মূর্তিমান এনার্জি। আর্টিস্ট হিসাবে মানুষটির বিচার নয়,—তাঁর বিচার যথার্থই তাঁর সরল, স্বাধীন এবং কোমল প্রকৃতির ক্ষেত্রে, তাঁর অদম্য কর্মশক্তি এবং তাঁর উদ্যমে। আজীবন সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন ঐ স্কুলটিকে দাঁড় করাতে। শিল্পী না হয়ে তিনি যদি অন্য কোন বিশেষজ্ঞ হতেন তাতেও তাঁর অম্লান কর্মধারা এই পরিণতিই লাভ করত। বন্ধুবাৎসল্য, শিষ্য-বাৎসল্য বা অনুগত-বাৎসল্য এসব সহজ গুণ তাঁর মতো শক্তিমানেরই বৈশিষ্ট্য; তাঁর মহত্ত্ব তাঁর স্বাধীন শক্তিশালী কর্মপন্থার মধ্যে উজ্জ্বল।

সাধারণতঃ বাংলার সমাজে, এই সময়টা যেন সকল স্তরেই প্রবল আলোড়ন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। লর্ড কার্জনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশান বক্তৃতা থেকেই আরম্ভ হ'ল অস্বস্তিটা। এতবড় দাম্ভিক উক্তি মেকলের পর কেউ কখনও করে নি। তার ফলে কলকাতার শিক্ষিত সমাজ যতটা আলোড়িত হয়েছিল, উত্তপ্ত হয়েছিল শিক্ষিত সাধারণ অনেক বেশী। ফলে হ'ল কি,—এক বিকালে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি, কার্জনের ঐ বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা টাউন হলে, বিরাট মিটিং। ছাপা হয়ে বক্তৃতাটি বহু সংখ্যায় বিতরিত হয়েছিল, আমরাও এক এক কপি সংগ্রহ করেছিলাম। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরব, যখন ইউরোপ তথা ব্রিটেনবাসীরা বন্য বর্বর জীবনযাপন করছিল তখন এই মহান ভূমিতে ভগবান গৌতম, মানব জীবনের চরম সত্য প্রচার করেছিলেন, আজও সেই সত্য নিয়ে পৃথিবীর অর্ধাংশ লোকে উন্নত সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে, সেই প্রাচ্য সভ্যতার উপর এ ভাবের উক্তি অত্যন্ত হেয় মনোবৃত্তির পরিচায়ক ইত্যাদি। তারপর পাশ্চাত্য সভ্যতার উক্তির গলদ যা কিছু তা অতি পরিষ্কার সহজ ও সরল ভাষায় বলে, বললেন—ভারতের অন্নে পুষ্ট হয়ে, ভারতের মধ্যে কাজ

করতে এসে একজন রাজ-প্রতিনিধির মুখ থেকে এই অন্যায় অযৌক্তিক দাম্ভিক উক্তি শোভা পায় না। এতো গেল ইংরাজী প্রতিবাদ ; এর পর রবিবাবুর উক্তি—সারা বাংলায় প্রতিবাদটাকে চাউর ক'রে দিলে তীব্রভাবে।

তখন থেকেই যেন রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমশ দেশের সকল শ্রেণীর গায়ে লেগে শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণকে পুষ্ট ক'রে তুলেছিল। কলেজের ছাত্ররাও গোলদীঘি, হেদো প্রভৃতি জায়গাতে বিকালে জড়ো হয়ে বেশ নিঃশঙ্কচিত্তে আলোচনা করতে শুরু করেছিল।

আর্ট স্কুলের ছাত্র হলেও স্বদেশী মুভমেণ্টের প্রবল তরঙ্গে আমরা কম হাবুডুবু খাচ্ছিলাম না। তারপর ১৯০৫ থেকে বঙ্গবিভাগ প্রতিবাদ কোন দিকেই বাদ ছিল না, বোধ হয় সমাজের উচ্চস্তর থেকে নিম্ন শ্রমজীবী স্তর পর্যন্ত প্রবলভাবেই যেন একটা উন্মাদনা অনুভব করেছিল ঐ সময়টায়, এটা তখনকার সবাই প্রত্যক্ষ ক'রে থাকবেন। আমরা যে যথার্থই দুই জাঁতার চাপের মধ্যে থেকে পিষ্ট হচ্ছি, এই ভাবটি ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ তা নেতাদের মুখে শুনে এবং বিশ্বাসরূপেও সকলকার মনে-প্রাণে অহরহ আঘাত করছিল। তার প্রতিবাদই ব্রিটিশ গুডস্ বয়কটের আন্দোলন। ফলে সরকারী পলিসি একদিকে মহা উদার হয়ে গেল যেমন, অপরদিকে স্বাধীনতাকামী ছোকরাদের উপর রিপ্রেশানের চাপ বাড়ল। ঠাকুরবাড়ি থেকে কিছু কম উৎসাহ যোগান দেওয়া হয় নি যার ফলে স্বদেশী মুভমেণ্টটা শিল্পের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা য়ুরোপীয়ান আর্ট চাই না, নিজ দেশীয় শিল্পই আমাদের ভালো। দেশীয় যা কিছু সবার উপর একটা টান সেই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির উপরেও যুক্তিযুক্ত একটা অনুরক্তির পরিচয় দেশের শিক্ষিত এক দলের কথায় ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছিল। এর চেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার আমি দেখি নি। অথচ হ্যাভেল সাহেবকে গোড়া থেকেই

স্কুলের ছেলেরা এমন কি এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক গালাগাল দিত, অন্নদা বাগচী প্রমুখ স্কুলের মাস্টারেরাও তাতে যোগ দিতেন এই বলে যে, তিনি আমাদের দেশে শিল্পের যে উন্নতি তার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক শ্রেণীর শিক্ষিত সাধারণের মনে ক্রমে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির উপর বেশ একটা আকর্ষণ, ঐ স্বদেশীর সময় থেকে স্পষ্টই অনুভূত হয়েছিল। একথা ঐতিহাসিক সত্য। নব্য ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি সময়োচিত আবির্ভাবে, স্বদেশী মুভমেণ্টের সঙ্গে প্রবল দেশাত্মবোধের জোর পেয়েছিল বলেই এত অল্প দিনে এতটা প্রসারিত হতে পেরেছিল। সুতরাং একথা কিছু মাত্র মিথ্যা নয় যে এই শুভ যোগাযোগের মূলে ছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার সৃষ্টি প্রতিভার প্রেরণা, সোজা একটি উন্নতিমুখী জীবনীশক্তির উৎস পেয়ে গেল এবং সেই অভিজ্ঞতাই হ'ল শক্তি, যা শিক্ষিত সাধারণ ঐ সময়ে মনে-প্রাণে গ্রহণ ক'রে নিতে পেরেছিল, —এ বিষয়ে আমার তিলমাত্র সংশয় নেই। পাকে-চক্রে ঐ নব শিল্পের আগমন দেশের উচ্চ স্তরেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তারপর যখন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট থেকে প্রদর্শনী আরম্ভ হ'ল, তখন থেকেই এই শিল্পকে নিয়ে ইংরাজী ও বাংলা ভাষায়, প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউর মধ্যে শুরু হ'ল সাহিত্য রচনা, যা শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। একটা সমাজের অভ্যুদয়ের পথে প্রকৃতির কর্ম যেন দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ব্রিটিশ গুডস্ বয়কটের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য হ'ল কাপড়। ম্যানচেস্টার থেকে কাপড় আমদানী বন্ধ করা, একেবারে মোক্ষম জায়গায় ঘা,—যার নাম মর্মস্থলে আঘাত। তাতে আমেদাবাদেরই বরাত ফিরল। মনে আছে বাংলার প্রতিজ্ঞার কথা, দুর্গাপূজায় আর অপবিত্র বিলাতী বস্ত্রে দেবীর পূজা চলবে না, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ দামে মোটা সুতার খাটো ধুতি-সাড়ী উৎপন্ন করতে আমেদাবাদের কলওয়ালারা দিবারাত্র কল চালিয়েও বাংলার দুর্গাপূজার কাপড় যোগাতে পারে

নি। সে কি উৎসাহ,—এখনকার অনেকেরই সে কথা মনে পড়বে। কাপড় যত বিশ্রী আর মোটা, সে কাপড় ততই পবিত্র, তার দামও তত বেশী। আমাদের ইণ্ডিয়ান আর্টের আমলাদারী যখন এল তার ধারাও ঠিক এই রকমই হ'ল। যত কুৎসিত শরীর গঠন, যত অস্বাভাবিক চোখ, নাক, মুখ, হাত, পা ততই সেটা ইণ্ডিয়ান, আর ততই তার অপ্রিসিয়েশান। হ্যাভেল সাহেবের প্রবন্ধ বেরোতে আরম্ভ হ'ল; ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রদর্শনী ও কেন্দ্ররূপে সমিতি গঠিত হবার পর থেকেই কাজের চাকা ঘুরে গেল। ঠিক জানি না, বিলাত থেকে নির্দেশটা কিভাবে এসেছিল। তবে এটা বোঝা গেল গভর্নমেণ্টের উপর স্তর অর্থাৎ গভর্নর থেকেই বাংলার এই নব শিল্পোদ্যমটি অত্যন্ত আগ্রহ এবং গুণগ্রাহিতার দৃষ্টি-ভঙ্গিতে নেয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিটিশ সরকার কতটা উদার সেদিকে দেশবাসীর তথা জগতের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থাই ছিল এর মধ্যে। দেশীয় এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজে সরকারের তরফ থেকে ধন্য ধন্য রব তুললে। হাইকোর্ট জজেরা সোসাইটির মেম্বার হলেন। বড় বড় উকিল, ব্যারিস্টার, মার্চেণ্ট ক্লাব, উচ্চ উচ্চ পদারূঢ় সরকারী কর্মচারী, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনবান জমিদার—মোটকথা সরকারী ছাপ মারা দেশের একদল, অপরদিকে যথার্থ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলার, ফেলো, তথা মেম্বারগণ পৃষ্ঠপোষক হয়ে পড়লেন।

অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে সমিতির যোগাযোগ প্রায় তখন থেকেই। অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ অগ্রণী শিল্পীগণের কাজ শিল্প প্রদর্শনীতে বেশ দামে বিক্রয় হতে লাগল, এবং সাধারণের দৃষ্টিতে তখন থেকেই যথার্থ নিউ বেঙ্গল আর্টের সৃষ্টি-প্রবাহ ধরা দিল। এটা অবশ্য আরও কয়েক বৎসর পরের কথা।

ওদিকে ক্ষুদিরামের ফাঁসি, প্রফুল্লের আত্মহত্যা, কারাগারে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা, অনুশীলন সমিতি, মানিকতলার মুরারিপুকুর

বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে অরবিন্দের বেকসুর খালাস এসবও চলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সরকারী পুলিস বিভাগে সি-আই-ডির জাল বোনা হয়ে গেল বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সারা ইস্টার্ন কমাণ্ড।

বাংলায় বেশ ক'রে আগুন জ্বালিয়ে রেখে গেলেন লর্ড কার্জন, তারপর এলেন মিলিটারী ভাইসরয় লর্ড মিণ্টো,—রাজনৈতিক জটিলতা বেশ ঘোরাল ক'রে মর্লি মিণ্টোর, ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসির কায়েমী ব্যবস্থা, তার সঙ্গে মুসলিমদের সেপারেট রিপ্রেজেণ্টেশান কায়েম করা হ'ল। আমরা প্রায় নিত্যই স্কুলের ফেরত গোলদীঘিতে না হয় ওভারটুন হলে, না হ'লে যে কোন মাঠে, বিপিন পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পাঁচকড়ি অথবা যে কোন একজন নেতার বক্তৃতা শুনতে লাগলাম যে, ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও শোষণ চরমে এসেছে আর কোন মতেই একে বরদাস্ত করা চলে না।

রাজনীতির প্রভাবটা তখন দেশের কেরানী এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র সাধারণের মধ্যে এসে পড়েছে। আমরা যতই বক্তৃতা শুনি না কেন, আসলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমাদের দেশকে ঠিক কিভাবে যে শোষণ করছে তার হদিশ পাই নি,—শুধু শুনি আর বিশ্বাস করি এই মাত্র। প্রবাসীতে কখনও কখনও দেখি যে কংগ্রেসে সরকারী কাজের নিন্দা করা হয়েছে,—দেশের জনমতের বিরুদ্ধে, দেশের পক্ষে ক্ষতিকর কতকগুলি কাজ করা হয়েছে বলে।

এদিকে স্কুলেতে আমার কাজ চলছে ভালই। ইতিমধ্যে কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েছিলাম। রং, তুলি, কাগজ ইত্যাদির খরচ কম নয়। আর হাত যখন চলতে আরম্ভ হয়েছে, তখন মাল নষ্টও বড় কম হচ্ছিল না। রচনার উপর ঝোঁকটাই বেশী। ফোলিয়েজ ক্লাসে ছ'মাস ছিলাম একাদিক্রমে। মডেলিংও ছিল তার সঙ্গে, আর অন্যান্য বিভাগের কাজ, যেমন মডেল ড্রয়িং পারস্‌পেক্‌টিভ, ডিজাইন, প্রভৃতি গুরুতর বিষয়গুলিও শিক্ষা চলছিল।

চমৎকার ব্যাপার! দ্বিতীয়বার বিবাহের যোগাযোগও ঘটে গেল এই সময়ে। বাবাই উদ্যোক্তা, কৌশলে বিবাহটা দিয়ে দিলেন। আসলে তাঁর আর্থিক সুবিধা কিছু হয়ে গেল আর আহিরীটোলার ভূতি মুখুজ্যের ছোট্ট একটি উজ্জ্বলশ্যামা বারো বছরের মেয়ে, বৌ হয়ে এসে আমাদের এই জটিল সংসারের মধ্যে ঢুকল।

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের অর্থাৎ জোড়াসাঁকো চাষাধোপা পাড়ার বাড়ির সংসারে চরম নৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধঃপতন এসেছে। ঠাকুর্দামশাই পাঁচ পিসির জন্য পাঁচ কাঠা জমি কিনেছিলেন ভবানীপুরে, এখন তাঁদের দুর্গতির দিনে সেটা বিক্রি ক'রে টাকাটার ভাগ পাঁচজনে নিয়ে যে যার ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুমার দুঃখ বাড়তেই লাগল, তিনি মাঝে মাঝে স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে কাঁদেন এই বলে যে,—ওগো, একবার এসে দেখে যাও তোমার সংসার আজ কি অবস্থায় এসেছে। যার উপর তোমার সব চে'য়ে বেশী বিশ্বাস ছিল সেই ছোট ছেলে তোমার কি কাজ করছে।

ইতিমধ্যে একদিন প্রভাতে ছোট কাকীমা পাগল অবস্থায় বাপের বাড়িতে মারা গেছেন এই খবর এল। আমরা গেলাম সৎকার করতে। কাকাবাবুর তখন উপার্জন ও স্ফূর্তিরই সময়, উপার্জন ও অপব্যয় দুই-ই প্রবল বেগে চলছে। তাঁর টাকা থোকথাক কতক যায় প্রতি শনিবারের রেসের পিছনে, বাকী যায় কতক মদের দোকানে আর কতক আনন্দময়ীর চরণে। মাস কাবারে মাইনে পাবার দিন পয়লা অথবা দোসরা যে কটা টাকা মাথা ফাটাফাটি ক'রে হাত ছিনিয়ে নেওয়া যায়। ঠাকুমা তাই দিয়ে সারা মাসের চালটা কিনে রেখে দেন। দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য, পোস্তার কারবারের খাতাখানিও চুরি গেল ঠাকুমার হাতবাক্স থেকে। না হলে ঐ পোস্তার কারবার থেকেও কিছু আসত, তাতে সংসারের অনেকটা ব্যয় সংকুলান হ'ত। আমি তো এসব খবর রাখতাম না, মায়ের কাছে কখনও কখনও শুনতাম। মা আবার নিজের পূজাপাঠ

নিয়েই থাকেন, আর স্বামী, দেওর, ননদ ও শাশুড়ীর মধ্যে অশান্তির দাবানল জ্বলতে দেখেন আর জুলজুল ক'রে চেয়েই থাকেন।

দাদামশাই মারা যাবার পর কাকাবাবু নাকি নানা প্রকারে ঠাকুমার কাছ থেকে অনেক টাকা বার ক'রে নেন। ঠাকুমা পঞ্চাশ টাকার, একশো টাকার বা হাজার টাকার নোট চিনতেন না। পঞ্চাশ টাকার নোট দশ টাকা বলে, একশো টাকা বলে হাজার টাকার নোট তিনি বার ক'রে নিয়েছেন কতবার। কাকাবাবুই প্রধান বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন তাঁর, তিনি বিশ্বাস ক'রেই এসেছেন,—শেষে যখন আসল ব্যাপার জানা গেল তখন মাথায় হাত। অশান্তি এড়াতে চাইলেন, কোন উচ্চবাচ্য করলেন না, পাছে বাবা এ সকল টের পান, তখন এই নিয়ে দুই ভাইয়ে হয়তো কলহ অশান্তি আরম্ভ হবে। বাবা নাকি এসব টের পেয়েছিলেন, তিনি কলহ অশান্তি এসব কিছুই না ক'রে কারবারটি হাত করতে পোস্তার কারবারের খাতাখানি সরিয়েছেন বিচিত্র কৌশলে। এখন ঠাকুমাও টের পেয়েছেন, যে এ কাজটা বাবাই করেছেন, কাকাবাবুও জেনেছেন সে কথা— তিনিও উচ্চবাচ্য করছেন না। ঠাকুমা কেবল মনের দুঃখে কান্নাকাটি করছেন আর বুক চাপড়াচ্ছেন স্বর্গত স্বামীকে উদ্দেশ ক'রে,—ওগো এ কি হল আমার, একবার এসে দেখো, এই কথা বলে।

বাবার যে এতবড় পাটোয়ারী পেটেন্টের বিষয়-বুদ্ধি আছে একথা আমি প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারি নি, শেষে মা যখন বললেন তখন আর অবিশ্বাসের কারণ রইল না। এখন পিসীরা ও ঠাকুমা, সবাই মিলে কাকাবাবুর জন্য একটি সুন্দরী পাত্রী দেখে বিবাহ দিয়ে তাঁকে বাইরের ভ্রষ্টাচার থেকে ঘরবাসী করবার চেষ্টায় উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। সেই সূত্রে একটি সুন্দর মেয়ে এক উন্নতিশীল সংসারের প্রভাব থেকে এসে পড়ল আমাদের এই অশান্তিময় সংসারের মধ্যে।

সাতাশ

১৯০৬ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে আমাদের আর্ট স্কুলে শিক্ষার প্রসার অনেকটাই হয়েছিল। পার্শি ব্রাউন লাহোর থেকে বদলী হয়েই এসেছিলেন। সৃষ্টি প্রতিভা তাঁর ছিল না বটে তবে শিক্ষক হিসাবে চমৎকার ছিলেন তিনি, অসাধারণ কর্মদক্ষতা ছিল তাঁর; তাঁর ব্যবহার আমাদের ভারি পছন্দসই। তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনি ছেলেদের কাজের উপর কখনই হাত লাগাতেন না। ভুল হলে পৃথক স্থানে দেখিয়ে দিতেন, ভুলটা তাতে পরিষ্কার বোঝা যেত। ইতিমধ্যে ফোলিয়েজ থেকে সেড্ লাইট ক্লাসে প্রমোশন পেয়েছিলাম এমনই সময় যে, ঠিক তার পনেরো দিন পরেই বাৎসরিক পরীক্ষা। হেডমাস্টারমশাই হরিনারাণবাবু,—তিনি চুয়া দেওয়া দোক্তা দিয়ে পান খেতেন, মাত্র ঐটুকুই ছিল তাঁর বিলাস। ক্লাসটিচার উপেন-বাবু আমায় প্রমোশন দিলেও তিনি বললেন,—তা হতে পারে না, পনেরো দিন বাদে একজামিন, তা হলে তোমার পরীক্ষা দেওয়া হবে না। তাঁর যুক্তি এই যে পনেরো দিনের মধ্যে আমার পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা আসতেই পারে না। কথাটা সত্য, কিন্তু সেড্ লাইটের কাজ আমি যে প্রাইভেটে এক বৎসর আগেই আরম্ভ ক'রে কতটা এগিয়ে আছি তা তিনি তো জানতেন না। শেষে রফা এই হ'ল যে, যদি পরীক্ষায় রেজাল্ট স্যাটিসফ্যাকটারী না হয় তা হলে ঐ ক্লাসে অন্ততঃ ছ' মাস থাকতেই হবে। আমি স্বীকার করলাম।

পনেরো দিন পরে পরীক্ষা হ'ল। পাস তো নিশ্চয়ই হবো এ বিশ্বাস ছিলই, এখন ফার্স্ট ক্লাস পাস দেখে সবাই খুশি। ছুটির পরই আমি বাস্ট ক্লাসে ঢুকলাম। এখন থেকে লাইফ স্টাডি শুরু হ'ল। ছুটিতে এলাহাবাদ গেলাম।

এবারের এলাহাবাদ যাওয়া এবং সেখানে থাকার মধ্যে রোমান্স আছে। আগে আমার দ্বিতীয় পত্নীলাভের ব্যাপারে একটি রহস্যপূর্ণ আবিষ্কার আছে, এখন সেই কথাটাই বলব। এক অদ্ভুত যোগাযোগে আমার এই দ্বিতীয় বিবাহ। তাঁরা কি ভেবে একুশ বছরের এই আর্ট স্কুলের দ্বিতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর ছাত্রের হাতে তাঁদের বালিকা মেয়েটিকে সোনাদানা নগদ পাঁচশো টাকা সুদ্ধ সম্প্রদান করেছিলেন তাঁরাই জানেন, তবে এই বিবাহ না ক'রে বাড়িতে শান্তি বজায় রেখে জীবন কাটাতে পারব না—এই কারণেই বিবাহে রাজী হয়ে ছিলাম। এটা এত তাড়াতাড়ি চাই নি, স্কুলে কাজ শেষ ক'রে উপার্জনক্ষম হলে তবে হবে এই ছিল আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু দৈবে এটা ঘটে গেল, সে দৈব বাবারই প্রবল ইচ্ছায় প্রভাবিত। এর বেশী বলার ভাষা নেই। মিনার মৃত্যুর পর থেকেই মাতৃহারা সন্তান দু'টিকে দেখতে যেতাম মধ্যে মধ্যে, সপ্তাহের মধ্যে একবার তো নিশ্চয়ই। আবার মধ্যে মধ্যে টোড়িরাম তাদের নিয়ে আসত আমাদের বাড়িতে, যখনই মা দেখতে চাইতেন। উমাপতিবাবুর স্নেহ আমার উপর সমানভাবেই ছিল, তারপর আর্ট স্কুলে প্রবেশ তিনি অনুমোদনও করেছিলেন। তারপর যখন চারকোল দিয়ে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর পোর্‌ট্রেট করলাম তখন তিনি মহাখুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন আমি নিশ্চিত যেন এতে সিদ্ধিলাভ করতে পারি। তারপর আমার আবার বিবাহের কথা যখন শুনলেন তিনি এটির অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে প্রস্তুত ছিলেন।

এখন এই দ্বিতীয় শ্বশুর বাড়িটি এই শহরেই, আহিরীটোলায়। বিবাহের প্রায় তিন-চার মাস পরের কথা, একবার নিমন্ত্রণ এল, জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধী এসে খবর দিলেন যে, বৃন্দাবন থেকে আমাদের দাদামশাই এসেছেন তোমায় দেখবেন। গিয়ে দেখি, এঁদের দাদামশাই হলেন আলুলায়িতজটাজুট কেশবানন্দজী, তাঁর বিশাল ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসে আছেন। গিয়ে প্রণাম ক'রে বসতেই তিনি

নিরীক্ষণ ক'রে দেখে বললেন, একে তো এলাহাবাদে কুম্ভের সময় বিনয়বাবুর ওখানে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তখন স্ত্রীবিয়োগ হয়েছিল। তা শেষে আমাদের ভূতির জামাই হল? ভূতিবাবু, আমার এই শ্বশুরের ডাক নাম। তারপর চলল কুষ্ঠি নিয়ে দেখাদেখি, শেষে বললেন, মিলনটা ঠিক হয় নি, পাত্রীর দিক থেকেই একটু অশান্তি আছে বটে। তা যাক ভবিতব্য যা ছিল তা হয়ে গিয়েছে, এখন আশীর্বাদ করি সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—এই বলে আশীর্বাদ করলেন।

শ্রীপাট গোস্বামী মালি পাড়ায় এঁদের আদি বাড়ি। কেশবানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নামটি শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ভট্টাচার্য, ঐ বাড়ির জামাই সেই সম্পর্কে আমার শ্বশুরের খুড়ো হন, তাই আমার সম্বন্ধীরা তাঁর নাতি, সুতরাং তিনি দাদামশাই। এঁরা জ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রমের কথাও অনেক বললেন। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামে পরিচিত ছিলেন, বেশ শিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী। পশ্চিমে, মীরাটে তাঁদের এক কারবার ছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর যখন বিক্ষিপ্তচিত্তে চঞ্চল হয়ে চারিদিকে শান্তির আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন কেশবানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে; তাঁর কাছে দীক্ষিত হয়ে তবে শান্তি পান। সেই অবধি দুজনে বড়ই ঘনিষ্ঠভাবে ধর্মক্ষেত্রে কাজে রত আছেন। ওঁদের সম্বন্ধে এইটুকুই মোটামুটি পরিচয়।

এবার এলাহাবাদে আমি মেশোমশাইয়ের নূতন বাড়িতে এসে উঠলাম। সরকারী কর্মচারীদের বসবাস অর্থাৎ পরিবারবর্গ নিয়ে স্থায়ীভাবে থাকার সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্টের নূতন ব্যবস্থা মতো লুকারগঞ্জ মহল্লায় মেশোমশাই এক একর জমি নিয়ে বেশ চমৎকার পাকা একতলা ইমারত তৈরি করেছেন। যখন বাড়ি তৈরি হচ্ছিল তখন, ঐ বাড়ির জন্য যত কিছু কাঠের দরজা জানালা আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটা বড় গোলা থেকে তাঁর অর্ডার মতো দেখে শুনে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলাম। সুতরাং আমার পক্ষে তাঁর নূতন বাড়িটি আনন্দেরই জিনিস। বাগান চারদিকে, মধ্যে আট দশখানা ঘরওয়ালা

বাড়িখানি চমৎকার হয়েছিল। তিনি ইঞ্জিনীয়ার, নিজেই প্ল্যান করেছেন, হবে না কেন সুন্দর। বাইরের একখানা ঘর আমায় কাজ করবার জন্য ছেড়ে দিলেন। তারপর শুনলেন, দীর্ঘকাল এখানে থাকবো, তাই আমার কাজ-কর্মে কোন বিঘ্ন না হয় সে দিকেই ব্যবস্থা করলেন, কারণ এখন আমি পেণ্টার হতে চলেছি। যদি সত্যই শিল্পী হতে পারি তাতে তাঁর সাহায্য, তাঁর অনুগ্রহ বড় কম নয়। তার উপর তিনি অসাধারণ গুণগ্রাহী মানুষ। কয়েকদিন থাকবার পর, গোপনে গোপনে মিস্ত্রীর সাহায্যে বাঁশ দিয়ে, দাঁড়িয়ে কাজ করবার একটা ইজেল তৈরি ক'রে বোর্ডে কাগজ এঁটে নিয়ে তাঁকে যখন সিটিং দিতে অনুরোধ করলাম, তিনি সত্য সত্যই বিস্ময় প্রকাশ করলেন, অবশ্য তখনই আনন্দে রাজী হলেন। তাঁকে বসিয়ে ওয়াটার কলারে একটা লাইফ সাইজ থ্রি কোয়ার্টার পোর্‌ট্রেট আঁকতে সাহস করবো এটা তিনি আশা করেন নি। কাগজ উৎকৃষ্ট, দামী ওয়াটম্যানের ডাবল্‌ এলিফ্যান্ট হাফ সিট, বোর্ডে এঁটে তো ড্রইং আরম্ভ করলাম। মেশোমশাইয়ের সহকর্মী, হরিদাস দে, তিনিও পি-ডাবলু-ডিতে কম্‌পিউটারের কাজ করতেন, ঐ লুকারগঞ্জে তিনিও দোতলা ছোট একটি দৌলতখানা বানিয়েছেন। কখন যে নিঃশব্দে এসে তিনি আমার পিছনে দাঁড়িয়েছেন, জানতাম না। যখন পেন্সিলের লাইনগুলি যথারীতি শেষ ক'রে একটু পিছনে হটেছি, লাগল তাঁর গায়ে মৃদু ধাক্কা, ফিরে দেখলাম। মুচকে হেসে তিনি বললেন, কনগ্রাচুলেশনস। মাই বয়, পোর্‌ট্রেট তোমার সাকসেস-ফুল হবে। মুখের ক্যারাক্‌টার ঠিক এনে ফেলেছ পেনসিলে, ভেরি গ্ল্যাড। পরদিন রং চাপাতে আরম্ভ করলাম। লাইফ থেকে এই হ'ল ওয়াটার কলার পোর্‌ট্রেট পেন্টিংএ আমার প্রথম উদ্যম। সবাই যখন একবাক্যে ঐ আলেখ্য চিত্রটির প্রশংসা করলে, তিনি শেষ দিনে আমায় তিনখানি দশ টাকার নোট দিয়ে বললেন,—তোমার রং, তুলি, কাগজ প্রভৃতি কেনবার জন্য দিলাম।

মেশোমশাই ও মাসিমার দুইখানি পোর্‌ট্রেট সম্পূর্ণ ক'রে যখন বাঁধিয়ে টাঙানো হ'ল সেদিন সত্যই আনন্দের দিন। মূর্তি বা ফিগার ছিল আমার শিল্পের প্রধান বিষয়, কিন্তু ল্যাণ্ডস্কেপ আমার রিক্রিয়েশান। এখানে দৃশ্যের তো অভাব নেই। খুসরুবাগের গেট, হিম্মৎগঞ্জের দিকে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর প্রধান ফটকটা নয়, স্টেশনের দিকে পিছনকার যে ফটক, ঘন মালতি লতাপল্লবিত তোরণ ভারি চমৎকার দৃশ্যটি, তারপর যমুনা ব্রীজ, সেখান থেকে ফোর্ট,—ওপারে ঝুসীর কেল্লা ইত্যাদি অনেক কিছুই জলের রঙে এঁকেছিলাম। প্রায় পাঁচ মাস কাটিয়ে এলাহাবাদে স্থিতির মধ্যে ছবি আঁকা ছাড়া এলাহাবাদের আরও কিছু কথা আছে, এখন সেটাও বলতে হবে।

দুই রোম্যান্সে মিলে এলাহাবাদে পাঁচ মাস আমার জীবনের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। ডিসেম্বরের প্রায় শেষাশেষি একখানি পত্র এল, ভূতিবাবু অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় শ্বশুরের লেখা। তিনি জানাচ্ছেন যে কেশবানন্দজী আমার শাশুড়ী, এবং আমার স্ত্রী প্রভৃতিকে নিয়ে কলকাতা থেকে অমুকদিন বৃন্দাবনে তাঁর আশ্রমে যাচ্ছেন। পথে তীর্থ-স্নানের জন্য পরদিন এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জে অমুকবাবুর বাড়িতে উঠবেন। সময়মতো সেইখানেই আমি যেন গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করি, অন্যথা না হয় ইত্যাদি। মেশোমশাইকে সেই পত্র দেখাতেই তিনি, তাঁর গুরুদেবকে এখানে তাঁর গৃহে আনবার ব্যবস্থা করলেন। আমায় আর যেতেও হ'ল না, তাঁর গুরুদেব, নাতনী (আমার স্ত্রীকে) নিয়ে এখানে এসে হাজির একখানা গাড়ি ক'রে। মাসিমা নববধূকে সেদিনটুকু রেখে দিলেন, গুরুদেবও আপত্তি করলেন না, - তিনি ঘণ্টাখানেক থেকে চলে গেলেন। আমি সারাদিন ছবি এঁকে কাটালাম, একবারও তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের প্রবৃত্তি হ'ল না। একে ছেলেমানুষ, কথা কইতে তার লজ্জার সীমা নেই—কি কথাই বা কইব তার সঙ্গে? সন্ধ্যার সময়, যখন তাকে নিয়ে যেতে গাড়ি এসেছে তখন একবার দেখা হ'ল। কিন্তু কোন

কথাই হ'ল না। কেবল একবারমাত্র জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন আছ? সে লজ্জায় জড়সড় হয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় উত্তর দিলে, ভাল আছি। তারপর ধীরে ধীরে আরও একটা কথা বললে,—দাদামশাই, আমায় মন্তর দিয়েছেন, এই কথাই যেন শুনলাম। ব্যাস্। কথা এই পর্যন্তই হ'ল। তারপর সে চলে গেল। দাদামশাই অর্থাৎ কেশবানন্দজী তাকে দীক্ষাদান করেছেন, তার মানে এই অল্প বয়সেই তাকে বেশ এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছেন। শুধুই মন্ত্র, না তার সঙ্গে কিছু যৌগিক ক্রিয়া-কর্মের ব্যাপার আছে? কথাটা তো জানা হ'ল না। কেন যে খানিক আগে কথা আরম্ভ করা হ'ল না, তার জন্য নিজের মধ্যে অনুতাপ হতে লাগল। কাজটা যেন ভাল হ'ল না।

আর একদিকে কিন্তু একটা কাজ আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যে সময় আমি মেশোমশাই মাসিমার যত্নে আদরে, তার উপর নিজের ছবি আঁকা নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছি, তখন উল্কার মতোই এক নারী এসে আমার জীবনাকাশ কিছুদিন উজ্জ্বল ক'রে রেখেছিল। সে বাইরে থেকেই এল অসুস্থ হয়ে ঐ সংসারের মধ্যে, ওঁদের দূর সম্পর্কীয় একজন। বিবাহিতা, একটি প্রায় পাঁচ বছরের ছেলে সঙ্গে। শুনলাম, তার স্বামী মাতাল এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতি। অকথ্য অত্যাচারে এবং পীড়নে জীবন তার দুর্বহ ক'রে তুলেছিল। তার ফলে শেষে অসুস্থ হয়ে যখন শয্যা আশ্রয় করলে তখনই মেশোমশাই তার চিকিৎসার জন্য এখানে আনিয়েছেন। এখানে এসে অবধি সে ভালই, শুধু তা নয় এই দেড় দুই মাসে, তার এমন রূপ ফুটেছে, তাতে সে যে সুন্দরী পরিবারস্থ সবাই তা অনুভব করল। আমায় দাদা বলতো প্রথম থেকেই, যখন দরকার হ'ত, ডাক্তারকে খবর দেওয়া, ওষুধ আনা, তার সেবার কতকটা কাজ আমার দ্বারা হয়েছিল,—আর তো কেউ ছিল না। মেশোমশায় দশটা-চারটে অফিস করতেন, কাজেই দিনের কাজটা আমায় করতে হ'ত। অবশ্য চিকিৎসা তার চলে নি বেশী দিন, এক সপ্তাহ পর থেকেই তার

স্বাস্থ্যের উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল, দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে একটি মাত্র ঔষধই চলছিল। শুধু ডাক্তারের কাছে রিপোর্টটা দেওয়া। এলাহাবাদের বিখ্যাত প্রবীণ ডাক্তার অবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই দেখছিলেন। এক মাসেই সে বেশ সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল।

বয়স তার প্রায় কুড়ি, আমার চব্বিশ। যোগাযোগটাও অপূর্ব। বাড়িতে তিনজন নারী,—সে অর্থাৎ যামিনী, মাসিমা আর তাঁর পুত্রবধূ, আমার বৌদি। দুপুরবেলা কোন দিন পাড়ার গিন্নিরা আসত অন্দরমহলে মাসিমার সঙ্গে তাস খেলতে, কোন কোন দিন তিনিও যেতেন প্রতিবেশীদের বাড়ি। গিন্নিদের, দেখলাম বেশ একটা আড্ডাধারী মনোবৃত্তি আছে। আর বৌদি তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে দুপুরবেলা তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে বেশ দীর্ঘকাল দিবানিদ্রা দিতেন, তারপর তিনটা থেকে আবার সংসারের কাজ আরম্ভ হ'ত। যেদিন দুপুরে আমি বাইরে কোথাও না যেতাম, বাড়িতেই কাজ করতাম, যামিনী আসত, কাছে বসত, আমার কাজ দেখত, কত তারিফ করত, আবার শেখবার অভিপ্রায়ও প্রকাশ করত। এখানে আরও একটা কথা এই যে, মেশোমশাই ও মাসিমাটি আমার অতীব সরলপ্রকৃতি,—আর আমার সৎভাবের উপর প্রগাঢ় আস্থা তাদের। পরস্পরের অপরিচিত এই যে অপরিণত মনবুদ্ধি, প্রাপ্ত যৌবন দুজন তাঁদের সংসারে বাস করছে, এদের মধ্যে একটা অবৈধ সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে এ কল্পনাও তাঁদের মধ্যে আসে নি। তারপর, এক লাইনে তিনখানা শোবার ঘর। একখানিতে বৌদি ছেলেমেয়ে নিয়ে, তার পাশের ঘরে যামিনী এক বুড়ি ঝি তার ছেলেটিকে নিয়ে শুতো, আর ঠিক তার পাশেই আমার ঘর। কি আশ্চর্য যোগাযোগ। এতটাই উদার ছিলেন তাঁরা। আমার বিশ্বাস, এক্ষেত্রে এই উদারতার সুযোগটাই বেশী কাজ করেছিল, তাইতেই আমাদের মধ্যে এই প্রীতির সম্পর্ক এতটা ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিল। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও এখানে একটু আলোচনার কথা আছে। অসুখের

সময় তার জন্য যেটুকু কাজ আমায় করতে হয়েছিল, অবশ্য আমার দিক থেকে, শীঘ্রই সে আরোগ্য লাভ করুক এ কামনা ছিল সত্য—কিন্তু তার দিক থেকে এইটুকু কাজের জন্য সে একটা গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করত। সেটা তার একদিনের কথায় টের পেলাম। সেদিন কথায় কথায় তার স্বামীর ব্যবহারের কথা বলে ফেললে; তুমি যা করেছ এমন কেউ কখনও করে নি আমার জন্যে। একটা মাস রেমিটেণ্ট জ্বর, গায়ের পায়ের বেদনায় শয্যাগত এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম দাঁড়াতে গেলে মাথা ঘুরত। তিনি সেজন্য এক-দিনও ডাক্তার ডাকা দরকার মনে করেন নি। ঘরের চাকরটি একদিন তাঁকে বলেছিল ডাক্তার ডাকবার কথা; নিজের কানেই শুনেছি তাকে বললেন, তোমার এত দরদ কেন? সে বেচারা লজ্জায় আর কথা কইতে পারলে না। বিদেশে একলা থাকতাম,—পোস্ট-মাস্টারের কোয়ার্টার, যদি কোন প্রতিবেশী এল, সেদিন আমার শাস্তি বাড়ল; তাঁর কেবল সন্দেহ, আর প্রহারই ছিল তার ধর্ম। ব্যবহারে স্বামীর মধ্যে ভালবাসা ছিল না। তার প্রাণের ভিতরে কতকটা শূন্য ছিল, এখানে আমার সহানুভূতিতেই যেন তা পূর্ণ হয়েছিল।

নারী-স্নেহের আকর্ষণ, এখানে অনুকূল ক্ষেত্রে এক ভাবপ্রবণ লোকের প্রাণে যে কতটা দুর্নিবার হয়ে ওঠে, এই সময়েই অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম। সত্য ভালবাসা, যার ভাল নাম প্রেম, সেটি সবার পক্ষেই কামনার ধন, তাই প্রেমকে নিধি বলেন কবিরা, সেই প্রেম একজনকে নিয়ে উচ্চস্তরে তুলে দেয় যদি তার মধ্যে কাম না থাকে। সকাম হয়েই প্রেমের সর্বনাশ ঘটায়, অনেক নীচে নামিয়ে আনে। আমি যে এখন বিবাহিত, আমার স্ত্রী বর্তমান এ সকল বিচার আমার মধ্যে স্থান পেলে না। অতি সহজভাবে আমরা এ ক্ষেত্রে দুজনে যেন দুজনের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিলাম। মনে হয় যতক্ষণ সে একা থাকত আমার কথাই ভাবত, আমিও যখন যে

কাজেই থাকি না কেন তার কথাই ভাবতাম। আমাদের আকর্ষণ সবার অগোচরে বেড়ে চলেছিল।

বিধাতার বিধান, তিন মাস পর তার স্বামী এসে তাকে নিয়ে গেল। দেখলাম, কঠোর তাঁর চেহারাটা, দেখতে কিন্তু সুন্দর। এত ভয়ানক প্রকৃতি যার, যার মধ্যে প্রেম নেই তাব মুখ এমন সুশ্রী হয় কি ক'রে? কিন্তু এমন সদালাপী মানুষ দেখি নি। গুণগ্রাহীও বটে। আমার ছবি দেখে,—ভাল লাগার কথা বললেন। তাঁর কর্ম স্থল বিলাসপুরে একবার যেতে নিমন্ত্রণ করলেন; বেশ ভাল সিনারী আছে। আশ্চর্য এই লোকটার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার। আর জগদম্বার কি যোগাযোগ, এমন মানুষের সঙ্গে এমনই সুন্দরীর যোগাযোগ। এমন ভয়ঙ্করের সঙ্গে সুন্দরের, কঠিনের সঙ্গে কোমলের মিলন তিনিই ঘটাতে পারেন। আমরা ভালই জানি তেলে-জলে মেলে না, মানুষ তা মেশাতে পারে না, কিন্তু তিনি পারেন যিনি ঐ দুটিকেই সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক তাদের রেলে তুলে দিয়ে এলাম। বিদায় নিয়ে যখন আসি তখন যামিনী আমায় প্রণাম করলে, দেখলাম তার চোখে জল।

তারপর আমি আরও কিছুদিন মেশোমশাইয়ের ওখানেই ছিলাম। তাঁদের ডিপার্টমেণ্টের সাহেব একজন এসেছিলেন একদিন তাঁর বাড়িতে, তাঁকে যত্ন ক'রে দেখালেন। সাহেব বেশী এপ্রিশিয়েট করলেন কাজটা ওয়াটার কালার বলে। বললেন, অয়েল কালারের চলনটাই বেশী, আমরা তাই বেশী দেখি। এতটা বড় পোর্‌ট্রেট জলের রং দিয়ে,—এড্‌মায়ারেবল, ইনডিড্‌। যাবার সময় বললেন, আমার কাছে ভাল ভাল ইংলিশ এ-চিং আছে—যদি দেখতে চাও দেখাতে পারি। যদিও বললাম,—যেতে চেষ্টা করবো, কিন্তু যাওয়া হয় নি।

কলকাতায় ফিরে এসে, এখন যেন নিজেকে বড় গম্ভীর দেখতে লাগলাম। এবার আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল, লক্ষ্য

হ'ল এখানকার বড় বড় আর্টিস্টদের স্টুডিওতে গিয়ে তাদের কাজ দেখতে হবে। বিশেষতঃ অয়েল কলারের কাজে যারা প্রসিদ্ধ। কলকাতায় এখন যামিনী গাঙ্গুলীর প্রতিষ্ঠাই সবার উপর, অসিত একদিন নিয়ে গেল। সে থাকত বেনেপুকুরে যামিনীবাবুদের বাড়ির কাছেই অশ্বিনী বাঁড়ুয্যে ব্যারিস্টারের বাড়িতে।

দেখলাম, যামিনীবাবু স্টুডিওতে কাজ করছেন; তাঁরই বড় মেয়ের একখানি বড় অয়েল পেন্টিং, দাঁড়ানো ছবি, হাতে একটি পাত্র। কি চমৎকার রং। তাঁর তেলের রঙে প্রতিষ্ঠা অসাধারণ জানতাম কিন্তু জলের রঙেও তাঁর যে কাজ দেখলাম আজ তাঁর স্টডিওতে, মনে হ'ল ওদিকেও তাঁর সমকক্ষ আমাদের কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে খুব কমই আছে। আমাদের সন্তোষ মাস্টারের ছোট ভাই আশুতোষ একজন অদ্বিতীয় ওয়াটার কলারের ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট। তার কাজ দেখেছিলাম, জে.সি. ব্যানার্জীর বাড়িতে সেকথা পরে বলবো। এখন যামিনীবাবুর যে কাজগুলি দেখলাম তাতে নিজেকে ধন্য মনে হ'ল। তাঁর পিতা জ্যোতিপ্রকাশবাবুর লাইফ সাইজ অয়েল পেন্টিং দেখলাম, পিতামহ যজ্ঞেশপ্রকাশ গাঙ্গুলী মহাশয়ের মূর্তিও দেখলাম। প্রাণে যে কি আনন্দ হ'ল তা আর বলবার নয়। কয়েকখানা অয়েলকলার ল্যাণ্ডস্কেপও দেখলাম।

লাইফ ক্লাসে ওঠবার পরই বলেছি সৌভাগ্যক্রমে পারশি ব্রাউন আমাদের নূতন প্রিন্সিপ্যাল এলেন এবং আমাদের ক্লাস নিজের হাতে নিলেন। বরদাবাবু ছিলেন মাস্টার, তিনি কোট প্যাণ্ট পরে আসতেন। শিবপুরের অধিবাসী, তাঁরা কয় ভাই গান বাজনায় দক্ষ, তার মধ্যে বরদাবাবু মধ্যম, পাখোয়াজ বাজাতে ভাল জানেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর কোন নাম ছিল না। ছেলেদের কাজের উপরে রঙের তুলি ঘষতে দেখে আমার শ্রদ্ধা ছিল না তাঁর উপর। ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে একজনকে খোঁচা দিয়ে কথা কওয়াই তাঁর অভ্যাস। নিজেকে প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ বলে যাদের ধারণা তাদের ঐরকমই হয়। নূতন

প্রিন্সিপ্যাল এসে একদিন তাঁকে ছেলেদের কাজের উপর কাজ করতে দেখে, পরদিন তেতলা থেকে একতলায় কপি ক্লাসে বদলী ক'রে দিলেন,—নিজে লাইফ ক্লাস হাতে রাখলেন। ছেলেদের সঙ্গে কাজ করতেন; আমরা এখন থেকেই যথার্থ কাজ ক'রে সুখ পেলাম। আগে ভয়েতে যে কাজটা মাস্টারমশাইকে দেখাতে সঙ্কোচ করতাম; পাছে তার উপর হাত চালিয়ে বিকৃত করেন, কারণ তিনি চোখে দেখতেন কম, প্রকাণ্ড পুরু মাইনাস চশমা দিয়ে দেখতেন, এখন স্বচ্ছন্দে নিজেদের কাজ প্রিন্সিপালের সামনে ধরি; যদি দেখাবার কিছু থাকে তিনি অন্য জায়গায় সেটা দেখিয়ে, বুঝিয়ে দেন। এ্যানিম্যাল স্টাডির জন্য তিনি জু গার্ডেনে পাঠাতেন সপ্তাহে একদিন। কোন কোন বারে, তাঁর লাল রঙের ঘোড়াটি আনিয়ে দিতেন, নীচে বাগানে আমরা স্টাডি করতাম।

লাইফ ক্লাস রি-অরগ্যানাইস করলেন তিনি; আমাদেরই রুটিন হ'ল চমৎকার। পূর্ণ ঘোষ ছাত্রদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলে সাহেব তাকেই মনিটার ক'রে দিলেন।

আঠাশ

এবার অয়েল কলারের সরঞ্জাম সব কিনতে হবে, পঞ্চাশ-ষাট টাকা খরচা। আবার এক সুযোগে সে ব্যবস্থাও হয়ে গেল। আমাদের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় শশীশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নী, তিনি শুনেছিলেন আমি পেন্টিং শিখছি, ধরে বসলেন আমার একখানা অয়েল পেন্টিং ছবি আঁকতে হবে,—খরচটা দেবো মজুরী দেবো না। তাঁকে বললাম,—আমাকে তাহলে মালমসলা কিনে দিন এই তে আরম্ভ করবো। তিনি এই সূত্রে আমায় সব কিছুই কিনে

দিলেন। আমি বেশ বড় সাইজের লাইফ সাইজ থি কোয়ার্টার ছবি একখানি প্রকাণ্ড রোম্যান ক্যানভাসের উপর আরম্ভ ক'রে দিলাম। রাজেন্দ্র মল্লিকদের বাড়িতে শশী হেসের কয়েকখানি বড় লাইফ সাইজ অয়েল পেন্টিং আছে। তখনকার তিনি প্রসিদ্ধ বাঙালী শিল্পী, ইটালি থেকে শিখে এসেছিলেন,—ইটালিয়ান স্কুলের কাজ, চমৎকার স্টাইল। তিনি ক্যানভাসের উল্টো পিঠেই কাজ করেছেন,—তাতে হয়তো রং বেশী গিয়েছে কিন্তু চমৎকার কালার এফেক্ট দেখানো গিয়েছে। আমিও ঐ দেখে উল্টো পিঠেই কাজ শুরু করলাম। রঙের শ্রাদ্ধ। কি ভাগ্য তখন রংঙের দাম এত চড়া ছিল না। অনেকদিন ধরেই শশীবাবুর ছবিখানা করেছিলাম। জগু বলে তাঁর ছোট ভাই জগদীশপুরে জলে ডুবে মারা গিয়েছিল, তারও বাস্ট পোর্‌ট্রেট এই সঙ্গে হয়ে গেল। এলাহাবাদ থেকে আসবার পর—এইভাবে অয়েল কলারের হাতে খড়ি হ'ল আমার এ বছর গরমের ছুটিতে। হরিনারাণবাবু হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছ থেকে স্কুলেই, আমাদের ক্লাসঘরে কাজ করবার পারমিশান নিয়েছিলাম; নিরিবিলি মনের আনন্দেই দুপুরবেলা রোজ এসে কাজ করতাম। স্কুল খোলবার আগেই সেখানা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললাম।

ঐ সময়ে স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের স্টেটের ম্যানেজার এবং মাইকেলের জীবনী লেখক যোগেন্দ্রনাথ বসু, ছেলেদের জন্য, রামায়ণের ছবি ও কথা বলে একখানা বই লিখছিলেন, পূর্ণ সেটা ইলাসট্রেট করছিল। কিন্তু একজনের দ্বারা অল্প সময়ে অতগুলি ছবি হওয়া সম্ভব ছিল না বলে আরও দু'তিনজন শিল্পীর দরকার হ'ল। পূর্ণ আমায় নিয়ে গিয়ে যোগেনবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে। তিনি আমায় তিন-চারখানা কাজের ভার দিলেন। তার একখানা হ'ল রাবণ যোগী বেশে সীতার কাছে ফল ভিক্ষা নিচ্ছে। দ্বিতীয়খানি লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে; তারপর একখানি লক্ষ্মণের শক্তিশেল। এইরকম তিন-চারখানা কাজ

পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। যখন বইটা প্রকাশিত হ'ল আমরা এক এক কপি উপহার পেলাম আর ইলাসট্রেশানের মজুরী তো পেলামই। মজুরীটা অবশ্য তেমন উৎসাহ ক'রে বলবার নয়। তীক্ষ্ণ বিষয় বুদ্ধিমান যোগেনবাবু বেছে বেছে ওরই মধ্যে ভাল স্টুডেণ্ট দিয়ে কাজটা সারলেন, সস্তায় কাজও হ'ল ছাত্রদের স্কোপ দেওয়াও হ'ল। সবদিক দিয়েই ভাল হ'ল, আমার সঙ্গে পরিচয়ও হ'ল।

হিরণ্ময় ঐ বাড়িরই ছেলে, আমাদের ঐ সব কাজে সে ভারি খুশি হ'ল, পরে তারই হাত দিয়ে একটা কাজ এল। মাইকেলের একখানা ছবির অর্ডার,—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পি. এন. ঠাকুরের তরফ থেকে উপহার দেওয়া হবে বলে। পূর্ণচন্দ্রই ছবিখানি সুসম্পন্ন করেছিল। সেইখানিই মনে হয় তার প্রথম অয়েল কলারের কাজ। এই সময়টা আমরা ভারি সুখে কাজ করছিলাম স্কুলে। পূর্ণচন্দ্র বুক ইলাসট্রেশানের কাজে নেমেছিল। এই ছাত্রাবস্থায়ই তার ওকাজে বেশ একটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। স্কুলে বসেই আমরা অনেক ইলাস-ট্রেশানের কাজ করছি। ব্রাউন সায়েব পূর্ণর উপর খুব প্রসন্ন ছিলেন, সেই ভাবটা বেড়ে গেল যখন পূর্ণ একবার তাকে ক্যালকাটা শেক্সপীয়ার সোসাইটির তরফ থেকে তাদের ড্রামা অভিনয় দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করলে। তিনি খুশি হয়েই সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। সতীশ মুখার্জী, পরে তিনি ড্রইংরুম এণ্টারটেনার হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, উত্তর কলকাতায় বাগবাজার আনন্দ চাটার্জীর গলিতে, ক্যালকাটা শেক্স-পীয়ার সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর একটা বিশেষ দক্ষতা ছিল। পূর্ণ ছিল একজন ঘনিষ্ঠ সভ্য। শেক্সপীয়ারের ড্রামা নিয়ে চর্চা করাই তাদের আসল কাজ। বৎসরে একবার ক'রে তাদের পাবলিক পারফরমেন্সের ব্যবস্থা ছিল। এবারে মার্চেণ্ট অফ ভেনিসের দুই একটি দৃশ্য অভিনয়াবৃত্তি ছিল।

ব্রাউন একটু দেরি ক'রে ফেলেছিলেন ; আরম্ভ হয়ে গেলে পর তিনি এলেন। পূর্ণচন্দ্র তখন স্টেজে, ব্যাসানিওর অংশ নিয়েছিল। সতীশ-চন্দ্র একই ক্ষেত্রে সাইলক আর এণ্টনিও তুইটি অংশই নিয়েছিলেন। তাঁর ইংরাজীতে আবৃত্তি অতীব সুন্দর হয়েছিল। অভিনয় দেখে সায়েব তো আমাদের খুব খুশি হয়ে উৎসাহ দিলেন। অবশ্য একথাও সত্য তিনি বিলাতে যেসব অভিনয় দেখেছেন তাঁর তুলনায় এসব হয়তো খুব চিত্তাকর্ষক নয়, কিন্তু এখানে যে ঐ রকমের একটা সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পেরেছে, এইটিই সবচেয়ে ভাল এবং লক্ষ্য করবার জিনিস। শেষে এই কথাই তিনি বললেন। আমরাও তা জানতাম। যাই হোক সায়েব, আমাদের এদেশে ইংরাজী সাহিত্য ও কাব্য নিয়ে ছেলেরা যে চর্চা করে এটা দেখে খানিক উপভোগ ক'রে থাকবেন।

এখন থেকেই স্কুলে ভারতীয় চিত্রকলা প্রসারের ব্যাপার আছে, —সে বিভাগে অবনীন্দ্রনাথই কর্তা। সেখানে ব্রাউনের কোন অধিকার নেই। তবুও প্রিন্‌সিপ্যাল হিসাবে মধ্যে মধ্যে একটু নাক গলাতে যেতেন, কিন্তু সেদিকে অবনীন্দ্রনাথ দৃঢ় আত্মতান্ত্রিক ; তবে এদিকে ভব্যতা রক্ষা তাঁর বংশমর্যাদা অনুসারে কিছু কম করেন নি। তাঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, ভোজনে তুষ্ট, তাঁর কাজ-কর্ম দেখানো শোনানো ; এসব ক'রে তিনি বুঝিয়ে ছিলেন যে তুমি প্রিন্‌সিপ্যাল আছ থাকো নিজের অধিকার নিয়ে, মদীয় বিভাগে নাক ঢোকাতে এসো না, এখানে তোমার কোন কর্তৃত্ব খাটবে না।

বাইরে যখন এ সব ব্যাপার চলছিল, আমার ভিতরে তখন অন্য ভাব।

এখন থেকেই পরমহংসদেবের এবং স্বামীজীর ছবি এবং তাঁদের জীবনালোচনা ঐ ১৯০৯ সাল থেকেই আরম্ভ এবং ক্রমে ক্রমে তা গভীর হতে চলেছিল আমার জীবনে।

বোধহয় এই সময় থেকেই ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি কাজ

আরম্ভ করেছিল ; নর্ম্যান ব্ল্যাণ্ট, একজন বড় দালাল সোসাইটিতে প্রথমেই যোগ দেন, তাঁরই কর্মাধ্যক্ষতায় সোসাইটি অনেকদূর চলে ছিল। হাইকোর্ট জজেদের মধ্যে হোমউড্ আর উডরোফ, এই দুজনেই প্রথম পৃষ্ঠপোষক হলেন। সিস্টার নিবেদিতাও আসতেন দেখেছি ছেলেদের কাজ দেখতে। সদাই প্রসন্ন মুখ তাঁর। আমাদের ক্লাসের কাজেও যথেষ্ট উন্নতি হ'ল ; মোট কথা স্কুলে তখন আবার ভাল সময় এল—য়ুরোপীয়ান তথা অয়েল কলার আর্টের উন্নতির জন্য ব্রাউন সায়েব আমাদের অনেক কিছুই সুখ-সুবিধা ক'রে দিলেন। নূতন মুভমেণ্ট বলে অবনীবাবুর সেক্সানে সব স্টুডেণ্টই ফ্রি—কেউ কেউ স্কলারশিপ পর্যন্ত পায়। তিনিও আমাদের সেক্-সানে ফ্রি-শিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করলেন ; এবং পাওয়ামাত্রই সবাইকে ফ্রি ক'রে দিলেন। আমি তখন এসব খবর পাই নি, তিন-চার মাসের মাইনে বাকী পড়েছে তাই বাড়িতে কাজ করছি স্কুল কামাই ক'রে। তখন নিয়ম ছিল মাইনে বাকী পড়লে রি-এড-মিশন নিতে হবে। অনুপস্থিত সব মাসের মাইনে আর দিতে হবে না। তখন দরখাস্ত করলে বোধহয় ফ্রি হতেও পারতাম।

মনে কিন্তু আমার দুঃখ ছিল না। কয়েকখানা রচনা, ফিগার ডিজাইন যাকে বলে, বাড়িতে আরম্ভ করেছিলাম, একখানা আমার খুব ভাল লেগেছিল। ছবিখানির নাম, মুক্তামালা—এক সুন্দরী, রত্নবণিকের দেওয়া একছড়া বড় বড় মুক্তামালা হাতে নিয়ে দেখছিল। অভয়কে দেখালাম—সে বলে কি মেয়ের মুখখানা নাকি আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর মতোই হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য কথা এই যে, আমার এই স্ত্রীর মুখে এখনও সৌন্দর্য বলতে কোন বস্তুর আভাস পাই নি ; একেবারেই সাধারণ দেখতে, পাঁচপাচি যাকে বলে, তার চেয়ে এক চুল বেশী নয়। তবে এই দু' আড়াই বছরের মধ্যে বালিকা থেকে কিশোরী অবস্থায় পড়ে দেখতে যেন সুস্থ ও শ্রীমতী হয়ে এসেছে, এইটুকুইমাত্র লক্ষ্য করা যায়। কালচারের দিক থেকে তার কোন

বালাই নেই, কেবল কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া ছাড়া। তবে আমাদের গৃহস্থ সংসারে যেটা বড্ডই দরকার—প্রভাতে উঠে উনানে আগুন দিয়ে ভাত চাপানো, অফিস স্কুলের ভাত যোগানো এসব কাজে সুদক্ষা। শিবরাত্রির উপবাস, বার ব্রত—এদিকে দুর্গাষ্টমীর ব্রত পালনে তার আগ্রহের সীমা নেই। একথা পিসিদের কাছে শুনেছি। কালচারে অগ্রণী হলে তার দ্বারা এসব কাজ পাওয়া যেত না, তাই বাবা বলেন, এসব গুণ থাকাই ভাল, কি হবে লেখাপড়া জানা মেয়ে। আসলে প্রকৃতিতে ইনি মিনার বিপরীত। রিফাইনমেণ্টের কোন ধারই পারেন না ইনি। দুই দুই মিলে চার হয় এইটি ঠিক বুঝতে পারেন। যাক, আমার প্রথম ডিজাইন নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীর কথাও একটু এসে পড়েছিল তাই বলে নিলাম। আমার দ্বিতীয় ডিজাইন হ'ল মালবিকাগ্নিমিত্র থেকে,—অগ্নিমিত্র মালবিকার নিভৃত সাক্ষাৎ। সেকালের কবিরা রাজার গুপ্তপ্রণয় নিয়ে বেশ কালচার করতেন। যাই হোক এই দু'খানা ছবির শেষ পর্যন্ত দুর্গতির সীমা ছিল না। প্রথম ছবিখানা ঠিক যেন ইটালিয়ান স্কুলের অনুসরণ আর দ্বিতীয়খানিতে রবি বর্মার প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়। নিজস্ব স্টাইল একটা শিল্পীর কতটা শক্তির পরিচয় একথা ধারণাই করতে পারি নি। তবে ঐ সময়ে যে কয়খানা রচনা চেষ্টা ক'রে আরম্ভ করেছিলাম একখানাও আমার মনোমত হয় নি। আমার বোধহয় শেষ পর্যন্ত তারা যে সদ্‌গতি পায় নি তার কারণও তাই।

অভয়চরণের কথা একটু আছে। সংসারে তার বাবা, বয়স প্রায় পঞ্চান্ন কি ষাট হবে, যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আর্ট স্কুলে তার শেখা চলল। সৌভাগ্যের মধ্যে অয়েল কালারে তার যখন হাত বেশ তৈরি হয়ে এসেছে তখনই তার বাবা যিনি সংসারের একমাত্র আর্নিং মেম্বার ছিলেন, মারা গেলেন। এইখানেই তার জীবনের একটা বাঁক। বিধাতার কি অপূর্ব বিধান প্রত্যক্ষ করলাম।

স্কুল তাকে ছাড়তেই হ'ল—কিন্তু এক বিচিত্র যোগাযোগের ফলে, চোরবাগানে বিখ্যাত রাজেন্দ্র মল্লিক বাবুদের মার্বেল প্যালেসের আর্টিস্ট হয়ে গেল সে। সেখানে তার মূল কাজ হ'ল রিনোভেটিং। তাঁদের অনেক ভাল ভাল বিলাতি পেন্টিং নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেগুলি মেরামত করা। কাজটা সোজা নয়, বরং অত্যন্ত গুরুতর; নূতন ছবি আঁকার চেয়ে অনেক কঠিন। ক্ষেত্রে পড়ে অত্যন্ত শীঘ্র সে কাজটা শিখে নিলে। তারপর, ওখানে ফটোগ্রাফীও করতে হ'ত। লাইফ থেকে আঁকার হাত তার ছিল না, কিন্তু ফটো থেকে বড় সাইজের ছবি সে খুব দক্ষতার সঙ্গেই শেষ করত। কার্জনের পর থেকে যতগুলি ভাইসরয় এসেছে, মিণ্টো, হার্ডিং, রেডিং, জেমস্-ফোর্ড প্রভৃতি সবার থ্রি কোয়ার্টার লাইফ সাইজ পোর্ট্রেট পর পর অভয় এঁকেছে মল্লিক বাড়িতে দেখেছি। ওর কাজ দেখবার জন্য—আবার আড্ডা মারতেও বটে মল্লিক বাড়িতে তখন আমার বড় ঘন ঘন যাতায়াত ছিল; কর্তারা এবং ছেলেরাও সবাই চিনতেন। তা ছাড়া জু গার্ডেন একটি ছিল, আসলে নানা রকমের পাখির সখই ওদের ছিল সব চেয়ে বেশী আর সেগুলি স্টাডি করবার জিনিস। তার মধ্যে বড় বড় সাদা ময়ূর, সাদা কাক, কাকাতুয়া আর বিচিত্র ময়না, ছিল বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। বার্ড অফ প্যারাডাইস, এত রকমের ইটালিয়ান মার্বেলের সংগ্রহ ওখানে আছে যা ভারতের কোন বড় বড় রাজপ্রাসাদেও বিরল। প্রাদেশিক গভর্নর তো বটেই, প্রত্যেক ভাইসরয় একবার ক'রে এই প্রাসাদোপম অট্টালিকায় এসে আপ্যায়িত হয়ে যেতেন তখনকার দিনে।

ইতিমধ্যে গত বৎসর এই সময়েই হিরণ্ময়ের বিবাহ হয়ে গেছে আমার বিবাহের কিছুদিন পরেই। পাকস্পর্শের দিন আমায় বলেছিল, বৌভাত হ'ল তার ভগিনীপতি, পাথুরেঘাটার গোপাল মুখুজ্যের বাড়িতে, আমরা খুব আনন্দ ক'রে দিনটি কাটিয়ে এলাম।

হিরণ্ময় তখন মডেলিং নিয়েছে—প্রতিভা তার ঐ পথেই তাকে

নিয়ে গেল। তখন আমরা বুঝলাম এইটিই তার লাইন। স্কুলে আমরা যেটুকু মডেলিং করতাম তাতে আমাদের যাই হোক তার তৃপ্তি হ'ত না। উন্নত প্রণালীর কাজ শেখবার সুযোগ তার জুটে গেল, দেখলাম এইভাবেই যারা প্রতিভাশালী তাদের সুযোগ এনে দেন পরমেশ্বর।

এল. জেনিংস, কলকাতায় লর্ড মিণ্টোর সময়েই গভর্নমেণ্ট স্কালপ্টার হয়ে এলেন, লাট সাহেবের স্টেবল বাড়ি তৈরি এবং আরও অনেক কিছু ভাস্কর্যের কাজ নিয়ে। লাট সাহেবের বাড়ির উত্তর দিকে যে রাস্তাটা ডেলহাউসী ইনসটিটিউটের দিকে গিয়েছে সেই পথের ডানদিকে প্রথম বাড়িতে তার স্টুডিও ছিল। হিরু সেইখানেই গিয়ে গভীর অধ্যবসায় সহকারে কাজ আরম্ভ করলে; জেনিংস ছিলেন সুচতুর কর্মদক্ষ মানুষ। কাজে-কর্মে দেখলেন, বুঝলেন যে হিরণ্ময় যথার্থই প্রতিভাশালী। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে হিরণ্ময়েরও একটু বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তিনিই ওকে বিলাতে গিয়ে রয়েল কলেজ অফ আর্ট থেকে শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ করতে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে যখন আমি এলাহাবাদে ছিলাম হিরণ্ময়ের স্ত্রীর অকালে মৃত্যু হ'ল। আমাদের স্ত্রী-বিয়োগের একই সূত্র, প্রসবের পরই তিনি মারা যান।

দীর্ঘকাল পর এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসেই আমি দেখলাম হিরুর, সন্ন্যাসী না হোক, ব্রহ্মচারী মূর্তি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে। একেই তো সে সুপুরুষ ছিল তার উপর এখন তার একেবারে বৈরাগীর ভাব, অপূর্ব দেখতে হয়েছিল তার মূর্তি।

দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলাম। এখন ক্লাসে উপস্থিত হয়ে দেখলাম সকলকার ইজেলে, বোর্ডের উপর হিরণ্ময়ের বৈরাগী মূর্তি; চারকোল দিয়ে হেডস্টাডি হয়েছে। শুনলাম, গত সপ্তাহেই তাকে মডেল ক'রে বসানো হয়েছিল। পূর্ণচন্দ্রের কাজটাই সব চেয়ে ভাল হয়েছিল। তার চারকোল স্টাডির মধ্যে একটা স্টাইল

আছে যা আর কারো কাজে পাওয়া যায় না। হায় হায় আমিই বঞ্চিত হলাম। এক সপ্তাহ আগে এলেই ঠিক এ সুযোগ পেতাম—এ সপ্তাহে নূতন মডেল দিয়েছে। হিরুর সঙ্গে দেখা হ'ল তার বাসায়। শুনলাম, তার বিলেতে যাবার কথাই হচ্ছে। তার প্রধান সহায় হ'ল প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। শুধু সহায় নয়,—তার ভগিনীপতি তো বটেই, তা ছাড়া বাল্যবন্ধু। দুজনে প্রণয় ছিল গভীর। যথার্থই মহৎ প্রাণ মানুষ, যাই হোক এখন স্ত্রী-বিয়োগের আঘাতটা সে এইভাবেই সামলাতে পারলে।

আরও দেখলাম ওরিএণ্ট্যাল আর্ট বিভাগে, অবনীবাবুর ক্লাসে অনেক উন্নতি হয়েছে। নির্বাচিত কয়েকটি ছাত্রের এক দল, ইতিমধ্যে মধ্য ভারতের নাইজাম রাজ্যে, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র-শিল্পের নমুনা বাঘ, অজন্তা প্রভৃতি স্থানে গুহাচিত্র দেখতে এবং তাই থেকে নকল করতে গিয়েছিলেন। অনেক কিছু কাজই তাঁরা ক'রে এসেছেন। নন্দলাল, অসিত প্রভৃতি ছাত্রদের সম্বন্ধে দেশের কাগজে সুখ্যাতি বেরিয়েছে। ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা এখন ঐ ইণ্ডিয়ান আর্ট সেকসানের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছেন অবনীবাবুর অধীনে। তিনি রাজপুত স্কুলের শিল্পী। বেশ কাজ করেন,—আলাপ-পরিচয় হ'ল। তিনি যে হেরেডিটারী আর্টিস্ট এই কথাটা অনেকবারই শোনালেন। তাই নিয়ে মডেলিং ক্লাসে এবং পরেশবাবুর মডেল ড্রইং ক্লাসে ছেলেরা খুব ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আরম্ভ ক'রে দিলে। ইণ্ডিয়ান আর্ট, হেরেডিটারী আর্টিস্ট না হলে শেখাবার অধিকার নেই, যোগ্যতাও নেই। যখন ঈশ্বরীপ্রসাদ করিডোর দিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছেন, তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছেলেরা এই বলে হোহো হাসি আরম্ভ ক'রে দিত। কি একটা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছিল এই দুই শিল্প বিভাগে, ইণ্ডিয়ান আর্ট সেকসানের উন্নতি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও ঠিক চলে ছিল একটুও কমে নি। তবে এটা ঠিক স্কুলের মধ্যে গুণগ্রাহী যে একদল, তারা এসবের উর্ধ্বে ছিল,

সমালোচনা চলত কিন্তু কদালোচনা কখনই হতে পারে নি আমাদের মধ্যে।

এই সময় বাবার শরীর নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। এর আগে তাঁকে কখনও একদিনের জন্যও অসুস্থ দেখি নি। এখন শুনলাম তাঁর বুকের মধ্যে একটা চাপ, মধ্যে মধ্যে বেদনা, হাঁপ লাগা, সময় সময় দম বন্ধ হবার মতো, এই সব ব্যাপার। অবশ্য একদিনেই এসব হয় নি, মাঝে মাঝে হ'ত এখন বিশেষরকম হওয়ায় ভয় পেয়েছেন, অথচ চিকিৎসাও করাবেন না। তাঁর বিশ্বাস থাক বা না থাক চিকিৎসায় অর্থ ব্যয় করতে তিনি চিরদিনই অরাজী। এখন তিনি ভাবছেন যত ভাবাচ্ছেনও তত, মাঝে থেকে মায়ের উদ্বেগের সীমা নেই। তিনি তো কিছুই করতে পারবেন না বেশ জানেন, বললেও তাঁর কথা গ্রাহ্য হবে না, তাই আমায় ধরেছেন,—তুই বল। দেখলাম, ঠাকুমা ও পিসিরাও সবাই এই বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

আমি বাইরে বাইরে থাকি, কাজ করি, কেবল ভিতরে আসি খেতে আর শুতে। বিশেষতঃ বাবার সঙ্গে সম্বন্ধ খুবই কম রাখি। দৈবাৎ ঘটনাচক্রে দেখাশুনা বা কথাবার্তা হ'ল, যদি তিনি সেটা ইচ্ছা করেন তবেই—না হলে ঐ ভাবেই চলছে। এখন মা এসে যখন ধরলেন,—দেখ দিকি, এত বড় একটা রোগ, তার চিকিচ্ছে করাবে না, না ওষুধ না কিছু—অতটা ভারি রোগ কি আপনি সারে? বুঝলাম, মা চাইছেন আমি অনুরোধ ক'রে তাঁকে চিকিৎসায় রাজী করি। কিন্তু এটাও জানেন আমার কোন কথাই তিনি গ্রাহ্য করবেন না। যাই হোক অসহায় মায়ের উদ্বেগ আমাতেও খানিক সংক্রামিত হয়েছিল। আর কিছু করতে না পারি তবুও একবার বলে দেখবো স্থির ক'রে নিলাম। কিন্তু, যাঁর অসুখ তাঁকে, তাঁরই চিকিৎসার কথা বলতে যাওয়া আর এক বিড়ম্বনা। এখন মায়ের ব্যাকুলতাই আমার প্রাণে কতক সাহস

এনে দিলে, আমি নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবো এই আশাতে। আমায় ধরেছেন, যাই হোক পরদিন সকালে তাঁর ঘরে যখন বিছানায় বসে বই পড়ছেন তখন গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বাবা যখন বাড়িতে থাকেন, তাঁর দুটি মাত্র স্থান—গরমের সময় ছাদে সারারাত, তারপর বিছানার উপর তাঁর সারাদিনের আসন। বাড়িতে থাকলে দিনে ঘুমোনো অভ্যাস নেই, কিন্তু রাত্রে ঘুমের জের পরদিন অফিস থাকলে ন'টা পর্যন্ত—আর ছুটি থাকলে বারোটাও হয়ে যায়। তারপর সারাদিন বসা, পড়াশুনা এবং কেউ গেলে কথাবার্তা ঐ বিছানায় বসেই চলে। সকল অবস্থায় তাঁর ঐ একই আসন, ঐ পালংএর উপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া, ইদানীং কখনও কখনও পোজ বদলে বালিসে ঠেসান দিয়ে পড়তেন। ১৯০৯ সালের কথা; তখনকার ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ লেখকদের রচনা ইংরাজী ভাষায় যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে বাবা ছিলেন তার একনিষ্ঠ পাঠক। যাই হোক দেখলাম দেয়ালে ঠাসা অনেকগুলি বালিসে হেলান দিয়ে, দুই পা লম্বা ছড়িয়ে পাইপ মুখে তিনি পাঠে তন্ময়। বইখানি এমনভাবে ধরা যে, ঘরে কেউ ঢুকলে তাঁর চোখে পড়বার সম্ভাবনা নেই। আমি সেজেগুজে নিজ বক্তব্য বলবার জন্য তৈরী হয়ে সাহস ক'রে গিয়ে তো দাঁড়ালাম, কিন্তু তাঁর যোগ ভঙ্গ হ'ল না দেখে ডাকলাম,—বাবা!

আমায় দেখেই প্রথমে আশ্চর্য এবং পরে সপ্রশ্ন বিস্মিত এমন ভাবেই চেয়ে দেখলেন, যেন বললেন, আমার কাছে তুমি! কি ব্যাপার? আমি সোজা কথাটাই একেবারে পেড়ে বসলাম,—

এতবড় একটা হার্টের অসুখ, চিকিৎসার আশু প্রয়োজন, এভাবে ফেলে রাখা ভাল নয়। জয়কৃষ্ণবাবুকে খবর দেবো তাই বলতে এসেছি। মা অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন।

মেজাজটি তাঁর ভালই ছিল, কিন্তু ডাক্তারের কথাটা তিনি ঠিক যেন ফুৎকারেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন,—তুমিও যেমন,

ডাক্তার বা ওষুধে কোন উপকারই হবে না, গুচ্ছের টাকাই খরচ হবে। আসলে আমার সময়টা এখন খুবই খারাপ, একটা ফাঁড়া আছে, বোধহয় গুরুতর একটা কিছু হবে। ঠিকুজীটা একবার কোন ভাল লোককে দেখাতে পারলে হ'ত।

ব্যস্, আর কোন কথা নয়, কোন দিকে দেখা নয়, আপন পাঠেই মনোনিবেশ করলেন। সেখানে যেন আমার অস্তিত্বই নেই। আমি হাত কচলাতে কচলাতে অনর্থক না দাঁড়িয়ে থেকে, মায়ের কাছে এসে সব খবর দিলাম,—যদিও তিনি সবই শুনেছিলেন, স্বকর্ণে।

পরমাশ্চর্য ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় সেই দিনই অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা ঘটে গেল। অবশ্য তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না, রাত্রে বাড়িতে এসে মায়ের কাছেই শুনলাম। এটা সম্পূর্ণই দৈব ব্যাপার, তা ছাড়া আর কি বলা যায়! এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার অবিনাশ বাঁড়ুয্যে, আমাদের বাপ-জেঠাদের মাসতুত ভাই, এ বাড়ির অবিনাশ দাদা, এই সময়েই কলকাতায় এলেন। ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের তিনি ছিলেন মেডিক্যাল এডভাইসর, বিশেষ প্রিয় চিকিৎসক, সেই সূত্রে বছরে একবার দুবার তিনি আসতেন আগেই বলেছি। কলকাতায় আমাদের বাড়িতে যখনই তিনি আসতেন তখনই একটা সাড়া পড়ে যেত। এখন এসেই, রাজেন্দরের বুকের ব্যাপার নিয়ে যা কিছু চলেছে, ঠাকুমা ও পিসিদের কাছে শুনে প্রথমেই তিনি এতদিন উপেক্ষা করার জন্য বাবাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করলেন। বাবা বাড়িতেই ছিলেন, সুতরাং তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করতে বিলম্ব করলেন না।

দীর্ঘকাল ধরে পরীক্ষা করলেন তাঁর শরীর। তার ফলাফল এবং ব্যবস্থা হ'ল এই,—রোগের নাম, ফ্যাটি-ডিজেনারেশন অফ হার্ট। অর্থাৎ সারা পেট এবং বুক জুড়ে ফুসফুস পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে চর্বি, এমন কি হৃৎপিণ্ডও আক্রান্ত। এখন তার চিকিৎসা,

জলাহারে থাকা, ক্ষীর, তেল ঘি, মাছ, মাংস ডিম এমনকি ডালএর সঙ্গেও কোন সম্পর্ক থাকবে না, এক টুকরো পটল বা বেগুন, কাঁচকলা সিদ্ধ এবং সামান্য দুটি ভাত না হয় শুকনো রুটি দুই একখানা, এই পথ্য ব্যবস্থা ক'রে ডাক্তার অবিনাশও চলে গেলেন আর বাবাও বিছানা নিয়েছেন, আর ওঠেন নি এমনই মুষড়ে পড়েছেন। এই পর্যন্ত এক দিকের কথা।

আর এক ব্যাপার ঘটল ঠিক পর দিন।

মনে দুঃখ বা উদ্বেগ থাকলে যখন একলা ভেবে চিন্তে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না তখন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গ কামনা খানিক শান্তির আশায়—এ অবস্থা সবারই হয় বোধ করি। মনে এই সব উদ্বেগের কারণ নিয়ে এখন আমিও হিরণ্ময়ের বাসায় গিয়ে উঠলাম, নীলমণি দত্তের গলি, চাঁপাতলাতে। মুখ দেখেই হিরু ধরেছে, বলে,—কি হয়েছে রে, বল না। তখন আগাগোড়া, সব কথাই বললাম, বিশেষতঃ বাবার সময়টা খারাপ যাচ্ছে এখন, ঠিকুজী দেখবার কথাটাও বাদ দিলাম না। শুনেই সে বলে কি, ঠিকুজীটা তুই এখনি নিয়ে আয়, গুরুজী এখানেই আছেন—আজই দেখিয়ে আসা যাক্। ছুটলাম বাড়িতে, আর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি থেকে ঠিকুজী নিয়ে উপস্থিত হলাম আবার। তারপর দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম অবিলম্বে চাঁপাতলা থেকে বড় বাজারের দিকে।

সোজা মেছুয়া বাজার স্ট্রীট দিয়ে কটন স্ট্রীটে এসে মাঝামাঝি নেপালী কোটিতে আমরা ঢুকলাম। পথে হিরণ্ময় কেবল এই কথাটুকু বললে, এ যোগাযোগটা কিন্তু দৈব, কারণ গুরুজী মোটে পরশু দিন এখানে পৌঁছেছেন। আমিও কিন্তু এর মধ্যে হিরণ্ময়ের হস্তক্ষেপটিই যথার্থ দৈব বলে নিলাম। সকল কিছু যেন শুভ যোগাযোগ পর্যবসিত হ'ল যখন গুরুজীকে দেখলাম। যেন নরসিংহ মূর্তি। বৃদ্ধ বটে কিন্তু এমন বিশালায়ত তেজপূর্ণ শক্তিশালী শরীর

এর আগে দেখি নি। আমরা প্রণাম ক'রে বসবার পর হিরণ্ময় সব কিছু পরিচয়াদির সঙ্গেই ঠিকুজীখানি তাঁর হাতে দিয়ে দিল; আর তিনিও তখনই কাজ আরম্ভ ক'রে দিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা কি কিছু বেশী হবে, গণনা হিসাবপত্র শেষে আমার হাত দেখলেন। আমার করকোষ্ঠী দেখার পর তাঁর সিদ্ধান্ত লিখে দিলেন যার অর্থ এই যে, আগামী আঠার বৎসর সাত মাস আঠারো দিনের মধ্যে তার প্রাণের কোন ভয় নেই। এখন যা হয়েছে তার সঙ্গে প্রাণের কোন গভীর সম্বন্ধ নেই। সাত-আট দিন মাত্র এর ভোগ। এখন থেকে এই খবর নিয়েই আমরা গুরুজীকে প্রণাম ক'রে পত্র পাঠ বেরিয়ে পড়লাম।

যথাকালে এই সংবাদ বাবার কাছে পেশও করলাম। সন্দিগ্ধভাবে তিনি বেশী করে গণকের কথাই জিজ্ঞাসা করলেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি গণনা করেছেন তিনি নির্ভরযোগ্য কিনা। যখন শুনলেন তিনি নেপালের প্রসিদ্ধ রাজগুরু এবং সিদ্ধজ্যোতির্বিদ তখন ফলাফলের উপর বিশ্বাস করলেন, এমন কি শেষে আনন্দে ও উৎসাহে তিনি উঠে বসলেন, এবং আমাদের উভয়কেই আশীর্বাদ করলেন। জননীও এখন নিরুদ্বিগ্ন হলেন; এবার আমিও আমার নিজ কর্মে মনোনিবেশ করলাম।

পরদিন বাবা অফিসে গেলেন; সেদিন বোধ হয় শনিবার ছিল। বেলা তিনটা নাগাদ বাবা বাড়ি ফিরলেন। তখন আমি দালানে আমার কাজের জায়গায় মনের আনন্দে কাজ করছি। প্রায় আধঘণ্টা পর মা আমায় ডেকে পাঠালেন। গিয়ে অন্দরে দেখি মা, সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। যাবা মাত্রই বললেন,— ওপরের দালানে দেখে আয়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই দেখি, উপরের দালানে মছলন্দের মাদুর পাতা তার উপর পাশে ছোট ভাই বোনটিকে নিয়ে বাবা, বসে, তাঁর সামনেই একটা ডিসের উপর গোটাদশবারো ডিম সিদ্ধ

একখানা হাতখানেক লম্বা প্রকাণ্ড ফোর্টের রুটি, হাফ পাউণ্ড মাখনের প্যাকেট, নুন মসলা-মরিচ—ক্যাভেণ্ডারের জেলী জ্যাম ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে মহা আনন্দে জলযোগে বসেছেন।

ভয়ে আমি স্তম্ভিত, আনমনা অবস্থায় এক পা এক পা ক'রে এগিয়ে কাছাকাছি যখন গিয়ে পড়েছি,—বললেন, কি বলো বাবা,—আজ তিনদিন খাই নি। জল খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে, এটা কি সম্ভব, তাকে তুমি বাঁচা বল? তার চেয়ে খেয়ে মরাই ঠিক, আর ঐটিই আমি বুঝি ভালো। কাম্-অন মাই বয়,—বোসো না, তুই এক স্লাইস খাও না, এই ফিংকী! দাদাকে একটা ডিস্ দে।

আর বলবার কিছুই রাখলেন না, করবারও কিছু নয়। বাইরে কাজ ফেলে এসেছি, রং তুলি সব ছড়ানো, আমি—আসছি, বলেই চলে এলাম। নীচে নেমেই দেখি মা ঠিক ধরেছেন, বললেন,—কি? আমি বললাম, মা গো। ইংরাজীতে একেই বলে হোপলেস, এ রোগ চিকিৎসার অসাধ্য। একাধারে রোগী ও চিকিৎসক এমনটা প্রায়ই দেখা যায় না।

খবরটা পরদিন হিরণ্ময়কেও দিলাম। সে অত্যন্ত সহজ অথচ দৃঢ় কণ্ঠেই বললে, ঠিক আছে, ও মানুষের কিছুই হবে না, দেখিস তুই। আমাদের খুদে মন, অল্প নিয়ে খেয়ে অল্প ভোগেই সন্তুষ্ট. ওরা হলেন জায়াণ্ট!

তারপর হিরণ্ময় বিলাত গেল। এই গণনায় ফল সত্যই হয়েছিল, কারণ তখন থেকে ঐ আঠারো বৎসর কয় মাস পরেই বাবা মারা যান তখন আমি বরোদায়।

১৯১০ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বিরাট এক-জিবিশান হবে, খবরটা আগেই বেরিয়েছিল। আমার ভারি ইচ্ছা দু'খান কাজ দেবো। কিন্তু সন্দেহ আছে আমার ছবি গ্রাহ্য হবে কি? ভেবেচিন্তে দরখাস্ত ক'রে দিলাম প্রদর্শনী অফিসে। উত্তরও এল যে—ছবি নির্বাচন করবেন আনন্দ কুমারস্বামী।

অমুক দিন থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়িতে ছবি নির্বাচনের কাজ আরম্ভ হবে সুতরাং ছবি যা কিছু হাজির করতে হবে, ঐখানে বেলা ছু'টো থেকে পাঁচটার মধ্যে। একটা এমনই ভয়, এমনই দুর্বলতা, এমন অসহায় অবস্থানুভূতি আমার কখনও আসে নি, ঐ আনন্দ কুমারস্বামী আর ঠাকুরদের বাড়ির নামে। জানতাম, আমরা পাশ্চাত্য শিল্পকলার উপাসক, তাই অবনীবাবুর বিষ নজর তো আছেই, তার উপর আনন্দ কুমারস্বামী তো ঠাকুর বাড়ির গুণগ্রাহী ভক্ত। আগে থেকেই যেন একটা নৈরাশ্যের বোঝা বুকের মধ্যে নিয়ে তো গিয়ে পৌঁছলাম, ঠাকুর বাড়ির উপরে দোতলার প্রকাণ্ড হল ঘরে।

গম্‌গম্‌ করছে হলটা,—মধ্যে ফরাসের উপর ছবির গাদা। সেখানে গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, অবনীন্দ্র তিন ভাই তো আছেন, তাঁদের ছেলেরাও আছে। তারপর রামানন্দবাবুও আছেন, ছবি দেখা হচ্ছে। পাগড়ি মাথায় দীর্ঘ শরীর পাঠনদের মতো বাবরী চুল, গোঁফ-দাড়ি কামানো গৌরবর্ণ আনন্দ কুমারস্বামী মাঝখানে। দেখলাম, বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান আর্টের ছবিই ওখানে রয়েছে। অবনীবাবু আমায় দেখলেন, বললেন—তুমি কোথা থেকে হে, কিছু কাজ এনেছ না কি? নন্দলালও ওখানে ছিল, সেই হলের একদিকে, আমায় দেখে এগিয়ে এসে প্রথমেই আমার ছবিটা নিয়ে দেখতে দেখতে বললে,—এখানে এতটা মাস্‌ল দেখিয়েছ কেন? এমন সময় অবনীবাবু দেখতে চাইলেন, ছবিখানি হাতে নিয়ে দেখে কুমারস্বামীর হাতে দিলেন। কুমারস্বামী এক মুহূর্তমাত্র দেখে অবনীবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—এ চলবে না।

অবনীবাবু বললেন, কেন, ওয়েস্টার্ন আর্ট সেক্‌স্থানে তো চলতে পারে? কুমারস্বামী বললেন,—না, ওটা রিজেকটেড। ছবিখানি তখন আমার হাতে দিয়ে অবনীবাবু বললেন,—তোমার তো হয়ে গেল, এখন তা হলে যাও। এতটা স্পষ্ট বলবার কারণ দেখলাম

খিদমদগারেরা তখন সবার জন্য জলখাবার আনতে আরম্ভ করেছে। দেখেই তাড়াতাড়ি আমি হলের বাইরে এলাম। সেখানে দেখি অজন্তার বিখ্যাত, সপুত্র সেই ভিখারিণীর ছবি, ফুল সাইজ, সেটা নন্দলালই কপি ক'রে এনেছে, আমায় সেটা দেখাল। দেখলাম, রংটা যেন বড় বেশী ডার্ক, অবশ্য ঐঘরে তখন কতক অন্ধকারই ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এতটা নিরুৎসাহ আর কখনও হই নি। আর এটাও বুঝলাম, যথার্থ তাঁবেদার না হতে পারলে ধনসম্পদশালী অভিজাত গৃহে একটু সৌজন্যের অনুগ্রহও পাওয়া যায় না। এতটা মানসিক অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, যে রাত্রে খেতে পারি নি, দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোতেও পারি নি।

ঊনত্রিশ

এই আঘাতে আমার যথার্থই কল্যাণ হয়েছিল। পূর্ণ একটি বৎসর আমার কোন কাজ কাকেও দেখাই নি। আমার সর্বপ্রথম রচনা একটি সুন্দর পেন্সিলের লাইন ড্রইং—প্রেমোন্মত্ত রাধা-কৃষ্ণ! গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দু'জনে দু'জনের দিকে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে চেয়ে আছেন। ছবিখানি রং দিয়ে আঁকবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা করি নি একটা কারণে। ছবিখানির ড্রইং দেখে আমাদেরই একজন বন্ধু এই মন্তব্য প্রকাশ করলেন,—এসব ছবিতে কোন পদার্থ নেইই বরং একটা ইম্‌মর‍্যাল আইডিয়াই এত স্পষ্ট ফুটেছে। ছবিখানিতে দু'জনকেই প্রায় উলঙ্গ দেখানো হয়েছিল। এ ছবি দেখে সত্যিকারের রসিক কেউ রস পাবে না। এই মন্তব্যটাও একটা আঘাত। তখন থেকেই, আর কাকেও আমার রচনা

দেখাতে যাবো না—এই সংকল্পে দৃঢ় হয়েই ছিলাম। এমন কি, কাজ করতে আরম্ভ করেছি এমন সময় অভয় এসে পড়লে সেটা চাপা দিয়ে ফেলতাম। আমাদের বাড়ির ঠাকুর-দালানেই আমার অধিকার, সেখানেই কাজ করতাম। বাইরে থেকে একমাত্র অভয়ই এসে পড়ত সেখানে। তবে পোর্ট্রেট পেন্টিংএর কাজটা সবার সামনেই করতাম, তাতে সংকোচ ছিল না।

ইতিমধ্যে ওয়াটার কলারের কয়েকখানি অর্ডারি বাজারের কাজ ক'রে কিছু উপার্জন করছিলাম। স্কুলের কাজে শেষের বছরখানেক কোন আকর্ষণ অনুভব করতাম না; দেখতেই তো পেতাম যে স্কুলের কাজ গতানুগতিক ধারাতেই চলে, তার মধ্যে আর উন্মাদনা নেই। শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আসল কথটা হ'ল ছাত্রের নিজের চেষ্টা, আর নিরন্তর নিজ অভ্যাসে দৃঢ় থাকা; তারপর উদ্ভাবনী শক্তি আর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের উৎকৃষ্ট কাজগুলি দেখা, এই কয়টাই আসল। স্কুলের শিক্ষার প্রতি আমরা সবাই আস্থাহীন হয়েছিলাম; তবে যখন এতটা দিন কাটিয়েছি তখন এখানকার সব কোর্সগুলিতে প্রথম বিভাগে পাস না করলে কি আর লাভটা হ'ল,—তাই সব কটা পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষাই করছিলাম। শেষ বৎসর ১৯১১ সালে শেষ পরীক্ষা দেবো। চার-পাঁচ মাস কামাইয়ের পর, বাড়িতে যে কাজগুলি করেছিলাম তার মধ্যে বেছে বেছে ভালগুলি নিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে দেখিয়ে ছুটির মাইনাটা মাপ করানো যাবে—এই আশায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাসে কাজ করতে অনুমতি দিলেন। পরীক্ষার সময় এলে গোড়া থেকে যতগুলি বিষয় শিক্ষা করা হয়েছিল সকলগুলিতেই ফার্স্টক্লাস, কেবল পারস্পেকটিভে সেকেণ্ড ক্লাস পাস হলাম।

এ বছরে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হ'ল, কলকাতায়, কংগ্রেসের সঙ্গে ভবানীপুরে পোড়া-বাজারের মাঠে বিরাট শিল্প প্রদর্শনী; অনেক দিন এমন একজিবিসন হয় নি।

গত বছরে সেই যে ধাক্কা খেয়েছিলাম আর কাকেও নিজের রচনা দেখাই নি। ছবি আমার ছিল কিন্তু, রিজেক্টেড হবে, এই নৈরাশ্যমূলক মনোভাবের বশে ও-সম্বন্ধে কাকেও কিছু বললাম না। স্কুলের হেড মাস্টারমশাই একজিবিসনের আগে যথা সময়ে যখন ক্লাসে এসে প্রশ্ন করলেন,—একজিবিসনে দেবার মতো কারো কোন রচনা আছে কিনা, তখন কেউ কোন কাজই দিল না। আমি তো উচ্চবাচ্যই করলাম না। যথা সময়ে একজিবিসন খুলল। জীবনে এই প্রথম এতবড় একজিবিসন প্রত্যক্ষ করলাম।

একজিবিসনে যাদের ছবি থাকে তাদের তুল্য পুণ্যবান্ লোক আর নেই, তার ওপর যাদের ছবি রেকমেণ্ডেড হয় তারা মহাপুণ্যবান্, এই ছিল তখনকার মনোভাব! একটি আক্ষেপ ছিল মনে, যেন বিচারের দোষেই আমার ছবি এলাহাবাদে নেয় নি, কিন্তু একটু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে মনে হয় যেন ছবিখানি দেখবার অযোগ্য ছিল না। তবে নন্দলাল ছবিখানা দেখেই বলেছিল যে মেয়ে মানুষের হাতে অত মাস্‌ল দেখানো ঠিক হয় নি। ঐ সময়ের পর এ দুবছর যেসব ছবি করেছি, তার মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই প্রদর্শনীর উপযুক্ত—এ বিশ্বাস গভীর ছিল, কিন্তু ঘর-পোড়া গরুর অবস্থা আমার। তখন এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে আমাদের পিছনে মুরুব্বি না থাকলে যেমন ভালমন্দ কোন চাকরিই এদেশে হয় না—হতে পারে না, তেমনি ঐ শিল্পীর পিছনে মুরুব্বি না থাকলে ছবি দেখানোর জন্য পছন্দও হয় না। তা ছাড়া ক্লাসের কোন স্টুডেণ্ট যখন দিল না, এমন কি পূর্ণ পর্যন্ত দিলে না তখন আমি দিলেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সমালোচনাও তীব্র হবেই, অতএব না দেওয়াই ভালো—এই মনে ক'রে আরও দিলাম না কোন ছবি। তবে তখন থেকেই মনের মধ্যে আমার একটা প্রবল ভরসা ছিল যে, এই ভগবানের রাজ্যে যথার্থ গুণ থাকলে কখনো তা প্রকাশিত হবেই। তখন থেকে এই বিশ্বাস রেখে কাজ

করতাম, কাকেও তা দেখাতাম না, এইভাবেই একটা যথা সময়ের অপেক্ষায় যেন ছিলাম যে সময়ে আমার প্রতিভাই আপন পথ ক'রে নেবে। তা ছাড়া আরও একটা বিষয় আমায় সজাগ রেখেছিল কুমারস্বামীর ছবি রিজেকসানের পর থেকে। সেটা এই যে আমায় যথার্থই গুণ সঞ্চয় করতে হবে যে গুণে চিত্রকর প্রতিষ্ঠার অধিকারী হয়। সে গুণ কি আমার জন্মেছে? কতটুকু শিখতে পেরেছি বা দেখাতে পেরেছি আপন কাজে? আর তখনকার ভারতীয় চিত্রকলার উপর আস্থাই ছিল না, কাজেই ও লাইনে নিশ্চয়ই যাবো না এই ছিল মনের কথা। বড় বড় ছবি আঁকবার ঝোঁক আমার খুবই আছে, তবে যথার্থ অয়েল কালারকে আমার ডিজাইনের প্রধান অবলম্বন করবো কিংবা ওয়াটার কালারকে করবো সেটা তখনও ঠিক করতে পারি নি। তখনও ওয়াটার কালারেই ডিজাইনগুলি করি। আর পোর্ট্রেটের মধ্যে যা অর্ডারি কাজ তা অয়েলেই ক'রে চলেছি। ইতিমধ্যে মাত্র একখানি অয়েলে পোর্ট্রেট করেছিলাম, আর তা সাকসেসফুল হয়েওছিল। দুই প্রথায় কাজ ক'রে চলেছিলাম।

যে শান্তি থাকলে একজন শিল্পী নিজ কাজে প্রাণ-মন সমর্পণ ক'রে, স্থির সংযমের ফলে একখানা সৃষ্টি করতে পারে সে শান্তি বাড়িতে আমার ছিল না। কেবলমাত্র যতক্ষণ কাজে থাকতাম ততক্ষণ আমার শান্তি।

এখন একজিবিসনের কথা বলতে আগের জোড়াসাঁকোর বাড়ির তখনকার কর্তাদের অর্থাৎ জেঠামশাই, বাবা, এঁদের মন্তব্যটা না বললে যেন মন কিছুতেই শান্ত হবে না। তাঁদের ভাষাটুকুও শুনবার মতো। একজিবিসন দেখে গিয়ে তাঁরা বাড়িতে গেলে পর জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন দেখলেন? অবশ্য আমি দেখবার পর তাঁরা দেখেছিলেন, কাজেই আমাদের পক্ষে খুব উপভোগ্য হয়েছিল তাঁদের মন্তব্য। জেঠামশাই বললেন,— এ কি

একজিবিসন তোরা দেখেছিস! যে সব একজিবিসন আমরা দেখেছি তার তুলনায় এ তো কিছুই নয়। আমরা ইণ্টারন্যাশান্যাল একজিবিসন দেখেছি ১৮৮৫ সালে, যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস আসেন; তখন ঐ মিউজিয়াম থেকে গড়ের মাঠের পশ্চিমের প্রায় সবটা নিয়ে একেবারে কেল্লার কোল অবধি জুড়ে এদেশে একটা এমনই একজিবিসন হয়েছিল সে রকমের প্রদর্শনী কখনও কোথাও হবে না। বড় বড় ইটালীয়ান পেণ্টারদের ছবি,—র‍্যাফেল দাবিঞ্চি, টিশিয়ান, মুরিলো, করেজিও প্রভৃতি শিল্পীর অরিজিন্যাল ছবি এসেছিল। আর মুর্শিদাবাদের নবাব,—যতো সব রাজা মহারাজারা, আমাদের পাকপাড়ার ইন্দির নারাণ পর্যন্ত অনেক ছবি কিনেছিলেন। প্যারিস, লণ্ডন, জার্মানী থেকে যেরকম আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস সব এসেছিল সে সব তোরা এখানে কোথাও দেখতে পাবি না। শেষে হুসেন খাঁর ম্যাজিক হয়েছিল, তাই না দেখে ইউরোপীয়ান সাহেবরা সবাই ধন্য ধন্য করেছিল। এমন সব আতস বাজি হয়েছিল যা কেউ কখনও দেখে নি। সে সবটাই আশ্চর্য ব্যাপার। আসলে সে একজিবিসনে সারা পৃথিবীর জিনিস এসেছিল।

তাঁরা অবশ্য পরদেশী যথেষ্ট আশ্চর্য অনেক কিছুই দেখেছিলেন স্বীকার করি। কিন্তু আমরা সেই একজিবিসনে স্বদেশীয় যা দেখেছিলাম তাও মনে হয় কিছু কম নয়। আমরা দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পী; সুতরাং আকর্ষণটা ছিল ছবির ওপরেই, তাই ছবির কথাই বলছি। বম্বে থেকে অয়েল কালারের পোর্‌ট্রেট এসেছিল অনেকগুলি—উৎকৃষ্ট, প্রথম শ্রেণীর কাজ। তার মধ্যে বোধ হয় বোমানজির একখানা প্রথম আর পিঠাওয়ালার একখানা দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। ধুরন্ধরের একখানা পোর্‌ট্রেট আর কয়েক-খানা রচনা এসেছিল, আগাগোড়া রবি বর্মার ছাঁচে আঁকা। এমন অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিমতা-পূর্ণ রচনা আর কারো হবে না।

আমার মোটেই ভাল লাগল না। একই রং ও একই টাইপের অসংখ্য মারাঠা মেয়ের ছবি—ধুরন্ধরের ছবির বৈশিষ্ট্য। গণপতি কাশীনাথের মাত্র দুই তিনটি কাজ এসেছিল, চমৎকার সেগুলি। আমাদের বাংলার অনেক শিল্পীর ছবি ছিল। তখনকার প্রসিদ্ধ অন্নদা বাগচী মশাইয়ের রচনা কয়েকখানি ছিল, আর বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খান পাঁচ-ছয় অরিজিন্যাল, নট ফর কমপিটিশান, মার্কা দিয়ে দেখানো হয়েছিল। আমাদের এ সমাজে প্রাচীন, সেকালের ভদ্রভক্তিমান এক শ্রেণীর কাছে তাঁদের ছবির একটা গুরুত্ব হয়তো ছিল, কিন্তু আমাদের চোখে অন্নদা বাগচীমশাইয়ের ফিগার কম্পোজিসান অর্থাৎ মৌলিক রচনার চেয়ে পোর্‌ট্রেটেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন এই ধারণা জন্মেছিল। তাঁরই সমসাময়িক এবং বন্ধু বামাপদবাবুরও মৌলিক রচনাবলী তথৈবচ। তখনকার বাজারে জার্মান লিথোগ্রাফের নকল, তাঁর দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, কর্ণ-কুন্তী, অভিমন্যু-উত্তরা, শান্তনু-গঙ্গা, অর্জুন-উর্বশী দেখে দেখে চোখ আমাদের উত্তপ্ত ও বিকৃত হয়েছিল। সেইসব ছবির অরিজিন্যাল-গুলি এখানে দেওয়া হয়েছে। সৌন্দর্যবোধ, মূর্তি রচনা সংক্রান্ত রূপরেখা এবং বর্ণ সংমিশ্রণে এমন কি ছবির পৌরাণিক বেশভূষালংকারাদি যাত্রা থিয়েটারেরই অনুকরণমাত্র, তাঁদের কৃতিত্ব আমাদের চোখে বড় গৌরব করবার মতো নিশ্চয়ই ছিল না। তবে পোর্‌ট্রেট পেন্টিং-এ তাঁদের কৃতিত্ব ছিল আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস বা ধারণা এই রকমই। একথাও সত্য যে, পোর্‌ট্রেটে, বম্বে স্কুলের কাজ এঁদের উপরের স্তরের, এটা ঐ একজিবিসনেই প্রমাণিত হয়েছিল।

এইবার যামিনীবাবুর কথা,—তাঁর কথা সবশেষে বলবার কারণ হ'ল, কি মৌলিক রূপ-রচনা, কি নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী সব দিকেই তিনি প্রতিভাশালী এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলেই আমাদের বিশ্বাস। এখানে তাঁর পোর্‌ট্রেটের ভাল নিদর্শন ছিল না। একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ তাঁর,

ডাস্ক অন দি রিভার পদ্মা,—ছবিখানি একজিবিসনে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল এবং ত্রিপুরার মহারাজা সেখানি খরিদ করেছিলেন, দাম ছিল মাত্র বারশো টাকা। সন্ধ্যার কুয়াশা-ভরা বায়ুমণ্ডল অথচ রাত্রি আসে নি, গোধূলি কালের ছবি। অকূল পদ্মার উপর একখানা মাল বোঝাই নৌকা, ভিতরে রান্না হচ্ছে, তারই আগুনের এক টুকরা প্রতিবিম্ব জলে পড়েছে। কি সুন্দর রচনা, এমনটি এর আগে দেখি নি। মনোমুগ্ধকর দৃশ্য যাকে বলে, ছবিখানি তাই। ছবিখানি ইউনিক। এর আগে আমাদের দেশে যে এতটা উৎকৃষ্ট ল্যাণ্ডস্কেপ জন্মায় এ ধারণা শুধু আমাদের নয়, এ দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ছিল না। অনেকগুলি ল্যাণ্ডস্কেপ ছিল তাঁর এই প্রদর্শনীতে, সকল-গুলিই বিক্রি হয়েছিল। যামিনীবাবুর ঐ ছবিখানিই তখন থেকে চিত্রামোদী বা শিল্পরসিক সমাজের সবাইকে অকৃষ্ট করেছিল তাঁর দিকে। দেখেছি ভবিষ্যতে ভরতের যে কোন স্থানে যতবার একজিবিসন হয়েছে যামিনীবাবুর ছবির আকর্ষণ সমানভাবেই চলেছিল। এখন থেকেই আমরা একটু বেশী বেশী যামিনীবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ল্যাণ্ডস্কেপ ছাড়া ফিগার কম্পোজিসনে তিনি যে কত বড় একজন দক্ষ শিল্পী তা তাঁর বিরহী যক্ষ, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ প্রভৃতি কয়েকখানি ছবিতে প্রমাণিত হয়েছিল। মোট কথা, সেবারে একজিবিসনে চিত্রশিল্প বিভাগে যামিনীবাবু ললাটে জয়-টীকা পেয়েছিলেন, আমাদের বিশ্বাস।

ঐ প্রদর্শনীতে ইণ্ডিয়ান আর্ট সেকসানও একটি ছিল। সেখানে নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী, হাকিম প্রভৃতির ছবি দেখানো হয়েছিল। সুরেন গাঙ্গুলীর কার্তিকেয় আর লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন এই দু'খানা ছবি ছিল। বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন ছবিখানি শুধুই ঐতিহাসিক কলঙ্ক নয়, শিল্পী সুরেন্দ্রনাথেরও কলঙ্ক। আর কি রচনার বিষয়-বস্তু ছিল না? তাঁর টেকনিক বেশ, তবে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সবাই জানেন অথবা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন

সুরেন গাঙ্গুলীর টেকনিকটা হুবহু তখনকার নন্দলালেরই অনুসরণ। ক্লাসের মধ্যে নন্দলালের টেকনিকই ছিল যথার্থ সরল, মৌলিক এবং প্রায় সকলদিকেই ভ্রম-ত্রুটি বিবর্জিত।

একজিবিসনের শেষ কথাটা এখনও বাকী আছে। কলকাতা শহরের দুজন অতি প্রসিদ্ধ রত্নবণিক বা জহুরী,—রায় বদ্রিদাস বাহাদুর, মুকিম টু হিজ একসেলেন্‌সি দি ভাইসরয়, আর লাভচাঁদ মতিচাঁদ। একজিবিসনে দুজনেরই স্টল ছিল। আমরা এই সূত্রে মহামূল্য রত্নগুলি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। বজ্র (হীরা) চুনি (রুবি) বৈদূর্য (ক্যাটস আই) মুক্তা, গোমেদ, বিদ্রুম্ (পলা) মরকত (এমারেল্ড), পুষ্পরাগ বা পোখরাজ, নীলা; হিন্দু শাস্ত্রের এই নয়টি রত্ন। এখনকার আমাদের শহরের দুই মুকিমের স্টলেই এই নব রত্নের নমুনা পর্যাপ্তই ছিল। তবে, দেখা গেল হীরার স্থানটা যেন সবার উপর, তার নীচে চুনি বা রুবি। লাভচাঁদের ঘরে চুনি একখানা ছিল, এমন জিনিস প্রায় দেখা যায় না। সাত রাজার ধনই বটে। ছোট একটা বাদামের সাইজ হবে, দাম তার পঁচিশ হাজার। আমার দৃষ্টিতে তার আকর্ষণই সব চেয়ে বেশী। হীরা দুই ঘরেই ছিল—বদ্রিদাসের ঘরে একখানা বৈদূর্য মণি ছিল, তার দাম ষোল হাজার হবে। অপূর্ব তার তিনটি লাইনে জ্যোতি রেখা। নীলার সংগ্রহে লাভচাঁদ একখানা রক্তমুখী নীলা দেখিয়েছিল—গাঢ় নীলের ভিতর থেকে একটা লালের আভা, এমন রঙের নীলা আগে কোথায় দেখি নি। পরেশনাথের প্রোশেসানে সম্ভ্রান্ত জৈন ব্যবসায়ীরা রত্ন ধারণ করেন, লাল, নীল, সবুজ হলুদের ছড়াছড়ি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি সাইজ—দেখবামাত্রই মনকে মুগ্ধ করে। জিনিসটি পাথর, কিন্তু বর্ণ ও জ্যোতিতে তাকে অলঙ্কারের শিরোমণি ক'রে রেখেছে। মানুষের খেয়াল যে কতটা প্রসারিত হতে পারে তা এই রত্নমন্দিরে এলেই ধারণা করা যায়।

এই যে কংগ্রেস উপলক্ষ্য ক'রে এমনই একটি বিরাট প্রদর্শনী, এর শেষ পরিণিত হ'ল অগ্নিকাণ্ডে। একেবারে আগুনের খেলা —বহু লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেল, প্রদর্শনীও শেষ হ'ল। ঠিক যেন প্রকৃতি দেখিয়ে দিলেন এই যে এতগুলি শ্রমলব্ধ মূল্যবান বস্তুর সমাবেশ, এত অর্থব্যয়, এতটা সময়ের ব্যবহার, এত এত জনসাধারণের উৎসাহ, শ্রম এবং প্রীতি, নরলোকে উপভোগের পরাকাষ্ঠা—এর পরিণাম আর নরদেহের পরিণাম একই। আসলে এই পোড়া-বাজার স্থানটিই অলক্ষুনে, এক দলের মতো।

একজিবিসন শেষ হয়েছিল কিন্তু তার নেশা অনেকদিনই ছিল। অনেকদিন কাজ করতে পারি নি—তুলি ছুঁই নি।

যদিও আর্ট স্কুলে আমাদের কাজ চলছিল, সম্পূর্ণই আমাদের নিজ নিজ চেষ্টার উপরে—আমাদের কিন্তু এই স্কুলের সার্টিফিকেটে মোটেই আস্থা ছিল না। অন্যান্য বিভাগে, যেমন ড্রইং, ড্রাফট্স-ম্যান, লিথোগ্রাফী, উড-এনগ্রেভিং প্রভৃতি বিভাগে পাস করলে যে সার্টিফিকেট পাওয়া যেত, তাতে কাজ হ'ত অর্থাৎ চাকরি পাওয়া যেত, কিন্তু এখানকার পেন্টিং শিক্ষার ফলে ছাত্রের কোন সদ্‌গতি নেই ; নিজের মেরিট দেখিয়ে পার্টিকে সন্তুষ্ট করতে পারলেই তবে তোমার কাজ আসবে। তার উপর দেশের সম্ভ্রান্ত ঘরে সবাই বিলাতি শিল্পীদের ভক্ত। বিলাতি শিল্পীদের তাঁরা ডেকে কাজ দেন। এখানে গভর্নমেণ্টের কাছেও এই স্কুলের সার্টিফিকেটের কোন মূল্য নেই। গভর্নমেণ্ট নিজের কাজে বিলাতি পেণ্টার ভাস্কর নিয়োগ করবেন, অন্ততঃ বিলাতি চাপরাশ চাই। কাজেই এহেন কলকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের সার্টিফিকেটের মূল্য কি ? আমরা তাই যখন স্কুল ছাড়লাম তখন সার্টিফিকেট না নিয়েই ছেড়েছিলাম। তখন প্রাইভেট কাজেরও চাপ পড়েছিল বেশী। পোর্ট্রেট ক'রে কিছু কিছু রোজগার করি। আর বাকী সময় ডিজাইনে গভীর ধ্যান লাগিয়েছি। মাঝে মাঝে স্কুলেও গিয়েছি।

যখন প্রথম দফায় মুক্তামালা, মালবিকাগ্নিমিত্র প্রভৃতি ঐসব ছবিগুলি লিখেছিলাম তখন একটু তরল ছিল মনের গতি। তারপর কুমারস্বামীর কাছে যখন সে ছবি প্রত্যাখ্যাত হ'ল সেই আঘাত পাওয়ার ফলে তখন ঐসব ছবি একেবারে বিলিয়ে দিলাম এমন ক্ষেত্রে, যেখান থেকে সেগুলি চোখে আর যেন না পড়ে। এরপর নূতন রচনা আরম্ভ হ'ল। সাইজেও বড় এবং আমার মনে হয় ভাবের গভীরতাও ছিল। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পূর্বে, একদিন সন্ধ্যায় বাগানে গোপার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে গান শুনেছিলেন, —গানটা গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব-চরিতে আছে, 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই'। ঐ ভাবাবস্থায় সিদ্ধার্থের মূর্তি, আমার এবারের কাজ। তারপর, রাধা ও ললিতা; তারপর, রাধা ও কৃষ্ণ; তারপর —পরা-বিদ্যা ইত্যাদি। এক বৎসরের মধ্যে পাঁচ ছয়খানা মৌলিক রচনা জন্মাল। কিন্তু কাকেও দেখাই নি তখনও। তা ছাড়া অসংখ্য ওয়াটার কলার স্কেচ করেছিলাম কিছুদিন শিমুলতলায় থেকে।

এই সময় থেকেই জীবনে আমার মধ্যে ব্যক্তিগত ধর্মের উন্মেষ হতে চলেছিল। আজ প্রায় এক বৎসর থেকে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত চলছিল। রামলালদাদার কাছে বসে ঠাকুরের কত কথাই শুনতাম। তিনি প্রায় সব সময়েই গুনগুন ক'রে গান করতেন, যখনই দেখা হয়েছে, ঐ গুনগুন গানেই তিনি মত্ত দেখতাম। তখন থেকে বেলুড় মঠে আর বাগবাজারে উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়েছিল। স্বামীজীর মেজভাই, মহিনদা তিনিও আমাকে ভালবাসতেন, শিল্পীদের উপর তাঁর প্রাণের টান ছিল। ওখানে মধ্যে মধ্যে ফিস্ট হ'ত, কাজেই যাবার আগ্রহ খুব ছিল। তিনি বিশেষ ক'রে বলতেন,—এখানে আসা-যাওয়া করছ, স্ত্রী-সঙ্গ করবে না। ভিতরের ধ্যান যেন ওদিক দিয়ে নষ্ট না হয়। এইভাবে ভিতরে ভিতরে একটা সাধনাও চলছিল যদিও প্রকৃত দীক্ষা নেওয়া তখনও হয় নি। তবে সৎসঙ্গের যে প্রবল একটা

প্রভাব আছে সেটা অনুভব করতে পারি, আমার পথটা যেন চিহ্ন ক'রে দেওয়া আছে।

স্কুল থেকে এসে হয় স্বামীজী না হয় ঠাকুরের ছবি নিয়ে বসি। বেশ ধ্যান হয়, সে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। তখন থেকেই অনুভব করতাম ঠাকুর যেন সব সময়েই আমার সঙ্গে আছেন— আমার যেন পতন নেই, সিদ্ধি আমার অবশ্যম্ভাবী। আর্ট স্কুল ছাড়বার আগেই কয়েক মাস বাইরে যাবার সুযোগ এল, এটা ঠাকুরেরই যোগাযোগ বলে মনে করি।

বহু তীর্থ ভ্রমণের পালা। অভয়ের কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা বন্ধু রেলে কাজ করতেন। তিনি অভয়ের জননী মাসি প্রভৃতি তিনজনকে পশ্চিমের সকল তীর্থদর্শনের জন্য রেলভ্রমণের পাস দিয়েছিলেন, কেবল নিয়ে যাবার লোকের অভাব। অভয় জানত আমার মতো ভবঘুরে বন্ধু তার আর নেই। আমায় ধরে বসল— স্কুলে নিয়মিত যাওয়ার বালাই নেই, আর মাথার উপর উপার্জনেরও তাড়া নেই, কাজেই আমাকেই যেতে হ'ল। সহধর্মিণীর দিক থেকে যেন একটুখানি বাধা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা গেল। নূতন বৌটি, তখন আমাদের বাড়িতেই ছিলেন, অবশ্য আর নূতন নেই। এখন তিনি সংসারে একজন বড় কাজের লোক। বড় গম্ভীর মানুষ, বেশী কথা বলেন না, কিন্তু কথার দাম আছে।

গয়াতে দুই রাত্রি, পরে কাশীতে, তিনরাত্রি কাটিয়ে মথুরা তারপর বৃন্দাবনে পনের দিন, তারপর রাজপুতানা, জয়পুর, অম্বর, আজমীর, পুষ্করাদি দেখে আবার শ্রীবৃন্দাবন, প্রায় দেড় মাস অবস্থিতি। বন-ভ্রমণ, তারপর হরিদ্বার, কয়েক দিন কাটিয়ে, আম্বালা হয়ে কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর তারপর প্রয়াগ, তারপর বৈদ্যনাথ হয়ে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন।

তার মধ্যে অদৃষ্টক্রমে প্রায় তিনমাস ভ্রমণ। যাত্রাকালে প্রথমটা গাড়িতে একটু বৈচিত্র্য আছে। এক সি. আই. ডি. সঙ্গে সঙ্গে

উঠলেন হাওড়া থেকে, পাশে বসে আলাপ আরম্ভ করলেন। খুব ভদ্র ব্যবহার, সিগারেট ধরালেন, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন,—অনুশীলন সমিতির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ আছে নাকি? আমি প্রথমে একটু বেশ নার্ভাস হয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময়ে ঠাকুরের মুখখানি মনে পড়ল, অন্তরে সাহস এল। তখন এমন কতকগুলি কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল যার ফলে ভদ্রলোক একেবারেই জল হয়ে গেলেন। তখন তিনি বলেন কি, আমরা পেটের দায়ে এই কাজ করছি, আসলে আন্তরিক কোন ইচ্ছে নেই যে আমাদের দেশের লোককে হয়রান ক'রে বেড়াই। এখন এমনই নিয়ম হয়েছে ইয়ংম্যান্ কেউ হাওড়া থেকে পশ্চিমের ট্রেনে উঠলেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে, যতক্ষণ না তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা হাওড়ায় থাকি আর ট্রেনেই ট্রাভল্ করি। তখন জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাদের দেশ কোথা? বললাম, মাদারীপুর মহকুমা ফরিদপুর জেলা, খালিয়া গ্রামেই আমাদের পৈত্রিক বাস। তিনি শুনে মহা আপ্যায়িত হয়ে বলেন,—আমার দেশ বরিশাল। এইসব কথায় কথায় বর্ধমান পর্যন্ত একই সঙ্গে চললাম। বর্ধমানে নেমে বললেন, আপনার কাছে কিছু পাওয়া গেল না, এখন থেকে অন্য শিকারের চেষ্টায় চললাম।

এই তীর্থ ভ্রমণের মধ্যে একদিনের জন্যও আমি পরমহংসদেবের কথা ভুলি নি। তিনি যেন ঐসব ক্ষেত্রেও রয়েছেন, এই রকম মনে হ'ত।

মেয়েদের কাছে যেটা তীর্থভ্রমণ আমাদের কাছে সেটা দেশ-ভ্রমণ। কারণ আমরা, ঠিক তীর্থ করবো বলে যাই না। আমরা থাকি কলকাতায়—কোন যোগাযোগে কোন পল্লীগ্রামে গিয়ে পড়ি, সেখানে দেখবার অনেক কিছুই আছে, যা আমাদের মতো কলকাতার অধিবাসীরা দেখেন না, দেখতে পান না, বা দেখতে ভালোবাসেন না, তাই দেখতে চানও না। আমাদের এই বাংলার

কোন গ্রামে, মনে করো একটি নদীর ধারে প্রকাণ্ড গ্রামের মন্দির, দিঘির বাঁধানো ঘাট, মেঠো পথের ধারে প্রকাণ্ড গাছ ; আশপাশেও অনেক দোকানপাট—গরুর গাড়ি ক'রে যাত্রী নামছে মন্দিরের ধারে। যারা নামছে তারা কেউ চাষাদের নথপরা গিন্নী, দুলপরা মেয়ে একটি সঙ্গে। তাঁতি বা কলুদের পুত্রবধু, কাঁখে কোলে তার ছেলেপুলে, তার মধ্যে কেউ উলঙ্গ, কেউ নীচে উলঙ্গ উপরে একটা জামা বা দোলাই, ছোট মেয়েরা ছোট শাড়ি পরা, মাথায় চুড়ো বাঁধা চুল, তার উপর পিতলের ঘুঙুর প্রভৃতি—এসব দেখতে কি বাবুরা চাইবেন ? অথচ এটা তীর্থ একটা। যে ক্যালক্যাসিয়ানরা পূর্ববঙ্গের, অর্থাৎ পিতৃভূমির অধিবাসীদের বাঙ্গাল বলেন, উড়িষ্যার অধিবাসীদের উড়ে বলেন, পশ্চিমের অধিবাসীদের মেড়ো বলেন অথচ এদের একটি না হলে তাঁদের অন্ন জোটে না, বা দিন চলে না—তাদের তীর্থের রুচি কত অদ্ভুত তা নিজের চোখে দেখেছি। আমাদের মধ্যে যাঁরা একটু রুচি-বাগীশ, তাঁরা দেশ ভ্রমণে যান হেল্‌থের জন্য মিহিজামে, শিমুলতলায় বা দেওঘরে। সেখানে সাঁওতাল অধিবাসীদের সঙ্গে মাত্র কাজ নেবার সম্পর্ক। এই, ওরে বেটা, এই তুই, ভিন্ন কথা নেই। সাঁওতালদের মেয়ে-ছেলে, তাদের ঘরকন্না তাঁরা দেখবার অযোগ্যই মনে করেন। কাজেই তীর্থে গিয়ে তাঁরা কি দেখবেন ?

দেশভ্রমণ, মানব জীবনের একটা প্রধান সুখ। তীর্থভ্রমণ তার চেয়েও বড়। দেশভ্রমণের কথাই বলছি, তা সত্য সত্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ? আমরা বাঙালী,—সব চেয়ে কম দেখি বাংলাকে, আমাদের মধ্যে যিনি একটু বাইরে যাবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন, তাঁরা দিল্লী দেখেছেন, আগ্রা দেখেছেন, লাহোর দেখেছেন, কিন্তু ঢাকা দেখেন নি, চট্টগ্রাম দেখেন নি, কুমিল্লা দেখেন নি। বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া দেখেন নি। তাঁরা হয়তো ভাববেন এই বাংলা আবার দেখবো কি, এখানে আছে কি ? এটি কিন্তু পুরুষদের কথা,

আমাদের মেয়েরা সেকথা বলে না। এবার এই তীর্থভ্রমণের সূত্রে দেখলাম মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থই বাস্তব। মানুষে মানুষে সহজ সম্বন্ধ, সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যেও বৈচিত্র্য তারা আকর্ষণ করতে পারে। আর তাদের দ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ল কোথায় কি পাওয়া যায়? এ যাত্রায় আমাদের ভ্রমণ গয়া থেকে আরম্ভ ক'রে বৈদ্যনাথেই শেষ, এর মধ্যে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি স্থানে তারা কিছুক্ষণ ধরে বসতি করছে। কোথাও ছয় থেকে আট ঘণ্টার কম থামে নি। যেখানে এক দিনরাত ছিল বা আরো বেশীক্ষণ ছিল সে কথা ছেড়ে দিচ্ছি। এ ছয়-আট ঘণ্টার মধ্যে তাদের মধ্যে কেউ সেখানকার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য খানিকটা দেখেছে অথবা সেখানকার শ্রমে উৎপন্ন কিছু না কিছু যোগাড় করেছে। যেখানে বেশীক্ষণ ছিল, পাণ্ডাদের ঘরে গিয়েছে তাদের বৌ ছেলেপিলে, তাদের ঘরকন্না, আহার বিহার, জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের আয় ব্যয় সঞ্চয়—শেষে তাদের সামাজিক রীতিনীতির খবর পর্যন্ত নিয়ে ছেড়েছে। তাই মনে হয় আমাদের মেয়েরাই মহৎ, পুরুষের তুলনায়।

আমরা বৃন্দাবনে যাই,—ঐ বৃন্দাবন, যমুনা তীরে পুরোনো মদনমোহনের মন্দির, ঐশ্বর্যপূর্ণ শেঠদের মন্দির অথবা গোপীনাথের তারপর শেষে বিধ্বস্ত গোবিন্দ মন্দিরটুকু দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসি, মনে করি খুব দেখলাম, কিন্তু মেয়েরা কত শ্রম ক'রে বৃন্দাবনের চৌরাশী ক্রোশ বন, এই বর্ষায় তারা ভ্রমণ ক'রে এল, —যেখানে যেটি, প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন ক'রে দেখে তবে তাদের শান্তি। আমি যুবা, পুরুষমানুষ, বন-ভ্রমণের সময়ে আমি গেলাম না, কিন্তু মাতৃস্থানীয়া যাঁরা আমার সঙ্গে গিয়েছেন তাঁরা তিনজনেই গেলেন। আমার না যাবার মধ্যে অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য ছিল। অন্তরের ইচ্ছা এদের সঙ্গে না যাওয়া, একলা স্বাধীনভাবে দেখার উদ্দেশ্যে তখন যাই নি। এরপর সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছিল কয়েক বৎসর পরে অবশ্য। মেয়েদের সঙ্গে

কোথাও যাওয়া, ঘরকন্না করতে করতে যাওয়া, সেটাই আমি চাই না। ওদের আর সব ভালো কেবল সকল কাজেই খুঁটিনাটি নিয়ে দেরি করা এইটুকুই এড়াবার যোগ্য ব্যাপার।

যাই হোক, এক্ষেত্রে তীর্থের কথা এখানে বলে কাজ নেই, প্রায় তিন মাসের বিবরণ, তা অন্য অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন। তবে আমি এখন প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ফিরে এলাম। সঙ্গে এল প্রত্যেক স্থানের কতগুলি স্কেচ্ খাতা ভরা, বিশেষত গয়া, বুদ্ধগয়া, কাশী, হরিদ্বার, রাজপুতানা, বৃন্দাবন, জয়পুর, আজমীর ও পুষ্করের কতকগুলি পেন্সিল ড্রইং আর ওদেশ থেকে যা কিছু কিনেছিলাম। আমার যত্নের ও শ্রমের জিনিস ছিল সেগুলি। ফিরে এসে, ঠাকুরের একখানি ছবি, যেখানি আগেই আরম্ভ করেছিলাম এখন সেখানি সযত্নে ফিনিস ক'রে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে রাখবার জন্য পঠিয়ে দিলাম রামলালদার কাছে আমার বন্ধু ফটিকদার হাতে। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্কুলে গেলাম।

তিরিশ

মাত্র তিনটি মাস পরে ফিরে এসে দেখলাম দেশের মধ্যে সকল দিকেই একটা প্রবল কর্মতৎপরতা। এইটুকু এখানে বলে রাখি যে, এই সময় থেকে অর্থাৎ ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ আটটি বৎসরের প্রায় সবটাই আমার তীর্থভ্রমণ ও সাধু-সঙ্গেই কেটেছে, সংসার-জীবন অদৃষ্টে ঘটে নি। সে-সব কথা এর পরে, এখন আমার শিল্পের কথাটাই মুখ্য। তবে এই আট বৎসরের মধ্যে কখনও কখনও অল্প সময়ের জন্য যখনই ঘরে ফিরেছি তখন শিল্প-জীবনই মুখ্য, আর বাইরে গেলে সেটা গৌণ হয়েছে।

এই যে সকল দিকের কর্মতৎপরতা বলেছি তার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার, বিপ্লবী দলের যা কিছু, যদিও দেশের পক্ষে সেইটেই মুখ্য, কিন্তু—শিল্পকলার দিকটাই আমার পক্ষে মুখ্য বলে এখন সেই কথাই বলছি।

এই সময়ে স্কুলের মধ্যে দেখলাম আমাদের সেকসানের চেয়ে ওরিয়েণ্টাল তথা ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের অবস্থা বিশেষ উন্নতমুখী। আরও দেখলাম, ইণ্ডিয়ান আর্টের প্রবল প্রতিষ্ঠা। ছাত্রসংখ্যা বেশ বেড়েছে, কাজও খুব উন্নততর এবং দ্রুততালে চলেছে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনেক বড় বড় লোক মেম্বার হয়েছেন। যেটি আমায় বেশী আকৃষ্ট করেছিল সেটি, আমাদের অর্ধেন্দ্র কাকার পাশ্চাত্য-কলা-পদ্ধতি ছেড়ে নব্য ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির অনুবর্তী হওয়া। তাঁর এই যে শিল্পচর্চা আসলে এটা সখের অথবা তার শিক্ষিত জীবনে চিত্তবিনোদনের দ্বিতীয় অবলম্বন এটা জেনে রাখা ভালো। তাঁর আসল বৃত্তি হ'ল সলিসিটারী। তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞাতি ভাই বিখ্যাত প্রবীণ সলিসিটার অপূর্বকুমার গাঙ্গুলী,—তিনিও ও. সি. গাঙ্গুলী,—মৃত্যুর পর তাঁরই দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠিত কর্মক্ষেত্রটি মহাভাগ্যের যোগাযোগে ঐ সময়ে হাতে নিয়ে প্রধান বৃত্তি হিসাবেই অবলম্বন করেছিলেন। আমার মনে হয় এই সময় থেকেই কাকার কর্মবহুল জীবনে অভ্যুদয়ের সূত্রপাত। তাঁর মধ্যে ছিল অনলস কর্মশক্তি। এখন পর্যন্ত তার এই দীর্ঘ কর্মজীবনে এক মুহূর্তের জন্য তাঁকে অলস অথবা দুর্বল দেখা যায় নি। তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধি, শিল্পকলা-প্রীতি এবং অপ্রতিহত কর্মশক্তি যাথাযোগ্য ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপেই প্রযুক্ত, যার মধ্যে একটুকুও ফাঁক নেই। তারপর এই ভারতীয় প্রাচ্যকলা প্রতিষ্ঠানের কর্মের সঙ্গে তাঁর মূল বৃত্তির সমন্বয়, নিজ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে তাঁর অধ্যয়ন, সম্পাদন এবং শিল্প-সংগ্রহ, ভারত ভ্রমণাদি সকল দিকেই কর্মের যে প্রসারতা তিনি

দেখিয়েছেন তা কেবল তাতেই সম্ভব, অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে তা সম্ভব হ'ত বলে আমার কখনই মনে হয় না। তাঁর কর্মজীবনের এইটিই বৈচিত্র্য এবং অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও বটে।

এখন এক ছুটির দিনে সকালে গিয়ে উঠলাম, গাঙ্গুলী লেনে তাঁদের বাড়িতে। সদরে দেখি, ওখানকারই মান্য একজন, আমাদের প্রমথ জেঠা। কাকার কাছে মধ্যে মধ্যে আমার শিল্প-চর্চার জন্য যাতায়াতের কথাও তিনি জানতেন। আমায় দেখে প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করলেন, বললেন,—জানো না তুমি ? আমাদের অধোন ওসব বিলাতি আর্ট ফার্ট ছেড়ে দিয়েছে, আজকাল কেবল দেবদেবীর মূর্তি আঁকছে। ওরিয়েন্টাল অথবা ইণ্ডিয়ান আর্ট কথাটা মনেই ছিল না হয়তো, তাই ঐকথা বলেছিলেন। যাও না, দেখ গে, ওপরেই আছে।

তাই দেখতেই তো এসেছি, বলে, তিন-চারটে ক'রে সিঁড়ির ধাপ একসঙ্গে লাফিয়ে উপরে উঠে বৈঠকখানার পাশের ছোট্ট ঘর-খানার পাশের ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে দেখি কাকা হাতে কলমে কাজে অভিনিবিষ্ট। একখানা ছোট্ট, বারো দশ সাইজের মতোই ছবি, তু'টিমাত্র ফিগার তার মধ্যে। যাত্রা থিয়েটারের নারদমুনির যেমন পরচুলের ভয়ঙ্কর গোঁফদাড়ি, সেই রকম দাঁড়িগোফওয়ালা, আলখাল্লা পরা এক শীর্ণকায় বৃদ্ধ মূর্তি আর তার সঙ্গে ঘাগরা-ওড়না-ঢাকা কুঁজো হাতে এক নারী। ঐ দাড়িগোঁফ আর তাদের উভয়েরই হাতের আঙুলগুলির অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ আকৃতিই চোখে আঘাত করে। বুঝলাম, আধুনিক নব্য ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির সাধারণ অথবা অসাধারণ বৈচিত্র্যই কাকা দেখাতে চান। যাই হোক, এখন জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে চাইতেই একটা হাই তুলে কাকা বললেন,—এটা 'ওমার খায়েম' থেকেই আঁকছিলাম। শুনেই মনে মনে বুঝতে পারলাম এখন তো ওমার খায়েমেরই পালা বটে। কিছুদিন আগে লিওপোল্ড হিল কোম্পানী, এক বিলাতি

পাবলিসার, বিখ্যাত কবি ফিটস্‌জিরাল্ডের ওমার খায়েমের প্রসিদ্ধ অনুবাদের এক নূতন সংস্করণের জন্য অবনীবাবুকে ছয় সাতখানি ছবি আঁকতে দিয়েছিল। আমরা আসল ছবিগুলি দেখেছিলাম, কারণ স্কুলেই তিনি সেগুলি এঁকেছিলেন। একে তিনি প্রথম থেকেই মোগল-রাজপুত-শিল্পকলা-পদ্ধতির অনুরাগী, তার উপর তাঁর দক্ষতা, তার উপর পাশ্চাত্য-প্রথায় শিক্ষিত তিনি—অসাধারণ তাঁর বর্ণ সমাবেশের বৈচিত্র্য। আমার ধারণা অপ্রতিদ্বন্দ্বী তিনি এক্ষেত্রে। তাঁর ছবিগুলি যে আমাদের চোখেও সুন্দর হয়েছিল তার আরও একটা কারণ, সেইগুলির কোথাও কোনো ফিগারে শরীর সংস্থানে কোনপ্রকার অসঙ্গতি ছিল না, কোনখানেই প্রাকৃত নিয়মভঙ্গ করেন নি। কি সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট ফিগারগুলি। যাই হোক এখন তাঁর ঐ কাজগুলি প্রচারের পর থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার শিল্পী ও ছাত্রবৃন্দ, যারা তাঁর অনুগামী, তাদের মধ্যেও ঐ ওমার খায়েম থেকে ছবি আঁকার চমৎকার ধুম লেগে গেল। এরই আগে যখন মেঘদূতের বিরহী যক্ষ আঁকেন, তারপরও এইভাবে যক্ষ-যক্ষিণীর পালা আরম্ভ হয়েছিল দেখছি। আবার তারও আগে, সাজাহানের মৃত্যু, তাঁর বিখ্যাত ছবি যখন বেরিয়েছিল তখনও এইভাবে শিল্পী-সাধারণের মধ্যে চলেছিল সাজাহান আঁকা। মহাজনো যেন গতঃ—এ নীতি আমাদের যেমন সর্বক্ষেত্রেই প্রকট এমন আর কোথা? যাই হোক এখন কাকার ঘরে আজ একখানি নয়ন-বিমোহন আলেখ্য দেখলাম, যার জন্য আজ এখানে আসাটা সার্থক মনে হ'ল—এখন তাই বলতে হবে।

ব্যাপারটি অদ্ভুত ব'লেই লেগেছিল তাই এখানে উল্লেখ না ক'রে পারলাম না। সামনের দেয়ালে দেখি কাকার ঐ সময়ের একখানি লাইফ সাইজ পোর্‌ট্রেট, ক্যানভাসখানা একটা পেরেকে টাঙানো আছে। অয়েল কলার পেন্টিং, বাস্ট সাইজ, চমৎকার আঁকা, আর বেশ স্টাইল আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, কে করেছে, কাকা? কাকা

বললেন, যামিনী। এখন এই যামিনী,—গাঙ্গুলী, রায় নয়। কাজখানা আমার চোখে চিত্তাকর্ষক, সন্দেহ নেই। দেখে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম। শিল্পী আবার ছবিখানি উপহার দিয়েছেন তাঁকে, সুতরাং আরও যত্ন ও গৌরবের বস্তু হয়েছে। আমায় অভিনিবিষ্ট দেখে কাকা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন দেখছো? লাল রং দিয়ে নিচে জে. পি. গাঙ্গোলি ইংরাজীতে সই রয়েছে যেমন তাঁর সব ছবিতেই থাকে।

সোজাসুজিই আমি তখনই বললাম, পোর্‌ট্রেটটি অতীব সুন্দর হয়েছে। শুনে উপেক্ষার ভাবেই তিনি বললেন, কেঁদে-ককিয়ে ঐ পোর্‌ট্রেটটাই হয়েছে। ঠিক যেন বলতে চাইলেন, ঐ পোর্‌ট্রেট ছাড়া আর কিছুই হয় নি। বর্ণ বিন্যাস, কলারীংও চমৎকার হয়েছে।

ব্যক্তি-বিশেষের কাজে পরোক্ষে তিনি যে এমনুই স্নেহ-প্রীতিবর্জিত ক্ষমাহীন সমালোচক এই প্রথম লক্ষ্য করলাম, বিশেষতঃ এমনই একখানা সুন্দর কাজের বিচারে। আরও মনে হ'ল, তাঁর এ মন্তব্য করবার অধিকারই বা কোথা? এ পর্যন্ত অয়েলে তো কোন কাজই করেন নি। তবে এটা কি পাশ্চাত্য-পদ্ধতির প্রতি বিতৃষ্ণা, যেটা তাঁর অবলম্বন নব্য ভারতীয় চিত্রকলার এখনকার পদ্ধতির প্রতি নব অনুরাগের অপর দিকটা কি তারই প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত? এখন কথা এই যে এইসময়ে কাকার মূর্তিটি যথার্থই চিত্তাকর্ষক ছিল। খুব সম্ভব তাইতেই যামিনীবাবু ছবি আঁকতে আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন। সত্য সত্যই এই সময়টা তাঁর রূপের মধ্যে এমনই একটি মহৎ ভাবের বিকাশ দেখতাম যা সাধারণত বিরল—একথা সবাই স্বীকার করবেন যাঁরা ঐ সময়ে তাঁকে দেখেছেন। কেবল একটা বিশেষ অসঙ্গতি রূপের সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বরের। রূপে ছিল আকর্ষণ, কণ্ঠস্বরে যেন তার বিপরীত; গরিমাগ্রন্থির তীব্র প্রকাশ। তবে একথা শিক্ষিত সমাজে সর্ববাদী-

সম্মত সত্য যে, তাঁর ইংরাজী বা বাংলায় শিল্প-সম্বন্ধে সকল লেখাই পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্যবহুল। তাঁর বিচার, বস্তু নির্ধারণ এবং বিশ্লেষণ যথেষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সরল। সেখানে তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত জ্ঞানানুভূতির উৎস খুলে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীত ক্ষেত্রেও দেখেছি, তাঁর গুণগ্রাহিতা অসাধারণ, এবং সমালোচকের খড়্গ সর্বদাই উদ্যত হয়ে আছে। শিল্প-জীবনের গোড়া থেকেই কিছু কিছু সংস্রব কাকার সঙ্গে তো ছিলই আমার কর্ম-জীবনের প্রসারতায় পরে কতক অংশে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল সেটা তাই এক সময়ে কাকার বিচার-শক্তির পরিচয় যেমন পেয়েছি এবং সময়ান্তরে তার প্রতিক্রিয়াও কম ভোগ করি নি। এই সকল কারণেই শুধু আমার শিল্প-জীবনের সঙ্গে বিশেষ খানিক সম্বন্ধ আছে।

এখন যামিনীবাবুর ঐ ছবিখানি, আমাদের চোখে সুন্দর, এখন তার পরিণতির কথাও একটু আছে। ছবিখানির সেটিং-এর একটু ত্রুটি ছিল, অবশ্য সেটা বাইরের কথা। এই পোর্ট্রেটের ব্যাক-গ্রাউণ্ডে ক্যানভাসে মাথার উপর স্পেসটা অত্যন্ত কম রাখা হয়েছিল। একজনের শরীর অতটা দীর্ঘ হলে (আলেখ্য) চিত্রের নিয়ম অনুসারে মাথার উপর ব্যাকগ্রাউণ্ডে অত কম জায়গা রাখা যায় ? সাড়ে ছয় কি সাত ফুট ফিগারের, বাস্ট অথবা ফুল সাইজ পোর্ট্রেটের মাথার উপর যতটা স্পেস থাকা স্বাভাবিক, কাকার মত মাঝারি স্টেচারের তাতো হতেই পারে না, যিনি লম্বায় ছয় ফুটের মধ্যেই হবেন, বেশী তো নয়ই। কাজেই এক্ষেত্রে অতটুকু স্পেস রাখা হ'ল কেন তা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক এই যত্ন এবং গৌরবের বস্তুটির উপর কাকার যত্ন ও শ্রদ্ধার অভাব এমনকি উপেক্ষার ভাব দেখে মনে মনে তখনই একটু বেদনা পেয়েছিলাম। প্রায় এক বৎসর পরে আবার যখন দৃশ্যটি দেখতে পেলাম তখন তাতে, একটু বেদনা নয়, পেলাম একটি রূঢ় আঘাত। অতবড়

একটা সম্পূর্ণ বাস্ট ২০″+২৬″ সাইজের ছবিখানার—দুই পাশে প্রায় ছয় ইঞ্চি ক'রে এবং নীচের দিকটা প্রায় এক ফুট ক্যানভাস কেটে বাদ দিয়ে, শুধু মুণ্ডুটুকু রেখে, একটা আড়াই-তিন ইঞ্চি দেবদারু কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে পশ্চিম দিকের দেয়ালে, উপর থেকে একটি পেরেকে ঝুলিয়ে টাঙানো হয়েছে। গায়ের কাপড় চমৎকার গ্রে রং-এর সুন্দর পাল্লাদার শালখানিতে শিল্পীর যে মনোরম বর্ণবিন্যাস এবং উচ্চস্তরের কলা-কৌশল ছিল তার আর কোন চিহ্নই নেই। দেখলাম,—ছবিখানির রঙেরও আর তেমন জেল্লা নেই, দেয়ালের ড্যাম্প, ধুলো ও ধোঁয়ার চিহ্ন স্পষ্ট। মলিন হয়ে গিয়েছে মূর্তিটি, সে এক বেদনাদায়ক দৃশ্য। মনে হ'ল এ যেন ঠিক তাঁর নিজেরই শিল্প-জীবনের পরিণত চিত্র। শিল্পী হতেই তিনি চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকৃতিসুলভ অধিকার ও অধ্যবসায় তাঁকে আর্ট সমালোচক করে কয়েকখণ্ড কারুশিল্পের বিবরণ-মূলক গ্রন্থ প্রচারের কাজে এবং লণ্ঠন বক্তৃতায় আটকে রেখে দিলে।

এটা গেল যামিনী রায়, জুনিয়ার শিল্পীর প্রথমাবস্থার একখানা উৎকৃষ্ট শিল্পকীর্তির পরিণতি। এখন আমাদের বাংলার স্বনামধন্য তথা ভারতের গৌরব যামিনী গাঙ্গুলীমশাইয়ের একখানা ভারত বিখ্যাত ছবির পরিণতির কথা না বলে থাকতে পারলাম না।

সবাই জানেন যামিনীবাবুর প্রথমদিকে চিত্রশিল্পের প্রবল উদ্যমের কথা। পামার্স নামে একজন ইটালীয়ান শিক্ষকের কাছে অবনীবাবু ও যামিনীবাবু দুজনেই শিখতেন। মামা ভাগনে দুজনেই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, তবে দু'দিকে। যামিনীবাবু অয়েল কলারের পক্ষপাতী ছিলেন, আর অবনীবাবু ছিলেন প্যাসটেল ও ওয়াটার কলারের। ঐ সময়ে তাঁর প্যাসটেলে আঁকা রবীন্দ্রনাথের যৌবনের ছবি আছে, ইতরাম সেটা ত্রিবর্ণে ছেপেছিলেন। অতুলনীয় ছবিখানি। পরিণামে আরও দেখা গেল যামিনীবাবু পাশ্চাত্য পদ্ধতিতেই দক্ষ হয়ে ওঠেন আর তাঁর মামা দেশীয় চিত্রকলাপদ্ধতির

অনুরাগী হয়ে, নব্য ভারতীয় অভ্যুদয়ের শীর্ষস্থানীয় হয়ে গেলেন। এখন ঐ সময়ে তাঁদের প্রথম বিকাশের যুগে যামিনীবাবু কাদম্বরী থেকে অতীব সুন্দর এবং বিশালকায় দু'খানি ছবি অয়েল কলারে এঁকেছিলেন। একখানি শূদ্রকের রাজসভা, অপরখানি,—অন্দর মহলে বসে রাজা শুকের উপাখ্যান শুনছেন। এতবড় একটি শক্তিশালী উদ্যম, বাংলার কথাই বলব, এ দেশের চিত্রশিল্পের ইতিহাসে এই প্রথম। সিপিয়াটিন্টে ছবি দু'খানি তখনকার রামানন্দবাবুর 'প্রদীপে' বেরিয়েছিল, ইউ. রায়ের এনগ্রেভিং। তারপর এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেস থেকে লিথোগ্রাফ ছাপাও হয়েছিল। অয়েল কলারের প্রকাণ্ড ঐ চিত্র দু'খানির একখানি ছিল এমারেল্ড বাওয়ার নামে মহারাজার বাগানে, অপর রাজসভার ছবিখানি ছিল অবনীবাবুদের বাড়িতে এবং গগনবাবুর অধিকারে। ঐ দু'খানি ছবিতেই যামিনীবাবুর অন্তর্নিহিত শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা কতটা মহৎ এবং উদার, কল্পনা তাঁর কতটা বিস্তীর্ণক্ষেত্রে ব্যাপ্ত তার পরিচয় স্পষ্ট। তাঁর মামার বাড়িতে যেখানি ছিল, বড় মামাকেই তিনি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথমে বেশ যত্নেই ছিল উপরের ঘরে, ক্রমে সেখানা বিলিয়ার্ড রুমে নেমে এল উপর থেকে। নীচের প্রায় অন্ধকার ঘরে, দেয়ালের ড্যাম্প, ধুলো, ধোঁয়া এবং উপেক্ষা—এই কয় শত্রু তাকে শীঘ্রই জীর্ণ বা ক্ষয় ক'রে এনেছিল, পরিণামে বাকি যেটুকু ছিল তা থেকেও যামিনীবাবুর প্রথমাবস্থার গৌরবের ছবিখানি বঞ্চিত হয় নি ; শেষে আবর্জনা ভরা গুদাম ঘরে তার সমাধি হয়ে গেল। তখন উপরে ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতিতে এক বরবর্ণিনীর হাতে, নলিনীদলগত বৃহৎ জলবিন্দু আঁকা চলছিল। উপেক্ষিত এই ছবিখানির অপরাধের কথা বলি।

বিলাতের রয়্যাল আর্ট একাডেমির তখনকার প্রেসিডেণ্ট বিখ্যাত স্যার ই. জে. পয়েণ্টারের একখানি ছবি,—কুইন শিবা এ্যাট দি কোর্ট অফ সলোমন, সলোমনের রাজসভায় রাণী শিবা—

একাডেমিতে দেখানো হয়েছিল এবং তখনকার কলা-রসিকদের আকৃষ্ট করেছিল। আমরা একাডেমির বাৎসরিক চিত্র-বিবরণীতে তার ছবি দেখেছি। ঐ বিখ্যাত ছবিখানিতে ব্যাকগ্রাউণ্ডে যে স্থাপত্য দেখানো হয়েছিল শূদ্রকের রাজসভা আঁকতে যামিনীবাবু ঐ ছবির কিছুটা অনুসরণ করেছিলেন। পয়েণ্টারের ঐ ছবিখানা থেকে প্রেরণা পেলেও, যামিনীবাবুর ছবিতে সবটাই অনুকরণ— একথা যিনি মনে করবেন তিনি ভুল করবেন। তখনকার এক শ্রেণীর সাহিত্য-রসিকের মত বা মন্তব্য ছিল বঙ্কিম, স্যার ওয়ালটার স্কটের আইভ্যানহো থেকেই দুর্গেশনন্দিনী রচনা করেছেন। এ কথার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তবে সেটা প্রেরণা ছাড়া আর কি হতে পারে? তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিগুলি যখন এটা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করেছে যে যামিনীবাবু পয়েণ্টারের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট শিল্পী নন, যেমন ওদিকে স্যার ওয়ালটারের তুলনায় বঙ্কিম কম প্রতিভাশালী ছিলেন না, এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। সুতরাং তার প্রথমাবস্থার অত বড় প্রশংসনীয় এবং মূল্যবান একখানি উদ্যম এভাবে তার মামার বাড়ি থেকে বিশেষতঃ যে মামারা শিল্পক্ষেত্রে দিক্‌পাল বিশেষ—এমনই মামা-ঘর থেকে উপেক্ষায়, অবহেলায় নষ্ট হওয়া জাতীয় শিল্প সম্পদ ভাণ্ডারের একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি।

দেশের ভবিষ্যৎ শিল্পী যাঁরা অথবা শিল্পের ঐতিহ্য নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাবেন তাঁরা যামিনীবাবুর ঐ কাজখানির মূল চিত্রখানি আর পাবেন না। ভাগ্যে এলাহাবাদের চিন্তামণিবাবু নিজ প্রেস থেকে ঐ দু'খানি লিথো-অলিওগ্রাফে ছেপেছিলেন, যদি তার কোন কপি থাকে তবেই কতক শান্তি, না হলে তার সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

শেষের দিক্‌টা একটু রিভোলটিং আর ভয়ানক ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়লাম। যা দেখি, সহপাঠীদের কাজ অথবা অন্য কারো কাজ,

চিত্র বা ভাস্কর্য, শিল্প-বিভাগে যে কোন কাজই দেখি না কেন ভ্রমশূন্য, সুন্দর মনোমত কাজ দেখতেই পাই না। ক্লাসেই কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র ছিল যারা সাত-আট বৎসর ঐ ক্লাসেই আছে, এতে অপমানবোধ নেই, আর কাজের মধ্যেও উৎকর্ষের বালাই নেই। সত্য বলতে কি, তাদের শিল্পদৃষ্টিই খোলে নি। একটা মডেলের মুণ্ড, তার বৈশিষ্ট্য কোথায় সেদিকে হুঁশ নেই। তাদের দম্ভ এইটুকু যে, তারা বাগচীমশাইয়ের সময়ের ছাত্র, অতোদিন পেন্টিং করেছে। আমাদের ইয়ং ব্যাচ যারা, তাদের মধ্যে দম্ভ নেই বটে কিন্তু অনুভূতি নেই, আদর্শ প্রকাশ করতে যে বুদ্ধি দরকার তারই অভাব। যোগকর্মে কৌশল চাই। শিল্পবিদ্যায় তার প্রয়োগেই তার সার্থকতা। আর্ট স্কুলের মধ্যে লাইফ ক্লাসের ছেলেরা দেখলাম—বেশীভাগ কাজের বেলা আসল কাজটা অনেকেই বোঝে নি। বেশীভাগ ছেলে দেখেছি, খেটে যাচ্ছে খুব, পুরা দস্তুর যাকে বলে ঠিক তাই, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারছে না; তাদের মনোমত প্রোগ্রেস নেই। কিন্তু কেন? এর উত্তর সোজা কথায় একদিন উপেনবাবুই দিলেন।' আমাদের ফোলিয়েজ ক্লাসের টিচার উপেনবাবু, স্টাফের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে ছোট। তিনি বললেন, শুধু খেটে গেলে হয় না, আগে ভালো ভালো কাজ, যাকে বলে ক্রিয়েশান, উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, লক্ষ্য করতে হয়। ভালো ভালো মাস্টার আর্টিস্টের কাজ দেখতে হয় তবেই তো ভালো কাজের ধারণা জন্মাবে। তারপর পরিশ্রম করলে তবে হবে যথার্থ কাজ। এই কথাগুলি ছেলেদের অবস্থা বুঝতে পেরেই বলেছিলেন। ঐ উপদেশটি অন্তরে ঢুকেছিল কখনও ভুলি নি। যারা যেটা চায় তাদের সে সুযোগও জোটে, এ সত্যও অমূল। তখন থেকে খুঁজে খুজে ভালো ভালো কাজ দেখাই কর্মের মধ্যে দাঁড়াল। ঠিক তার পরেই এই সমালোচকের দৃষ্টি পাওয়া।

টুওরনিয়ে নামে একজন হাঙ্গেরীয়ান আর্টিস্ট এই সময় কলকাতায়

এসেছিলেন। তিনি কয়েকখানি মূল্যবান পোর্‌ট্রেট করেন। আমাদের স্কুলের দোতালায়, প্রিন্সিপ্যালের অনুপস্থিতিতে তাঁর অফিস ঘরখানিতেই করেছিলেন। আমরা তাঁর দু'খানি কাজ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বর্ধমানের মহারাজা ও মহারাণীর আলেখ্য। ফুলসাইজ, সিংহাসনে বসা ছবি, সাড়ে পাঁচ ফুট চওড়া হবে। অয়েল কলার পোর্‌ট্রেট যে কতটা উচ্চস্তরের এবং জীবন্ত-ভাবের হতে পারে তাঁর কাজগুলিতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় আছে। মহারাণীর ছবিখানি আমি বেশী ক'রে কয়েকবার দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তা ছাড়া দরজা বন্ধ ক'রে যখন কাজ করতেন, গোপনে, বড় চাবির ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ ক'রে দেখতাম তাঁর ফিনিসের কাজ, টাচ্ মারা। সে একটা দেখবার জিনিস,—কতদূর থেকে দেখে, বুঝে তবে ল্যোকাল এফেক্ট দেখাতে হয়, তার কাজের প্রণালীর মধ্যেই দেখলাম। ঐ দু'খানি কাজে আমার যে শিক্ষা হয়েছে তিন বছর রং-তুলি নিয়ে কসরতে তা হয় নি। তারপর দ্বিতীয় সুযোগ যামিনীবাবুর বাড়িতে।

যামিনীবাবুও টুওরনিয়ের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন নিজ স্টুডিওতে তাঁর কাজ দেখাবার জন্যে। এইভাবে দু'জনে আলাপ হ'ল। ফিগারে বোল্ডনেস য়ুরোপীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য। যামিনীবাবুর স্টাইলটা খুব সফ্‌ট তাই যামিনী-বাবুর পোর্‌ট্রেটের কাজ দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, পোর্‌ট্রেটের মধ্যে ভিগার চাই। অয়েল কলারে কেমন ক'রে পোর্‌ট্রেট স্কেচ করতে হয় তিনি যামিনীবাবুকে বসিয়ে, লাইফ সাইজের চেয়ে একটু বড়, একটা বোল্ড হেড-স্টাডি ক'রে দেখালেন যে, কাজ এইরকম হওয়াই উচিত। আমরা দেখতে গেলাম সেই কাজখানা। যিনি ফটোগ্রাফের মতো চোস্ত ফিনিস পছন্দ করেন তিনি সুখী হতে পারবেন না সে কাজ দেখে, কিন্তু সে কাজটা তৈল চিত্র-বিভাগের সম্পদ। কাজখানার বৈশিষ্ট্য হ'ল তেলে রং কেমন ক'রে

ব্যবহার করতে হয়, আর একজনের গায়ের বা মুখের রং তার আলো ও ছায়ার বৈশিষ্ট্য সে রঙের বিশিষ্ট আভা দেখা যায়, সেই ভাবটা খুব জোর দিয়ে দেখানো। ছবিখানা তেলের রং আর চওড়া তুলি দিয়েই আরম্ভ, পেন্সিল বা চারকোল আউট লাইনের উপর রং দিয়ে আরম্ভ নয়। মোটা মোটা লাইন দিয়েই আউট লাইনের কাজ করা হয়েছে। তারপর সোনালী রঙের এফেক্ট, মুক্তামালা কেমন ক'রে আঁকতে হয় দেখিয়েছেন। সাধারণত এখানকার আর্টিস্টরা মুক্তামালা আঁকতে এক একটা মুক্তার ড্রইং ক'রে নিয়ে তবে রং করেন—কতবারে কত রকমের রং লাগিয়ে। তিনি করেছেন কি, সমস্ত মালার ফরমেশানটা আলাদা ড্রইং না ক'রে একেবারে রং দিয়ে কাস্ট স্যাডো এঁকে সম্পূর্ণ করেছেন, তারপর তুলির কায়দায় বড় বড় টাচ্ দিয়ে দিয়ে মুক্তার গভীর রং, পরে হাল্কা ছায়ার প্রান্তে রিফ্লেকশানের রং লাগিয়েছেন,—শেষে হাই লাইটের এক একটা টাচ্ দিয়ে সব শেষ করেছেন। দূর থেকে তার এফেক্ট কি চমৎকার, যেন এক একটা মুক্তা স্পষ্ট জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। যামিনীবাবু ছবিখানার ঐ অংশগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের দেশী চিত্রকর আর য়ুরোপীয় চিত্রকরদের বৈশিষ্ট্য তখনই বুঝেছিলাম। এখানকার এঁরা, একটা জিনিস দেখাতে, কেমন ক'রে ঠিক আউট লাইন থেকে আরম্ভ ক'রে তার শেষ পর্যন্ত, দফায় দফায় রং দিয়ে কত পরিশ্রমে তার খুঁটিনাটি সব কিছুই সম্পূর্ণ রূপটা দেখাতে পারবেন সেই চেষ্টাতেই প্রাণান্ত করেন। আর ওঁরা, সেই জিনিসটি রং ও তুলি ব্যবহারের কৌশলে কত সহজেই, রঙের এফেক্টের জোরে দেখানো যেতে পারে সেই চেষ্টা করেন। এর ফল খুব ভালো তো হয়ই পরিশ্রমও অনেক কম। বিশেষত অয়েল কলারের কাজে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব যেন সংস্কারগত। যামিনীবাবুর যত অয়েল কলারের কাজ দেখেছি —প্রত্যেক কাজখানা, ল্যাণ্ডস্কেপই হোক বা পোর্‌ট্রেটই হোক,

ফটোগ্রাফের মতোই সফ্‌ট, অতি কোমল, কিছুক্ষণ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, আর টুওরনিয়ের কাজের বৈশিষ্ট্য, ফিনিসটা যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করে চোখের সামনে, জোর রঙের সঙ্গে তার তুলির নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার পদ্ধতি, তার ফলে একটু দূর থেকে জীবন্ত মনে হয়। পরবর্তীকালে যামিনীবাবুর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে টুওর-নিয়ের প্রভাব কতটা, তা তাঁর আগেকার ছবির সঙ্গে মেলালেই বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন আমাদের রামমোহন লাইব্রেরীতে মহর্ষির একখানা পোর্‌ট্রেট আছে চমৎকার স্টাইলে আঁকা। ডাঃ রাসবিহারী, স্যার আশুতোষের ছবি, সুরেন মল্লিকের ছবি এ সকল কাজ ওঁর অয়েল কলার পোর্‌ট্রেটের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট নিদর্শন। রানপুরের নবাবদের অনেকগুলি ছবি তিনি করেছেন সেগুলির প্রত্যেকখানিই তাঁর নিজ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলায় আলেখ্য শিল্পগৌরবের ইতিহাস। আমি যামিনীবাবুর পোর্‌ট্রেটের কথা এখানে বেশী বলেছি, তার কারণ দেশের বেশীভাগ শিক্ষিত লোকে তাঁর নৈসর্গিক দৃশ্যের চরমোৎকর্ষের কথাই জানেন, কিন্তু তিনি যে কতবড় একজন পোর্‌ট্রেট পেণ্টার অনেকেই তা জানেন না। বিলাতের কলিয়ার, সলোমন, আউটলেস ডিকসি প্রভৃতি যে স্তরের শিল্পী, যামিনীবাবু পোর্‌ট্রেটে সেই স্তরের শিল্পী। মৌলিক রচনার কথা অন্য, সে কথা এখানে নয়।

একত্রিশ

স্বভাব বা প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গেসঙ্গেই এটা লক্ষ্য করেছি আমার সঙ্গ ও সঙ্গীরও বিশেষ পরিবর্তন হয়েছিল। তারপর আর্ট স্কুলে পাঁচ বৎসর কাল কর্মসূত্রে তিনজন জীবনব্যাপী, বন্ধুর যোগাযোগ এটিও বিচিত্র ব্যাপার! সেই তিনজন—অভয়চরণ, হিরণ্ময় ও পূর্ণ ঘোষ। তারপর মনে হয় স্কুলেতে কর্মাবস্থার মধ্যেই কয়েকজন উৎকৃষ্ট ধার্মিক লোকের সঙ্গ আমার হয়েছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে এসে সহজে আমাদের দূর অথবা নিকট আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ প্রীতি লাভ, আমার অদৃষ্টে যা ঘটেছিল আমাদের বাড়ির আর কারো ভাগ্যে ঘটে নি। আমার পিতামহদেবের মামার বাড়ি বলে, গাঙ্গুলী বাড়ির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার যে গভীর সম্বন্ধ, ক্রমে ক্রমে এই চার পুরুষে, সে সম্বন্ধ অনেক দূরে চলে গিয়েছে। উভয় বংশেরই বিস্তার বহু হয়ে গিয়েছে বলে, অনেকেই বড়বাজার ত্যাগ ক'রে শহরের অন্যান্য মহল্লায় ঘর বেঁধেছেন। যতদিন অতটা বিস্তার হয় নি ততদিন আমার সঙ্গে সকল বাড়ির পরিচয়টা বেশী ছিল, তার মধ্যে গাঙ্গুলী বাড়ির অর্ধেন্দ্র কাকার সঙ্গে শিল্পসূত্রে ঘনিষ্ঠতার কথা বলেছি। তার পরেই তখন আমার ঘনিষ্ঠ যাতায়াত ছিল দেবেন দাদার কাছে। তিনিও গাঙ্গুলীদের ভাগিনেয়, আর একজন গোল্ড মেডালিস্ট উচ্চশ্রেণীর এলোপ্যাথিক চিকিৎসক। তখন তিনি চাঁদনী হাসপাতালের রেসিডেন্ট সারজন ছিলেন। তাঁকে দেখতে এবং স্বভাবেও অনেকটা আমাদের রামদয়াল বাবুর মতো, যিনি উৎসবের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক। দেবেনদার অনেক গুণ ছিল। প্রথমত তিনি ঈশ্বরভক্তিপরায়ণ, তারপর তিনি বিদ্বান, শাস্ত্রজ্ঞ যাকে বলে তাই তিনি এবং সামুদ্রিক জ্যোতিষে পারদর্শী।

তিনি গান বড় ভালোবাসতেন, আর তখন গান আমার অভ্যাস ছিল। তখনকার দিনে কমলাকান্ত, রামপ্রসাদের গান ভালোবাসেন যে লোক তিনি নিশ্চয়ই সেকেলে। তারপর তখন বালির রামচন্দ্র দত্তমশাইয়ের কয়েকখানি গান খুব বিস্তৃতভাবেই প্রচার হয়েছিল, বাঙালী-সমাজে। তার মধ্যে—'তনয়ে তার তারিণী', 'হে দুখহারি কর নিস্তার', 'কে তুমি হে তরুবর আছ সুখে দাঁড়াইয়ে', 'উঠগো করুণাময়ী খোল গো কুটির দ্বার ; আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার'—ইত্যাদি গান তখন খুবই চলছে। অনুরুদ্ধ হলেই আমি যেখানে যেতাম ঐসব গানই গাইতাম। সেইজন্য আরও স্নেহ যত্ন পেতাম প্রচুর। তারপর তখন কান্তকবি রজনীকান্তের গান, 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'কুটিল কুপথ ধরিয়া', 'প্রণমি তোমারে চলিনু নাথ সংসার কাজে', প্রভৃতি এ সকল গান তখনকার দিনে সর্বজনপ্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের গানও তখন সমাজের সর্বস্তরেই ছড়িয়েছে। কোন কোন সমাজে কবির গান তখন যে জানে না বা গায় না তার সেই ভদ্রসমাজে আসন বা ব্যবহার নেই বললেই হয়। ছেলেবেলায় কিন্তু রবিবাবুর গান শুনেছি খুব কম কারণ তখন অত্যন্ত কম লোকেই রবিবাবুর গান জানত বা গাইত। তারপর কৈশোরে মামার বাড়িতে প্রথম শুনলাম, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মতো বাসিও, আমি নিশিদিন হেথা বসে আছি, তোমার যখন মনে পড়ে আসিও। আমি সারা নিশি তোমা লাগিয়া রব বিরহ শয়নে জাগিয়া, তোমার যখন মনে পড়ে প্রভাতে আসিয়া মুখ পানে চেয়ে হাসিও।' তারপর শুনলাম,—'যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা সখা চোখের দেখা দিতে এসো না—ভালোবেসে যদি দুখ পাও সখা, পায়ে ধরি ভালো বেসো না' ইত্যাদি।

এইসব গান তখন এত চলেছিল যে প্রত্যেক সংসারের ছেলে যারা গাইতে পারে সবাই তারা গাইত। তারপর,—'এখনও

তারে চোখে দেখি নি শুধু বাঁশী শুনেছি, মণ প্রাণ যা ছিল তা দিয়ে ফেলেছি' এ গানটিও এত চলেছিল শেষে গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত হয়েছিল।

এখনকার দিনে দেশে নর-নারী বালক-বালিকা রবিবাবুর যে-সব গান শোনেন, গান করেন তখনকার দিনে তাঁর কোন্ গান, কি ভাবের গান দেশের, প্রধান প্রধান শহরে সাধারণের মধ্যে চলত শুনলে কালের পার্থক্য বুঝবেন এবং উপভোগ করবেন বলেই এগুলি দিয়েছি। ব্রাহ্মসঙ্গীত কতকগুলি ঐসময় খুব বেশী বেশী চলত, যেমন, 'তোমারে করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'—'বিপদ ভয় বারণ'—'সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি'—'জননীর দ্বারে আজি ঐ শুনগো শঙ্খ বাজে'—ইত্যাদি গান তখন ভদ্র ভক্তসমাজে বিশেষ আদৃত।

দেবেনদার কাছে সপ্তাহে একদিন, প্রায় রবিবারেই বিকালে যেতাম। দেবেনদার মা, আমার বড় পিসিমা, তিনি সবার চেয়ে বোধহয় বেশী ভালবাসেন গান, তিনি এসে বসলে তবে গান আরম্ভ হ'ত। তারপর দেবেনদার সঙ্গে কথাবার্তায় খানিকক্ষণ কাটিয়ে রাত্রে চলে আসতাম। একদিন বিকালে, তখনও বেলা আছে, রোদটা খানিক তাঁদের বড় হলের মধ্যেও ছিল মনে হয়, হঠাৎ দেবেনদা বলেন,—দেখি আর্টিস্ট, তোমার হাতটা, ব'লে হাতটা টেনে নিয়েই দেখতে আরম্ভ করলেন। আমার হাতের তিনটি লাইনের মধ্যে বুড়ো আঙুলের দিকে লাইনটা যাকে ইংরাজী-মতে লাইফ লাইন বলে সেটা খণ্ডিত, মাঝখানটা তার ফাঁক। তাই দেখে অনেকক্ষণ পর বললেন,—এখন থেকে তৈরী থাক, পঁয়ত্রিশ পর্যন্তই তোমার আয়ুকাল। এখন তোমার কত—পঁচিশ? আমি বললাম, ঐ রকমই হবে বোধহয়।

তিনি বললেন, এই দেখ, তোমার জীবন-রেখা পঁয়ত্রিশের বেশী যায় না। বলে বেশ ক'রে খণ্ড তুটির মধ্যে ফাঁক দেখিয়ে দিলেন।

এই সময়টার মধ্যেই তোমায় এমনভাবে প্রস্তুত হতে হবে যাতে সহজেই ঐ অবস্থাটি পেরিয়ে যেতে পার।

সেই যে ধারণা হয়ে গেল আমি পঁয়ত্রিশের মধ্যেই মরব, তখন থেকে একদিনের জন্য কথাটা ভুলি নি। যে কাজই করি না কেন ঐ ভাবটাই প্রবল রইল মনের মধ্যে। প্রকৃত কথা এই যে, এই আট নয় বৎসর সময়টা এমন কিছু করতে হবে যাতে আমার মৃত্যুতে কোন ক্ষোভ বা অনুশোচনা না থাকে। সত্য সত্যই তখন থেকে দিনগুলি আমার বড়ই দ্রুত কাটতে লাগল।

পরমহংসদেবের কথা ভাবি, বেলুড় মঠে যাই, দক্ষিণেশ্বর যাই, সিমলায় মহিনদার কাছে যাই, অন্তরে যেন একটা অভাব, কি যেন আমার জীবনে একান্তই অভাব তা পাচ্ছি না। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করি কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শোওয়া বন্ধ, বাইরে কিংবা ছাদে শুই। মহিনদার ওখানে চিরঞ্জীববাবু, প্রাণেশ,—তারপর কটিমামা, সুরেন মিত্তির প্রভৃতি স্বামীজীর সাক্ষাৎ শিষ্যদের সঙ্গে দেখা হয়, সঙ্গ হয়—কত কথা হয় তাঁদের পুণ্য-চরিত্র, সাধন এবং তাঁর ভক্তগণের সঙ্গে ব্যবহার সম্বন্ধে। প্রাণ যেন আলোকে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তাতেই কেটে যায় সেই অবসাদ,—এইভাবে চলল। ইতিমধ্যে এক বন্ধু-সঙ্গে তারাপীঠে বামাখেপার কাছে গেলাম। সেই মহাপুরুষ-সঙ্গের পূর্ণ বিবরণ অন্যত্র আছে। তাঁর সঙ্গ ক'রে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এলাম। তিনি বললেন,—তোর তো কুণ্ডলিনী জাগ্রত, এখন বুঝে নে কেনে। কিছুই বুঝলাম না। কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, দীক্ষা দিতে হয় যিনি গুরু তিনিই দেবেন আর কারো কাছে দীক্ষা নেব না। কারণ কাকেও আমার পছন্দ হয় না। এইভাবে চলল মনের অবস্থা। কি ছটফটানি যে আরম্ভ হয়ে গেল। ছবি আঁকার কি সুখ, তাও যেন ক্রমে ক্রমে আমার অতটা আকর্ষণের বিষয় রইল না। আর, বাড়িটায় ঢুকতে প্রাণ চায় না।

ইতিমধ্যে দশঘরায় বিপিন রায়, তিনি নাকি খুব ভাগ্যবান পুরুষ শিপ্‌স ব্যানিয়ন এণ্ড স্টিভিডোরএ জাহাজী কাজ করতেন; আমার দ্বিতীয় শ্বশুর ভূতিবাবুর বন্ধু। তাঁরই অনুরোধে তাঁর ফটো থেকে একখানা লাইফ সাইজ বাস্ট ছবি করলাম অয়েল কলারে। ছবি খুব পছন্দ হ'ল যখন সেখানা হ্যারিস সাহেবকে দেখিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর নিজের চোখ ছিল না। হ্যারিস সাহেব,—ইংলিশ-ম্যান. তখন কলকাতায় বড় বড় লোকদের ছবি আঁকছিলেন। বিপিনবাবুর মোসাহেবেরা তখন তাঁকে পরামর্শ দিলেন, আমরা এখানে অয়েল পেন্টিংএর কি বুঝি, হ্যারিস সাহেব যদি বলেন ঠিক হয়েছে তা হলে বুঝবো। তাই, পাঠানো নয়, কর্তা নিজে নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। ছবি ডেলিভারি দেবার একমাস পর যখন আমি গেলাম, তখন বিপিন রায় মশাই নিজ মুখে এইসব বিবরণ বললেন আমায়। এমন জায়গায় আমার লোভ হ'ল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে। জিজ্ঞাসাও করলাম, হ্যারিস সাহেবকে দিয়ে ছবিখানা করালে কত নিত সে? বললেন, ওদের কাজ আর আপনার কাজ? বললাম—কেন নয়, যদি পোর্‌ট্রেট ঠিক হয় কাজও ভালো হয়? তখন বললেন,—তা হতে পারে না, তোমরা ইয়ংম্যান, সবে আরম্ভ করেছ। আর এটা আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে কাজ, ইত্যাদি বলে পিঠ চাপড়ে বিদায় করলেন, একশো টাকার একটা চেক্‌ দিয়ে। যখন আমি চলে আসছি তখন বললেন, তোমাদের এই সবে তো আরম্ভ, কত উপার্জন করবে, এরপর কত বড় বড় কাজ করবে। কিছু মনে ক'রো না যেন! টাকাটা পছন্দ হ'ল না, নয়? আমি বললাম, এখানে কাজটা যদি আপনি নিজে পছন্দ করতে পারতেন ঢের সুখী হতাম। টাকার কথা ভাবি নি। শুনে তিনি বললেন, খুব পছন্দ হয়েছে, সত্যি বলছি মাইরী।

সেটা সাহেব পছন্দ করবার পর,—তার আগে নয়। এই কথাটা বলেই চলে এলাম।

আমার জীবনটা দুঃখের, একথা যখনই মনে হয়,—আশ্চর্য দেখছি সেইসময় এমনই ঘটনা পর পর কয়েকটা ঘটে যায় যাতে মনের ক্ষোভ দূর হয়ে যায়ই, উপরন্তু আমি ভগবানের বিশেষ কৃপা-প্রাপ্ত জীব, তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ আমাতে আছে এই ভাবটা প্রবল হয়ে আমায় কিছুদিন আনন্দে ভাসায়; ফলে তখন খুব উৎসাহেই নিজ পথে চলে যেতে পারি। সম্প্রতি 'ভারতবর্ষ' বলে ডি. এল. রায়ের প্রতিষ্ঠিত একখানা মাসিক পত্র বেরিয়েছে। আগে 'প্রবাসী'ই ছিল একমাত্র সচিত্র মাসিক, তাও আবার পত্র সংখ্যা তার সত্তর আশির মধ্যে হবে। 'ভারতবর্ষ', সচিত্র তো হ'লই, দু'খানা ক'রে রঙীন ছবি আর প্রায় দেড়শো পাতা প্রতি সংখ্যায়—তখন 'প্রবাসী'কে বাধ্য হয়ে অত বড়ই করতে হ'ল, দু'খানা ক'রে রঙীন ছবিও দিতে হ'ল—অবশ্য এর জন্য তার দামও বাড়াতে হ'ল। ফলে দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যজীবীদের মহা উপকার।

হরিদাস চাটুজ্যের ছোট ভগিনীর বিবাহ হ'ল শ্যামবাজারের অখিল গাঙ্গুলীর এক ছেলের সঙ্গে। আমার ঠাকুরদাদামশাইয়ের মামাতো ভাই হলেন অখিল ঠাকুর্দা তাঁরই ছোট ছেলে আমার কাকা, সুতরাং তার বিবাহে বরযাত্রীও গেলাম। আলাপ-পরিচয় হ'ল হরিদাসবাবুর ছোট ভাই সুধাংশুর সঙ্গে। সুধাংশু বলে কি আপনাদের এড্ভারটাইস করবার জন্যই তো সচিত্র মাসিক পত্রিকা, প্রবাসীতে দেখেন না কত সব ইণ্ডিয়ান আর্টিস্টদের ছবি ছাপা হয়ে কত এড্ভারটাইস হচ্ছে। আপনার আঁকা ডিজাইন যদি থাকে দিন না আমাদের 'ভারতবর্ষে', কত লোক জানতে পারবে আপনার কাজের কথা। অবশ্য আপনাদের জন্য এমনই আমরা ছাপাবো, কিছু লাগবে না।

আমি তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলাম, আর্টিস্টরা কাজ দেবে আবার ছাপাবার জন্য পয়সাও দেয় নাকি? সুধাংশু বলে,—

নিশ্চয়ই,—না হলে ট্রাইকালার ব্লক একখানা ছাপ্তে খরচ কত তা কি জানেন ? কপার প্লেট, কেমিক্যাল্স ইত্যাদি। আমি ঠিক তখনও জানতাম না 'প্রবাসী' থেকে আর্টিস্টরা কিছু পায় কিনা তাদের ছবি ছাপবার জন্য। তবে এটা জানতাম, তারা নিশ্চয়ই কিছু দেয় না। কারণ নন্দলাল, সুরেন গাঙ্গুলী প্রভৃতি ছাত্রেরা কখনও টাকা দিয়ে ছবি ছাপবার পাত্রই নয়। সুরেন থাকত অর্ধেন্দ্র কাকার বাড়িতে, তবে তাদের কোন আত্মীয় কিনা তা জানতাম না। যাই হোক, এখন সুধাংশুর কথা শুনে মনে মনে ঠিক করলাম স্কুলে একবার নন্দলাল কিংবা সুরেনকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেবো। যাই হোক, আমি ছবি দিতে রাজী হলাম 'ভারতবর্ষে'—তবে হরিদাসবাবুর সঙ্গে কোন কথা হ'ল না। সুধাংশু বললে,—কিছুই দরকার নেই, দাদার কাছে ছবি দিয়ে আসবেন তিনি ঠিক নেবেন।

পরদিন মহা সঙ্কোচের মধ্যেই ছবি নিয়ে গেলাম গুরুদাসবাবুর দোকানে। সামনেই হরিদাস চট্টোপাধ্যায় গম্ভীরভাবে বসে। তখনও কুমারস্বামীর প্রত্যাখ্যানের কথা মনে আছে, তাই ধীরে ধীরে ছবিখানি উপরের ঢাকা খুলে দেখালাম। ছবিখানা বড়, ওয়াটার কালারের পক্ষে, ছাব্বিশ আঠারো সাইজটা ছোট নয়। তা ছাড়া ভালো গোল্ড মাউণ্ট দেওয়া, অতি যত্নে রাখা ছিল। দেখে তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, রেখে যান ; ছাপা হলে যে সংখ্যায় বেরুবে, 'ভারতবর্ষে'র সেই সংখ্যা পাবেন। আচ্ছা, তা হলে নমস্কার বলে নাকের কাছে যুক্তকর ঠেকিয়ে আমায় তৎক্ষণাৎ চলে আসতে বাধ্য করলেন। বোধহয় সেটা আশ্বিনের শেষ অথবা কার্তিকের প্রথম।

কাছেই মহিনদার আড্ডা, মনের দুঃখে সেইখানে হাজির হলাম। সেখানে পশুপতি ডাক্তার, প্রাণেশ, চিরঞ্জীববাবু এক এক হুকায় তাওয়া চড়িয়ে মনের আনন্দে কথাবার্তায় অভিনিবিষ্ট

আর রকের উপর স্টোভে মাংস চড়েছে প্রকাণ্ড ডেকচিতে। যেতেই, আরে আরে পেণ্টার, এসো, আজ রাত্রে তোমার এখানে খাবার নিমন্ত্রণ রইল, এখন চুপচাপ বসে যাও, গুরুতর কথা হচ্ছে আমাদের! বলে মহিনদা নলে মুখ দিলেন। দেখি আমাদের শৈল, ইণ্ডিয়ান আর্ট সেকসানের,—অবনীবাবুর নূতন ছাত্র। তারও এখানে গতিবিধি আছে। বসে গেলাম তার পাশে। মধ্যে মধ্যে প্রাণেশ উঠে দেখে আসছে রান্নাটা।

কথা হচ্ছিল, হেঁটে এক সময় মেসোপটেমিয়ার মরুভূমি পার হয়েছিলেন মহিনদা। এক দুপুরে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে—এক জায়গায় ক্যারাভান দাঁড়াল, একটা ঝরনা থেকে জল বেরোচ্ছে। দলের মাতব্বর যারা আগে তারাই ঝরনাতে গেল। পাশ দিয়ে একটা ক্ষুদ্র নালার মতো ঐ জল এসে মাঠে শুষে যাচ্ছে। উটেরাও জল খাবে, তাই নালার খুব কাছেই পিছন ক'রে দাঁড়িয়ে। মহিনদা যখন জল খাচ্ছেন তখন সেই জলে একটা উট প্রস্রাব করলে। উনি তখন তৃষ্ণায় অবসন্ন, সেই জলই আঁজলা ক'রে খেয়ে ফেললেন। ঐ মরুভূমিটা পার হতে কি কষ্ট পেয়েছিলেন সেই কথা হচ্ছিল। সময়টা তখন, স্বামীজী ইংলণ্ডে—কি ভাবে ইংলণ্ড আমেরিকা তাঁর আরব্ধ কাজ ঠিক মতো ক'রে যেতে হবে, সেই সকল পথ নির্দেশের জন্য শরৎ মহারাজ, কালী মহারাজ প্রভৃতি গুরুভাইদের লণ্ডনে আসতে লিখে ছিলেন। মহিনদাও তাঁদের সঙ্গে যান। স্বামীজীর বিনা অনুমতিতে যাওয়ার জন্য তিনি মহিনদাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করেন,—তুমি কি কাজে এসেছ, এখানে সন্ন্যাসীদের ভিক্ষালব্ধ অর্থ ব্যয় ক'রে? ফিরে যাও তুমি। জেদের উপর মহিনদা সারা পথ হেঁটে ফিরে আসেন—সেই গল্পই এখন হচ্ছিল। এই সূত্রে তিনি টার্কি, এসিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া, ইরাক, ইরান, পূর্ব এসিয়ার অনেক দেশই দেখেছিলেন।

বললেন,—ওরা অন্নকে কি শ্রদ্ধা করে। পথে যেতে এক

জায়গায় দেখা গেল একটুকরো রুটি, শুকনো, কঠিন হয়ে গিয়েছে প্রখর রৌদ্রের তাপে। তখনই সর্দার উচ্চ উটের পিঠ থেকে নেমে সেটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে জেবের মধ্যে রেখে দিলে। উট ওদের যেন প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম বন্ধু। ঘোড়া আর উট, এই দুটি প্রাণী ওদের সমাজে সব চেয়ে বড় সম্পত্তি, এমন কি সোনা-রূপা হীরা-জহরত, তুচ্ছ হয়ে যায় ওদের ঐ দুই পশুর কাছে। এইসব কথাই শুনলাম মহিনদার কাছে।

কয়েকদিন পরের কথা,—ঠাকুরের একখানি ছবি আর স্বামীজীর একখানি ধ্যানমূর্তি ইতিমধ্যে বেলুড় মঠের জন্য তৈরি ক'রে শরৎ মহারাজের কাছে হাজির হলাম। খুশি হয়ে তিনি তখনই গণেনকে ডেকে তাঁর হাতেই দিলেন, বললেন,—ছবি দু'খানা মা ঠাকুরাণীকে দেখিয়ে কালই বাঁধাতে দেবে, তারপর বাঁধানো হলে আমায় দেখিয়ে বেলুড়ে পাঠিয়ে দেবে। কোথায় থাকবে রাখাল মহারাজ বলে দেবেন।

একটু চা ও খাবার খাওয়া হলে পর বললেন,—দাঁড়াও, তোমায় একখানা ছবি দেখাই। ছবিখানা একজন য়ুরোপীয়ান এঁকেছে, কি রকম হয়েছে দেখো। সবে কাল আমরা এটা প্যাক খুলেছি, —এই বলে আবার গণেনকে দিয়ে সেখানা আনালেন। ছবিখানা বাস্ট সাইজ, তখনও ফ্রেম হয় নি।

চার হাত দূর থেকেই দেখলাম। ফ্রেম হয় নি। ফ্র্যাঙ্ক ডোরাখ, একজন পোলিশ পেণ্টার। পথে য়ুরোপ যাবার সময় মহারাজদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় জাহাজে। ঠাকুরের জীবন-কথা শুনে তিনি শরৎ মহারাজকে অনুরোধ করেন, ঠাকুরের এবং মা ঠাকুরাণীর যতগুলি ফটো আছে সব এক এক কপি যেন তাঁকে নিশ্চয়ই তাঁর ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তাঁরা ফিরে এসেই সেগুলি পাঠিয়ে দেন। যথাসময়ে সেগুলি পেয়ে, এতো দিন পর এইখানি পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, এরপর মায়ের ছবিও

পাঠাবেন, ঠাকুরের ছবি আরও একখানা এঁকেছেন সেখানিও পাঠাবেন।

ছবিখানিতে এমন সুন্দর জ্যোতির্মণ্ডল দেখানো হয়েছে ব্যাক-গ্রাউণ্ডে, যেন সেই জ্যোতির মধ্যে থেকেই মুখখানি উদ্ভাসিত হয়েছে। কেবল শরৎ মহারাজ এইটুকু বললেন, যেভাবের ফরসা ধবধবে দাঁত দেখানো হয়েছে, ঠাকুরের কখনও অত শুভ্র দাঁত ছিল না। দাঁতে তাঁর পানের ছোপ থাকত। মাজবার পরে মাঝখান ফরসা হ'ত বটে কিন্তু ধারে ধারে দাঁতের কিনারায় ছোপ থাকত, সেটা পাকা রং। অবশ্য শেষদিকে আর পান খেতেন না বটে। আর একটু বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সামনের দাঁত দুটি বড়। হাসি তাঁর মুখে এমন মধুর ছিল ঐ উঁচু দাঁত দুটির জন্য—যে দেখেছে সে হাসি, সেই মুগ্ধ হয়েছে। সকল সময়েই প্রসন্নভাব ঐ দাঁত দুটিতেই যেন প্রকট ছিল। মুখের সেই হাসিটি দেবার চেষ্টা করেছে, দেখ না কি রকম খেটেছে? অয়েল কালারে কি চমৎকার ফাইন লাইন দিয়েছে ঐ হেলোর ধারে ধারে?

বেশী কথা না বলে এই সত্যটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তাঁর এত ছবি এত জায়গায় আছে এতগুলি দেশীয় চিত্রকরের আঁকা, কিন্তু এমন সুন্দর জীবন্ত মূর্তি কেউ দেখাতে পারে নি। ঠাকুরের মূর্তি ঠিক কেমনটি ছিল তা ঐ ছবি পাঁচ মিনিট দেখলেই একজনের প্রাণের মধ্যে প্রতিভাত হবে। শরৎ মহারাজের মন্তব্য পেলাম, এখন রাখাল মহারাজের মন্তব্যটা শুনলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ত, কারণ রাখাল মহারাজ তাঁকে আরও বেশী দেখেছেন।

পরে, একদিন আমি বেলুড় মঠে গেলাম, এক সময় রাখাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, সুযোগ বুঝে, ঐ ডোরাখের ছবির কথা। তিনি বললেন, দেখো, ঠাকুরের ছবি কখনও সমালোচনা করি না। পেণ্টার তোমরা, সেদিক থেকে তোমাদের যদি কিছু থাকে ক্রিটিসাইস করতে পারো—তার সঙ্গে আমাদের কোন কথা

নেই। আমরা ভালোই জানি ঠাকুরের ছবি যিনিই কেন আঁকুন না, তাঁকে তো ধ্যান দিতে হয়েছে? সেই অবস্থায় তিনি যেভাবেই শেষ করুন না কেন, তার সমালোচনা না করাই ভালো, নয় কি? ঠাকুর আমাদের ধ্যানের রাজা, ধ্যানের বস্তু এতই মহৎ দেখতেন যে,—তার ঠিক বিচার অর্থাৎ ফিসিক্যাল করেক্টনেসটা হ'ল কিনা, অথবা, কোন জায়গায় কোথাও একটু বেমানান হ'ল কিনা, এসব বিচারে তাঁর মন খারাপ হয়ে যেত। আর সত্যি কথাই তো, তাঁর একখানা ছবি দেখে আমরা কেমন ক'রেই বা বলবো ঠিক হয়েছে কিনা? ঠাকুরের মূর্তি বলে যেটাই দেখি মনে হয় তাঁরই মূর্তি।

তাঁর কথার মধ্যে মূল সত্যটুকু বুঝলেও মনের চাঞ্চল্যে বলে ফেললাম,—আপনারা তাঁকে অনেকদিন ধরে দেখেছেন কিনা সেইজন্যই জানতে ইচ্ছা হয়, কাজখানা কেমন হ'ল। বাধা দিয়ে তিনি বললেন,—দেখো, বললে বিশ্বাস করবে তোমরা? আমরা তাঁর রূপ যত দীর্ঘকালই দেখি না কেন, কখনও এক রকম দেখি নি। একজনের রূপ যে এতটা বদল হয় সাধারণে তা কি বুঝবে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর প্রত্যেক মুভমেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারা বদলাতে দেখেছি। এমন গভীর পরিবর্তন দেখেছি যেন সে মানুষই নয়, চেনা যায় না যে এই মানুষটির সঙ্গে আমরা দিনরাত কাটিয়েছি। সময় সময় একটা ভয়ও আসত আমাদের মধ্যে যে, এ কি দেখছি!

জিজ্ঞাসা করলাম,—ভয়? তিনি বললেন,—হ্যাঁ, ভয় বলতে ভূতের ভয় নয়; একটা গুরুগভীর উদ্বেগের ভাব। সময় সময় মনে হ'ত এই দেবদুর্লভ সঙ্গ আমাদের ভাগ্যে দীর্ঘকাল কি থাকবে? এই আশঙ্কা। তাঁর গলায় বেদনা হবার আগে, শেষবার পেনেটিতে যাওয়া, সেখানে আমরা সবাই তো ছিলাম। তিনি ঐ মূর্তি দেখাবেন বলেই যেন সবাইকে ডেকে ডেকে নিয়ে গেলেন, কেবল

মাকে নিলেন না। সেখানে পৌঁছে বেশ আছেন আমাদের সঙ্গে; ফষ্টিনষ্টি করছেন, ইতিমধ্যে যেমনই একটু অন্যমনস্ক হয়েছি আমরা, হঠাৎ দেখি আমাদের মধ্যে তো তিনি নেই, গেলেন কোথা! কীর্তনের মাঝে নাচছেন, ঐযে, কে উনি? ঠাকুর আমাদের না, যাঁর সঙ্গে আমরা চব্বিশ ঘণ্টা রয়েছি? একি সেই মানুষ? আমাদের এ চোখ দুটো এত ভুলও দেখতে পারে? মনে হ'ল— যেন সে মুখ নয়, চেনবার মতো কিছু নেই, কেবল ঐ সামনের বড় দাঁত দুটির সঙ্গে দেবতার প্রসাদে ভরা সেই মৃদু মধুরতম হাসিটুকু। নিত্য তাঁর যে রূপ দিনরাত দেখেছি, সেই রূপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জ্যোতির্ময় এক দেবমূর্তি। এমন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কোথাও দেখি নি। চোখের ভুল নয়, সে ভুল না হয় আমাদের হতে পারে কিন্তু নরেনের চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত কথা। নরেন পর্যন্ত বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখেছিল, তার চোখে ততক্ষণ পলক পড়ে নি। শেষে যখন তাঁর সেই ভাব ভাঙল, স্বামীজীই কেবল আমাদের এই কথা বললেন—খবরদার, এ নিয়ে আলোচনা না করা হয়। আমরা জানি কেন তিনি একথা বলেছিলেন,—গৃহী ভক্তদের মধ্যে একদল অত্যন্ত দুর্বল চিত্ত, ভাব-সর্বস্ব ছিল যারা ঠাকুরের বাইরের কয়েকটা ভাবকে যথাসর্বস্ব মনে ক'রে তাই নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করত।

আজ রাখাল মহারাজের মুখে যেকথা শুনলাম জীবনে কখনও ভুলব না। ঠাকুরের ছবি সমালোচনার বিষয়ে আর কোন কথাই নেই—কেবল এইটুকু বুঝলাম যে,—মহৎ এই শিল্পী, ফ্র্যাঙ্ক ডোরাখ মহাশয়, ঠাকুরের তিনখানি ছবির মধ্যে কেশবের বাড়িতে যে দাঁড়ানো ছবিখানা নেওয়া হয়, সেই ছবির মুখখানিই ফোটাবার চেষ্টা করেছেন, সে মুখে তাঁর সমাধির মধ্যে স্বাভাবিক হাসিটুকু ছিল বলে।

ঠাকুরের মূর্তি সম্বন্ধে যে তথ্য আজ পেলাম, তাতে অন্ধকার

মনের ভিতর থেকে যথার্থই তাঁর রূপ যেন আমার মধ্যে ফুটে উঠল।

প্রায় এই সময়েই, শ্রীম, অর্থাৎ মহেন্দ্র গুপ্ত, যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত লিখেছেন নিজের ডায়রি থেকে, তাঁর সঙ্গে দেখা এবং পরিচয় ঘটল। গান তিনিও ভালোবাসেন, বিশেষত ঠাকুর যেসব গান গাইতেন বা শুনতে ভালোবাসতেন ভক্তদের মুখে। আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন ইনস্টিটিউসানটি তাঁর। উপর তলায় তাঁর পরিপারবর্গ থাকতেন, তিনি ঐ স্কুলের উত্তরদিকে গলির মধ্যে উপরের একখানা ঘরে থাকতেন, লেখাপড়া করতেন ; সদরে খিল দিয়ে থাকতেন, কেউ না বিরক্ত করে। একদিন বিকালে বেলুড় মঠের কানাই মহারাজ মহিনদার ওখানে এসেছিলেন, তখন আমিও ওখানে ছিলাম। মহিনদা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—এখন কোথায় যাওয়া হবে? তিনি বললেন, মাস্টারমশাইয়ের কাছে একবার যেতে হবে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—আমায় নিয়ে যাবেন, —অনেকদিনের সাধ একবার তাঁর কাছে যাবো? কানাই মহারাজ ইংরাজীতে বললেন, মাস্ট, নিশ্চয়ই যাবে ; তবে ওঠো। উঠলাম।

প্রথমদিনে করলাম কয়েকখানি গান, আবার শুনলাম তাঁর মুখ থেকে কয়েকখানি, শেষে কত কথা হ'ল, আমি চিত্রকর শুনে আমায় বললেন.—একখানা ছবি আঁকতে পারেন? একটি পাখি তার বাসার উপরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে, আর তার চোখের দৃষ্টি উপর দিকে, ঠিক এইরকম—বলে দেখিয়ে দিলেন কি রকম বিহ্বল দৃষ্টি। সেদিন এই পর্যন্ত।

এই পাখির ডিমে তা দেওয়া, ঠাকুরের মুখে একথা অনেকেই শুনেছেন,—ধ্যানের অন্তর্নিহিত ব্যাপার বুঝিয়ে দিতে তিনি কোথাও পাখির ডিমে তা দেওয়ার সময়ের কথা বলেছেন ; তার বিহ্বল দৃষ্টির কথাও বলেছেন। ধ্যানের অবস্থা যখন আসে, ঠিক ঐ রকম হয়। বাড়িতে এসেই ছবিখানা রং দিয়েই আরম্ভ করলাম।

দু'দিনেই সম্পূর্ণ ক'রে ফেললাম, কিন্তু তারপর অনেকদিন যাওয়া হ'ল না তাই তাঁকে সেটা দেখানোও হ'ল না।

এ সময়টা চারদিকেই গোলযোগ। অরবিন্দের কথাই চলছে, রাজনৈতিক আন্দোলন বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র, বেঙ্গল পার্টিসানের মডিফিকেসান, রাজধানী দিল্লীতে যাওয়া এইসব ব্যাপার চলছিল। বিপিন পালের রাজনৈতিক বক্তৃতার কণ্ঠ এতটা তীব্র এবং উচ্চ যে সুরেনবাবুর উপরেই যেন তাঁর স্থান হয়ে গেল। রাজনৈতিক ব্যাপারগুলিতে এখন আমার আর সে আগ্রহ ছিল না, যদিও তাঁতের কাপড় ও দেশী টুইলের শার্ট, পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল, এই আমার রাজবেশ—সর্বত্র এই পোষাকেই যাতায়াত চলত।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। যখনই প্রাণটা বেশী ছটফট্ করে তখন হয় মহিনদার দরবারে গিয়ে বসি, না হয় মাস্টার-মশাইয়ের কাছে। তাঁর কাছেও আমার অবারিত দ্বার। চলে যাই দক্ষিণেশ্বরে রামলালদার কাছে, না হয় বেলুড় মঠে। দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় দূর বলে খুব ঘন ঘন যাতায়াত চলে না। এখন থিওসফিক্যাল সোসাইটি হলে কুলদা ভাগবৎরত্নের ভাগবৎকথা শুনতে আমাদের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবারে নিয়মিত যাতায়াত চলছিল। বুধবারে আদি ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়াও বন্ধ হ'ত না। তবে ওখানে যাবার মুখ্য উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের গান শোনা আর শেখা। তখন গোপেশ্বরবাবুর ভাই সুরেনবাবুই ওখানে গাইতেন; বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। রবিবাবুর অনেকগুলি গান এই সময়ে শিখেছিলাম এবং মনের মধ্যে যখন অবসাদ এসে বড় কাতর ও অবসন্ন ক'রে তুলত তখন গানগুলি গাইলেই প্রাণে শান্তি পেতাম। আরও দেখেছি যখন মানসিক অবসাদ আমায় বড় ঘন ঘন আক্রমণ ক'রে দমিয়ে দিত কয়েকখানা গান আমার পক্ষে তখন যেন অমৃতের কাজ করত। বিশেষত গীতাঞ্জলির এই গানখানি আদি ব্রাহ্ম সমাজ থেকেই শিখেছিলাম।

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো। সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো॥ কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার হৃদয়প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো'॥

মোট কথা আমায় আগামী শেষ দিনের জন্য তৈরী হতে হবে, অর্থাৎ এখন থেকে জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতেই হবে, আর তার উপায় হ'ল সাধনের দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ।

আমাদের গাঙ্গুলী বাড়ির অর্ধেন্দ্রকাকার সঙ্গীতে অনুরাগের কথাও বলেছি। চিত্র শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব যেমন সমঝদার হিসাবেই—সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সেই রকম। তাঁদের বড় বাজারে, গাঙ্গুলী লেনের ঐ ছোট বাড়িখানিতে, বিশেষ কাজে কর্মে, অনেক-বারই গানের আসর হয়ে গিয়েছে এবং আমরা অনেকেই তা উপভোগ করেছি। এই সময়টা কতকগুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর ব্যাপার কলকাতাবাসীদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েছিল। তার মধ্যে একটি শিশুর বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভার বিকাশ, ইনফ্যাণ্ট প্রডিজি যাকে বলে তা আমরা দেখেছিলাম। অন্যান্য স্থানে এই অনুষ্ঠান হলেও আমরা কাকার বাড়িতেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম, এই বিশিষ্ট গানের আসরে। তাঁর বাড়ি ছোট হ'লে কি হয়, মন অথবা উদ্যম তাঁর চিরদিনই বিশাল। দেখলাম সেই আসরে ঐ শিশুর মধ্যে সঙ্গীত প্রতিভার অদ্ভুত বিকাশ উপলক্ষ ক'রে তাঁর পরিচিত রাজ্যের বন্ধুবর্গ কাকেও আহ্বান করতে বাকি রাখেন নি।

ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিশারদ দ্বিজেন্দ্র বাগচি মহাশয়ের নাতনী, বয়স পাঁচ ছয় বৎসর হবে, ধ্রুপদ খেয়াল গানে সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। সবাই দেখলাম ফ্রক-পরা মেয়েটিকে,—যাতে দূরের লোকেও দেখতে পায় এইজন্য একটা খুব উঁচু তাকিয়ার উপর বসানো হয়েছে, পাশেই তার ঠাকুরদাদা বসে আছেন। হাতে

তাল দিতে দিতে চৌতালে একখানি সোহিনী রাগিণীর গান গাইছে সে। আর প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী, দীনু হাজরামশাই পাখোয়াজে সঙ্গত করছেন। যেই সোম আসছে, তখন আসরসুদ্ধ লোক একই সঙ্গে ঝোঁক দিয়ে, হা, আ, আ, শব্দে, তারপর বাহবা ধ্বনিতে গানের সবকিছু আওয়াজ ডুবিয়ে দিচ্ছেন। মেয়েটির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ নয় বরং মৃদু, কিন্তু সুরবৈশিষ্ট্য ঠিকই দেখিয়েছিল যদিও তার মুখ দিয়ে গানের শব্দগুলি এখনও স্পষ্ট বার হবার সময় হয় নি।

সভায় অনেকেই, তার মাধ্য গুণী জ্ঞানী ও রসিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অবনীবাবু, সমরবাবু, যামিনীবাবু প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও ছিলেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহের পর যখন প্রথম মিনাদের বাড়ি গেলাম মেয়েদের দেখতে, উমাপতিবাবু অতীব সহজভাবেই আমায় গ্রহণ করলেন, কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণী আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেন না। এই কথাটি স্পষ্ট ক'রে বলে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন যে, আমার ধন, আজ কার হ'লরে। নুনি, বিনু, তোদের বাপ আজ পর হয়ে গেল, অধিকারবুদ্ধি নরনারীমাত্রেরই থাকে, কিন্তু মনে হ'ল সেটা নারীর মধ্যে খুব তীক্ষ্ণ, খুব সজাগ। যাই হোক এই যে ব্যবধানের পাঁচিল তৈরি হ'ল, তা ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে উঠল জীবনগতির সঙ্গে সঙ্গেই।

এরপর আমি তো নিয়মিতই যেতাম, মেয়েরাও আমাদের বাড়িতে আসত এমনভাবে, যেন সম্পর্কটা শুধু আমারই সঙ্গে। ক্রমে তারা বড় হয়ে উঠছিল, তাদের মধ্যে দেখলাম উমাপতিবাবুর শিক্ষা এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ শাশুড়ী ঠাকুরাণী, মেয়ে দু'টি যাকে মা বলেই ডাকত,—তাঁর শিক্ষা, দু'টি বিভিন্ন ধারায় বরাবরই তাদের জীবনে কাজ করছে।

ছবি আঁকতেও তখন ঘন ঘন সেখানে গিয়েছি। প্রথমে

উমাপতিবাবুর তারপর শাশুড়ী তারপর বড় মেয়ে নলিনী তারপর ছোটটি বিনু,—এই কয়খানি ছবি পর পর হ'ল জলের রংএ। আমার আর্ট স্কুলে প্রবেশ এবং আর্টিস্ট হবার আকাঙ্ক্ষা উমাপতিবাবু সর্বান্তকরণে অনুমোদন করেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল যে আমি সিদ্ধিলাভ করবই। তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। আমার বেশভূষার অবস্থা দেখে তিনি একটা কাশ্মীর সিল্কের থান কিনে জামা তৈরি করিয়ে দিলেন। বললেন,—যখন যা দরকার মনে করবে গোপনে আমায় বলতে কোন সংকোচ করো না। ঐ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উপার্জন করতে একটু দেরি হবে, কিছুদিন তোমায় একটু কষ্ট করতেই হবে, তারপর তোমার শ্রমের পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে। এইভাবে তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সম্বন্ধটাও অনেক সহজ হয়ে এসেছিল। সেটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যখন শ্বশুর-মশাই, তাঁর শরীর খারাপ হওয়ায় শিমুলতলায় চেঞ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা কবলেন। তাঁর এক ভাগনে বিহারীবাবু কটকের মুন্সেফ, কিছুদিন সাতাক্ষিরায় বদলী হয়ে মারা যান, শিমুলতলায় তাঁর দু'খানা বাড়ি। তারই একখানা খালি পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানাতেই থাকার ব্যবস্থা হ'ল। আমায় সঙ্গে যেতে অনুরোধ করলেন, আমিও রাজী হলাম। সেই প্রথম প্রায় মাস খানেক শিমুলতলায় কাটিয়েছিলাম। সেখানেও আঁকার কাজ চলেছিল ভালো, পোর্‌ট্রেট, ল্যাণ্ডস্কেপ কত কি। তারপর ঘটনাচক্রে আমায় কলকাতায় ফিরতে হ'ল। টালী-গঞ্জের নবাববাড়ির এক যুবকের ছবি এঁকেছিলাম, সাহজাদা প্রায় দেড় বছর আগে মারা যান; একখানি অয়েল ও একখানি ওয়াটার কলার ছবি—কিন্তু দাম আগে পাই নি। এতদিন পর তাঁদেরই একজন, যিনি মধ্যস্থ হয়ে ঐ দু'খানা ছবি করিয়ে ছিলেন, তিনি লিখেছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে এসে আদালত থেকে, ছবি দু'খানার দাম নিয়ে যেতে। যাই হোক আমি ফিরে এসে টাকাটা উদ্ধার করলাম, তারপর আবার নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে লেগে গেলাম।

ঐ যে প্রথম শিমুলতলায় যাওয়া, প্রাণের মধ্যে গভীর রেখাপাত করেছিল। শ্বশুরবাড়িতে ওঁদের সঙ্গে থেকে পাই নি, আবার কোন সুযোগে যদি যেতে পারি তবে দীর্ঘকাল থাকবো আর নিজের মনোমতো কাজ করবো, এই ভাবের একটা গোপনে বাসনা আমার মনের গভীর তলে লুকোনো ছিল। ঐ সুযোগ এল এক বৎসরের মধ্যেই। শিমুলতলায় এইবারের থাকাটা এই জীবনে এমনই একটি স্মরণীয় কাল যার কথা আমার স্মৃতি থেকে এখনও লুপ্ত হয় নি।

বাল্যজীবনে, মেজপিসির মেয়ে বিভার কথা বলেছি, যার পাঁচ বছর বয়সে খুব ধুমধাম ক'রে চাঁপদানীর বেণীবাবুর মেজ ছেলে কীর্তিচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল। ইতিমধ্যে বেণীবাবু মারা গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পর কীর্তি ভাই তিনটিকে নিয়ে সকল কিছু বৈষয়িক ব্যবস্থা, এমন কি অফিসের কাজও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন সম্প্রতি তার কল্যাণকামী কাকার সাহায্যে তার বড় বাগান করবার সখ হ'ল। কীর্তিচন্দ্র অনেকটা জায়গা নিয়ে শিমুলতলায় একখানা বাড়ি ও বাগান তৈরি করালেন। বাড়ির নাম হ'ল 'মাধব-ভিলা'। তারপর ভাড়া দেওয়া চলল কিছুদিন। আত্মীয়-স্বজন যার শরীর খারাপ হ'ত ঐখানে গিয়েই স্বাস্থ্যলাভ করত। শিমুলতলার পরই ঝাঝা, এস. পি. চাটুজ্জের নার্সারী ছিল সেখানে। কীর্তিচন্দ্রের জীবনে প্রধান সখ হ'ল নার্সারী করা। এ অঞ্চলের মাটিটা গোলাপের পক্ষে খুব ভালো দেখে, এখানেই আরো অনেকটা জায়গা নিয়ে বেশ বিস্তৃত নার্সারী আর গোলাপের চাষ হ'ল— নিউমার্কেটে একটা স্টলও খোলা হ'ল। বেশ চলতে লাগল তাঁর গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের ব্যবসা।

এখন বিভা তার ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে ওখানেই আছে। কীর্তিচন্দ্র আমায় নিয়ে উঠলেন মাধব-ভিলায় তাঁর শিমুলতলার বাড়িতে। প্রায় পাঁচ মাস ছিলাম, বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। আমার জীবনের এক মহা সুখের কাল।

শিমুলতলার চারিদিকেই পাহাড়ের অতি মনোরম দৃশ্য তখন জগতের সঙ্গে অন্যসব সম্বন্ধ ভুলিয়ে দিলে। ক্রমে ক্রমে কলকাতা থেকে রং, তুলি, কাগজ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যা কিছু মদনের মারফত আনিয়ে নিলাম, আর মনের সাধে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকতে প্রলুব্ধ হলাম। ফটিকদাই, আর্মি নেভি স্টোর থেকে, উৎকৃষ্ট ওয়াটার কলারের কাগজ কিনে পাঠিয়ে দিলেন। এমন উৎকৃষ্ট কাগজ ইতিপূর্বে আর ব্যবহার করি নি। তারপর গাঢ় অভিনিবিষ্ট ঐ দৃশ্যের মহিমার মধ্যে।

জীবনে আমার, শিমুলতলা থেকে যে বস্তুলাভ ঘটেছিল তার গুরুত্ব কম নয়। ঐকান্তিক নির্জনতার সুযোগেই খুলেছিল নিজ জীবনের পথে অন্তর্দৃষ্টি, সে বিষয়ে আলোচনার দরকাব নেই এখন। দ্বিতীয় লাভের কথাই বলব, সেটা হ'ল নৈসর্গিক সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে তরুলতা বনভূমি পর্বত আকাশের অনুভব, যা আমার জীবন ধন্য করেছিল। সেই আনন্দের দিন আমার কিন্তু দীর্ঘকাল রইল না, ফিরে আসতে হ'ল। স্যার আর. এন. মুখার্জির বাড়িতে তিনটি বিশালকায় ইউক্যালিপটাস গাছ ছিল, সেটা নিম্নভূমি থেকে চমৎকার দেখাত, একটা অপূর্ব দৃশ্য। সবসুদ্ধ বারোখানা মাঝারি সাইজের দৃশ্য আর আটখানা রচনা নিয়ে বাড়ি এলাম। আর নিয়ে এলাম চমৎকার স্বাস্থ্যপূর্ণ হৃষ্টপুষ্ট দেহ। আমায় দেখে সবার চোখে তখন বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠল।

এই সময়টায় আমার অনেকগুলি কাজ জমেছিল। ডিজাইন বোধ হয়, ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে বারো তেরোখানা আর ল্যাণ্ডস্কেপ ঐ ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় দু'ডজন হবে। আমাদের সহপাঠী পূর্ণ, লালমোহন, অভয় প্রভৃতি শিল্পী, যারা এখনকার দিনে বাজারে কাজ ক'রে সংসার চালাচ্ছে তাদেরও এত ছবি জমে নি ঘরে কাজ ক'রে। তারা বাড়িতে কাজই করে না, ছবি জমাবে কি! কিন্তু এভাবে আমার জমা ছবিতে কোন উপকারই তখন

ছিল না ; কেবল মনে একটা বল আর সন্তোষ ছিল এই যে, আমার মনোমতো কাজ এতগুলি আছে যা কেউ দেখলে খুশী হবে, তাছাড়া আমার পরিশ্রমের একটা নিদর্শন তো বটে ! তবে আর একদিকে আমার একটা দোষ ছিল, সেই যে ১৯১০ বা ১১ সালে এলাহাবাদ একজিবিসনের চিত্র নির্বাচনের বেলা অবনীবাবুদের বাড়িতে কুমারস্বামীর হাতে প্রত্যাখ্যান, যেটা আমি অবিচার বলেই ধরে নিয়েছিলাম, সেই অবধি প্রায় দশ বৎসর কোনও একজিবিসনে ছবি দেওয়ার নামেই ভয় হ'ত, পাছে আবার রিজেক্‌টেড হয়ে যায়,—আবার অপমানের ভাগী হতে হয়। আজও মনে পড়ে ছোট্ট প্রথমকার সেই সুন্দর মুক্তামালা ছবিখানির কি অপমান! অবনীবাবু পর্যন্ত কুমারস্বামীকে বললেন,—কেন, এ ছবিতে ওয়েস্টার্ন আর্ট সেকসানে দেওয়া যেতে পারে ? তাও কুমারস্বামী গ্রহণ করলেন না।

এখনও মনে আছে, প্রথম ওঠবার মুখে যে আঘাত তা বড় তীব্রই হয়ে থাকে, সে কথা ভুলে যাবার নয়। কিন্তু এটাও বুঝতে পারি, বিধাতার বিধানে যেটা ঘটে, সেই আঘাত তীব্র হলেও ফল তার ভালোই হয়। পরবর্তীকালে, এত সাবধানে কাজগুলি করতাম, তীক্ষ্ণ সমালোচনার মধ্য দিয়ে নিজেকে এমনই তৈরি করতে পেরেছিলাম যাতে সিদ্ধির পথে এমন কি কোন ক্ষেত্রেই যথেচ্ছাচারী হতে পারি নি ; সিদ্ধির পরে যথেচ্ছাচার এখনকার দিনে প্রায় সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিদের মধ্যে দেখা যায়। ভাবটা তার এই যে, আমার হাত থেকে যা বেরোবে তাইই হবে মাস্টারপিস্ আর উচ্চশ্রেণীর শিল্প। যাই হোক এখন শিমুল-তলা থেকে ফিরে এসে মহানন্দে আবার মদন অথবা চুনীলালের আড্ডায় গাঢ় প্রবেশ করলাম। হাজির সেখানে দিন-রাতে প্রায়ই হতাম যেদিন মহিনদার আড্ডায় যাওয়া হ'ত না। বিশেষ ক'রে তাঁদের কথা পরে আরও বলবো। প্রায় সপ্তাহে একদিন মহিনদার

ওখানে চাঁদা ক'রে খাওয়া-দাওয়া হ'ত। এখন সেখানেও একদল বন্ধু ছিল, আমায় যাঁরা প্রীতির চোখে দেখেছিলেন, তার মধ্যে আমার মামা, সুরেন মিত্তির, প্রাণেশ ও চিরঞ্জীববাবু। বিমল বলে একটি ছেলে, রাখাল মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছিল, তখন প্রায়ই মহিনদার ওখানে আসত। বোধহয় মেদিনীপুর জেলায় বাড়ি, কথায় তার একটু ঐ অঞ্চলের টান ছিল। অল্প বয়সেই স্বামীজী ও ঠাকুরের ভক্ত হয়েছিল সে—সরল প্রাণ বলে আমার সঙ্গে ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল।

আত্মপ্রসাদ শিল্পীর একটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস। সে প্রসাদ আসে কর্মসিদ্ধির ফলে। আর কর্মসিদ্ধি কি ক'রে আসে? সেটার অনুসন্ধানের ভার প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্মপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন। আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম জানি না, একটার পর একটা অশান্তি এসে আমাকে একেবারে পাগল করবার যোগাড় করেছিল—শেষ আঘাতটা এল বাবার কাছ থেকে। ঠাকুরদাদামশাইয়ের মৃত্যুর পর কাকাবাবু সেরিফ অফিসের ছোটবাবু হয়েছিলেন, তাঁর একটা প্রীতি ছিল আমাদের ওপর। সেরিফ অফিসের এক নিলাম থেকে কাকাবাবুর সাহায্যে একটা সুন্দর বুককেসের খোল কিনেছিলাম বারো টাকায়, তাতে আমার কাগজ, রং, তুলি, যন্ত্রাদি ব্যবহার্য যা কিছু রাখব বলে। শুধু দু'টো পাল্লা ক'রে নিলেই সব ঠিক হয়ে যায়, এমনই অবস্থা। অপেক্ষায় আছি কোন একটা কাজ হাতে এলেই ওটা সম্পূর্ণ ক'রে নিয়ে ব্যবহার আরম্ভ করা যাবে। বাবা ডাকলেন, বললেন,—ওটা তুমি কত দিয়ে কিনেছ? বললাম, আপনি তো শুনেছেন সেকথা। তখন বারোটি টাকা বার ক'রে দিয়ে বললেন, এখন থেকে ওটা আমার, এই নাও তোমার টাকা। বললাম, টাকা চাই না। তিনি বললেন,—নিতেই হবে টাকা,

আমি যতদিন বাঁচাবো ব্যবহার করবো ওটার মনোমতো পাল্লা তৈরি ক'রে নিয়ে —তারপর আমার অবর্তমানে ওটা তোমারই হবে।

যাই হোক, জামাটা গায়ে দিয়ে চটিটা পায়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লাম। কোথা দিয়ে কোথায় চলেছি কিছুই খেয়াল নেই, কতক্ষণ হেঁটেছি তাও জানি না, হুঁশ হ'ল মহিনদার আড্ডার মধ্যে ঢুকে। দেখি তিনি তামাক সাজছেন। একেবারে চারটে পাঁচটা কলকেতে তাওয়া চড়িয়ে সেজে রাখা, তারপর একে একে ব্যবহার করা, এই তাঁর নিয়ম। আমায় দেখেই তিনি যেন আনন্দে লাফিয়েই উঠলেন, এসো, এসো, আজ তোমায় আলিঙ্গন করবো,—'ভারতবর্ষে' তোমার ছবি দেখে বড় খুশী হয়েছি ; বলে সেই তামাক মাখা হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

বুঝলাম, 'ভারতবর্ষে'র এই অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ছাপা হয়ে ছবিখানা বেরিয়েছে। কোথায় গেল সারাদিনের দুঃখ-অবসাদ, প্রাণের মধ্যে যেন শান্তির ধারা ঢেলে আমার আনন্দে ভাসিয়ে দিলে। তারপর মহিনদা বললেন,—অনেক দিন থেকে তোমার কাজ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু তোমায় বলি নি, বাড়ি থেকে এতদূরে এনে দেখানো সুবিধা হবে কি হবে না। আজ প্রথম তোমার কাজ দেখলাম, ঐ কাজখানার ভিতর দিয়ে তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দেখতে পেলাম ; বড় খুশী হয়েছি আজ।

তারপর একে একে সব আসতে আরম্ভ হ'ল, আজ তাঁর সবার সঙ্গেই ঐ কথা চলল। যাই হোক এরপর প্রাণেশ, চিরঞ্জীববাবু, পশুপতি ডাক্তার এলেন, তারপর মেটাফিসিক্সের কথাও হ'ল। মহিনদার এই যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা তা আমাদের শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে নয়, এটা পাশ্চাত্য দর্শনের জ্ঞাত ও জ্ঞেয়বাদের যেসব আলোচনা তাই। আত্মা এবং তার কর্ম, এই অনুভূতি সম্পর্কে চিত্তের প্রসার। তার মধ্যে ভগবানের কথা নেই— আত্মার সঙ্গে ভগবৎ সম্বন্ধের কথা নেই, আছে কেবল সোল অর্থাৎ

আত্মা নিয়ে তার সঙ্গে জগৎ সম্বন্ধের কথা। আমার পক্ষে তা অনেকটাই নীরস ছিল যদিও তাই-ই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনতাম আর মধ্যে মধ্যে ভোজসভায় উপস্থিত থাকতাম। ভিতরে ভিতরে বৈরাগ্যের ভাব ধীরে ধীরে আমার সংযমের পথে নিয়ে চলেছিল। এখন যা কিছু জ্ঞানরাজ্যের বা যা কিছু ভক্তি রাজ্যের কথা, তা আমায় আকর্ষণ করত। এসব ক্ষেত্রে অভয় আমার সঙ্গী ছিল না, কারণ তার অসুখের পর দীর্ঘকালের জন্য তাকে চেঞ্জে যেতে হয়েছিল গিরিডিতে। ফিরে এলে 'পর তার পিতৃবিয়োগ হ'ল, সংসারের বোঝা তার ঘাড়ে পড়ল। তাকে মল্লিকবাড়ি চাকরি নিতে হ'ল। সেইখানেই তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। কিন্তু আমাকেও মধ্যে মধ্যে বাইরে যেতে হ'ত, কারণ মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়েছিল, ধর্ম এবং সাধনের পথে অদম্য একটা প্রেরণা ধীরে ধীরে আসছিল। বিশেষত মদনের বাড়িতে আড্ডায় তখন থেকে যাওয়া চলছিল বেশী, আরও সেই কারণে অভয়ের সঙ্গে খুব ঘন ঘন দেখা হ'ত না।

ইতিমধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা প্ল্যান মনের মধ্যে ছকে ফেললাম। মদনের বাড়িতে যেতে যেতে ফটিকদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার যোগাযোগ ঘটল, ফটিকদার স্ত্রী মারা যান, তিনি একজন প্রচ্ছন্ন ভক্ত ছিলেন,—হারবার্ট ডয়েল কোং-এর স্বত্বাধিকারী, হ্যারিসন রোডে মদনের বাড়ির সামনে অপর ফুটে ছিল তাঁদের অফিস। তাঁদের পিতার মৃত্যুর পর থেকে কয়টি ভাইয়ে ঐ অর্ডার সাপ্লাইয়ের কারবার চালাচ্ছিলেন। এই ফটিক-দার কথা বিশেষ একটু বলতে হবে কারণ এই সময়কার জীবনে ফটিকদার সঙ্গে যোগাযোগটা দৈবচালিত ব্যাপার বলেই আমার বিশ্বাস। মদনের কাশীপুরে পৈতৃক অতি সুন্দর একখানা বাগান ছিল, মধ্যে মধ্যে সেখানে পার্টি হ'ত আমরা কয়েকটি নির্বাচিত বন্ধু মিলে গ্রীষ্মকালের বিকালে সেখানে গিয়ে স্নানের পর কথাবার্তায়

আনন্দে গানে, গল্প-সল্প শেষে আহারাদি সেরে ফিরে আসতাম। এই বাগানখানি আমাদের প্রীতি-সম্মেলনের স্থান ছিল। একদিন আমরা কয়টি বন্ধু মিলে বিকালে বাগানে গেলাম। আমরা ছিলাম পাঁচ-ছ'জন তার মধ্যে প্রধান,—মদনমোহন,—মাড়োয়ারী হাসপাতালের ছোট ডাক্তার পি. সি. রায়, বন্ধুবর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বড়লাটের অফিসে কলকাতা-সিমলা সারভিসের একজন বড় কর্মচারী আর চুনীলাল বর্মণ—ডাঃ এস. কে. বর্মণের পুত্র, ঔষধের কারখানার মালিক। আর ফটিকদা। চুনীলালের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তাম। বিধাতার বিধানে এই কয়জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আমার ঘটেছিল এই সময়টায়—আমাদের নিভৃত মিলন প্রায়ই এই কজনকে নিয়ে। কখনও মদনের বাড়িতে বা বাগানে আর কখনও বা চুনীলালের বাড়িতে অথবা তার ঢাকুরিয়ার বাগানে। যাই হোক, সেদিন হ'ল কি, আমি ভজন গান আরম্ভ করলাম,—ঠিক সন্ধ্যার সময়ে, সবাই বেশ স্থির হয়ে শুনছিল। আমি তন্ময় হয়েই গাইছিলাম, হঠাৎ আমার চমক ভাঙল নন্দদার কথায়—আমার গা টিপে বললেন, ঐ দিকে দেখো চেয়ে।

দেখি ফটিকদা সংজ্ঞারহিত, ভাব সমাধির অবস্থা, সর্বাঙ্গে পুলক, চোখে ধারা,—এই অবস্থায় চুনী তাঁকে ধরে ফেলেছে ঘাটের মার্বেল পাথরে বাঁধানো চাতাল থেকে পড়ে না যান, যেহেতু তিনি ধারেই বসেছিলেন আর মদন তাঁকে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তার আঙুলগুলি জপের মতো ক'রেই ধরা ছিল। বোধহয় পাঁচ মিনিটকাল শুয়েছিলেন, অচৈতন্য অবস্থায়, তারপর তিনি উঠে বসে, —কৈ, গান, প্রমোদ? বন্ধ হ'ল কেন? জয়দেবের পদটি গাইছিলাম,—রাধা বদনবিহসিত বিলোকন বিবিধ বিকার বিভঙ্গম, আবার আরম্ভ করলাম, জলনিধি মিব বিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গম ইত্যাদি। মহা আনন্দের তরঙ্গ উঠল—সবাই সেদিন ফটিকদার ভাব লক্ষ্য ক'রে তাঁর প্রতি একটি বিশেষ আকর্ষণ

অনুভব করলে,—সেই থেকে আমরা ঐ কয়জনে প্রায়ই ঘন ঘন একই উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর মিলতে শুরু করলাম। বিশেষত ফটিকদাকে, তখন থেকে দেখলাম, আমার সঙ্গে বড়ই ঘনিষ্ঠভাবে এমন কি যেন অচ্ছেদ্যভাবে ছিল। সারাদিন যা কিছু কাজকর্ম করি, সন্ধ্যার আগে ফটিকদার সঙ্গে না মিলে থাকতে পারতাম না।

দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়ল, এই সময়ে আমাদের একজন বন্ধু বাড়ল, তিনি হলেন রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায়—'পন্থা'র সম্পাদক এবং একজন বড় থিওসফিস্ট, ঝামাপুকুরে তিনি থাকতেন। আমরা প্রায়ই মদনের সঙ্গে তারই গাড়িতে যেতাম তাঁর বাড়িতে। নীচের ঘরে তিনি বসতেন, আরম্ভ হ'ত ভগবৎ কথা। তিনি বলতেন জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব মিলিয়ে। লোকটি অসাধারণ তত্ত্বদর্শী পুরুষ। তিনি বলেন, জীবের ভক্তিরাজ্যে প্রথম প্রবেশ হয় মাতৃভাব নিয়ে—সহজ কথায় বলতে গেলে, ইষ্টদেবতাকে মাতৃভাবে ধারণাই সহজ হয়, তারপর যখন অগ্রগতি হয় তখন পুরুষ অর্থাৎ পিতৃভাব সহজেই চিত্তের মধ্যে আশ্রয় পায়, যেমন শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, অথবা নারায়ণ ইত্যাদি ইষ্টের উপর পুরুষবুদ্ধি হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে রূপ বা আকার চলে যায়। সান্নিধ্য হ'লেই অরূপ, আত্মা বা ব্রহ্মভাব হৃদয়ঙ্গম হয়, বিকাশেই আত্মার সঙ্গে হয় পরমাত্মার পরিচয়। তখনই জীবরূপী আত্মা ব্রহ্মগুণসম্পন্ন হয়ে যান। তখনই হয় পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ, পরমাত্মা বা পরব্রহ্মে স্থিতিলাভ হয়। জীবভাবেই ক্রমবিকাশের পথে, পর পর নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমেই এটা হয়। এভাবে রাজেনদার কাছে আমরা অনেক কিছুই শুনতে পেতাম।

কোন কোন দিন থিওসফিস্টমণ্ডলের কেন্দ্রস্থ দু'জন অদৃশ্য গুরুর কথাও হ'ত। এই দুই গুরুমূর্তি তাঁরা পূজা করেন। অগ্রগামী, উচ্চ অধিকারীরা তাঁদের দর্শন পায়, প্রত্যক্ষ নির্দেশ পায় তাঁদের কাছ থেকে। রাজেনদার কাছে ঐ দুই গুরুদেবের ফটো আছে।

আমি পূর্বেও ঐ তুই গুরু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। একজন মাস্টার অর্থাৎ প্রভু এম, (মরু ঋষি) অপরজন প্রভু, কে. এইচ। ইনি কৃষ্ণ অবতার হয়েছিলেন।

রাজেনদা জানতেন আমি শিল্পী, মদনমোহনের পরিচিত অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের কাজ করেছি আর মদনের ঘরে আমার হাতের অনেকগুলি ছবি ছিল, বড় গৌরব ক'রে সবাইকে দেখাত। প্রশংসা আমার যতটা প্রাপ্য, তার গুণগ্রাহিতার ফলে সে প্রশংসার ভার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। রাজেনদাও ক্রমে আমার প্রতি বিশেষ একটু স্নেহ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। একদিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন,—দেখ, মাস্টারদের ছবি বড় গোপনে রাখতে হয়, আমি ঠাকুরঘরে পুজোর জায়গায় সে ছবি তু'খানা কৌশলে একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখেছি,—তোমায় দেখাবো। দেখ আমার ভারি ইচ্ছে তাই থেকে তুমি তু'খানা পেন্টিং ক'রে দেবে; তোমার হাতের ঐ কাজে আমার শুধু নয়, তুমিও অনেক কিছুই পাবে। কেমন, তুমি রাজি?

মেয়েলি একটা কথা আছে,—ওরে সেদো, ভাত খাবি? সেদো বলে হাত ধুয়ে তৈরী হয়ে আছি। আমারও তাই,—ঐ মাস্টারদের ছবি দেখবার জন্য কতদিন আগে থেকেই আকাঙ্ক্ষায় জর্জরিত হয়ে আছি। এখন শুধু দেখা নয় আঁকতে পাবো, এই আনন্দে নাচতে ইচ্ছা হ'ল। সেই রাত্রেই ফটো তু'খানি যত্ন ক'রে এনে শোবার ঘরে আলমারীর মধ্যে রাখলাম, তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘণ্টা খানেক বসে বসে জুয়েল ল্যাম্পের আলোয় দেখলাম। তু'খানা ছবিই, কোন অয়েল কলারের পোর্ট্রেট থেকে হাফ সাইজে ফটো কপি করা। রাজেনদার অনুরোধ, ছবি তু'খানি ঠিক ঐ ফটোর মাপেই 'সেম সাইজ' যাকে বলে তাই করতে হবে, ছোট নয়, বড় নয়। পরদিনই আরম্ভ ক'রে দিলাম। সেদিন ছিল কালীপূজা। বিকালে মদনের আড্ডায় গেলাম, দেখি ফটিকদা আমার জন্য

অপেক্ষা করছেন, কালীপূজার রাত্রিটি দক্ষিণেশ্বরে কাটাবার বাসনায়। আর কথা নেই, দু'জনে ঐখান থেকে বড়বাজারের ঘাটে যাত্রা, সেখান থেকে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে।

ঠাকুরের ঘরে ভক্ত সমাগম কম হয় নি, আর রামলালদা সবাইকেই যথাযোগ্য ব্যবহারে মুগ্ধ ক'রে রেখেছেন। রামলালদার স্নেহময় ব্যবহারে, সে রাত্রে আমাদের অবস্থান যে কি আনন্দের হয়েছিল তা বলবার চেষ্টা না ক'রে শুধু এইটুকুমাত্র বলবো, আমাদের মনে হ'ল যেন ঠাকুরের সঙ্গেই আমরা সারারাত কাটিয়েছি। মশার কি ভয়ানক অত্যাচার, তাও আমরা গায়ে মাখি নি; সমাহিত অবস্থায় ফটিকদাকে নিয়ে একবার পঞ্চবটি, একবার সিদ্ধাসনের দিকে, একবার নাটমন্দিরে আবার ঘাটের চাঁদনীতে এইভাবে সারারাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ঘরে এসে পৌঁছে গেলাম।

এই সময়টা আমার দোটানা অবস্থা। মূলে কেবলই এই কথাটা অন্তরে তোলপাড় করছে যে, আমি একেবারেই সংসারের সংস্রব থেকে বেরিয়ে না গেলে কোন রকমেই আমার জীবন সার্থক হবে না। আমাকে সংসার ছাড়তেই হবে। কিন্তু আমার ছবি? যে বিদ্যার অধিকারে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি, স্বামী বিবেকানন্দের ছবি,—সিদ্ধার্থ ও গোপার ছবি, শিব-পার্বতী, রাধাকৃষ্ণ ধ্যানের ছবি,—এইসব সৃষ্টি, এতে যে আনন্দ তা কি কম? অপর দিকে সাধন-ভজন, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধ্যান-ধারণা, সমাধি এসব হ'ল কৈ? ছবি আঁকা রাখলে সংসারে থাকতে হবে, উপার্জন করতে হবে, স্ত্রী নিয়ে বিধিমত ঘরকন্না করতে হবে, মহাপাতকে ভরা ঐ বাড়িতেও থাকতে হবে। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি পিসিদের চিৎকার গলাবাজি —গালাগাল, বাবার বদ মেজাজের ঝাঁজ, তাঁর হুকুম মতো সব কাজই করতে হবে। এখানে কেবল ঝগড়া, পিসিতে পিসিতে, ভাইয়ে ভাইয়ে, মায়ে ঝিয়ে, বাপে ছেলেতে এমন কি ঝিয়ে মনিবেও ঝগড়া।

ঝগড়া যেন এই জোড়াসাঁকো চাষাধোপা পাড়ার ২২নং বাড়ির বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছে এই শেষ দশ বছর, বিশেষত ১৯১০ সালের মে মাসেই বোধহয়, যখন হেলীর কমেট দেখা দিয়েছিল সেই সময়টায়। বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও যাবার সময় মনে হ'ত ভগবান করেন, আর এ বাড়িতে ফিরে আসতে না হয় তা হলে বাঁচি। এইভাবে ক্রমে ক্রমে যাদের সঙ্গে বাস করি তাদের আর আত্মীয় মনে হ'ত না। নূতন কাকীমা আসার পর থেকে কাকাবাবুর ব্যবহার ক্রমে ক্রমে আরও অসাধ্য রোগের মতোই চিকিৎসার বাইরে চলে যেতে বসেছে। পিসিদের ও ঠাকুমার জীবনে শান্তি একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। যে ঠাকুমার ভালোবাসা বালক ও কিশোর অবস্থা পর্যন্ত আমায় সঞ্জীবিত রেখেছিল এখন আর আমার সে ঠাকুমা নেই, বাবার বংশের সঙ্গে কেবল শাপ অভিশাপের সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে, বিশেষত পোস্তার কারবারের মূল দলিল চুরি যাবার পর থেকে। চুলোয় যাক ওসব কথা, সময় সময় মাথা খারাপ হয়ে যায়। যতই মনে করি ওসব কথা আর ভাববো না—কিন্তু এমন সম্পর্ক যে না চাইলেও বাড়িতে থাকলেই ওদের কথা এসে পড়ে।

এই সময়েই আমার বিবাহিত দ্বিতীয় জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে সম্বন্ধের মোদ্দা কথাটি একটু বলে নি, কারণ এর পর হয়তো আর অবসর হবে না। এগারো-বারো বছরের, যেন বাক্‌শক্তিহীন এবং শিক্ষা সংস্কৃতিহীন হাবা-গোবা ঐ মেয়েটি যখন আমাদেব বাড়িতে এলেন তখন আমাদের বাড়ির যেমন পতনের অবস্থা, তাদের সংসারেও সেই ভাবের অবস্থা, যদিও তাদের অনেকগুলি ভাইয়ের মধ্যে দু'জন এবং বাবা উপার্জনক্ষম। প্রথমে সে আমাদের বাড়িতে থাকতেই চাইত না। কেন? এতবড় বাড়িতে এতগুলি পরিবার চিৎকার, ঝগড়াঝাটি সারাদিন,—শান্তির নামগন্ধও নেই, এমন সংসার সে আগে দেখে নি। আরও, আমার উপর তার টান বলে কিছুই ছিল না, কারণ রাত্রে একত্র শয়ন ব্যবস্থাও ছিল না, কথাবার্তা

সামান্য রকমেই চলত বটে ঘরে যখনই আসতাম। লেখাপড়া শুনেছিলাম, প্রথম ভাগ শেষ, দ্বিতীয় ভাগের কতকটা,—সুতরাং চিঠিপত্রের কোন বালাই ছিল না—সেদিকে আমার শান্তি বলতে হবে। তা ছাড়া মনে হয় আমার উপেক্ষাও সে অনুভব করতে পারে নি, তখন সে বাপের বাড়ি থাকবার জন্যই লালায়িত। এই ভাবে দু'আড়াই বৎসর কেটে গেল। এই সময় আমারও তার কথা ভাববার সময় ছিল না, যদিও ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতাম, কিংবা আমাদের বাড়িতে যখন আনা হ'ত তাকে দেখতাম মাত্র। এখন কিছুদিন থেকে দেখছি তার মধ্যে যৌবনের লাবণ্য বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে এই সময় আমার এলাহাবাদ যাওয়া এবং সেখানে পূর্ববর্ণিত ঔপন্যাসিক প্রেমসম্বন্ধ। ঐ ঘটনার পর যখন কলকাতায় এলাম, তখন শ্বশুরবাড়ি নিমন্ত্রণে একদিন যাই। তখন দেখি আগের সেই বালিকা আর নেই, এ যেন আর এক স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী—সঙ্গে সঙ্গে তার চাহনিতে একটা পৌরাণিক মোহময় আকর্ষণ। কথা কওয়াটা তার কমই ছিল, তার মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ টান এখন থেকে টের পাওয়া গেল। বুঝলাম, এইবার আমার আর একদফা মানসিক দ্বন্দ্বের পালা শুরু হ'ল। যাই হোক, ওদিকে মায়াবিনীকে আর বেশী প্রশ্রয় না দিয়ে সেই রাত্রেই তাদের বাড়ি থেকে চলে এলাম, আর এই ভয় একটা সঙ্গে নিয়ে এলাম যে, মহামায়ার এই যে অগ্রগতি আমায় কোন্ দুর্বল রন্ধ্রপথে আক্রমণ করবে আর আমার পক্ষে তা সামলানো সম্ভব হবে কি না। 'জয় জগদম্বা' বলে মনে মনে এই প্রার্থনা ক'রে নিলাম যে, আমি যেন তার রূপ-যৌবনে মুগ্ধ হয়ে সংযম না হারাই। সংযমের প্রতিজ্ঞা তখন কঠিন ভাবেই কাজ করছে আর দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়মঠ, মহিনদার আড্ডা, মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গই আমার মধ্যে শক্তি যোগাচ্ছে। মনে সাহস, সুন্দর স্বাস্থ্য—সর্বদা সৎভাবের চিন্তা আমায় সব সময়ে আগলে রাখছে।

বাড়িতে কিন্তু বৌ আনাবার জোর চেষ্টা চলছিল কারণ আমাদের অচলা পিসি, যিনি আমাদের ভাগে পড়েছিলেন, দুবেলা রান্না তাঁর পক্ষে ভার হওয়ায়, তিনি এক বেলার রান্না তার উপর চাপিয়ে একটু হালকা হতে চাইছিলেন। বাবাও পিসির উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সমর্থক ও সিদ্ধির সহায় ছিলেন কিন্তু আমি একটু বাঁকা ছিলাম বলেই চট ক'রে তাকে আনানো হয় নি। কিন্তু আর আমার মতামত গ্রাহ্য করা চলবে না ওদের, ষড়যন্ত্রের এই কথাটা আমায় মা চুপি চুপি বলে দিলেন। আমি আর কি করতে পারি,—এ সংসারের বিধাতার বিধান আমায় মাথা পেতেই নিতে হবে। যা হবার তা হবে ভেবে নিজ কর্মে গাঢ় অভিনিবিষ্টই রইলাম।

একদিন ঠাকুরদালানে নিজ আসনে বসে গুনগুন ক'রে গান করতে করতে কাজ করছি, 'চিঠি, চিঠি' বলে পিয়ন এক চিঠি ছেড়ে গেল। চিঠিখানা খামের কিন্তু দেখি অতি ছেলেমানুষের হাতের লেখা ঠিকানাটা,—বাইশ নম্বর যেন দু'টো দ, আর আমার নামটার বানান ঠিক নয়,—সব অক্ষর বিশৃঙ্খল, ভাবলাম এ আবার কোথা থেকে এল? তাড়াতাড়ি খুলে দেখি একখানা এক্সাইজ বুকের পাতা ছিঁড়ে লেখা। উপরে শ্রীশ্রীদুর্গা দিযে আরম্ভ, তার নীচে, সহায়, কথাটাও আছে। শ্রীশ্রীচরণেষু বলে সম্বোধন করা,—তার পর যা লেখা আছে তা পড়ে আমার বুক ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে উঠল। তা উঠুক, কিন্তু আমায় তা বলতেই হবে। যা লেখা ছিল তা এই,— একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, বাঘ যন্ত্রণায় ইত্যাদি ইত্যাদি কথামালার বাঘ ও বকের গল্পের প্রথম প্যারা অতি কষ্টে লেখা এবং পড়াও গেল ততোধিক কষ্টে,—কোন ছেদও নেই বা কোন অক্ষরে মাত্রাও নেই, শব্দ শৃঙ্খলার কোন বালাই নেই। সব শেষ এই লাইনটি লেখা আছে,—চিঠির উত্তর দিও, ইতি তোমার দাসী শ্রীমতী সরোজিনী দাসী, প্রাণনাথ আমি তোমারই দাসী, থাকোমণি। পাছে ভালো নামে চিনতে না পারি

তাই ডাকনামটাও দেওয়া হয়েছে। চমৎকার ব্যাপারটা, কী অদ্ভুত বিস্ময়বোধ আমায় স্তম্ভিত ক'রে দিলে।

সে যাই হোক, এই হ'ল আমার জীবনের দ্বিতীয় প্রেমময়ীর প্রথম প্রেমপত্র। এতদিন পর আমার কাছ থেকে কোন পত্র না পেয়েই পত্র লিখেছেন। তাঁর প্রথম ভাগ অবধি পড়া, এটুকু বিদ্যায়ও স্বামীকে পত্রলেখা আটকায় নি। অবশ্য এ পত্রের উত্তরে পত্র না দিয়ে, যেহেতু লিখে উত্তর দেবার কিছুই ছিল না, যেতে হ'ল ব্যাপারটা কি জানতে। কিন্তু তাতে তিনি যে সুখী হলেন না, তা বোঝা গেল তাঁর প্রশ্ন দেখে। দেখা হতেই জিজ্ঞাসা করলেন, আমার চিঠি পেয়েছিলে? স্বীকার করলাম, তখন আবার প্রশ্ন,— উত্তর দিলে না কেন? আমি বললাম, এই তো আমি এসেছি।

চিঠির জবাব না দিয়ে এলে কেন? এ প্রশ্নে আমায় কি বুঝতে হবে?

জানি না, আমার আসাটা যে ভুল হয়েছে সেটা তাঁকে বোঝাতে পেরেছিলাম কিনা; তবে তাঁর এই প্রথম প্রেমপত্রখানির অন্ত-র্নিহিত যে রহস্যটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল অনেক প্রশ্নের পর তা প্রকাশিত হ'ল এই সূত্রে এবং তা এই যে,—তাঁর বড় বৌদি প্রেমপত্র লিখতে একজন মহাদক্ষ লোক। বটতলা থেকে প্রকাশিত একখানি, সচিত্র প্রেমপত্র, তাঁর অধিকারে আছে এবং তিনি যখন বাপের বাড়ি যান তাই দেখে তাঁর স্বামীকে পত্র দিয়ে থাকেন। আর, স্বামীটি তাঁর, কবিতা লেখেন সুতরাং তার বৌদিদি কবিতায় সেইসব পত্রের উত্তর পেয়ে থাকেন। এখন আমাদের এতদিন বিবাহ হয়েছে, কোন পক্ষ থেকে কোনপ্রকার পত্রালাপ নেই, বড় বৌদিটি তাঁকে বিধিমতো প্রকারে বুঝিয়েছেন যে এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। আর স্বামীর পত্র না পেলেও স্ত্রীর পত্র লেখা উচিত, না লিখলে পুরুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। তাই এখন যখন আমি (এলাহাবাদ) প্রবাস থেকে ফিরে এসেছি এই হ'ল উপযুক্ত সময়

পত্র দেবার। তা যেন হ'ল, কিন্তু কি দেখে লেখা যাবে, বড় বৌদির নিজের বইখানি তো তোরঙ্গের মধ্যে চাবি দেওয়া। চিঠি না লেখার জন্য তিনি অনুযোগ করতেই পারেন যথা, চিঠি লিখিস না তাই চিঠি পাস না, আমরা লিখি, তার উত্তরও পাই, কিন্তু নিজের বইখানি দিতে পারেন না। বয়সে ছোট বলে মুখ ফুটে চাইতেও তো লজ্জা করে? তাই নিরুপায় হয়েই সামনে যা পেয়েছেন ছোট ভাইয়ের পড়বার বই কথামালাখানি নিয়ে, যেহেতু তার মধ্যেও তো অনেক কথা ছাপা আছে। ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে খুব গোপনে প্রথম গল্পের এক প্যারা লিখে, আর চিঠিতে উত্তর দেবার অনুরোধ ক'রে কর্তব্য শেষ করেছেন। বাড়ির কেউ জানে না, আর ছোট ভাইটিকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে উত্তরে স্বামীর পত্র পাবার আশায় দিন গুণছেন। এই কারণেই আমার আবির্ভাবের চেয়ে আমার পত্রই ছিল অভিপ্রেত। এই হ'ল প্রথম প্রেমপত্রের রহস্য। বৌদিদির সেই সচিত্র প্রেমপত্রের মধ্যে যা সব লেখা আছে তার মধ্যে কেবল, প্রাণনাথ, কথাটি মনে ছিল, পত্রে তাই শেষকালে লেখা হয়েছিল। নিজ নামের শেষে দাসী লিখেছ কেন, একথা জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারি নি। তার উত্তর হ'ল, আমি তো তোমার দাসী তাই নিজের নামের পরেও দাসী দিয়েছি। তুমি বেটাছেলে, লেখাপড়া জানো, আর একথাটা বুঝতে পারলে না? আমায় আবার জিজ্ঞাসা করছ, কেন? আমি মুখ্যু বলে কি এতটুকুও জানি না মনে করো?

এখন এই পত্র পাবার পর আর তাকে বিদ্যাশিক্ষাহীন মনে করবার পথ রইল না, নিজ অধিকার বুঝে নিতে মেয়েদের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বিদ্যাই যথেষ্ট—এর বেশী না হলেও ক্ষতি ছিল না, প্রমাণিত হয়ে গেল। এই যে প্রথম পত্র তার মধ্যে আমার এই জীবন-সাঙ্গনীর প্রকৃতির যে পরিচয় ছিল পরবর্তী দীর্ঘকালে তা আমার ধর্মজীবনেও যতটা, সংসার জীবনেও ততোধিক কার্যকরী

হয়েছিল। এই ঘটনার পর আমাদের বাড়ি থেকে তাঁকে আনা হ'ল ঘর করতে এবং এখন থেকে আমাদের সংসারের একবেলার রান্নার কাজ তার উপর চাপিয়ে অচলা পিসি তাকে দক্ষ গৃহিণী ক'রে তোলবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন। আমারও প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ঐ বাড়িতে। কানাঘুষা চলছিল বাড়িখানি কাকাবাবুর দেনার দায়ে বাঁধা পড়েছে। ঠাকুমার নামে বাড়ি। বাবাও নিজের অংশ রক্ষার জন্য যা দরকার তা করেছেন ঠাকুমার সাহায্যে।

তখন থেকেই অর্থাৎ ১৯১১ সালের শেষ দিক থেকে অধিকাংশ সময় পর্যটনেই কাটত, অসুস্থ না হ'লে বাড়ি ফিরি নি। এইভাবে বাইরে থাকার ফলে একজনের পক্ষে কষ্ট হলেও আর সবার পক্ষে আমি বাইরের লোকের মতোই হয়ে গিয়েছিলাম। এইভাবে তখন থেকেই বলতে হবে জোড়াসাঁকোর বাড়ির সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হবার দিন ঘনিয়ে আসছিল।

এখন ফটিকদার সঙ্গে কালীপুজোর রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে কাটিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রভাতে যখন ফিরে আসি, আমার মাথাটা একটু ভার-ভার বোধ হ'ল, গ্রাহ্য না ক'রে স্নানাহার করেছি, তারপর বেরিয়ে পড়লাম আমাদের আড্ডায়। সেইখানেই সন্ধ্যায় কম্প দিয়ে জ্বর এল, প্রবল জ্বর আর কম্প দেখে ম্যালেরিয়া সাব্যস্ত হ'ল। একাদিক্রমে ছয়টি মাস কাল ধরে চলল ভোগ-ভোগান্ত। এই ছ'মাসের ইতিহাস চমৎকার ; দু-চার দিন ভালো থাকি আবার জ্বর-ভোগ চলে কয়েক দিন। আমার এই অসুখ স্ত্রীর পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়েছিল, বুঝলাম তার ভাবগতিক দেখে। সাত-আট দিন জ্বর ছাড়ে না অথচ বাড়ির কেউ গা করে না, ডাক্তারও আসে না, কোন চিকিৎসার ব্যবস্থাই নেই দেখে সে চিঠি লিখে বড় ভাই ও তার পিতৃদেবকে ডাক্তার সঙ্গে হাজির করিয়ে ছাড়লে। আমার পিতৃদেব চুপচাপ, কারো সঙ্গে দেখা করলেন না, বেয়াইয়ের সঙ্গেও নয়। ম্যালেরিয়ায় কুইনিন ছাড়া ঔষধ নেই। কাজেই কঠিন

জোলাপ আর তাই-ই চলতে লাগল। যখনই ভালো থাকি তখন রাজেনদা'র মাস্টারদের অপরূপ মূর্তির ছবি দুখানি আঁকি, আর প্রায় সব সময়েই মনে মনে ঐ সব অধ্যাত্ম গুরুর আলোচনাই চলে। এক এক রাত্রে, প্রবল জ্বরের সময়ে মুখ দিয়ে অনর্গল ইংরাজী বক্তৃতা বার হতে থাকে। যেন এক ঘর লোক; দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি। সঙ্গিনী ভয় পেয়ে সারারাত জেগে, মাথায় হাওয়া ক'রেই কাটায়। সকালে তার সংসারের রান্নার ডিউটি থাকে না, কেবল কুটনো কুটে রান্নার যোগাড় ক'রে দিয়ে এলেই খালাস, রাত্রেই তাঁর রান্নার পালা, তাই দিনমানে সেবার কাজ চলে ভালো। রাত্রেই জ্বরটা প্রবল থাকে, নিঝুম ভাবে থাকি, কত কি দেখি, কত ভাবে ভাসতে থাকি। মধ্যে একবার জ্বর যখন পাঁচ-ছয় দিন বন্ধ ছিল তখনই মাস্টারদের ছবি দুখানা শেষ করলাম। তারপর অন্ন-পথ্যের পরদিন মহা উৎসাহে একেবারে রাজেনদার বাড়িতে মদন ও ফটিকদার সঙ্গে হাজির হলাম ছবি নিয়ে। আমার জ্বরের কথা শুনে তিনি কেবলমাত্র এই কথা কয়টি বললেন,—যে দুই মহাপুরুষের ছবি আজ আঁকলি সেটা তোর ধর্মজীবনের একটা ধাপ বলেই মনে রাখিস। আর তোর জ্বর যদি না হ'ত তা হ'লে আমি মনে করতাম তুই কিছুই পাস নি। ওঁদের কৃপা সহ্য করার শক্তি সবার থাকে না। ঐ জ্বরের ভিতর দিয়ে কি পেয়েছিস এখনই বুঝতে পারবি নি, যাক আরও কিছুদিন।

আর কিছু বুঝি না বুঝি যতবারই প্রবল জ্বর এসেছে, আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে ডুবে গেছি, তারপর আমি এক যেন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে অপূর্ব জ্যোতির আভাস পেয়েছি আর যখন সে অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে একটু বাহ্য চৈতন্যরাজ্যে ফিরে আসছি তখনই ক্ষণেকের জন্য শুভ্রবর্ণ এক দেবমূর্তির দর্শন পেতাম। উজ্জ্বল তামার রং, দীর্ঘ কেশ, শ্মশ্রু ও গোঁফ, প্রসন্নবদন—তারই মধ্যে মৃদু হাসির আভাস—যেন শিবের মূর্তি। তারপর সম্পূর্ণ বাহ্য হলে কি

আনন্দই পেয়েছি তা আর বলবার নয়। একথাও রাজেনদাকে বলেছিলাম। তিনি শুধু বললেন,—আচ্ছা আচ্ছা, আর এসব আলোচনায় কাজ নেই। আর কোন কথাই বললেন না, আমি তাঁর ইঙ্গিত বুঝলাম—সবার কাছে এসব আলোচনা করবার নয় সুতরাং আর কিছুই বললাম না।

এক দুই ক'রে ছয় মাস কেটে গেল। বড় জোর এক সপ্তাহ মাত্র ভালো থাকি তারপর আবার জ্বর আসে, আবার চার-পাঁচ দিন ভোগ চলে। এটা দেখেছি, আমি সেরে গেছি মনে ক'রে হয়তো যখনই তানপুরা ছেড়ে গান আরম্ভ ক'রে দিলাম, সর্বদাই এক ভক্তি রসে প্রাণ আমার ভরা থাকত। কয়েকখানি নূতন গান রচনা ক'রে ফেলেছিলাম, তারই খুব কসরত চলত। সেই গানে একটা মত্ততা আনত, আর সন্ধ্যার পর অফিসের কাজ সব সেরে ফটিকদা যেদিন আসতেন সে রাত্রে বহুক্ষণ অবধি গান চলত, যতক্ষণ না পর্যন্ত ফটিকদা চলে যেতেন ততক্ষণ গানের ধারা থামত না। বোধ হয় সেই রাত্রেই না হয় ঠিক পরদিন কম্প দিয়ে প্রবল জ্বর আরম্ভ হয়ে যেত। ঐ জ্বরাবস্থায় যাকে পেতাম, হয়তো ছোট ভাই এসেছে অথবা যখন শালারা শ্বশুরবাড়ি থেকে অথবা অভয় এসেছে দেখতে, তাদের ধরেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি অধ্যাত্ম-গুরুদেবের কথা আরম্ভ ক'রে দিতাম, একটা উন্মাদনা এসে যেত বলতে বলতে। যারা শুনত তারাও মুগ্ধ হয়ে শুনত, তাদের যে ফিরে যেতে হবে, তা মনে থাকত না। তারপর, সে সময়ে বাইরে দালানে যেখানে কাজ করি সেখানে তো যেতে পারতাম না, প্লেট ভরা রং, কাগজ প্রয়োজনীয় সব কিছুই এই শোবার ঘরে আনিয়ে রেখেছিলাম—যখনই ইচ্ছা হ'ত বিছানায় বসে বসেই কাজ করতাম। এই সময়েও কম কাজ করি নি। থাকোমণির একখানা পোর্ট্রেটও চুপি চুপি এঁকে ফেলেছিলাম। তিনি আবার ঘরের দরজায় খিল না এঁটে

সিটিং দিতেন না, পাছে ভগিনীরা অথবা কোন গুরুজন দেখে ফেলে। কয়েকটি ডিজাইনও করেছিলাম, প্রায় আট নয়খানি কাজ ঐ অবস্থায় শেষ করেছি। পরে যেসব বিক্রি হয়েছিল, তা আমার ভ্রমণের সাহায্য করেছিল।

ছয় ছয় মাস ভুগছি—কিছুতেই জ্বরের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই, জীবন যেন দুর্বহ হয়ে উঠেছিল; ছবি আঁকাও আর ভালো লাগছিল না।

এইবার থাকোমণি এগিয়ে এসে আমায় মুক্তির, বিশেষত এই উৎকট রোগমুক্তির পথ দেখালে। আর তো পারা যায় না—এ অবস্থায় একদিন সকালে বাইরে বসে ভাবছিলাম কি করি। তার কাজকর্ম সেরে আমার ছোট ভাইকে দিয়ে বাইরে থেকে আমায় ডাকিয়ে আনালে। একটু বিরক্ত হয়েই আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হুকুম?

সে চিরদিনই বেশী কথার মানুষ নয়, বললে,—মাথায় হাত দিয়ে দালানের সিঁড়িতে বসেছিলে কেন? বললাম, এ জ্বর তো সারছে না, ক্রমে ক্রমে বেশ দুর্বল ক'রে ফেলছে, জানি না এই-ভাবেই শরীর ছাড়তে হবে কি না? তখন সে বলে কি,—আমার একটা কথা শুনবে? অধীর হয়েই বললাম, গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথাটাই বল না।

ইতিমধ্যে বলতে ভুলে গেছি, সে গোপনে কয়েকখানি পুস্তক পাঠ এবং ভায়া শিক্ষায় কতকটা অগ্রসর হয়েছে। সে বললে, কিছুদিনের জন্যে তুমি নবদ্বীপে গিয়ে থাকো, আমি নিশ্চয় বলছি সেখানে তুমি সেরে যাবে।

আমার শাশুড়ী, বাপের একটিমাত্র মেয়ে, নবদ্বীপের যুগনাথ-তলা অধিবাসী হরনাথ ভট্টচায্যিমশাই তাঁর বাবা। তিনি মারা যাবার পর থেকেই আমার দিদি-শাশুড়ী তাঁর মেয়ের সংসারে প্রধান হয়ে আছেন। নবদ্বীপের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাওয়া-

আসা করেন। এখন তিনি সেইখানে আছেন, তাই সে আমায় সেখানে পাঠাতে চায়। কতবড় ত্যাগ এটা তার অর্থাৎ এ বাড়িতে সে একলা থাকবে আমার সঙ্গ ছাড়া হয়ে, কারণ শ্বশুর-শাশুড়ী দেবর ননদ পিসিরা যে ব্যবহার করতেন তা তো বলবার নয়। বিশেষত আমি উপার্জন ক'রে আমাদের সংসারের আনুকূল্য কিছুই করতে পারি না, তাই বাবার উপেক্ষা তো ছিলই পরন্তু বাড়িতে বাইরের লোকের মতো থাকায় সবারই যেন একটা আক্রোশ আর বৈরীভাব আমার উপর ছিল, আমার জীবন-সঙ্গিনীরও দুর্গতির সীমা ছিল না। এমন কি তার বিবাহের গহনা-গুলিও তার ছিল না, সবগুলি বাবা অধিকার ক'রে রেখেছিলেন, তাকে ব্যবহার করতেও দেন নি, সংসারে দেবার মতো আমার উপার্জন ছিল না ব'লে। আমার মেজ ভাইটি তখন চাকুরীতে ঢুকে ছিল, মাসিক কিছু টাকা বাবার হাতে দিত কাজেই আমার উপর আক্রোশটা বেশী হবারই কথা। যাই হোক, এখন প্রাণের দায়ে আমায় নবদ্বীপে পাঠাতে চায়। আমি ভালো হয়ে যাবো স্থান পরিবর্তনে একথা ডাক্তারও নাকি তাঁদের কাছে বলেছিল তাই এই শুভ আয়োজন। সেখানে সকল কিছুই সুবিধা হবে, আমার কোন কষ্টই হবে না, এমন ব্যবস্থা হয়েছে গঙ্গাস্নানও হতে পারবে, আর অসুখটাও সারবে। ইতিমধ্যে ভাইদের মারফতে সকল ব্যবস্থাই ঠিক ক'রে ফেলেছে, আমার মত হ'লে এই শনিবারেই বিকালে যাত্রা করতে পারবো, শ্বশুরমশাই এসে আমায় নিয়ে যাবেন।

হঠাৎ মনে পড়ল, সেই প্রথম ভাগ অবধি বিদ্যা যার,—একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, এই যার প্রথম প্রেমপত্র, এখন না হয় আর একটু অগ্রগতি হয়েছে, সেই মেয়েটি এখন এতটা কল্যাণ-বুদ্ধি ধরে, আমার জন্য এতটা ভাবনা শুধু নয়, নিরাময়ের ব্যবস্থা পর্যন্ত ক'রে বসে আছে ভাবতেই কেমন অদ্ভুত লাগে। বিদ্যা আমাদের ঘরের মেয়েদের কোন্ কাজে লাগে? তবে এটা সত্য,

কুমারী অবস্থায় ওটা উৎকৃষ্ট অকুপেশান, সংসারে প্রবেশ করবার পর লেখাপড়াটা ওদের হিসাবের বুদ্ধিকে বাড়ায়, তার চেয়ে বড় বেশী কিছু হয় কিনা সন্দেহ। বিদ্যার আসল যেটা,—সহজ বুদ্ধি, সেটা এঁদের জন্মগত সংস্কার।

সকল দিকে অনুকূল যোগাযোগ, এই তো ঠিক ঘর ছাড়বার কাল। আশ্চর্য যোগাযোগের ফলে হঠাৎ গুরুলাভও ঘটে গেল। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে প্রবল উদ্দীপনা। নিষ্কৃতি—ভোগজীবন, স্বার্থময় সংসারের কর্মজীবন থেকে মুক্তির আনন্দে বিহ্বল চিত্ত, তবুও কাকেও আভাসে কিছুমাত্র জানাই নি যে এবার আমার শেষ এবং সার্থক পলায়ন।

ঠিক পূর্বদিনে, কেমন একটা সাধ উঠল মনে—যাবার আগে ফটিকদাকে একবার খাওয়াবো। তখনকার দিনে আগেই বলেছি, ফটিকদার ভগবৎ-ভক্তি এবং বিশ্বাস, আমাদের বান্ধব সমাজে সবাইকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। বিপত্নীক তিনি তখন তাঁর অনুরাগে দীপ্ত উচ্চ সাধকের অবস্থা। ভালোবাসতেন আমায়, এখন প্রস্তাব মাত্রেই রাজী হলেন।

তাঁকে নিয়ে খাওয়া-দাওয়া হ'ল সেদিন দুপুর বেলায়, আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। খাওয়া হয়ে গেলে একটু বিশ্রামও করলেন, দেখলাম বেশ ভাব-তন্ময় অবস্থা। হঠাৎ কথার মাঝে বলে বসলেন,—এবার ঘর ছাড়বার আয়োজন বুঝি ?

আমি তো অবাক! মুখে আমার কোন কথাই নেই—চুপ ক'রেই রইলাম। তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়লেন,—ঠাকুর কি কাকেও বিবাহ ক'রে, স্ত্রী রেখে ঘর ছাড়তে বলেছেন ? এই তো ক'বছর বিবাহ করেছিস, অথচ বরাবরই আলাদা রয়েছিস, বেশ তো ক্রিয়াকর্ম নিয়ে আছিস। আর সে তো কোন বাধাই সৃষ্টি করে নি, এখন আবার ঘর ছাড়া কেন ? এটা বাড়াবাড়ি নয় কি ? এত কথার পর আমি বললাম,—তুমি কি জানো না যে কি ভয়ানক

পরিবেশের মধ্যে রয়েছি, এখানে থাকলে ইহজন্মে আমার আর কিছু হবে কি ? শুনে তিনি বললেন,—যার হবার তার এখানেই হবে।

তখন আসল কথাটা বললাম,—তুমি ঠাকুরের কথা বলেছিলে; —ঠাকুর কি এ কথাটা পুনঃপুনঃ সবাইকে জিগির দিয়ে বলেন নি যে, সংসারে মন লাগাবার আগে যেমন তেমন ক'রে কোলাহলের বাইরে গিয়ে, নির্জনে ভজন সাধন ক'রে আগে তাঁকে লাভ করতে হবে। ইষ্টই তিনি,—সেই ইষ্টলাভ ক'রে তখন যা খুশী করো, ভুল হবে না। এটা তিনি প্রত্যেকের জীবনের প্রধান কাজ বলেছেন, আর সময় থাকতে থাকতেই করতে বলেছেন। যতদিন ছিলেন ততদিন প্রত্যেককে সাহায্য করেছেন যাকেই মুমুক্ষু দেখেছেন। জানো না কি এ সব ?

তা ছাড়া আমি তো একেবারেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছি না। তারপর আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র আয়ুর কথাটা বললাম, —এখন প্রায় ছাব্বিশ, এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার জীবন সার্থক যাতে হয় তা করতেই হবে আমায়; সাধারণ একজন অজ্ঞান ভোগকীট কামিনীকাঞ্চনের দাস হয়ে মরা এটাও হবে না, জেনো ঠাকুর আমার সহায়।

ব্যাস মোক্ষম উত্তর—আর একটিও প্রতিবাদের ভাষা নেই তাঁর মুখে। বুঝলাম এটিও তাঁর দয়া, তাঁর অভিপ্রেত কাজে কোন বাধাই থাকতে পারে না।

এর পরদিনই শুভ যাত্রা—সাতটি বছর মুক্ত জীবনে যে আনন্দ তা প্রকাশের ভাষা নেই। তবে এইটুকু বলতে লোভ হয়—যেমন পাখি একটা, খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণ ভরে একবার এদিক ওদিক চারদিকের মুক্ত বায়ুমণ্ডলে উড়ে বেড়ায়—তারপর ক্লান্ত হয়ে একটি বৃক্ষ আশ্রয় করে, আমারও তাই হয়েছিল। একচোট প্রাণ ভরে ঘুরে নিলাম প্রথমে, সাধনে নামবার আগে। প্রথম

দু'তিন বৎসর তীর্থ, অতীর্থ, পর্বত ও সমতল ক্ষেত্রে, এদেশ ওদেশ ক'রে মহা আনন্দে উচ্ছ্বসিত প্রাণে. ভদ্রাভদ্র জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করলাম তার মধ্যে সাধু সঙ্গও আছে। শেষে এক মহামাত্মা সিদ্ধ অবধূত আমায় কৃপা ক'রে ভ্রমণের চাঞ্চল্য ঘুচিয়ে দিলেন। তারই প্রেরণায় আমি স্থির হলাম এবং শ্রীবৃন্দাবনে আসন ক'রে যথার্থ সাধনমার্গে প্রবেশ করলাম। সে কথা স্বতন্ত্র।)

১৯১৮ সালের মাঝামাঝি আমি আবার ফিরে এলাম। তারপর আমার গৃহস্থ জীবন, সেটা শিল্পজীবনেরই কথা।